কবিমানসী

প্রথম খণ্ড : জীবনভাষ্য

জগদীশ ভট্টাচার্য

৪২, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

বিশ্বভারতীর প্রাক্তন সহকারী-কর্মসচিব
স্বর্গত কিশোরীমোহন সাঁতরা মহাশয়ের স্মরণে
তদীয় সহধর্মিণী শ্রীমতী অমিয়া দেবীর
করকমলে

ভূমিকা

১

কবিমানসী রবীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ কবিজীবনী। 'কবিকথা'য় কথিত কবির 'স্বপন-মুরতি গোপনচারী' কবিসত্তার পরিচয়লাভই এ গ্রন্থের মুখ্য উদ্দেশ্য। রবীন্দ্রনাথের সারস্বতলীলা সমগ্রভাবে এক অপূর্ব মহাকাব্যের মহিমা লাভ করেছে। রবীন্দ্রনাথের জীবনও একখানি আশ্চর্য মহাকাব্য। মধুররসই সেই মহাকাব্যের অঙ্গিরস। বর্তমান গ্রন্থে আমরা নানা-রস-সমন্বিত রবীন্দ্র-জীবন-মহাকাব্যের সেই অঙ্গিরসেরই রহস্য উন্মোচনের চেষ্টা করেছি। গ্রন্থের প্রতিপাদ্য প্রথম অধ্যায়ে বিবৃত হয়েছে। সুতরাং এখানে তার পুনরুল্লেখ বাহুল্য মাত্র। কবিমানসী দুই খণ্ডে প্রকাশিত হবে। প্রথম খণ্ড জীবনভাষ্য, দ্বিতীয় খণ্ড কাব্যভাষ্য। কাব্যভাষ্য তিন পর্বে বিভক্ত: প্রেমচেতনা, সৌন্দর্যচেতনা ও জীবনদেবতা-চেতনা। গ্রন্থের প্রতিটি খণ্ডই স্বয়ংসম্পূর্ণ।

রবীন্দ্রনাথের পূর্ণাঙ্গ জীবনচরিত রচনায় শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় দুঃসাহসী পথিকৃৎ। চার খণ্ডে প্রায় দুহাজার পৃষ্ঠাব্যাপী তাঁর 'রবীন্দ্র-জীবনী' একখানি মহাগ্রন্থ। সম্ভবত বাংলা জীবনী-সাহিত্যের বৃহত্তম গ্রন্থ। সুদীর্ঘ দিনের পরিশ্রমে বহুমুখী রবীন্দ্র-জীবনের অজস্র তথ্যরাজি সযত্নে সংকলন করে তিনি তাঁর গ্রন্থখানি রচনা করেছেন। রবীন্দ্র-তীর্থের কৌতূহলী ও শ্রদ্ধাবান পরিব্রাজক মাত্রেরই তিনি নমস্য। তাঁর কাছে আমাদেরও ঋণের সীমা নেই।

কিন্তু রবীন্দ্রমানসের বিচারে আমরা প্রভাতকুমারের সঙ্গে একমত হতে পারি নি। কাদম্বরী দেবীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক এবং কবিজীবনে তার তাৎপর্য নির্ণয়ে প্রভাতকুমার দোলাচল চিত্তবৃত্তির পরিচয় দিয়েছেন। 'রবীন্দ্র-জীবনী'র প্রথম খণ্ডের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায়, ১৩৪৩-এর অগ্রহায়ণে। তাতে প্রভাতকুমার লিখেছিলেন, "রবীন্দ্রনাথের বয়স যখন ছয় কি সাত তখন জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পত্নী তাঁহাদের সংসারে বধূরূপে প্রবেশ করেন (১২৭৫)। তাহার পর মাতা সারদা দেবীর মৃত্যুর পর এই বৌঠাকুরাণী মাতৃহীন শিশুদের মাতৃস্থান গ্রহণ করিয়াছিলেন।" [পৃ° ১৫০-১৫১]। রবীন্দ্র-জীবনী প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় রবীন্দ্রনাথের

তিরোধানের প্রায় পাঁচ বৎসর পরে, ১৩৫৩ সালের বৈশাখে। ততদিনে রবীন্দ্রনাথের সমগ্র রচনাবলী জীবনীকারের সম্মুখে বর্তমান রয়েছে, সাময়িকপত্রের পৃষ্ঠা থেকে অনেক অচলিত রচনা আবিষ্কৃত হয়েছে, এবং রবীন্দ্র-জীবন সম্পর্কে অনেক নূতন তথ্য সংকলিত হয়েছে। প্রভাতকুমার তাঁর বক্তব্য ঈষৎ সংশোধন করে লিখলেন, "রবীন্দ্রনাথের বয়স যখন সাত বৎসর তখন কাদম্বরী দেবী বালিকা বধূরূপে এই গৃহে প্রবেশ করেন। তারপর মাতা সারদা দেবীর মৃত্যুর পর তিনিই মাতৃহীন শিশুদের মাতৃস্থান, বন্ধুস্থান গ্রহণ করিয়াছিলেন।" [পৃ° ১৫১]। লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, প্রথম সংস্করণের "মাতৃস্থান" দ্বিতীয় সংস্করণে হয়েছে "মাতৃস্থান, বন্ধুস্থান"। কিন্তু প্রভাতকুমারই বলেছেন, "'অকাশপ্রদীপে'র শ্যামা, কাঁচা আম, 'নবজাতকে'র বধূ প্রভৃতি কবিতার মধ্যে তাঁহারই [কাদম্বরী দেবীরই] কথা নানা সুরে ধ্বনিয়াছে।" [প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ° ১৫৩]। অথচ 'আকাশপ্রদীপে'র "শ্যামা" ও "কাঁচা আম" প্রভৃতি প্রেমের কবিতা যে "মাতৃস্থানীয়া" কোনো নারীকে অবলম্বন করে লেখা চলে না, প্রভাতকুমার সেকথা ভুলে গিয়েছেন। তাই তাঁর রচনায় রসাভাস ঘটেছে।

আসলে প্রভাতকুমার তলিয়ে দেখেন নি যে, আমাদের পারিবারিক জীবনে সমবয়স্ক দেবর ও ভ্রাতৃবধূর যে-সম্পর্ক স্বভাবতই অতি মধুর, রবীন্দ্রনাথের জীবনে তা মধুরতম রূপ নিয়েই দেখা দিয়েছিল; এবং রবীন্দ্রনাথের সারস্বত সাধনায় তা নিগূঢ় প্রেরণারূপে ক্রিয়াশীল হয়েছিল। বস্তুত, কাদম্বরী দেবীর প্রতি তরুণ রবীন্দ্রনাথের হৃদয়ানুরাগই তাঁর জীবনের গভীরতম উপলব্ধি এবং কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুই রবীন্দ্র-জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। সম্প্রতি [৭ আগস্ট ১৯৬১] রবীন্দ্রনাথের পরমাত্মীয় শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ কৃপালনি-রচিত 'Tagore : A Life' নামে রবীন্দ্রনাথের একখানি জীবনী-গ্রন্থ ইংরেজিতে নয়াদিল্লীর 'মালঞ্চ' থেকে প্রকাশিত হয়েছে। এই গ্রন্থখানি তাঁর আশু-প্রকাশিতব্য পূর্ণাঙ্গ রবীন্দ্র-জীবনীর সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। এই গ্রন্থে শ্রীযুক্ত কৃপালনি রবীন্দ্র-জীবনে কাদম্বরী দেবীকে বলেছেন, "a playmate and guardian angel." [পৃ° ২৫]। রবীন্দ্র-জীবনে কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুর তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে তিনি বলেছেন, "...no other loss ever had so profound an impact on his mind and his genius. It did not

break him, it made him." [পৃ° ৫৫]।—কতো সংক্ষিপ্ত অথচ কতো তাৎপর্যপূর্ণ এই উক্তি!

রবীন্দ্র-জীবনের নবাবিষ্কৃত তথ্যরাজির আলোকে কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুই যে কবিজীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, এ সত্য আজ দিবালোকের মতোই স্বচ্ছ হয়ে উঠেছে। তাই দেখতে পাই বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষ রবীন্দ্রশতবর্ষপূর্তি গ্রন্থমালার অন্তর্ভুক্ত 'বিচিত্রা' নামক 'রবীন্দ্র-রচনা-সঞ্চয়ে' 'জীবনস্মৃতি' থেকে যে একটিমাত্র প্রসঙ্গকে অখণ্ড ভাবে গ্রহণ করেছেন তা হল 'মৃত্যুশোক'। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে সহৃদয় রসিকসমাজ ও বিদগ্ধজনের দৃষ্টিভঙ্গির যে পরিবর্তন হচ্ছে এটিও তার একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন।

২

'কবিমানসী'র প্রথম চতুর্দশ অধ্যায় 'শনিবারের চিঠি'তে ধারাবাহিক ভাবে ১৩৬৪ সালের অগ্রহায়ণ থেকে ১৩৬৬ সালের আষাঢ় মাসে প্রকাশিত হয়েছিল। তারপর অনিবার্য কারণে প্রকাশ দু বৎসর বন্ধ থাকার পর পঞ্চদশ ও ষোড়শ অধ্যায় ১৩৬৮ সালের আষাঢ় থেকে ভাদ্র মাসে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থাকারে প্রকাশে বিলম্ব হওয়ায় একদিক দিয়ে গ্রন্থকারের লাভই হয়েছে। রবীন্দ্র-শতবার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ও রচনারাজির আলোকে প্রয়োজনীয় পরিশোধন ও পরিমার্জন করার সুযোগ ঘটেছে। তন্মধ্যে 'সাহিত্য আকাদামি' প্রকাশিত 'Rabindranath Tagore : A Centenary Volume' গ্রন্থে শ্রীমতী ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর রচনাটি থেকে তথ্য আহরণ করে 'বিজয়া' শীর্ষক ত্রয়োদশ অধ্যায়কে পূর্ণাঙ্গ রূপ দিতে পেরেছি। অন্যান্য রচনার কথা যথাস্থানে যথাসম্ভব উল্লিখিত হয়েছে।

এই গ্রন্থরচনায় পাণ্ডুলিপি আকারে রক্ষিত অমুদ্রিত কোনো উপকরণ ব্যবহার করা হয় নি। কেবল একটিমাত্র ব্যতিক্রম আছে। ১৩৬৮ সালের ১৪ই বৈশাখ 'শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সঙ্ঘে'র উদ্যোগে কলিকাতায় ৬৭ সার্দার্ণ এভিনিউ ভবনের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত রবীন্দ্রনাথের জন্ম-শতবার্ষিক উৎসবে অবনীন্দ্র-ভগিনী শ্রীমতী সুনয়নী দেবী 'রবিকার জন্মদিনে' শীর্ষক যে সভানেত্রীর ভাষণ প্রদান করেন তার একটি চুম্বক বিবরণী ১৫ই বৈশাখের

আনন্দবাজার পত্রিকার অষ্টম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছিল। সেই ভাষণের সম্পূর্ণ অনুলিপি আমাকে সংগ্রহ করে দেন 'আনন্দবাজারে'র তরুণ সাংবাদিক শ্রীমান অমিতাভ চৌধুরী। আমি দুবার সেই উপকরণ ব্যবহার করেছি।

'কবিমানসী' সাময়িক-পত্রিকায় যখন প্রকাশিত হতে শুরু হয় তখন কেউ কেউ আমাকে ভুল বুঝেছিলেন। হয়ত তাঁরা মনে করেছিলেন আমি মূর্খের মতো এমন একটি নিষিদ্ধ এলাকায় প্রবেশ করতে চাইছি যেখানে দেবদূতেরা পর্যন্ত অতি সন্তর্পণে পদক্ষেপ করতে ভয় পায়। হয়তো তাঁদের মনে হয়েছিল আমার রচনার দ্বারা রবীন্দ্র-মহিমা ক্ষুণ্ণ হবে, কবিচরিত্র কালিমালিপ্ত হবে। আসলে রবীন্দ্রনাথ ও কাদম্বরী দেবীর সম্পর্ক নিয়ে তাঁদের চিন্তা ও চেতনা কলুষমুক্ত নয় বলেই তাঁরা এ আশংকা পোষণ করেছিলেন। কিন্তু 'রবীন্দ্র-জীবনী'তে আভাসে ইঙ্গিতে যে-সব কথা বলার চেষ্টা হয়েছে, সত্যের আলোকে তার স্বরূপ নির্ণয় এবং কবিজীবনে তার তাৎপর্য-নিরূপণ একান্ত প্রয়োজনীয় বলেই আমরা মনে করেছি। তাই যথাসম্ভব সংস্কারমুক্ত মন নিয়ে এই আলোচনায় অগ্রসর হয়েছি। এই প্রসঙ্গে 'সনেটের আলোকে মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে যেকথা বলেছি পুনরায় তা স্মরণ করি,—"রবীন্দ্রনাথ বাঙালী জীবনে সূর্যমণ্ডলের অগ্নিবিহঙ্গ-রূপেই বিরাজমান। মর্ত্যলোকে অদিতিবংশের চিরশুদ্ধ এই অগ্নি-শিশুর মর্মকোষে সংগুপ্ত সুধার সন্ধানে অগ্রসর হওয়ার পূর্বে সামাজিকের চেতনাকে কলুষিত কামসংস্কার থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ও পরিশুদ্ধ করেই এপথে অগ্রসর হতে হবে।"[পৃ° ২১৩]।

আলোচনায় ভুলভ্রান্তি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পেরেছি এ স্পর্ধা করা উচিত হবে না। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বমনা পুরুষ, তাঁর সুবিশাল হৃদয়-অরণ্যে প্রবেশ করে দিগ্‌ভ্রান্ত হওয়া অস্বাভাবিক নয়। তা ছাড়া সত্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়ে ভুলের পথ খোলা রাখাই বরং ভালো। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "আমরা ভুল করিতেও সংকোচবোধ করিব না। কারণ, ভুল করিবার অধিকার যাহার নাই, সত্যকে আবিষ্কার করিবার অধিকারও সে পায় নাই। পরের শতশত ভুল জড়ভাবে মুখস্থ করিয়া রাখার চেয়ে স্পষ্টভাবে নিজে ভুল

করা অনেক ভালো। কারণ, যে চেষ্টা ভুল করায়, সেই চেষ্টাই ভুলকে লঙ্ঘন করাইয়া লইয়া যায়।" ["শিক্ষাসমস্যা," 'শিক্ষা']।

গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়ে আমার সঙ্গে সকলেই একমত হবেন এতটা আমি আশা করি না। কিন্তু একথা বিশ্বাস করি যে, শেষ পর্যন্ত সত্যেরই জয় হবে। তাই কবিগুরুর সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে বলতে সাহস পাই :

সত্য যেথা কিছু আছে
বিশ্ব সেথা রয়।

৪

কবিমানসী রচনাকালে প্রত্যাশিত ও অপ্রত্যাশিত বহু ক্ষেত্র থেকে উৎসাহ, সাহায্য ও প্রেরণা পেয়েছি। তন্মধ্যে সর্বাগ্রে স্মরণীয় রাজশেখর বসু মহাশয়ের উৎসাহবাণী। 'শনিবারের চিঠি'তে 'কবিমানসী'র দশম অধ্যায়ের প্রথম কিস্তি প্রকাশিত হবার পর তাঁর কাছ থেকে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবে নিম্নোদ্ধৃত পত্রখানি আমি পাই :

৭২, বকুলবাগান রোড, কলিকাতা-২৫
২৭/১০/৫৮

প্রীতিভাজনেষু
আপনার চিঠি পেয়ে সুখী হলাম। আমার বিজয়ার নমস্কার জানবেন। আপনার লেখা রবীন্দ্র চরিত্র খুব চমৎকার লাগছে।

আপনার
রাজশেখর বসু

বসু মহাশয়ের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল না। আমার বিজয়া-সম্ভাষণের উত্তরেই তিনি এই চিঠি লিখেছিলেন। চিঠিখানি পাবার পর আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করি। সেদিন তাঁর কাছে যে আশীর্বাদ ও উৎসাহ

পেয়েছিলাম তাকেই আমি 'কবিমানসী' রচনার শ্রেষ্ঠ পুরস্কার বলে মনে করি। কবিমানসীকে তিনি বলেছেন 'রবীন্দ্র-চরিত-কথা।' এ গ্রন্থের যোগ্যতর পরিচয় আর কিছু হতে পারে বলে আমি মনে করি না। দুঃখের বিষয় যে, আমার রচনা গ্রন্থাকারে প্রকাশের পূর্বেই তিনি স্বর্গত হয়েছেন।

এই প্রসঙ্গে আমার অগ্রজপ্রতিম সুহৃৎ ও শুভৈষী সজনীকান্ত দাস মহাশয়ের কথাও বারবার মনে পড়ছে। প্রথম দিকে তিনি আমাকে অকুণ্ঠ সমর্থন জানাতে পারেন নি ; আমার বক্তব্য সম্পর্কে তাঁর মনেও সংশয় ছিল। 'আত্মবিসর্জন' শীর্ষক একাদশ অধ্যায় প্রকাশিত হবার পর তাঁর মন সম্পূর্ণ সংশয়মুক্ত হয়, এবং তারপর থেকে তিনি আমার আলোচনার যৌক্তিকতায় পূর্ণ আস্থা স্থাপন করেন। এমন কি আমার বক্তব্যের সমর্থনে রবীন্দ্রনাথের তরুণ বয়সের রচনা থেকে অজ্ঞাত তথ্য আবিষ্কারেও তিনি আত্মনিয়োগ করেন। তারই ফলস্বরূপ তিনি 'শনিবারের চিঠি'র ১৩৬৭ সালের আষাঢ় সংখ্যায় 'রবীন্দ্রকাব্যে প্রথম প্রিয়াসম্ভাষণ' শীর্ষক প্রবন্ধটি রচনা করেন। তাতে তিনি বলেছেন, "শ্রীমান্ জগদীশ ভট্টাচার্য রবীন্দ্রকাব্যজীবনের বিকাশে কাদম্বরী দেবীর যথার্থ স্থান 'শনিবারের চিঠি'তে প্রকাশিত···ধারাবাহিক প্রবন্ধ "কবিমানসী"তে চমৎকার ভাবে নির্ণয় করিয়াছেন। তাঁহারই অদ্যাপি অসমাপ্ত প্রবন্ধের পরিপূরক হিসাবে আমি সম্প্রতি কাদম্বরী দেবী প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যে দুই-চারিটি রচনার সন্ধান পাইয়াছি তাহার পরিচয় দিয়া, এই প্রবন্ধের শিরোনামায় লিখিত প্রসঙ্গের অবতারণা করিব।" [শনিবারের চিঠি, আষাঢ় ১৩৬৭, পৃ° ২৬৬]।

কবিমানসীকে যথাসত্বর গ্রন্থাকারে প্রকাশের জন্যে সজনীদা আমাকে বারবার তাড়া দিয়েছিলেন। আমার পরম দুর্ভাগ্য যে, গ্রন্থখানি আমি তাঁর হাতে তুলে দিতে পারলাম না।

এই গ্রন্থরচনায় পূর্বসূরিবৃন্দের রচনাবলী ছাড়াও আমি আরো অনেকের কাছে সাহায্য পেয়েছি। অধ্যাপক ডক্টর সুকুমার সেন মহাশয় আমাকে বলেছিলেন যে, বিদ্যাসাগরের প্রয়াণ-বৎসরেই আনা তরখড় লোকান্তরিত হন, এবং তাঁর মৃত্যুসংবাদ বাংলা সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। তাঁর কাছে এই ইঙ্গিত পাওয়ার পর ঐ বৎসরের সাময়িক-পত্রিকা ঘেঁটে 'বামাবোধিনী' পত্রিকা থেকে আনা-প্রসঙ্গ উদ্ধার করা আমার পক্ষে সহজসাধ্য হয়েছে।

'আনন্দবাজারে'র তরুণ সাংবাদিক শ্রীমান অমিতাভ চৌধুরী সুনয়নী দেবীর অভিভাষণের একটি অনুলিপি সংগ্রহ করে দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। শ্রীমানকে আমার প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই।

এই গ্রন্থের 'শব্দ-পঞ্জী' রচনা করেছেন আমার প্রিয়শিষ্য, অধ্যাপক শ্রীমান অরুণ বসু। অরুণ শুধু সাহিত্য-রসিকই নয়, ভাস্কর বসু ছদ্মনামে সে একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ গীতিকারও বটে। রবীন্দ্র-সংগীতের রহস্যনিকেতনে সে আমার চোখের আলো। তার উত্তরোত্তর উন্নতির পথে আমার আশীর্বাদ রইল।

আমাদের সর্ব কর্ম চিন্তা ও আনন্দের নেতৃস্থানীয় পুরুষ, বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যক্ষ, শ্রীযুক্ত প্রশান্তকুমার বসু মহাশয় তাঁর অনিঃশেষ উৎসাহ দিয়ে আমাকে অনুক্ষণ অনুপ্রাণিত করে রেখেছেন। সুখে দুঃখে সম্পদে বিপদে তাঁর উদার স্নেহাশ্রয়ের কথা কোনোদিনই ভুলবার নয়।

বঙ্গবাসী কলেজের বাণিজ্য-বিভাগের উপাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় জীবিকাক্ষেত্রে ভিন্নগোত্রের মানুষ হয়েও তাঁর পরিশীলিত মন নিয়ে প্রতি পদক্ষেপে নানা প্রশ্নের দ্বারা আমার বক্তব্যকে বিশদীভূত করে তোলার কাজে প্রভূত সাহায্য করেছেন। বহুভাষাবিৎ পণ্ডিত, আমার পরম প্রীতিভাজন সহকর্মী, অধ্যাপক শ্রীমান বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য তাঁর কবিচিত্তের কৌতূহল ও জিজ্ঞাসা নিয়ে আমাকে চির-অতৃপ্ত করে রেখেছেন। আমার সমপ্রাণ বন্ধু ও সতীর্থ, বাংলা সাহিত্যের লব্ধপ্রতিষ্ঠ অধ্যাপক, শ্রীযুক্ত বিভূতি চৌধুরী প্রথম থেকেই আমাকে দ্বিধাহীন সমর্থন জানিয়ে অকুণ্ঠভাবে এগিয়ে যাবার প্রেরণা দিয়েছেন। খ্যাতনামা কথাশিল্পী, আমার অনুজপ্রতিম অধ্যাপক, শ্রীমান নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রতিপক্ষের দৃষ্টিকোণ থেকে সম্ভাব্য নানা প্রশ্ন উত্থাপন করে আমাকে সর্বদা সতর্ক করে রেখেছেন। 'আচার্য গিরিশচন্দ্র সংস্কৃতি ভবনে'র সহকর্মী অধ্যাপকবৃন্দও এই গ্রন্থরচনায় নানা ভাবে উৎসাহ ও প্রেরণা যুগিয়েছেন।

'শনিবারের চিঠি'তে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশকালে আমার পুত্র-প্রতিম শ্রীমান রঞ্জনকুমার লেখকের খেয়ালখুশিজনিত অনেক যন্ত্রণা হাসিমুখে সহ্য করেছেন। গ্রন্থাকারে প্রকাশ-কালেও তিনি এর উপর সতর্ক দৃষ্টি রেখেছেন।

'কবিমানসী'র প্রকাশক শ্রীযুক্ত গোপালদাস মজুমদার মহাশয় সুষ্ঠুভাবে গ্রন্থখানির প্রকাশ-ব্যাপারে কোনো কার্পণ্য করেন নি। তাঁর কাছে আমি ঋণী। তাঁর অর্থ-ঋণ হয়তো পরিশোধ করা যাবে, কিন্তু তাঁর স্নেহ-ঋণ অপরিশোধ্য।

আমার যৌবনলগ্নে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ-পরিচয়ের সুযোগ করে দিয়েছিলেন বিশ্বভারতীর তৎকালীন সহকারী-কর্মসচিব কিশোরী-মোহন সাঁতরা মহাশয়। গ্রন্থোৎসর্গে পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁকেই স্মরণ করেছি।

রবীন্দ্র-রসিকসমাজে গ্রন্থখানি সমাদৃত হলে পরিশ্রম সার্থক মনে করব।

বঙ্গবাসী কলেজ
৮ বৈশাখ, ১৩৬৯

জগদীশ ভট্টাচার্য

সূচীপত্র

কোনো ক্ষণজন্মা ব্যক্তি কাব্যে ও জীবনের কর্মে উভয়তই নিজের প্রতিভা বিকাশ করিতে পারেন; কাব্য ও কর্ম উভয়ই তাঁহার এক প্রতিভার ফল। তাঁহাদের কাব্যকে তাঁহাদের জীবনের সহিত একত্র করিয়া দেখিলে তাহার অর্থ বিস্তৃততর, ভাব নিবিড়তর হইয়া উঠে। দান্তের কাব্যে দান্তের জীবন জড়িত হইয়া আছে, উভয়কে একত্রে পাঠ করিলে জীবন এবং কাব্যের মর্যাদা বেশি করিয়া দেখা যায়।

কবিজীবনী [সাহিত্য], আষাঢ় ১৩০৮

…কাব্যরচনা ও জীবনরচনা ও-দুটা একই বৃহৎ-রচনার অঙ্গ।

…কবির জীবন যেমন কাব্যকে প্রকাশ করে কাব্যও তেমনি কবির জীবনকে রচনা করিয়া চলে।

…পদ্মের বীজকোষ এবং তাহার দলগুলির মতো একত্রে রচিত আমার জীবন ও কাব্যগুলিকে একসঙ্গে দেখাইতে পারিলে সে চিত্র ব্যর্থ হইবে না।

জীবনস্মৃতি, রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত পাণ্ডুলিপি, ১৩১৮

প্রথম অধ্যায়

"যে-আমি স্বপন-মুরতি গোপনচারী"

১

"The Hero as Divinity, the Hero as Prophet, are productions of old ages; not to be repeated in the new. They presuppose a certain rudeness of conception, which the progress of mere scientific knowledge puts an end to. There needs to be, as it were, a world vacant, or almost vacant of scientific forms, if men in their loving wonder are to fancy their fellow-man either a god or one speaking with the voice of a god. Divinity and Prophet are past. We are now to see our Hero in the less ambitious, but also less questionable, character of Poet; a character which does not pass. The Poet is a heroic figure belonging to all ages; whom all ages possess, when once he is produced, whom the newest age as the oldest may produce;—and will produce, always when Nature pleases. Let Nature send a Hero-soul; in no age is it other than possible that he may be shaped into a Poet."

—Carlyle[১]

কার্লাইল যে সত্তাকে Hero-soul বলেছেন, আমি তাকেই বলেছি 'সূর্যমণ্ডলের অগ্নিবিহঙ্গ'।[২] রবীন্দ্রনাথ বাঙালী-জীবনে সেই Hero-soul, সেই অগ্নিবিহঙ্গ। সেই সত্তা কি প্রেরণায় কবিসত্তায় বিকাশিত ও উন্মীলিত হল, সেই রহস্যকথাই আমাদের বর্তমান আলোচনার উপজীব্য। যে প্রেরণার কথা আমি বলতে চাইছি সেটি আমার স্বকপোলকল্পিত নয়। কবি নিজেই বার বার সেই প্রেরণার কথা বলেছেন। পঞ্চাশ বৎসর অতিক্রম করে আত্মজীবনী লিখতে বসে 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থে পঁচিশ বৎসর পর্যন্ত পৌঁছেই কবি

অকস্মাৎ কথা-বলা বন্ধ করে দিয়েছেন। কেন বন্ধ করেছেন সে সম্পর্কে কবির কৈফিয়ত গ্রন্থের অন্তিম অনুচ্ছেদে অভিব্যক্ত হয়েছে। সেই অনুচ্ছেদের দিকে আর-একবার দৃষ্টি নিবদ্ধ করা প্রয়োজন। কবি বলছেন :

"এবারে একটা পালা সাঙ্গ হইয়া গেল। জীবনে এখন ঘরের ও পরের, অন্তরের ও বাহিরের মেলামেলির দিন ক্রমে ঘনিষ্ঠ হইয়া আসিতেছে। এখন হইতে জীবনের যাত্রা ক্রমশই ডাঙার পথ বাহিয়া লোকালয়ের ভিতর দিয়া যে-সমস্ত ভালোমন্দ সুখদুঃখের বন্ধুরতার মধ্যে গিয়া উত্তীর্ণ হইবে, তাহাকে কেবলমাত্র ছবির মতো করিয়া হালকা করিয়া দেখা আর চলে না। এখানে কত ভাঙাগড়া, কত জয়পরাজয়, কত সংঘাত ও সম্মিলন। এই-সমস্ত বাধা বিরোধ ও বক্রতার ভিতর দিয়া আনন্দময় নৈপুণ্যের সহিত আমার জীবনদেবতা যে একটি অন্তরতম অভিপ্রায়কে বিকাশের দিকে লইয়া চলিয়াছেন তাহাকে উদ্‌ঘাটিত করিয়া দেখাইবার শক্তি আমার নাই। সেই আশ্চর্য পরম রহস্যটুকুই যদি না দেখানো যায়, তবে আর যাহাকিছুই দেখাইতে যাইব তাহাতে পদে পদে কেবল ভুল বুঝানোই হইবে। মূর্তিকে বিশ্লেষণ করিতে গেলে কেবল মাটিকেই পাওয়া যায়, শিল্পীর আনন্দকে পাওয়া যায় না। অতএব খাসমহালের দরজার কাছে পর্যন্ত আসিয়া এইখানেই আমার জীবনস্মৃতির পাঠকদের কাছ হইতে আমি বিদায়গ্রহণ করিলাম।"[৩]

আত্মকথা বলতে গিয়ে কবিমানসে কেন এই দ্বিধা—এ প্রশ্নের উত্তর রবীন্দ্রজীবনজিজ্ঞাসুকে অবশ্যই পেতে হবে। কিন্তু কবি যাকে বলছেন তাঁর জীবনদেবতার একটি অন্তরতম অভিপ্রায় সমস্ত বাধা বিরোধ ও বক্রতার ভিতর দিয়ে আনন্দময় নৈপুণ্যের সঙ্গে তাঁর জীবনে বিকশিত হয়ে উঠেছে, সেই অভিপ্রায়কে জানতে না পারলে কবিকে জানার সব চেষ্টাই নিরর্থক। সেই আশ্চর্য পরম রহস্যটুকুর যবনিকা উন্মোচিত না হলে কবিজীবনের মর্মলোক আর কোন উপায়েই নির্বারিত হবে না। ইতিহাসবাদী তেন্ (Taine)-এর 'the race, the milieu, the moment'-তত্ত্ব যত নিগূঢ়ান্বেষীই হোক না কেন, স্যাঁৎ-বাভ্ (Sainte-Beuve)-এর 'des ames delicates', রবীন্দ্রনাথের ভাষায় জীবনদেবতার সেই অন্তরতম অভিপ্রায়ের রহস্যান্বেষণই কবিজীবনের তীর্থপথে বিগ্রহদর্শনপ্রার্থী পরিব্রাজকের মর্মগত অভিপ্রায়।

কবি নিজেও বার বার সেই কথাই বলেছেন। 'উৎসর্গ' কাব্যগ্রন্থে "কবিকথা" কবিতায় তাঁর আত্মকথা সার্থক কাব্যচ্ছন্দে গ্রথিত হয়েছে :

বাহির হইতে দেখো না এমন করে,
আমায় দেখো না বাহিরে।
আমায় পাবে না আমার দুখে ও সুখে,
আমার বেদনা খুঁজো না আমার বুকে,
আমায় দেখিতে পাবে না আমার মুখে,
কবিরে খুঁজিছ যেথায় সেথা সে নাহি রে।

* * *

নব-অরণ্যে মর্মর-তান তুলি
যৌবন-বনে উড়াই কুসুমধূলি,
চিত্ত-গুহায় সুপ্ত রাগিণীগুলি
শিহরিয়া উঠে আমার পরশে জাগিয়া।

* * *

নাহি জানি আমি কী পাখা লইয়া উড়ি,
খেলাই ভুলাই দুলাই ফুটাই কুঁড়ি,
কোথা হতে কোন্ গন্ধ যে করি চুরি
সন্ধান তার বলিতে পারি না কাহারে।

যে আমি স্বপন-মুরতি গোপনচারী,
যে আমি আমারে বুঝিতে বুঝাতে নারি,
আপন গানের কাছেতে আপনি হারি,
সেই আমি কবি, কে পারে আমারে ধরিতে।[৪]

এই 'স্বপন-মুরতি গোপনচারী' সত্তাকে তাঁর বাণীপ্রকাশের মধ্যে আবিষ্কার করাই কবি-জীবনীকারের মুখ্য কৃত্য। 'কবিকথা'য় কবি বলেছেন, 'কবিরে পাবে না তাহার জীবনচরিতে।' বলাই বাহুল্য, এই জীবনচরিত 'বাহির হইতে দেখা' জীবনেরই তথ্যপূর্ণ কাহিনী। 'মানুষ আকারে বদ্ধ যে জন ঘরে' শুধুমাত্র তার কথাই যে-জীবনচরিতে ধরা পড়ে সেই জীবনীতে কবিকে নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে না। কিন্তু 'সাহিত্য' গ্রন্থের "কবিজীবনী" প্রবন্ধে

রবীন্দ্রনাথ একথাও বলেছেন যে, যাঁরা ক্ষণজন্মা পুরুষ "তাঁহাদের কাব্যকে তাঁহাদের জীবনের সহিত একত্র করিয়া দেখিলে তাহার অর্থ বিস্তৃততর, ভাব নিবিড়তর হইয়া উঠে।"[৫] রবীন্দ্রনাথও ক্ষণজন্মা পুরুষ, তাঁর জীবনচরিতও একখানি অপূর্ব মহাকাব্য। আত্মচরিত লিখতে বসে তিনি বলেছিলেন, "কাব্যরচনা ও জীবনরচনা ও-দুটা একই বৃহৎ-রচনার অঙ্গ।"[৬] সেজন্যেই, "কবির জীবন যেমন কাব্যকে প্রকাশ করে কাব্যও তেমনি কবির জীবনকে রচনা করিয়া চলে।"[৭] আত্মচরিত-রচনা প্রসঙ্গে কবির এই মন্তব্যের সূত্র অনুসরণ করে বলা যায় যে, কবির যে জীবন কাব্যকে প্রকাশ করে সেই জীবনকথাই যথার্থ কবিজীবনী। আর কবির কাব্যই সেই কবিজীবনীকে রচনা করে চলে। সুতরাং কবির "যে-আমি স্বপন-মুরতি গোপনচারী" সেই 'আমি'কে জানতে হলে তাঁর কাব্যরচনার উৎস-সন্ধান করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। রবীন্দ্রনাথ নিজেও তাই করেছিলেন। ১৩১০-১১ বঙ্গাব্দে 'বঙ্গভাষার লেখক' গ্রন্থে (মুদ্রণকাল ১৩১১) যখন তাঁকে আত্মজীবনকথা লিখে দেবার জন্যে অনুরোধ করা হয়, তখন তিনি জীবনবৃত্তান্ত থেকে বৃত্তান্তটা বাদ দিয়ে তাঁর মধ্যে তাঁর অন্তরদেবতার যে একটি প্রকাশের আনন্দ রয়েছে সেই কথাই তাঁর অপূর্ব ভাষায় লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি বলেছেন, "সেই আনন্দ সেই প্রেম আমার সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, আমার বুদ্ধিমন, আমার নিকট প্রত্যক্ষ এই বিশ্বজগৎ, আমার অনাদি অতীত ও অনন্ত ভবিষ্যৎ পরিপ্লুত করিয়া আছে। এ লীলা তো আমি কিছুই বুঝি না, কিন্তু আমার মধ্যেই নিয়ত এই এক প্রেমের লীলা।"[৮] জীবনে অন্তরদেবতার সেই প্রেমের লীলার কথা স্পষ্ট করার জন্যে কবি নিজের কবিতার সাহায্য নিয়ে বলেছেন :

আজ মনে হয় সকলেরি মাঝে
তোমারেই ভালোবেসেছি ;
জনতা বাহিয়া চিরদিন ধরে
শুধু তুমি আমি এসেছি।
চেয়ে চারিদিক পানে
কী যে জেগে ওঠে প্রাণে—
তোমার আমার অসীম মিলন
যেন গো সকলখানে।[৯]

কবি তাঁর এই অন্তরদেবতাকে কখনো বলেছেন কৌতুকময়ী অন্তর্যামী, কখনো বলেছেন অন্তরতম জীবননাথ, প্রিয়তম প্রাণেশ। অর্থাৎ কখনো তিনি নারী, কখনো পুরুষ। তিনিই কবিকে অতীতের মধ্য থেকে অনাগতের মধ্যে প্রাণের পালের ওপর প্রেমের হাওয়া লাগিয়ে কাল-মহানদীর নূতন নূতন ঘাটে বহন করে নিয়ে চলেছেন। কবির সেই অন্তরদেবতা, তাঁকে যে নামেই অভিহিত করা হোক না কেন, তিনি কবির মানসসুন্দরী, তাঁর লীলাসঙ্গিনী, তাঁর কৌতুকময়ী অন্তর্যামীই হোন, অথবা তাঁর অন্তরতম জীবনদেবতাই হোন, তাঁরই আবির্ভাবে কবির জীবনপাত্রে যে লীলারস উচ্ছলিত হয়ে উঠেছে, সেই লীলারস-আস্বাদনের রসিক-পন্থার সন্ধানই রবীন্দ্র-কাব্যরসিকের মুখ্যতম এষণা। রবীন্দ্রনাথ নিজেও সেই পথের নির্দেশ দিয়ে বলেছেন, "কবিকে উপলক্ষ করিয়া বীণাপাণি বাণী, বিশ্বজগতের প্রকাশশক্তি, আপনাকে কোন্ আকারে ব্যক্ত করিয়াছেন তাহাই দেখিবার বিষয়।"[১০]

২

কিন্তু এই লীলারসৈকসর্বস্ব দৃষ্টি কারো কারো মতে একদেশদর্শী বলে মনে হতে পারে। প্রশ্ন হতে পারে, এই দৃষ্টি দিয়ে কি রবীন্দ্রনাথকে সমগ্রভাবে পাওয়া যাবে? আর যদি সেই মহাজাগতিক সত্তার সামগ্রিক পরিচয়ই না পাওয়া যায় তা হলে সেই দৃষ্টি যতই অন্তরঙ্গ ও আন্তরিক হোক না কেন, তা খণ্ডিত দৃষ্টির অধিক মর্যাদা পাবার দাবি করতে পারে কি?

রবীন্দ্রনাথ সহস্রশীর্ষ পুরুষ, সহস্রাক্ষ। রবীন্দ্রনাথের মানসলোকে নানা রবীন্দ্রনাথের লীলা। শুধু রবীন্দ্রনাথের কথাই বা বলি কেন, সার্থক প্রতিভা নিয়ে যাঁরাই জন্মগ্রহণ করেছেন তাঁরা সবাই সহস্রশীর্ষ পুরুষ। কার্লাইলের কথাই আবার মনে পড়ে। বিরাট পুরুষের বহুমুখী ব্যক্তিত্বের কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন :

"I confess, I have no notion of a truly great man that could not be *all* sorts of men. The poet who could merely sit on a chair, and compose stanzas, would never make a stanza worth much. He could not sing the Heroic warrior, unless he himself were at least a Heoric warrior too. I

fancy there is in him the Politician, the Thinker, Legislator, Philosopher ;—in one or the other degree, he could have been, he is all these."[১১]

বলাই বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথও বিচিত্রের দূত। কিঞ্চিদধিক অশীতিবর্ষব্যাপী তাঁর সুদীর্ঘ জীবনে বার বার ঋতুবদল হয়েছে, এবং তার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর রূপ ও রীতিবদলও হয়েছে বার বার। শিল্পী-হিসাবে কবিতায়-গানে-গল্পে-উপন্যাসে-নাটকে-রসরচনায় কলাকৃতির বহু বিচিত্র সমাবেশে তাঁর বাণীপ্রকাশ 'নব রে নব নিতুই নব'। বিষয়ালম্বনের দিক দিয়ে বিশ্বমানবের বাণীদূত তিনি ; নৈসর্গিক ও অনৈসর্গিক, ঐহিক ও পারত্রিক, মানবজীবনে যে সব ভাব বিচিত্ররূপে বিরাজমান তাঁর কবিকৃতিতে তারা ধরা পড়েছে। তিনি বলেছিলেন, "আমি পৃথিবীর কবি, যেথা তার যত উঠে ধ্বনি আমার বাঁশির সুরে সাড়া তার জাগিবে তখনি",[১২]—এই সুরসাধনা তাঁর জীবনে সার্থক হয়েছে। জীবনশিল্পী-হিসাবেও ঋষিপ্রতিম তাঁর জীবনসাধনা কখনো শিক্ষাচার্য কখনো আশ্রমগুরু, কখনো ভক্ত কখনো প্রাজ্ঞ, কখনো দেশপ্রেমিক কখনো বিশ্বমানবের শুভৈষী রূপে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। কবি নিজেই রসিকজনসুলভ ভাষায় বিশ্বরাজ্য ও মনোরাজ্যে সর্বগ্রাসী তাঁর ক্ষুধানলের স্বরূপ বিশ্লেষণ করে বলেছেন, "মদগর্বিতা যুবতী যেমন তার অনেকগুলি প্রণয়ীকে নিয়ে কোনোটিকেই হাতছাড়া করতে চায় না, আমার কতকটা যেন সেই দশা হয়েছে। মিউজদের মধ্যে আমি কোনোটিকেই নিরাশ করতে চাই নে।...আমার ক্ষুধানল বিশ্বরাজ্য ও মনোরাজ্যের সর্বত্রই আপনার জলন্ত শিখা প্রসারিত করতে চায়। যখন গান তৈরি করতে আরম্ভ করি তখন মনে হয়, এই কাজেই যদি লেগে থাকা যায় তা হলে তো মন্দ হয় না ; আবার যখন একটা কিছু অভিনয়ে প্রবৃত্ত হওয়া যায় তখন এমনি নেশা চেপে যায় যে মনে হয় যে, চাই কী, এটাতেও একজন মানুষ আপনার জীবন নিয়োগ করতে পারে। আবার যখন 'বাল্যবিবাহ' কিংবা 'শিক্ষার হেরফের' নিয়ে পড়া যায় তখন মনে হয়, এই হচ্ছে জীবনের সর্বোচ্চ কাজ। আবার লজ্জার মাথা খেয়ে সত্যি কথা যদি বলতে হয় তবে এটা স্বীকার করতে হয় যে, ঐ যে চিত্রবিদ্যা বলে একটা বিদ্যা আছে তার প্রতিও আমি সর্বদা হতাশ প্রণয়ের লুব্ধ দৃষ্টিপাত করে থাকি।"[১৩]

কবি যখন এই চিঠি লিখছেন তখন (১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দে) তাঁর জীবনে পদ্মা-শিলাইদহ-পর্ব চলছে। পৈতৃক জমিদারির পর্যবেক্ষণ ছাড়া বাইরে থেকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কোন দায়িত্ব তাঁর স্কন্ধে আরোপিত হয় নি। কিন্তু তার পর শান্তিনিকেতন-পর্বে যখন তিনি নিজেই সমাজসংস্কার ও দেশহিতব্রতে নানা কর্মযজ্ঞে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন তখন তাঁর শালপ্রাংশু ব্যক্তিত্ব বিরাট বনস্পতির মতো আপন বলিষ্ঠ সত্তাকে দশ দিকে প্রসারিত করে দিয়েছে। তার ফলে কবিজীবনে বিশ্বপ্রকৃতির অখণ্ড শান্তি বিদায় নিয়েছে, নির্জনে অরণ্যে পর্বতে অজ্ঞাতবাসের মেয়াদ ফুরিয়েছে। শুরু হয়েছে বিশ্বমানবের রণক্ষেত্রে ভীষ্মপর্ব। তাই বিশ্বপ্রকৃতির লীলানিকেতনে তমাল-তরুতলের বংশীবাদক হয়ে উঠেছেন মহাকুরুক্ষেত্রের পাঞ্চজন্যনাদী পার্থসারথি। কবি ভুলে গিয়েছেন, 'যে-গাছে সুগন্ধ ফুল ফোটে সে গাছে আহার্য ফল না ধরলেও চলে।'[১৪]

অথচ 'পাব্লিক নামক গ্যাসালোকজ্বালা স্টেজের উপর'[১৫] নেচে বেড়ানো যে তাঁর স্বধর্ম নয়, এ কথা কিন্তু কবি ভাল করেই জানতেন। জীবনটি কেমন হলে তাঁর মনের মত হয় সেই স্বপ্নকথা ১৮৯১ খ্রীস্টাব্দের অক্টোবরে শিলাইদহ থেকে লেখা একখানি পত্রে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কবি লিখছেন, "হঠাৎ মনে পড়ে গেল, বহুকাল হল ছেলেবেলায় বোটে করে পদ্মায় আসছিলুম, একদিন রাত্রির প্রায় দুটোর সময় ঘুম ভেঙে যেতেই বোটের জানলাটা তুলে ধরে মুখ বাড়িয়ে দেখলুম নিস্তরঙ্গ নদীর উপরে ফুট্‌ফুটে জ্যোৎস্না হয়েছে, একটি ছোট্ট ডিঙিতে একজন ছোকরা একলা দাঁড় বেয়ে চলেছে, এমনি মিষ্টি গলায় গান ধরেছে—গান তার পূর্বে তেমন মিষ্টি কখনও শুনি নি। হঠাৎ মনে হল, আবার যদি জীবনটা ঠিক সেই দিন থেকে ফিরে পাই! আর-একবার পরীক্ষা করে দেখা যায়; এবার তাকে আর শুষ্ক অপরিতৃপ্ত করে ফেলে রেখে দিই নে—কবির গান গলায় নিয়ে একটি ছিপ্‌ছিপে ডিঙিতে জোয়ারের বেলায় পৃথিবীতে ভেসে পড়ি, গান গাই এবং বশ করি··· ; জীবনে যৌবনে উচ্ছ্বসিত হয়ে বাতাসের মতো একবার হু হু করে বেড়িয়ে আসি, তার পরে ঘরে ফিরে এসে পরিপূর্ণ প্রফুল্ল বার্ধক্যটা কবির মতো কাটাই। খুব যে একটা উঁচু আইডিয়াল তা নয়। জগতের হিত করা এর চেয়ে ঢের বেশি বড় আইডিয়াল হতে পারে, কিন্তু আমি সবশুদ্ধ যে রকম লোক আমার ওটা মনেও উদয় হয় না।"[১৬]

কিন্তু কবির গান কণ্ঠে নিয়ে কেবল 'গান গাওয়া আর বশ করা' কবির নিয়তি নয়। ত্রিশের কোঠা পেরিয়ে জীবনের তৃণ-বিছানো বীথিকা পৌঁছল এসে পাথরে-বাঁধানো রাজপথে। তাঁর ডাক পড়ল বন্ধুর পথ দিয়ে তরঙ্গমন্দ্রিত জনসমুদ্রতীরে।

সেদিন জীবনের রণক্ষেত্রে
দিকে দিকে জেগে উঠল সংগ্রামের সংঘাত
গুরুগুরু মেঘমন্দ্রে।
একতারা ফেলে দিয়ে
কখনো বা নিতে হল ভেরি।
খর মধ্যাহ্নের তাপে
ছুটতে হল
জয়পরাজয়ের আবর্তনের মধ্যে।
পায়ে বিঁধেছে কাঁটা,
ক্ষত বক্ষে পড়েছে রক্তধারা।
নির্মম কঠোরতা মেরেছে ঢেউ
আমার নৌকার ডাইনে বাঁয়ে,
জীবনের পণ্য চেয়েছে ডুবিয়ে দিতে
নিন্দার তলায় পঙ্কের মধ্যে।
বিদ্বেষে অনুরাগে
ঈর্ষায় মৈত্রীতে
সংগীতে পরুষ-কোলাহলে
আলোড়িত তপ্ত বাষ্পনিশ্বাসের মধ্য দিয়ে
আমার জগৎ গিয়েছে তার কক্ষপথে।[১১]

কবিজীবনের চল্লিশ ও পঞ্চাশের কোঠা, অর্থাৎ তাঁর প্রৌঢ়প্রহর কেটেছে এই বিরোধ-সংক্ষোভের মধ্য দিয়ে। বিশ্বরাজ্য ও মনোরাজ্যের সর্বত্রই তাঁর সর্বগ্রাসী প্রতিভার ক্ষুধানল যে আপনার জ্বলন্ত শিখা প্রসারিত করতে চেয়েছিল এ তারই পরিণাম, বিচিত্রমুখী জীবনের এই হল অনিবার্য নিষ্করুণ নিয়তি। অথবা সবার সঙ্গে যুক্ত হয়েই যাঁর জীবনের সামগ্রিক পূর্ণতা, বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ-ভেদে তাঁর জীবনকৃত্য সর্বদাই দ্বিধাবিভক্ত ; বহির্মুখী সত্তায়

চলে বহিরঙ্গ-সঙ্গে নাম-সংকীর্তন, আর অন্তর্মুখী সত্তায় 'অন্তরঙ্গ সঙ্গে লীলা-রস-আস্বাদন'। কিন্তু, বলাই বাহুল্য, নাম-সংকীর্তনের প্রতি কবির সহৃদয়-সমাজের তেমন কৌতূহল নেই, অন্তরঙ্গ লীলারসাস্বাদনের দিকেই তাঁদের অনিঃশেষ আকর্ষণ ও আসক্তি।

৩

তবু অস্বীকার করার উপায় নেই যে, কবি-হিসাবেও তাঁর জীবনের কারিগর তাঁর চিত্তফুলবনের বিচিত্র ঋতুর পুষ্পসম্ভার দিয়ে 'নানা রবীন্দ্রনাথের একখানা মালা' গেঁথে রেখেছেন। তার মধ্য থেকে তাঁর অন্তরঙ্গতম আসল পরিচয় কোন্‌টি—এ প্রশ্নের উত্তর না পাওয়া পর্যন্ত কবিজীবন সম্পর্কে কৌতূহলের নিবৃত্তি কিছুতেই হতে পারে না। আমাদের সৌভাগ্য, রবীন্দ্রনাথ নিজেই এ প্রশ্নের সুস্পষ্ট উত্তর তাঁর রচনাবলীতে, গদ্যে ও কবিতায়, পরিচ্ছন্ন ভাষাতেই ব্যক্ত করে গিয়েছেন। ষাটের কোঠায় পড়ে, অশীতিবর্ষব্যাপী কবিজীবনের শেষপাদে, অর্থাৎ জীবনের শেষ কুড়ি বৎসরে, রবীন্দ্রনাথের মনে বার বার এই প্রশ্ন জেগেছে, এবং প্রত্যেকবারই তিনি তাঁর উত্তর অন্তরের মধ্যে খুঁজে পেয়েছেন।

এই সম্পর্কে তাঁর প্রথম আত্মজিজ্ঞাসা বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে চৌষট্টি বৎসর বয়সে দক্ষিণ-আমেরিকা যাত্রার সমুদ্রপথে। রবীন্দ্রনাথ ১৯২৪ সনের ১৯ সেপ্টেম্বর দক্ষিণ-আমেরিকা যাত্রা করেন "তাদের শতবার্ষিক উৎসবে যোগ দেবার জন্যে", এবং ১৯২৫ সনের ১৭ ফেব্রুয়ারি দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। যাত্রার পূর্বে কবির শরীর অসুস্থ, মন ক্লান্ত ও অবসন্ন। সেই যাত্রার কথা কবি ডায়ারির আকারে লিপিবদ্ধ করে রাখেন। 'যাত্রী' গ্রন্থে "পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি" অংশে কবির সেই ডায়ারি সংকলিত হয়েছে। সমুদ্রের উপর 'হারুনা-মারু' জাহাজে বসে ১৯২৪ সনের ৫ই অক্টোবর কবি যে ডায়ারি লেখেন তাতেই তাঁর নিভৃত মুহূর্তের আত্মচিন্তা ভাষা পেয়েছে। আমার বক্তব্য প্রাঞ্জল করবার জন্যে সেদিনের সমগ্র ডায়ারিটিই উদ্ধারযোগ্য। অন্তত তার যে সব অংশ অত্যাবশ্যক সেগুলিই এখানে সংকলন করা যাক। কবি বলেছেন:

"মানুষের আয়ুতে ষাটের কোঠা অস্তদিগন্তের দিকে হেলে-পড়া। অর্থাৎ, উদয়ের দিগন্তটা এই সময়ে সামনে এসে পড়ে, পূর্বে-পশ্চিমে মুখোমুখি হয়।

"জীবনের মাঝমহলে, যে-কালটাকে বলে পরিণত বয়স, সেই সময়ে অনেক বড়ো বড়ো সংকল্প, অনেক কঠিন সাধনা, অনেক মস্ত লাভ, অনেক মস্ত লোকসান এসে জমেছিল। সব জড়িয়ে ভেবেছি, এইবার আসা গেল পাকা-পরিচয়ের কিনারাটাতে। সেই সময়ে কেউ যদি হঠাৎ এসে জিজ্ঞাসা করত, 'তোমার বয়স কত?' তা হলে আমার গোড়ার দিকের ছত্রিশটা বছর সরিয়ে রেখে বলতুম, আমি হচ্ছি বাকিটুকু। অর্থাৎ, আমার বয়স হচ্ছে কুষ্ঠির শেষ দিকের সাতাশ। এই পাকা সাতাশের রকম-সকম দেখে গম্ভীর লোকে খুশি হল। তারা কেউ বললে, 'নেতা হও', কেউ বললে, 'সভাপতি হও', কেউ বললে, 'উপদেশ দাও।' আবার কেউ বা বললে, 'দেশটাকে মাটি করতে বসেছ।' অর্থাৎ, স্বীকার করলে দেশটাকে মাটি করে দেবার মত অসামান্য ক্ষমতা আমার আছে!

"এমন সময় ঘাটে পড়লুম। একদিন বিকেলবেলায় সামনের বাড়ির ছাতে দেখি, দশ-বারো বছরের একটি ছেলে খালি-গায়ে যা-খুশি করে বেড়াচ্ছে।...

"কিসে যেন একটা ধাক্কা দিয়ে আমাকে মনে করিয়ে দিলে যে, অমনি করেই নগ্ন হয়ে সমস্তর মধ্যে মগ্ন হয়ে নিখিলের আঙিনায় আমিও একদিন এসে দাঁড়িয়েছিলুম। মনে হল, সেটা কম কথা নয়। অর্থাৎ, আজও যদি বিশ্বের স্পর্শ প্রত্যক্ষ প্রাণের মধ্যে তেমনি করে এসে লাগত তা হলে ঠকতুম না। তা হলে আমার জীবন-ইতিহাসের মধ্যযুগে অকালে যুগান্তর-অবতারণার যে সব আয়োজন করা গেছে তার ভার আমার চেয়ে যোগ্যতর লোকের হাতেই পড়ত, আর বাদশাই কুঁড়ের সিংহাসনটা আমি স্থায়ীরূপে দখল করে বসবার সময় পেতুম। সেই কুঁড়েমির ঐশ্বর্য আমি যে একলা ভোগ করতুম তা নয়, এই রসের রসিক যারা তাদের জন্য ভাণ্ডারের দ্বার খুলে দিয়ে বলা যেত, পীয়তাং ভুজ্যতাম্।...

"মুশকিল এই যে, পৃথিবীতে দুর্ভিক্ষ আছে, মশা আছে, পুলিস আছে, স্বরাজ পররাজ দ্বৈরাজ নৈরাজের ভাবনা আছে, এরই মধ্যে ঐ গা-খোলা ছেলেটা দিনের শেষ প্রহরের বেকার বেলাতে ছাদের উপরে ঘুরে বেড়ায়। আকাশের আলিঙ্গনে-বাঁধা ওই ভোলা-মন ছেলেটিতে একটি নিত্যকালের কথা আছে, সে আমি শুনেছি, কিন্তু সে আমি ভাষায় কেমন করে স্পষ্ট করে তুলব।

"আজ মনে হচ্ছে, ওই ছেলেটার কথা আমারই খুব ভিতরের কথা, গোলেমালে অনেককাল তার দিকে চোখ পড়ে নি। বারো বছরের সেই নিত্য-ভোলা ইস্কুল-পালানো লক্ষ্মীছাড়াটা গাম্ভীর্যের নিবিড় ছায়ায় কোথায় লুকিয়ে লুকিয়ে খেলা করছিল। এখন ভাবনা ধরিয়ে দিলে, আমার আসল পরিচয় কোন্ দিকটায়। সেই আরম্ভ-বেলাকার সাতাশের দিকে, না, শেষ-বেলাকার ?...

"এও বুঝলুম, এ-জগতে কাঁচা মানুষের খুব একটা পাকা জায়গা আছে, চিরকেলে জায়গা। ষাট বছরে পৌঁছে হঠাৎ দেখলুম, সেই জায়গাটা দূরে ফেলে এসেছি।

"যতই বুঝতে পারি ততই দেখতে পাই, পাকা দেয়ালগুলোই মায়া, পাথরের কেল্লাই কয়েদখানা। মন কাঁদছে, মরবার আগে গা-খোলা ছেলের জগতে আর-একবার শেষ ছেলেখেলা খেলে নিতে, দায়িত্ববিহীন খেলা। আর, কিশোর বয়সে যারা আমাকে কাঁদিয়েছিল, হাসিয়েছিল, আমার কাছ থেকে আমার গান লুঠ করে নিয়ে ছড়িয়ে ফেলেছিল, আমার মনের কৃতজ্ঞতা তাদের দিকে ছুটল। তারা মস্ত বড়ো কিছুই নয়; তারা দেখা দিয়েছে কেউ বা বনের ছায়ায়, কেউ বা নদীর ধারে, কেউ বা ঘরের কোণে, কেউ বা পথের বাঁকে। তারা স্থায়ী কীর্তি রাখবার দল নয়, ক্ষমতার ক্ষয়বৃদ্ধি নিয়ে তাদের ভাবনাই নেই; তারা চলতে চলতে দুটো কথা বলেছে, সব কথা বলার সময় পায় নি; ...তাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললুম, 'আমার জীবনে যারা সত্যিকার ফসল ফলিয়েছে সেই আলোর, সেই উত্তাপের দূত তোমরাই। প্রণাম তোমাদের। তোমাদের অনেকেই এসেছিল ক্ষণকালের জন্য, আধো-স্বপ্ন আধো-জাগার ভোরবেলায় শুকতারার মতো, প্রভাত না হতেই অস্ত গেল।'"[১৮]

উদ্ধৃত ডায়ারিতে অভিব্যক্ত কবির আত্মচিন্তাই তাঁর কবিজীবনের শেষ-চতুর্থাংশের ভূমিকা বা সূচনাপত্র বলা যেতে পারে। এই আত্মচিন্তার মধ্য দিয়ে তাঁর যে অন্তরঙ্গ পরিচয় উদ্ঘাটিত হয়েছে তার মূল কথা হল এই যে, রবীন্দ্রনাথ কবি, রবীন্দ্রনাথ প্রেমিক। সত্তর বৎসর যেদিন পূর্ণ হল সেদিন কবি "পান্থ" কবিতায় নিজের সত্য পরিচয় দিয়ে বললেন :

শুধায়ো না মোরে তুমি মুক্তি কোথা, মুক্তি কারে কই,
আমি তো সাধক নই, আমি গুরু নই।

আমি কবি, আছি
ধরণীর অতি কাছাকাছি,
এপারের খেয়ার ঘাটায়।[১৯]

২৪শে বৈশাখে লেখা এই কবিতারই গদ্যরূপ পাই পরদিন, অর্থাৎ ২৫শে বৈশাখে কবির সপ্ততিতম জন্মোৎসবে শান্তিনিকেতনে যে অভিভাষণ দেন তার মধ্যে। সেখানে কবি বলেছেন, "আমি তত্ত্বজ্ঞানী শাস্ত্রজ্ঞানী গুরু বা নেতা নই—একদিন আমি বলেছিলাম, 'আমি চাই নে হতে নববঙ্গে নবযুগের চালক'—সে কথা সত্য বলেছিলাম। শুভ্র নিরঞ্জনের যাঁরা দূত তাঁরা পৃথিবীর পাপক্ষালন করেন, মানবকে নির্মল নিরাময় কল্যাণব্রতে প্রবর্তিত করেন, তাঁরা আমার পূজ্য; তাঁদের আসনের কাছে আমার আসন পড়ে নি। কিন্তু সেই এক শুভ্র জ্যোতি যখন বহুবিচিত্র হন, তখন তিনি নানা বর্ণের আলোকরশ্মিতে আপনাকে বিচ্ছুরিত করেন, বিশ্বকে রঞ্জিত করেন, আমি সেই বিচিত্রের দূত। আমরা নাচি নাচাই, হাসি হাসাই, গান করি, ছবি আঁকি—যে আবিঃ বিশ্বপ্রকাশের অহৈতুক আনন্দে অধীর আমরা তাঁরই দূত। বিচিত্রের লীলাকে গ্রহণ করে তাকে বাইরে লীলায়িত করা—এই আমার কাজ।...শঙ্খঘণ্টা বাজিয়ে যাঁরা আমাকে উচ্চ মঞ্চে বসাতে চান, তাঁদের আমি বলি, আমি নিচেকার স্থান নিয়েই জন্মেছি, প্রবীণের প্রধানের আসন থেকে খেলার ওস্তাদ আমাকে ছুটি দিয়েছেন।"[২০] পাঁচ বৎসর পরে ১৩৪৩ সালের ১৮ই বৈশাখে লেখা 'পত্রপুটে'র পনেরো সংখ্যক কবিতায় কবি এই সত্যকেই উজ্জ্বলতর অনুভূতির মধ্যে প্রকাশ করে বলেছেন যারা অন্ত্যজ, যারা মন্ত্রবর্জিত তিনি তাদেরই দলে। বলেছেন, 'আমি ব্রাত্য, আমি মন্ত্রহীন।'

৪

'যাত্রী'র যে ডায়ারির সাক্ষ্য নিয়ে আমরা বলেছি—রবীন্দ্রনাথ কবি, রবীন্দ্রনাথ প্রেমিক, সে সম্পর্কে এবার রবীন্দ্রনাথের নিজের কথাটি শোনবার চেষ্টা করা যাক। পঁচাত্তর বৎসর বয়সে কবি বলছেন:

আমার গানের মধ্যে সঞ্চিত হয়েছে দিনে দিনে
সৃষ্টির প্রথম রহস্য,—আলোকের প্রকাশ,
আর সৃষ্টির শেষ রহস্য,—ভালবাসার অমৃত।[২১]

আমরা বলেছি রবীন্দ্রনাথ সূর্যমণ্ডলের অগ্নিবিহঙ্গ। আলোকের ঝরনাধারায় অগ্নিস্নানই তার স্বভাবধর্ম। কিন্তু এই অগ্নিবিহঙ্গ সৃষ্টির প্রথম রহস্য থেকে সৃষ্টির শেষ রহস্যে, আলোকের প্রকাশ থেকে মানবহৃদয়ের 'মহানভ-অঙ্গনে' ভালবাসার অমৃতলোকেই তার মুক্তপাখা বিস্তার করে চলেছে। সেই নভোচারী দিব্যবিহঙ্গ একাধারে ওয়ার্ডসওয়ার্থ ও শেলির স্কাইলার্ক। সে একই সঙ্গে অনন্ত সুধা দান করছে এবং অনন্ত সুধা প্রার্থনা করছে।

কবিজীবনে 'সৃষ্টির শেষ রহস্য,—ভালবাসার অমৃত'ই যে পরম-প্রার্থনীয় এই সত্যেরই প্রকাশ তাঁর চুয়াত্তর বৎসর-পূর্তি দিবসে অর্থাৎ ১৩৪২ সালের ২৫শে বৈশাখে প্রকাশিত 'শেষ সপ্তক' কাব্যগ্রন্থের ছয় ও তেতাল্লিশ সংখ্যক দুটি কবিতায় অবিস্মরণীয় কাব্যরূপ পেয়েছে। তেতাল্লিশ সংখ্যক কবিতাটি সর্বজনবিদিত, 'সঞ্চয়িতা'য় "পঁচিশে বৈশাখ" শিরোনামায় সেটি সংকলিত হয়েছে। এই কবিতাটিতে গদ্য-কাব্যচ্ছন্দে কবি তাঁর অন্তরঙ্গ আত্মপরিচয় দিয়েছেন। ছেলেবেলার রূপকথার রাজ্য পেরিয়ে ফাল্গুনের প্রত্যূষে কৈশোরের স্বপ্নচেতনার স্বরূপ বিশ্লেষণ করে কবি বলছেন :

তরুণ যৌবনের বাউল
সুর বেঁধে নিল আপন একতারাতে,
ডেকে বেড়ালো
নিরুদ্দেশ মনের মানুষকে
অনির্দেশ্য বেদনার খেপা সুরে।

এই কটি পংক্তির মধ্যে কবির প্রেমচেতনার মর্মকথাটি যেন বলা হয়েছে। বাউলের মন নিয়ে অনির্দেশ্য বেদনার খেপা সুরে নিরুদ্দেশ মনের মানুষকে ডেকে বেড়ানোই রবীন্দ্র-প্রেমের রূপকল্প। কবি বলছেন, তাঁর ডাক শুনে বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মীর আসন টলেছিল, তিনি পাঠিয়ে দিয়েছেন তাঁর কোনো-কোনো দূতীকে পলাশবনের রঙ-মাতাল ছায়াপথে, কাজভোলানো সকাল-বিকালে। কবিজীবনের প্রথম-ঘুমভাঙা-প্রভাতে তারাই রেখে গেছে নতুন-ফোটা বেলফুলের মালা; তাঁর ভোরের স্বপ্ন ছিল তারই গন্ধে বিহ্বল। তার পর একদিন কবি পাথরে-বাঁধানো রাজপথ দিয়ে তরঙ্গমন্দ্রিত জনসমুদ্রতীরে এসে পৌঁছলেন, তাঁর প্রৌঢ় প্রহর কাটল নগর-কীর্তনের বারোয়ারিতলায়। কিন্তু সেই অবসাদের অপরাহ্ণে অপ্রত্যাশিত পথে এসেছে অমরাবতীর মর্তপ্রতিমা—

সেবাকে তারা সুন্দর করে, তপঃক্লান্তের জন্যে তারা আনে সুধার পাত্র। কবিজীবনে সেই অমরাবতীর মর্তপ্রতিমাদের লক্ষ্য করে কবি বলছেন :

তারা আমার নিবে-আসা দীপে
জ্বালিয়ে গেছে শিখা,
শিথিল-হওয়া তারে
বেঁধে দিয়েছে সুর—

*   *   *

তাদের পরশমণির ছোঁওয়া
আজো আছে
আমার গানে, আমার বাণীতে।

কাবকণ্ঠের এই অকুণ্ঠ স্বীকৃতির মধ্যেই কবিপ্রেমিকের মর্মলোক সমুদ্ঘাটিত।

'শেষ সপ্তকে'র ছয়-সংখ্যক কবিতাটি এই প্রেমকাহিনীরই পরিপূরক কবিতা। মানুষের জগতে প্রেমিকরূপেই যে তিনি অমর হয়ে থাকতে চান, এই আকাঙ্ক্ষাকেই কবি এই কবিতায় একটি রূপকাত্মক রূপকল্পের সাহায্যে প্রকাশ করেছেন। জীবনের গোধূলি-লগ্নে মানুষের পৃথিবী থেকে শেষ-বিদায় নেবার আগে রবীন্দ্রনাথ একবার সারাজীবনের অতিক্রান্ত পথের দিকে তাকিয়ে বলেছেন :

আমার এতদিনকার যাওয়া-আসার পথে
শুকনো পাতা ঝরেছে,
সেখানে মিলেছে আলোক-ছায়া,
বৃষ্টিধারায় আমকাঁঠালের ডালে ডালে
জেগেছে শব্দের শিহরণ,
সেখানে দৈবে কারো সঙ্গে দেখা হয়েছিল
জল-ভরা ঘট নিয়ে যে চলে গিয়েছিল
চকিত পদে।

এই সামান্য ছবিটুকু
আর-সব-কিছু থেকে বেছে নিয়ে
কেউ একজন আপন ধ্যানের পটে এঁকো
কোনো একটি গোধূলির ধূসর-মুহূর্তে।

আর বেশি কিছু নয়।
আমি আলোর প্রেমিক ;
প্রাণরঙ্গভূমিতে ছিলুম বাঁশি-বাজিয়ে।

'এই সামান্য ছবিটুকু—'? সামান্যই বটে। আমরা এই ছবিটুকুকে বলেছি, রূপকাত্মক রূপকল্প। সামান্য ছবিটি হল,—দৈবে কারো সঙ্গে দেখা হয়েছিল, জল-ভরা ঘট নিয়ে যে চলে গিয়েছিল চকিতপদে। বলাই বাহুল্য, জল-ভরা ঘট নিয়ে চকিতপদে চলে-যাওয়ার ছবিটি বিরহী-প্রেমেরই রূপক। রবীন্দ্রনাথের চিত্তলোকে এই বিরহী-প্রেমেরই পদ্মাসন চিরপ্রতিষ্ঠিত। এই চিরবিরহতত্ত্বের আলোকেই তিনি দান্তে ও বেয়াত্রিচের প্রেমকে বিশ্লেষণ করে বলছেন :

"বিয়াত্রিচে দান্তের কল্পনাকে যেখানে তরঙ্গিত করে তুলেছে সেখানে বস্তুত একটি অসীম বিরহ। দান্তের হৃদয় আপনার পূর্ণচন্দ্রকে পেয়েছিল বিচ্ছেদের দূর আকাশে। চণ্ডীদাসের সঙ্গে রজকিনী রামীর হয়তো বাইরের বিচ্ছেদ ছিল না, কিন্তু কবি যেখানে তাকে ডেকে বলছে,

তুমি বেদবাদিনী, হরের ঘরনী,
তুমি সে নয়নের তারা—

সেখানে রজকিনী রামী কোন্ দূরে চলে গেছে তার ঠিক নেই। হোক-না সে নয়নের তারা তবুও যে-নারী বেদবাদিনী, হরের ঘরনী, সে আছে বিরহলোকে। সেখানে তার সঙ্গ নেই, ভাব আছে। নারীর প্রেমে মিলনের গান বাজে, পুরুষের প্রেমে বিচ্ছেদের বেদনা।"[২২]

জলভরা ঘট নিয়ে চকিত-পদে যে চলে যায় সেই নিরুদ্দেশ মনের মানুষকে অনির্দেশ্য বেদনার খেপা সুরে ডেকে বেড়ানোর রূপকল্প দুটি কবিপ্রেমিকের বিরহীপ্রেমের বেদনাসিন্ধু-মন্থন-করা ধন।

এই হল আমাদের Hero-soul, কবিপ্রেমিক রবীন্দ্রনাথের আত্মপরিচয়-কথা। যথাসম্ভব কবির নিজের ভাষাতেই আমরা সে পরিচয় সংকলনের চেষ্টা করেছি। কিন্তু তবু এখানে একটা মৌলিক প্রশ্ন থেকে যায়। কবি তাঁর জীবনকে দু-ভাগে বিভক্ত করে নিজের কথা বলেছেন। মোটামুটিভাবে

চল্লিশ থেকে ষাট বছর বয়স পর্যন্ত এক ভাগ, অর্থাৎ তাঁর ভাষায় 'জীবনের মাঝমহল', যখন কবির মনে হয়েছে, 'এইবার আসা গেল পাকা-পরিচয়ের কিনারাটাতে।' আর এক ভাগ হল জীবনের প্রথম চল্লিশ এবং শেষ কুড়ি বৎসর। কবির ভাষায়, অস্ত-দিগন্ত যখন উদয়-দিগন্তের সামনে এসে পূর্বে-পশ্চিমে মুখোমুখি হয়েছে। এই দুই যুগে জীবন ও জগৎ সম্পর্কে কবির দৃষ্টিভঙ্গির চেহারা বদল হওয়ার ফলে তাঁর আত্মপরিচয়ের ভাষাও পরিবর্তিত হয়েছে। জীবনের মাঝমহলে আত্মপ্রকাশের রহস্য বিশ্লেষণ করতে গিয়ে কবি জীবনদেবতা-তত্ত্বের আশ্রয় নিয়েছিলেন। প্রাণের পালের উপর প্রেমের হাওয়া লাগিয়ে কালমহানদীর ঘাটে ঘাটে 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'য় যিনি কবিকে পরিচালিত করেছেন, তাঁকেই তিনি বলেছিলেন জীবনদেবতা। তাঁর জীবনে যে একটি অন্তরতম অভিপ্রায় আনন্দময় নৈপুণ্যে বিকশিত হয়ে উঠেছে সেই আশ্চর্য পরম রহস্যকেই তিনি তাঁর জীবনদেবতার লীলা বলেছেন। কিন্তু অস্ত-দিগন্তের কোলে পৌঁছে উদয়-দিগন্তের দিকে তাকিয়ে প্রাণরঙ্গ-ভূমির বংশীবাদক বলছেন, এই জীবনে দৈবে কারো সঙ্গে দেখা হয়েছিল যে ভরাঘট নিয়ে চলে গিয়েছিল চকিত পদে; এই সামান্য ছবিটুকুই তাঁর জীবনের পরম সত্য। কবি এই চিত্রকল্পকে বিশ্লেষণ করেই যেন বলছেন দৈবে-দেখা এই নারীই হল অমরাবতীর মর্তপ্রতিমা। এই মর্তপ্রতিমাই তাঁর জীবনে যাতে সত্যিকার ফসল ফলিয়েছে সেই আলোর, সেই উত্তাপের দূত।

কবিজীবনের দুই যুগে আত্মপরিচয়ের এই দুই প্রকাশ-রীতি—এই জীবনদেবতাতত্ত্ব ও প্রেমতত্ত্বের মধ্যে কি কোন অসামঞ্জস্য আছে? এই জিজ্ঞাসাই কবিপরিচিতি-প্রসঙ্গে রসিক চিত্তের অন্যতম মুখ্য জিজ্ঞাসা। আমরা মনে করি, জীবনদেবতাতত্ত্ব এবং প্রেমতত্ত্ব কবিজীবনে একই তত্ত্বের দুটি নাম। কবি মাঝমহলে পৌঁছে যখন জীবনদেবতাতত্ত্ব বিশ্লেষণ করেছেন তখন তাঁর কণ্ঠে প্রজ্ঞাপ্রবীণের প্রাজ্ঞোক্তি উচ্চারিত হয়েছে, আর শেষ জীবনে যখন নিরুদ্দেশ মনের মানুষের উদ্দেশে বাউল-যৌবনের অনির্দেশ্য বেদনার কথা বলেছেন তখন নবীন-কিশোরের প্রাণখোলা সহজোক্তিই তাঁর কণ্ঠে ফুটে উঠেছে। সে ভাষা 'দিনের শেষ প্রহরের বেকার বেলাতে ছাদের উপর ঘুরে বেড়ানো' ওই গা-খোলা ছেলেটিরই ভাষা। প্রথমটি তত্ত্বরসিকের ভাষা, দ্বিতীয়টি প্রেমিকের। প্রথম পাত্রে পরিবেষিত হয়েছে

লীলারস, দ্বিতীয় পাত্রে প্রেম। একটি ব্যক্তিসীমার জগতে দাঁড়িয়ে প্রাকৃত ভাষায় কথা, আর একটি বিশ্বাত্মবোধে প্রবুদ্ধ হয়ে অসীমের দিকে তাকিয়ে রসতত্ত্বের গান।

কিন্তু রবীন্দ্রমানসে প্রেমের পাত্রেই বিশ্বের লীলারস আস্বাদিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'জীবনস্মৃতি'তে বলেছেন, তাঁর জীবনে একটি মাত্র পালা, আর সে পালার নাম দেওয়া যেতে পারে 'সীমার মধ্যেই অসীমের সহিত মিলন-সাধনের পালা।' জীবনদেবতাতত্ত্ব এই সীমার মধ্যেই অসীমের সহিত মিলন-সাধনেরই তত্ত্ব। জগতের মাঝে যিনি বিচিত্ররূপিণী তিনিই কবির অন্তর মাঝে একাকিনী অন্তরবাসিনী হয়ে আছেন। দ্যুলোকে ভূলোকে যে-চঞ্চলগামিনী চল-চরণে বিলাসময়ী, তিনিই কবির 'একটি স্বপ্ন মুগ্ধ সজল নয়নে, একটি পদ্ম হৃদয়-বৃন্তশয়নে, একটি চন্দ্র অসীম চিত্তগগনে।' তাঁর সঙ্গে কবির রহস্যময় বিচিত্র বিরহমিলনলীলা 'জীবনদেবতা' ও 'অন্তর্যামী' কবিতায় লীলারসরূপেই আস্বাদিত হয়েছে। কবি ও তাঁর বিদগ্ধ কাব্যরসিক সমাজে এই জীবনদেবতাতত্ত্বের বহু বিশ্লেষণ হয়েছে। কিন্তু বহু সূত্র ও বহু ভাষ্যের অবাঞ্ছিত প্রাদুর্ভাবে মূল সত্যটি যেন ঢাকা পড়ে গেছে। এই সম্পর্কে কবির অন্তিম বিশ্লেষণটিই সর্বাধিক প্রামাণ্য এবং বিশেষ ইঙ্গিতপূর্ণ। রচনাবলী সংস্করণের চতুর্থ খণ্ডে 'চিত্রা'র 'সূচনা'য় কবি বলেছেন, "বস্তুত চিত্রায় জীবনরঙ্গভূমিতে যে মিলন-নাট্যের উল্লেখ হয়েছে তার কোনো নায়ক-নায়িকা জীবের সত্তার বাইরে নেই এবং তার মধ্যে কেউ ভগবানের স্থানাভিষিক্ত নয়।"

বলাই বাহুল্য, জীবনরঙ্গভূমিতে যে মিলন-নাট্যের কথা এখানে কবি বলেছেন, চিত্রায় বিশেষ করে 'অন্তর্যামী' ও 'জীবনদেবতা' কবিতাযুগলেই সেই মিলন-নাট্যের লীলা অভিব্যক্ত হয়েছে। 'অন্তর্যামী'তে লীলার অধিনেত্রী হলেন কৌতুকময়ী নায়িকা, আর 'জীবনদেবতা'য় সেই সত্তাই বৈষ্ণবের 'প্রেমবিলাসবিবর্তে'র সহোদরা রীতিতে হলেন কবির অন্তরতম নায়ক। কিন্তু কবি বলেছেন, এই মিলন-নাট্যের কোন নায়ক-নায়িকা জীবের সত্তার বাইরে নেই। এখানেই আমাদের পরম জিজ্ঞাসা, যদি কবি-জীবনে তাঁর জীবনদেবতার 'আশ্চর্য পরম রহস্যময় আবির্ভাব' জীবের সত্তার বাইরে না থাকে, তবে কে তিনি? 'কো তুহুঁ বোলবি মোয়।'

রবীন্দ্রনাথ একদিন 'বৈষ্ণব-কবিতা'য় রসিকচিত্তের কৌতূহল নিয়ে বৈষ্ণব

কবির উদ্দেশে একটি জিজ্ঞাসাকে কাব্যচ্ছন্দে গ্রথিত করেছিলেন। কবির জিজ্ঞাসা ছিল :

সত্য করে কহ মোরে হে বৈষ্ণব কবি,
কোথা তুমি পেয়েছিলে এই প্রেমচ্ছবি,
কোথা তুমি শিখেছিলে এই প্রেমগান
বিরহ-তাপিত। হেরি কাহার নয়ান,
রাধিকার অশ্রু-আঁখি পড়েছিল মনে।
বিজন বসন্তরাতে মিলন-শয়নে
কে তোমারে বেঁধেছিল দুটি আঁখিডোরে,
আপনার হৃদয়ের অগাধ সাগরে
রেখেছিল মগ্ন করি। এত প্রেমকথা,
রাধিকার চিত্ত-দীর্ণ তীব্র ব্যাকুলতা
চুরি করি লইয়াছ কার মুখ, কার
আঁখি হতে।[২৩]

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধেও আমাদের এই একই জিজ্ঞাসা।—তোমার জীবন-দেবতার যে প্রেমলীলার কথা তুমি বলেছ, 'কোথা তুমি পেয়েছিলে এই প্রেমচ্ছবি, কোথা তুমি শিখেছিলে এই প্রেমগান বিরহ-তাপিত?' 'এত প্রেমকথা,...চুরি করি লইয়াছ কার মুখ, কার আঁখি হতে?'

৬

এই প্রশ্নের উত্তরই পেতে হবে কবির সমগ্র জীবনের কাব্য ও জীবন-সাধনার মধ্য দিয়ে। জীবনদেবতাতত্ত্ব রবীন্দ্রনাথের জীবনের কোনো একটি বিশেষ যুগের বিশেষ তত্ত্ব নয়। 'সোনার তরী'-'চিত্রা'-যুগেই তার আবির্ভাব, তার আগেও তাকে পাওয়া যায় নি, পরেও পাওয়া যাবে না,—এমন কথা বললে সমগ্র রবীন্দ্রজীবনকেই ভুল বোঝা হবে। আসলে জীবনদেবতাতত্ত্বই রবীন্দ্রজীবনতত্ত্ব, এবং কবিপ্রেমিকের মানসলক্ষ্মীই তাঁর জীবনদেবতা।

এই প্রসঙ্গে আমাদের পূর্ব বক্তব্যটি পুনরায় স্মরণ করা যেতে পারে। 'সনেটের আলোকে মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে [পৃ. ২১২] আমি বলেছি,

বেয়াত্রিচের প্রতি দান্তের যে প্রেম, লরার প্রতি পেত্রার্কার যে প্রেম, রবীন্দ্র-জীবনের প্রেম তারই সগোত্র। বলেছি দান্তে ও পেত্রার্কার প্রেম ক্রবাতুর-প্রেমেরই দোসর। রবীন্দ্রপ্রেমও ক্রবাতুরপ্রেমের সহোদর। কাজেই রবীন্দ্র-প্রেমের স্বরূপ-সন্ধানে ক্রবাতুর-প্রেমের স্বরূপ-বিচার অপরিহার্য। শ্রীমতী ডরথি এল. সেয়ার্স তাঁর অনূদিত দান্তের ডিভাইন কমেডির পারগেটরি গ্রন্থের ভূমিকায় সেই প্রেম-প্রসঙ্গে বলেছেন:

"That doctrine, arising out of the conditions of a feudal society, did not, strictly speaking, represent an attitude to sex. It did not (directly at any rate) determine your behaviour to your wife, or to your trull. In its origin, it was a devotion—part amorous and part worshipful—to a particular lady who in rank and culture was your acknowledged superior, and who was addressed normally as "Madonna", but frequently also, among those Provencal poets with whom the cult started, by the masculine title "midons—my liege."[২৪]

কিন্তু দান্তের ও পেত্রার্কার প্রেম ক্রবাতুরদের প্রেমচর্যার দোসর হলেও, তাঁদের মহত্তর কবিসত্তায় তাঁদের প্রেমতত্ত্বের মধ্য দিয়েই বিশ্বসত্য উন্মেষিত হয়েছে। তাঁদের কবিকল্পনায় বিশ্বসৃষ্টির মূলে এক নারীসত্তার অস্তিত্ব আভাসিত হয়েছে, সেই সত্তা নিসর্গজগৎ ও মানবজগতের একটি রহস্যময় যোগসূত্ররূপে বিরাজমান। সেই নারীসত্তা চিরবসন্ত ও বিশ্বজনীন পুনর্জন্মের অধিনেত্রী দেবী—'the mistress of spring and universal rebirth'. দান্তে-পেত্রার্কার এই বিশ্বাসই পরবর্তী কালে রোমান্স ঐতিহ্যের মূলে ক্রিয়াশীল। 'Belief in a fundamental *rapport* between nature and human spirit and in woman as the mystic channel through which this passed, is at the core of the romance tradition'.

কিন্তু দান্তে ও পেত্রার্কার স্বরূপ-বিশ্লেষণে প্লেটোনিক প্রেমের স্বরূপ বিশ্লেষণ অপরিহার্য। আমরা দ্বিতীয় খণ্ডে তার বিস্তৃত আলোচনা করব, কিন্তু এখানে সে সম্পর্কে সূত্রাকারে দু-একটি কথা বলা প্রয়োজন। প্লেটো তাঁর ডায়লগের 'সিম্পোসিয়াম' (Symposium) ও ফিড্রাস (Phaedrus) খণ্ডেই বিশেষ করে

এই প্রেমতত্ত্ব আলোচনা করেছেন। প্লেটোর প্রেমতত্ত্বের মূলে রয়েছে Eros-তত্ত্ব, এবং সিম্পোসিয়ামের উপজীব্য হল "to find the highest manifestation of the 'Love' which controls the world in the mystic aspiration after union with the eternal and super-cosmic Beauty."[২৫]

গ্রীক পুরাণে এরস হচ্ছেন কামদেব—the God of sensual passion; কিন্তু পৌরাণিক কল্পনায়ও দুই এরসের কথা বলা হয়েছে। দিব্য এরস আর জৈব এরস—Heavenly and Vulgar Eros. দুজনেরই জননীর নাম আফ্রোদিতে। কিন্তু দিব্য এরসের জননী আফ্রোদিতে ইউরেনাসের অযোনিসম্ভবা দুহিতা, আর জৈব এরসের জননী জিউস ও দিওনের কন্যা। ইউরেনাস-দুহিতা দিব্যাঙ্গনা, তার সন্তানের মধ্যেও সেই ধর্ম সঞ্চারিত। প্লেটোর সিম্পোসিয়াম এই দিব্য এরসেরই প্রশস্তি।

"Eros, desirous love, in all its forms is a riching out of the soul to a good to which it aspires but has it not yet in possession....

"The object which awakens this desirous love in all its forms is beauty, and beauty is eternal. In its crudest form, love for a beautiful person is really a passion to beget offspring by that person and so to attain, by the perpetuation of one's stock, the *succedaneum* for immortality which is all the body can achieve. A more spiritual form of the same craving for eternity is the aspiration to win immortal fame by combining with a kindred soul to give birth to sound institutions and rules of life.

"But the goal still lies far ahead. When a man has followed the pilgrimage so far, he "suddenly descries" a Supreme Beauty which is the cause and source of all the beauties he has discerned so far. The true achievement of immortality is finally affected only by union with this."[২৬]

মোটামুটিভাবে প্লেটোনিস্টরা বলেন যে, এই প্রেমতীর্থপরিক্রমায় ছটি স্তর অতিক্রম করে যেতে হয়; "The vision of earthly beauty which inspires in the beholder a spiritual love of the woman from

whom this beauty shines, is only the first stage in the ascent of the soul. The Platonists appear to have distinguished six stages, each marking an advance towards the universal and the divine : thus, for example, in the third stage the lover has risen to a general contemplation of feminine beauty ; in the fourth he sees, through the eyes of the soul, an *image* of the heavenly beauty ; in the fifth he actually beholds it ; in the last stage he enters into union with it."[২৭]

রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যতত্ত্ব ও প্রেমতত্ত্বের স্বরূপ-সন্ধানীর কাছে প্লেটোনিক প্রেমের স্বরূপ ও বিচিত্র স্তরে তার ক্রমবিকাশের কথা যে অপ্রাসঙ্গিক নয়, উপরের উদ্ধৃতিগুলি থেকে তা আভাসিত হবে। অবশ্য একথা বলার এই উদ্দেশ্য নয় যে, রবীন্দ্রনাথ প্লেটোনিক প্রেমের মন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছিলেন এবং সেই ভাবেই জীবন যাপন করেছেন। আমাদের বক্তব্য হল, রবীন্দ্রনাথ বহুশ্রুত কবি, প্লেটোর প্রেমতত্ত্বও তাঁর অপরিজ্ঞাত ছিল না। মুখ্যত শেলির মাধ্যমেই তিনি প্লেটোনিক প্রেমের সঙ্গে অন্তরঙ্গ ভাবে পরিচিত হন। শেলিই উনবিংশ শতকে প্লেটোনিক-প্রেম ও প্রেমতত্ত্বকে বিশেষ ভাবে পুনরুজ্জীবিত করেন। তিনি সিম্পোসিয়ামের অনুবাদও করেছিলেন। অধ্যাপক কার্লস বেকার তাঁর সম্পাদিত শেলির কাব্যসংকলনের [মডার্ন লাইব্রেরি, নিউইয়র্ক] ভূমিকায় বলেছেন :

"For the young Shelley, woman seemed to be the completing agent for man, the necessary complementary force by which his fullest self-realization was made possible. As his theism developed, he transferred his "completing agent" concept to a non-earthly plane. The woman-symbol, which had for him extremely complex mythological as well as highly personal associations, was conveniently carried over. Following imaginatively the counsel which Diotima gave Socrates in Plato's Symposium, Shelley sought to elevate his thinking through the forms of knowledge up to the contemplation of Divine Ideas and finally to "the vision of one single science." In the end, his single science, the

great agency making for unification in a divided world, was the doctrine of cosmic love. Only by understanding it could man reach the height of his manifest destiny."

শেলি-মানসের এই বিশ্লেষণের আলোকে রবীন্দ্র-মানসের কথা চিন্তা করলেই বুঝতে পারা যাবে রবীন্দ্রনাথকে কেন একদিন বাংলার শেলি বলা হত। অধ্যাপক জেমস এ. নটপোলস তাঁর 'The Platonism of Shelley' গ্রন্থে [ডারহাম ১৯৪৯] শেলিকে বলেছেন 'এ ন্যাচারাল প্লেটোনিস্ট।' রবীন্দ্রনাথও শেলির মতো স্বভাবধর্মেই প্লেটোনিস্ট। প্লেটোর সঙ্গে যদি তাঁর কোনো পরিচয় নাও থাকত তা হলেও এ কথাই প্রমাণিত হত যে, প্লেটো প্রেমতত্ত্ব ও সৌন্দর্যতত্ত্ব সম্পর্কে তাঁর আর্ষ-দৃষ্টিতে যে সত্যের সন্ধান পেয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনেও সেই সত্য তাঁর জীবনচর্যায় প্রতিফলিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই অর্থেই 'রাবীন্দ্রিক প্লেটোনিজ্‌ম্' কথাটি সত্য। আমরা যদিও বলেছি, বেয়াত্রিচের প্রতি দান্তের যে প্রেম এবং লরার প্রতি পেত্রার্কার যে প্রেম তারই সগোত্র হল রবীন্দ্রজীবনের প্রেম। কিন্তু এক জীবনের সঙ্গে আরেক জীবনের তুলনা সর্বদাই আংশিক এবং আভাসিক। সেই জন্যেই দান্তীয় বা পেত্রার্কান প্লেটোনিজ্‌মের সঙ্গে রাবীন্দ্রিক প্লেটো-নিজ্‌মের সাদৃশ্য যেমন আছে, তেমনি বৈসাদৃশ্যও যে কম নেই এ সত্য ভুলে গেলে চলবে না।

তবু দান্তের জীবনে বেয়াত্রিচে এবং পেত্রার্কার জীবনে লরার আবির্ভাবের মতো রবীন্দ্রজীবনেও তাঁর মানসলক্ষ্মীর আবির্ভাব ঘটেছিল। পেত্রার্কা তেইশ বৎসর বয়সে সপ্তদশী লরার সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন। কিন্তু দান্তের নয় বৎসর বয়সেই তাঁর জীবনে ঘটেছিল বেয়াত্রিচের আবির্ভাব। রবীন্দ্রনাথের বেয়াত্রিচেও তাঁর জীবনে এসেছিলেন তাঁর আট বৎসর বয়সে।

রবীন্দ্রনাথ সতেরো বৎসর পেরিয়ে 'ভারতী' পত্রিকায় "বিয়াত্রীচে, দান্তে ও তাঁহার কাব্য" প্রবন্ধে লিখেছিলেন, "বিয়াত্রীচেই তাঁহার [দান্তের] সমুদয় কাব্যের নায়িকা, বিয়াত্রীচেই তাঁহার জীবনকাব্যের নায়িকা। বিয়াত্রীচেকে বাদ দিয়া তাঁহার কাব্য পাঠ করা বৃথা, বিয়াত্রীচেকে বাদ দিলে তাঁহার জীবন-কাহিনী শূন্য হইয়া পড়ে। তাঁহার জীবনের দেবতা বিয়াত্রীচে, তাঁহার সমুদয় কাব্য বিয়াত্রীচের স্তোত্র।"

কবিকিশোর যখন এই ভাষায় দান্তে-বেয়াত্রিচে-কথা লেখেন, তখন তাঁর কৌতুকময়ী অন্তর্যামীর ওষ্ঠাধরে স্মিতহাস্য বিকশিত হয়ে উঠেছিল কি না জানি না ; কিন্তু আট বৎসর থেকে আশী বৎসর বয়স অর্থাৎ জীবনের শেষদিন পর্যন্ত যে-নারী রবীন্দ্রজীবনের নানা পর্বে নানা রূপে দেখা দিয়েছেন, মনে হয় কবি যেন তাঁর অজ্ঞাতসারেই বেয়াত্রিচে-প্রশস্তি রচনা করতে গিয়ে তাঁর নিজের সেই মানসলক্ষ্মীরই প্রশস্তি রচনা করে রেখেছেন। কবিমানসী-কথায় আমরা কবিজীবনে সেই আবির্ভাবের পরম রহস্যেরই যবনিকা উন্মোচনের চেষ্টা করব।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা মনে রাখতে হবে। রবীন্দ্রনাথের হৃদয়ানুরাগের উপমা হিসাবে আমরা দান্তে-বেয়াত্রিচের প্রেমের কথা বলেছি। বলেছি তাঁর কবিমানস শেলির কবিমানসেরই সহোদর। এবং এই প্রসঙ্গেই এসেছে ক্রবাদুর-প্রেম এবং প্লেটোনিক প্রেমতত্ত্বের কথা। রবীন্দ্রমানস-বিশ্লেষণে এই প্রতীচ্য দৃষ্টিভঙ্গি একদেশদর্শী মনে হওয়াই স্বাভাবিক। ভারতভূমিও প্রেমসাধনার পুণ্যতীর্থ। এদেশের প্রেমধর্মের ঐতিহ্যও মোটেই উপেক্ষণীয় নয়। আমাদের প্রেমভক্তিশাস্ত্রেই শুধু নয়, অলংকারশাস্ত্রেও 'রতি'র সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় প্রেমসাধনার ঐতিহ্যকেও অঙ্গীকার করে নিয়েছিলেন। 'সুরদাসের প্রার্থনা' কবিতায় ভক্তকবি সুরদাসের প্রেমকাহিনীর সাহায্যেই প্রেমের বিশুদ্ধীকরণ-তত্ত্বটিকে তিনি কাব্যরূপ দিয়েছেন। চণ্ডীদাসের প্রেমসাধনাও তাঁর চিত্তকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। 'যাত্রী' গ্রন্থে তিনি একই সঙ্গে দান্তের ও চণ্ডীদাসের প্রেমসাধনার উল্লেখ করেছেন। [দ্রষ্টব্য : 'যাত্রী', পৃ° ৬০]। কাজেই একথা ভুললে চলবে না যে, প্রেমসাধনায় ভারতীয় ভক্তপ্রেমিকগণের প্রভাবও রবীন্দ্রমানসে ক্রিয়াশীল ছিল। য়ুরোপীয় সংস্পর্শে তা পরিপুষ্ট হয়েছে মাত্র। 'কল্পনা' কাব্যগ্রন্থে "বর্ষামঙ্গল" কবিতায় কবি বলেছিলেন :

শতেক যুগের কবিদলে মিলি আকাশে
ধ্বনিয়া তুলেছে মত্তমদির বাতাসে
শতেক যুগের গীতিকা।

রবীন্দ্রনাথের মানস-আকাশেও ভারতীয় এবং য়ুরোপীয় শতেক যুগের কবিদলের শতেক যুগের গীতিকা ধ্বনিত হয়েছে। তাই তাঁর কবিমানসের বিশ্লেষণে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বিচিত্র ঐতিহ্যের কথা অবশ্যই স্মরণীয়।

॥ উল্লেখপঞ্জী ॥

১ The Hero as Poet, English critical Essays, 19th. Century, পৃ° ২৫৪।

২ দ্রষ্টব্য, গ্রন্থকার রচিত 'সনেটের আলোকে মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থ, পৃ° ২৬১।

৩ রবীন্দ্র-রচনাবলী-১৭, পৃ° ৪৩২।

৪ রবীন্দ্র-রচনাবলী-১০, পৃ° ৩৬-৩৭।

৫ সাহিত্য, পৃ° ১৬২।

৬ জীবনস্মৃতির রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত পাণ্ডুলিপি। দ্রষ্টব্য, রবীন্দ্র-রচনাবলী-১৭, পৃ° ৪৫৫।

৭ তদেব।

৮ 'আত্মপরিচয়', পৃ° ১৪।

৯ 'উৎসর্গ', ১৩-সংখ্যক কবিতা, রবীন্দ্র-রচনাবলী-১০, পৃ° ২৪।

১০ 'আত্মপরিচয়', পৃ° ২৯।

১১ English Critical Essays, 19th. Century, পৃ° ২৫৫।

১২ "ঐকতান", 'জন্মদিনে' কাব্যগ্রন্থ।

১৩ 'ছিন্নপত্র', পৃ° ১৭৮-১৭৯।

১৪ তদেব, পৃ° ১৫১।

১৫ তদেব, পৃ° ১৫৬।

১৬ তদেব, পৃ° ৮৫-৮৬।

১৭ "পঁচিশে বৈশাখ", 'শেষ সপ্তক'; দ্রষ্টব্য, সঞ্চয়িতা, পৃ° ৬৯৩-৯৪।

১৮ 'যাত্রী', পৃ° ৭৩-৭৮।

১৯ 'পরিশেষ', রবীন্দ্র-রচনাবলী-১৫, পৃ° ১৬৮।

২০ 'আত্মপরিচয়', পৃ° ৭৩-৭৬।

২১ 'পত্রপুট', পনেরো সংখ্যক কবিতা; রবীন্দ্র-রচনাবলী-২০, পৃ° ৪৮।

২২ 'যাত্রী', পৃ° ৬০।

২৩ 'সোনার তরী'; রবীন্দ্র-রচনাবলী-৩, পৃ° ৪১-৪২।

২৪ Dante : The Divine Comedy : Purgatory. পেঙ্গুইন ক্লাসিকস, ১৯৫৪, ভূমিকা, পৃ° ৩২।

২৫ দ্রষ্টব্য : The Encyclopaedia Britannica, ১৪শ স°, ১৮শ খণ্ড, পৃ° ৫৫।

২৬ তদেব।

২৭ The Italian Influence in English Poetry : A. Lytton Sells, পৃ° ১৫৯।

দ্বিতীয় অধ্যায়

আবির্ভাব

১

রবীন্দ্রনাথের প্রেরণাদাত্রী দেবী মানবী-মূর্তিতে মহর্ষিদেবের শুদ্ধান্তঃপুরে প্রবেশ করলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বধূরূপে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বিবাহ হয় ১২৭৫ বঙ্গাব্দের ২৩শে আষাঢ় অর্থাৎ ১৮৬৮ খ্রীস্টাব্দের ৫ই জুলাই। মহর্ষির পঞ্চম পুত্র জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথের নতুনদা, বয়সে তাঁর চেয়ে বারো বছরের বড়। তাঁর জন্ম ১২৫৬ বঙ্গাব্দের ২২শে বৈশাখ। সুতরাং বিবাহের সময় তাঁর বয়স ১৯ বৎসর ২ মাস। ঠাকুর পরিবারের নতুন বৌ মধ্য-কলিকাতা-নিবাসী শ্যামলাল গাঙুলির তৃতীয়া কন্যা কাদম্বরী [কাদম্বিনী] দেবী। নতুনদা'র বিবাহের সময় রবীন্দ্রনাথের বয়স সাত বৎসর দু মাস, কাদম্বরী দেবীর বয়স নয় বৎসর ;[১] সুতরাং রবীন্দ্রনাথের নতুন বৌঠান তাঁর চেয়ে এক বৎসর দশ মাসের বড়।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের এখানে এভাবে বিবাহ হয় তা তাঁর মেজদা সত্যেন্দ্রনাথের ইচ্ছা ছিল না। সত্যেন্দ্রনাথ প্রথম ভারতীয় আই. সি. এস.। কুড়ি বৎসর উত্তীর্ণ না হতেই বিলাত গিয়ে যখন সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় পাশ করলেন তখন তাঁর বয়স সবে একুশ বৎসর পূর্ণ হয়েছে। বিলাত যাত্রার পূর্বে সতেরো বৎসর বয়সে সত্যেন্দ্রনাথের বিবাহ হয়। পত্নী জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর বয়স তখন মাত্র সাত বৎসর। সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে লণ্ডন থেকে সত্যেন্দ্রনাথ পিতৃদেবের কাছে প্রার্থনা জানালেন যাতে মহর্ষিদেব তাঁর পুত্রবধূর শিক্ষালাভের জন্যে তাঁকে ইংলণ্ডে প্রেরণের অনুমতি প্রদান করেন। লণ্ডন থেকে ১৮৬৪ সনের ১১ই জানুয়ারি সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর ত্রয়োদশী বধূকে লিখছেন : 'আমি বাবামহাশয়কে এক পত্র লিখিয়াছি, আমার ইচ্ছা যে তিনি তোমাকে ইংলণ্ডে প্রেরণ করেন। * * যে পর্যন্ত তুমি বয়স্ক শিক্ষিত ও সকল বিষয়ে উন্নত না হইবে, সে পর্যন্ত আমরা স্বামী স্ত্রীর সম্বন্ধে প্রবেশ করিব না। * * তোমার হৃদয় মন এখন অন্তঃপুরের প্রাচীর মধ্যে শুষ্কপ্রায় হইয়া

রহিয়াছে। তুমি ইংলণ্ডে আসিয়া আর এক নূতন ক্ষেত্র পাইবে। তুমি উন্নত হও, শিক্ষিত হও, তুমি ইংলণ্ডের সমাজের মধ্যে থাকিয়া তোমার স্ত্রীহৃদয়কে সহস্রগুণে বলবান কর, এ অপেক্ষা আমি আর অধিক কি দেখিতে চাই।'[২]

এই পত্র থেকেই সত্যেন্দ্রনাথের সমাজবিপ্লবী মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যাবে। জন স্টুয়ার্ট মিলের শিষ্য, 'স্ত্রী-স্বাধীনতা'র প্রণেতা, পারিবারিক জীবনে সর্ববিধ অবরোধপ্রথার বিলুপ্তিকামী সত্যেন্দ্রনাথ যে বাল্যবিবাহের বিরোধী হবেন তা বলাই বাহুল্য। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বিবাহের মাসখানেক পূর্বে আমেদনগর থেকে তিনি পত্নীকে লিখছেন, 'তবে নতুনের বিবাহের আর বিলম্ব নাই—শ্যাম গাঙ্গুলীর ৮ বৎসরের মেয়ে—আমি যদি নতুন হইতাম, তবে কখনই এ বিবাহে সম্মত হইতাম না। কোন হিসাবে যে এ কন্যা নতুনের উপযুক্ত হইয়াছে জানি না।' চার দিন পরে আবার লিখছেন, 'জ্যোতি না দেখিয়া শুনিয়া একজনকে বিবাহ করিয়া ইংলণ্ডে ৪।৫ বৎসরের জন্য চলিয়া যাক—সেখানকার সমাজে সঞ্চরণ করিয়া ও সুশিক্ষিত হইয়া ফিরিয়া আসিয়া এক অপরিচিত, হয়ত অশিক্ষিত স্ত্রী কি তাঁহার মনোনীত হইবে?' এমন কি বিবাহ যখন সম্পন্ন হয়ে গেছে তখনো তিনি লিখছেন, 'শ্যামবাবুর মেয়ে মনে করিয়া আমার কখনই মনে হয় না যে ভাল মেয়ে হইবে—কোন অংশেই জ্যোতির উপযুক্ত তাহাকে মনে হয় না। জ্যোতি এই বিবাহে কেমন করিয়া সম্মত হইল, এই আমার আশ্চর্য মনে হইতেছে।'[৩]

মহর্ষিদেব তাঁর দ্বিতীয় পুত্রের এই সংস্কারপন্থী মনোভাব সম্পর্কে সম্পূর্ণই সচেতন ছিলেন। কেন এ ভাবে এই পরিবারে বিবাহ স্থির করা হল তার কৈফিয়ত হিসাবে তিনি সত্যেন্দ্রনাথকে লিখছেন: 'জ্যোতির বিবাহের জন্য একটি কন্যা পাওয়া গিয়াছে এইই ভাগ্য। একে ত পিরালী বলিয়া ভিন্ন শ্রেণীর লোকেরা আমাদের সঙ্গে বিবাহেতে যোগ দিতে চাহে না, তাহাতে আবার ব্রাহ্মধর্মের অনুষ্ঠান জন্য পিরালীরা আমাদিগকে ভয় করে। ভবিষ্যৎ তোমাদের হস্তে—তোমাদের সময় এ সংকীর্ণতা থাকিবে না।'[৪]

বস্তুত জ্যোতিরিন্দ্রনাথের শ্বশুরবংশ কলিকাতার গাঙ্গুলি পরিবার জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির সঙ্গে পূর্ব থেকেই নানাভাবে পরিচিত ও সম্পর্কিত

ছিলেন। এই প্রসঙ্গে একটু পূর্বকথা স্মরণ করা প্রয়োজনীয়। কুশারী বংশের পঞ্চানন ঠাকুরই পাথুরেঘাটা, জোড়াসাঁকো এবং কয়লাহাটার ঠাকুরগোষ্ঠীর আদিপুরুষ। পঞ্চাননের পুত্র জয়রাম। জয়রামের চার পুত্র এক কন্যা— আনন্দীরাম, নীলমণি, দর্পনারায়ণ, গোবিন্দরাম ও সিদ্ধেশ্বরী। জয়রামের মৃত্যুর পর নীলমণি ঠাকুরই পরিবারের অভিভাবক হন। নীলমণি ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধীনে চাকরি করতেন। কোম্পানি ১৭৬৫ খ্রীস্টাব্দে বাংলা বিহার উড়িষ্যার দেওয়ানি লাভ করার পর নীলমণি ঠাকুর উড়িষ্যার কালেক্টরের সেরেস্তাদার হয়ে উড়িষ্যা গমন করেন। এই চাকরিতে তিনি প্রভূত অর্থ উপার্জন করেছিলেন। নীলমণি যখন উড়িষ্যায় তখন দর্পনারায়ণ কলিকাতায় পরিবারবর্গের অভিভাবক। তিনি নানারূপ ব্যবসা-বাণিজ্যে যথেষ্ট ধনাধিকারী হন। পৈতৃক সম্পত্তির সঙ্গে এই দুই ভ্রাতার উপার্জিত সম্পদ যুক্ত হল। তখন কনিষ্ঠ গোবিন্দরামের বিধবা রামপ্রিয়া দেবী সুপ্রীমকোর্টে নালিশ করে নিজ সম্পত্তি পৃথক করে নিলেন। রামপ্রিয়া দক্ষিণডিহীর নন্দরাম গাঙ্গুলির কন্যা। রামপ্রিয়া তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র জগন্মোহন গাঙ্গুলিকে কলিকাতায় হাড়কাটা গলিতে একটি বাসস্থান নির্মাণ করে দেন। গোবিন্দরাম ঠাকুরের শ্বশুরবংশের কলিকাতা শাখার সূত্রপাত এখান থেকেই। জগন্মোহন গাঙ্গুলি কলিকাতায় তাঁর পিসী রামপ্রিয়া দেবীর কাছেই প্রতিপালিত হন। রামপ্রিয়া দেবীর উদ্যোগেই গুড়ী কেনারাম রায় চৌধুরীর কন্যা শিরোমণি দেবীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। এই শিরোমণি দেবী দ্বারকানাথ ঠাকুরের মাতুল-কন্যা। জগন্মোহনের পাঁচ পুত্র: গোপাললাল, রসিকলাল, রামলাল, শ্যামলাল ও বিহারীলাল। বিবাহসূত্রে জগন্মোহনের সঙ্গে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। জীবনের শেষ কয়েক বৎসর তিনি তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র-দুটিকে নিয়ে দ্বারকানাথের বাড়িতে এবং মদন-মোহন চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে অতিবাহিত করেছিলেন। জগন্মোহন সংগীতে ও নানাপ্রকার কারুশিল্পে নিজে গুণী ও গুণগ্রাহী ছিলেন। তাঁর অনন্যসাধারণ শারীরিক বলের নানাবিধ গল্প সেকালে প্রচলিত ছিল। তিনি ছিলেন একাধারে সংগীতরসিক ও সন্দেশরসিক। দ্বারকানাথের গৃহে ময়রা প্রেরিত সন্দেশ পরীক্ষার তিনি ছিলেন অভ্রান্ত যাচনদার। তাঁর দ্বিতীয় পুত্র রসিক-লালও নানাবিধ শিল্পকলায় ছিলেন বিশেষ পারদর্শী। দ্বারকানাথের গৃহের

প্রতিমাকে তিনি নিজের তৈরি সাজে সুসজ্জিত করতেন। সংগীতে সুনিপুণ রামলাল বিষয়কর্মেও সুনিপুণ ছিলেন। চরিত্রবলেও তিনি ছিলেন শ্রদ্ধার পাত্র। তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা অন্নদা দেবীকে দ্বারকানাথের ভাগিনেয় নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিবাহ করেন। কনিষ্ঠার বিবাহ হয় দ্বারকানাথের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাধানাথের পৌত্র শৈলেন্দ্রনাথের সঙ্গে। পুত্র বিনোদলাল ইংরেজি সাহিত্যে পারদর্শী ছিলেন। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে 'নবনাটক' অভিনয়ে তিনি নায়কের ভূমিকায় বিশেষ সুখ্যাতি অর্জন করেন।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের শ্বশুর, জগন্মোহনের চতুর্থ পুত্র শ্যামলাল গাঙ্গুলিও কলারসিক ছিলেন। ঠনঠনের শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের কন্যা ত্রৈলোক্যসুন্দরীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। শ্যামলালের কোনো পুত্রসন্তান ছিল না। তাঁর চার কন্যা: বরদা, মনোরমা, কাদম্বরী [কাদম্বিনী] ও শ্বেতাম্বরী। শ্যামলাল গাঙ্গুলির তৃতীয়া কন্যা এই কাদম্বরী দেবীকেই মহর্ষিদেব তাঁর পঞ্চম পুত্র জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বধূরূপে নির্বাচিত করেন।[৫] যোগ্য পরিবারেই বিবাহের ব্যবস্থা হয়েছিল, কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথ তাতে সন্তুষ্ট হতে পারেন নি। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের শ্বশুর সম্পর্কে তিনি খুব বেশি শ্রদ্ধাবান ছিলেন না, সে কথা তাঁর পত্রেই প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু আপত্তির মূল কারণ ছিল বাল্যবিবাহ।

পূর্বেই বলা হয়েছে, বিবাহের সময় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বয়স ছিল ১৯ বৎসর ২ মাস। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ১৮৬৪ খ্রীস্টাব্দে পনেরো বৎসর বয়সে, কেশবচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত 'কলিকাতা কলেজ' [পরে 'আলবার্ট কলেজ'] থেকে দ্বিতীয় বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজে ফার্স্ট আর্টস [এফ. এ.] ক্লাসে ভরতি হন। কিন্তু এফ. এ. পরীক্ষা আর তাঁর দেওয়া হয়ে ওঠে নি। ঠাকুর-পরিবারে তখন নতুন যুগের হাওয়া বইছে। আমোদ-প্রমোদ ও নাট্য-কৌতুকের বান ডেকেছে। জোড়াসাঁকোয় নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিশোর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সেদিকেই বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হলেন। মধুসূদনের 'কৃষ্ণকুমারী' ও 'একেই কি বলে সভ্যতা'য় যথাক্রমে কৃষ্ণকুমারীর মাতা ও সার্জেনের ভূমিকায় অভিনয় করে তিনি সুখ্যাতি লাভ করলেন। তারপর ১৮৬৭ খ্রীস্টাব্দের ৫ই জানুয়ারি যখন ঠাকুরবাড়িতে মহাসমারোহে রামনারায়ণের পারিতোষিকপ্রাপ্ত 'নবনাটক' অভিনীত হল তখন তিনি কনসার্টে হারমোনিয়ম বাজিয়েছিলেন এবং অভিনয়ে নটীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

এই অভিনয়কালে সত্যেন্দ্রনাথ সাড়ে পাঁচ মাস ছুটি নিয়ে বম্বে থেকে কলকাতা এসেছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ কিছুদিন কাশীপুরের বাগানবাড়িতে সদ্য-বিলাত-ফেরত ব্যারিস্টার-বন্ধু মনোমোহন ঘোষের সঙ্গে সস্ত্রীক অতিবাহিত করেন। মেজদা-ভক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথও তাঁর সঙ্গী হলেন। এফ. এ. পরীক্ষা তখন নিকটবর্তী ; তিনি পরীক্ষার পড়া ছেড়ে দিয়ে মনোমোহনের কাছে ফরাসি ভাষা শিক্ষা করতে শুরু করলেন। কাশীপুরে মেজ-বৌঠান জ্ঞানদা-নন্দিনী দেবীর কাছে বম্বের গল্প, সেখানকার সমুদ্র ও প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর কথা শুনে বম্বে দেখার জন্য উৎসুক হন এবং কাউকে কিছু না বলে চুপচাপ সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে বম্বে যাত্রা করেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মেজদা ও মেজ-বৌঠানের সঙ্গে প্রায় সাত মাস বম্বেতে ছিলেন। সেখানে ফরাসি ভাষা, চিত্রাঙ্কন-বিদ্যা এবং মুসলমান ওস্তাদের কাছে সেতার-বাদন শিক্ষা করেন। সত্যেন্দ্রনাথ এক পত্রে গণেন্দ্রনাথকে লিখেছেন, 'জ্যোতি সেতার শিখছে, এই তার একমাত্র আমোদ। আমি তাকে ফরাসি শেখাচ্ছি। সে খুব খাটছে। বড় লাজুক, সমাজে মিশতে পারে না। বোধ হয় বাড়ি যাবার জন্য ব্যাকুল হয়েছে।'

সত্যেন্দ্রনাথের আকাঙ্ক্ষা ছিল তাঁর প্রিয় ভাইটিও বিলাত গিয়ে তাঁর শিক্ষা সমাপ্ত করে আসেন। কাজেই তাঁর কাছ থেকে কলকাতা ফিরে আসার কয়েক মাস পরেই যখন জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বিবাহের কথাবার্তা চলতে থাকে তখন তিনি তাঁর অমতই প্রকাশ করেছিলেন। তাছাড়া প্রগতিশীল সমাজে প্রাপ্তবয়স্কা তরুণীর সঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বিবাহ হয় এ ইচ্ছাও সত্যেন্দ্রনাথ এবং জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর ছিল। সূর্যকুমার [গুডীব] চক্রবর্তীর বড় মেয়ের সঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বিবাহের জন্য জ্ঞানদানন্দিনী দেবী বহুদূর অগ্রসরও হয়েছিলেন। দ্বারকানাথের চেষ্টায় যে-চারজন বাঙালী বিলাতে ডাক্তারি পড়তে গিয়েছিলেন সূর্যকুমার চক্রবর্তী তাঁদেরই একজন। তিনি এক 'মালয় ফিরিঙ্গী মেয়ের' পাণিপীড়ন করেন। সত্যেন্দ্রনাথ এবং জ্ঞানদানন্দিনী যখন বম্বেতে তখন কুমারী কার্পেণ্টারের সঙ্গে সূর্যকুমারের বড় মেয়েও বিলাত থেকে ভারতে এসেছিল। জ্ঞানদানন্দিনী তাঁর স্মৃতিকথায় লিখছেন : 'উনি যখন Miss Carpenter-এর সঙ্গে গল্প করতেন আমি তার সঙ্গে ছুটোছুটি খেলা করতুম, যদিও সে আমার বড় ছিল। শ্যামলা রঙের

উপর তার মুখশ্রী ভাল ছিল। তাকে আমার দেবর জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সঙ্গে বিয়ে দিতে আমার ইচ্ছা হয়েছিল ; কলকাতায় এসে তাঁকে দেখিয়েওছিলুম। কিন্তু এই সব দেখে শুনে ওর মা তাড়াতাড়ি তাকে কন্‌ভেণ্টে নান্‌ করে দিলেন, পাছে আমাদের সঙ্গে বেশি মেলামেশা করে।'* পরবর্তী জীবনে এই তরুণীই সিস্টার বেনেডিক্‌টা নামে পরিচিতা হন।

মেজবৌঠানের অভিলাষ মত গুডীব-দুহিতার পাণিপীড়ন জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ভাগ্যে ঘটে নি, এবং তাঁকে বিলাত পাঠিয়ে শিক্ষিত করে আনার যে বাসনা মেজদা অন্তরে পোষণ করতেন তাঁর জীবনে তাও পূর্ণ হল না। শেষ পর্যন্ত শ্যামলাল গাঙুলির ন' বছরের বালিকা-কন্যাই তাঁর জীবনসঙ্গিনী হলেন। কিন্তু গাঙুলি-বাড়ির নবমীর শশিকলা একদিন ঠাকুরবাড়ির অভিনব পরিবেশ প্রেরণা ও শিক্ষাদীক্ষা পেয়ে ষোলকলায় পূর্ণ হয়ে উঠলেন। তাঁর সেই জ্যোতির্ময়ী মূর্তির ধ্যানে বিহ্বলচিত্ত সে যুগের কবিগুরু বিহারীলাল তাঁর বন্দনাগীতি রচনা করে বললেন,

তুমি প্রভাতের উষা,
স্বর্গের ললাট-ভূষা,
ব্রহ্মার মানস-সরে প্রফুল্ল নলিনী গো।
[সাধের আসন। দশম সর্গ। ৭ ॥

২

কাদম্বরী দেবী যেদিন ঠাকুরবাড়িতে নতুন বৌ হয়ে এলেন সেদিন মহর্ষি-ভবনে সেকাল ও একালের সন্ধিলগ্নের ভাঙন-গড়নের কাজ চলছে। ঠাকুর-বাড়িতে যুগসন্ধির সেই ক্রান্তিকাল যাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে নব নব সাফল্যের গৌরবে উত্তীর্ণ হল, এই প্রসঙ্গে সেই সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কীর্তিকথা বিশেষভাবেই স্মরণীয়। শ্রীপুলিনবিহারী সেন 'বাংলার স্ত্রী-স্বাধীনতার অন্যতম পথিকৃৎ' সেদিনকার সেই দুঃসাহসী তরুণের কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে বলেছেন : 'আমরা যদি এ কথা স্মরণ রাখি যে, উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার নবজাগরণের প্রধান একটি কেন্দ্র মহর্ষি দেবেন্দ্র-ভবন, বঙ্গনারীর আত্মবিকাশের উদ্‌যোগ এই পরিবারের কন্যা ও বধূদের দ্বারা এককালে অনেকখানি পরিপুষ্টি

লাভ করেছে, তা হলে স্ত্রী-স্বাধীনতার মন্ত্র এই পরিবারের মধ্যে বিশেষভাবে যাঁর প্রবর্তনায় সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, যাঁর প্রভাব কেবল পরিবারের চতুঃসীমার মধ্যেই আবদ্ধ থাকে নি—তাঁর কথাও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়।'[৭]

সেকালের ঠাকুর-পরিবার ছিল দুই মহলে বিভক্ত, সদর মহল আর অন্দর মহল। শুধু ঠাকুর-বাড়িতেই নয়, অভিজাত গৃহের অন্তঃপুরিকারা পর্দা আর অবরোধপ্রথার মধ্যেই ছিলেন বন্দিনী। স্বর্ণকুমারী দেবী 'আমাদের গৃহে অন্তঃপুরশিক্ষা ও তাহার সংস্কার' প্রবন্ধে লিখেছেন: 'তখন অন্তঃপুরে অবরোধপ্রথা পূর্ণমাত্রায় বিরাজমান। তখনও মেয়েদের একই প্রাঙ্গণের এ বাড়ি হইতে ও বাড়ি যাইতে হইলে ঘেরাটোপ মোড়া পালকীর সঙ্গে প্রহরী ছোটে, তখনও নিতান্ত অনুনয় বিনয়ে মা গঙ্গাস্নানে যাইবার অনুমতি পাইলে বেহারারা পালকী শুদ্ধ তাঁহাকে জলে চুবাইয়া আনে।'[৮] ঠাকুর-পরিবারে অন্তঃপুরের অবরোধ সম্পর্কে জ্ঞানদানন্দিনী দেবী তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন: 'সেকালে আমাদের অন্দরমহলে এক ছেলে-মানুষ-করা পুরনো লোক ছাড়া কেউ আসতে পারত না। বিবাহিত লোকেরা ছাড়া কেউ রাতে বাড়ির ভিতর আসতেন না, কিন্তু কখন কখন দিনে মায়ের সঙ্গে কথা বলতে আসতেন।'…

'আমার মনে পড়ে বাবামশায় যখন বাড়ি থাকতেন আমার শাশুড়ীকে একটু রাত করে ডেকে পাঠাতেন, ছেলেরা সব শুতে গেলে। আর মা এক-খানি ধোয়া সুতি শাড়ি পরতেন, তারপর একটু আতর মাখতেন; এই ছিল তাঁর রাত্রের সাজ।'…

'আমরা তখন শুধু একখানা শাড়িই পরতুম, তার উপর শীতকালে সন্ধ্যাবেলায় হয়ত একটা দোলাই গায়ে দিতুম।'[৯]

বলাই বহুল্য, সেকালের এই দুর্ভেদ্য অবরোধের মধ্যে পরিবারের বাইরের লোকের পক্ষে অন্তঃপুর-প্রবেশ ছিল কল্পনাতীত ব্যাপার। সত্যেন্দ্র-নাথের জীবনে এই নিয়ে একটি বিশেষ কৌতুকাবহ ঘটনা ঘটেছিল। ব্যারিস্টার মনোমোহন ঘোষ ছিলেন তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু। অভিন্নহৃদয় দুই বন্ধুতে মিলে পরামর্শ করে বাংলা থেকে প্রথম সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিতে বিলেত যাত্রা করেন। সত্যেন্দ্রনাথের বিয়ের পর বন্ধুপত্নীকে দেখার লোভ মনোমোহনের হওয়া খুবই স্বাভাবিক। অথচ সেদিন তা সহজসাধ্য ব্যাপার

ছিল না। সত্যেন্দ্রনাথ কি কৌশলে বন্ধুকে অন্তঃপুরে নিয়ে গিয়েছিলেন সে প্রসঙ্গে জ্ঞানদানন্দিনী দেবী লিখছেন : 'ওঁর এক বন্ধু ছিলেন মনোমোহন ঘোষ। ওঁর ইচ্ছে যে তিনি আমাকে দেখেন—কিন্তু আমার ত বাইরে যাবার জো নেই, অন্য পুরুষেরও বাড়ির ভিতরে আসবার নিয়ম নেই। তাই ওঁরা দুজনে পরামর্শ করে একদিন বেশি রাত্রে সমান তালে পা ফেলে বাড়ির ভেতরে এলেন। তার পর উনি মনোমোহনকে মশারির মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে নিজে শুয়ে পড়লেন। আমরা দুজনেই মশারির মধ্যে জড়সড় হয়ে বসে রইলুম ; আমি ঘোমটা দিয়ে বিছানার এক পাশে আর তিনি ভোম্বলদাসের মত আর এক পাশে। লজ্জায় কারো মুখে কথা নেই—। আবার কিছুক্ষণ পরে তেমনি সমান তালে পা ফেলে উনি তাঁকে বাইরে পার করে দিয়ে এলেন।'[১০]

এই প্রসঙ্গে 'আমার বাল্যকথা'য় সত্যেন্দ্রনাথও লিখেছেন, 'আমি ছেলেবেলা থেকেই স্ত্রীস্বাধীনতার পক্ষপাতী। মা আমাকে অনেক সময় ধমকাইতেন, 'তুই মেয়েদের নিয়ে মেমদের মত গড়ের মাঠে ব্যাড়াতে যাবি না কি?' আমাদের অন্তঃপুরে যে কয়েদখানার মত নবাবী বন্দোবস্ত ছিল তা আমার আদবে ভাল লাগত না। আমার মনে হত, এই পর্দাপ্রথা আমাদের জাতির নিজস্ব নয়, মুসলমান রীতির অনুকরণ।···আমাদের প্রাচীন হিন্দু আচার অন্যতর। অবরোধপ্রথা আমার অনিষ্টকর কুপ্রথা বলে মনে হত। আমি গোপনে আমার এক বন্ধুকে বাড়ির ভিতর নিয়ে গিয়ে আমার স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবার জন্য কত ফন্দী করতুম এখন মনে হলে হাসি পায়।'

সত্যেন্দ্রনাথ যে অন্তঃপুরের অবরোধকে সত্যসত্যই জেলখানার মত মনে করতেন, এবং সেই অবরোধে বন্দিনীদের বেদনা যে তাঁর বুকে গভীরভাবে বাজত তার প্রমাণ বিলাতপ্রবাসেও তিনি স্বপ্ন দেখতেন যেন জোড়াসাঁকোর বাড়ির ভিতরের খড়খড়ি ভেঙে দিচ্ছেন। লণ্ডন থেকে ১৮৬৪ খ্রীস্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারি তিনি পত্নীকে লিখছেন : 'আমি সেদিন এক চমৎকার স্বপ্ন দেখিয়াছি। স্বপ্ন দেখিলাম যেন আমি বাড়ি ফিরিয়া গিয়াছি, তোমাদের সকলের সঙ্গে দেখা ও হাসি হইতেছে—হঠাৎ আমাদের বাড়ির ভিতরকার কাঠের ঝরকার দিকে নজর পড়িল। তাহা আমি সহ্য করিতে পারিলাম না।

আমি কাহাকে আদেশ করিলাম—কৈলাশ মুখুয্যেকে বুঝি—যে ও সব ঝরকা কেন—সব ভাঙ্গিয়া ফেল। কৈলাস 'যে আজ্ঞা' বলিয়া গেল, কিন্তু কতক পরে দেখিলাম তাহা এখনও ভাঙ্গা হয় নাই। ইহাতে কুপিত হইয়া কৈলাসকে আবার ডাকাইয়া বলিলাম, তুমি যদি আমার কথা না শুন তবে বাবা-মহাশয়কে বলিয়া দেব—আর যে পর্যন্ত ও ঝরকা না ভাঙ্গিয়া ফেলিবে সে পর্যন্ত আমি এক গ্রাস অন্ন মুখে করিব না, এক বিন্দু জল পান করিব না। এই কথাগুলি এমন জোরে কুপিতভাবে বলিলাম যে আমার সর্বশরীর কাঁপিতে লাগিল ও ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল।'[১১]

সত্যেন্দ্রনাথের এই স্বপ্ন একদিন বাস্তবেও সত্য হয়ে উঠেছিল। তাঁর বিলাত থেকে প্রত্যাবর্তনের পর থেকেই ঠাকুর-পরিবারের অন্তঃপুরে এ কালের হাওয়া প্রবেশ করতে লাগল। কর্মস্থল বম্বেতে পত্নীকে সঙ্গে নিয়ে যাবার অনুমতি যখন মহর্ষিদেব দিলেন তখন ঠাকুরবাড়ির বধূ বহির্জগতে পদক্ষেপের প্রথম অধিকার পেলেন। বাইরে বেরবার মত কাপড় তখনো মেয়েদের মধ্যে চলতি হয় নি। জ্ঞানদানন্দিনী দেবী লিখছেন: 'সে সময় আমাদের খালি এক শাড়ি পরা ছিল, তা পরে তো বাইরে যাওয়া যায় না। তাই উনি কোনো ফরাসি দোকানে ফরমাশ দিয়ে একটা কি পোশাক আমার জন্য করালেন,—বোধ হয় তাদের মতে oriental যাকে বলে। সেটা পরা এত হাঙ্গাম ছিল যে ওঁর পরিয়ে দিতে হত, আমি পারতুম না।'[১২] কিন্তু সেবার সত্যেন্দ্রনাথ অন্তঃপুর থেকে তাঁর স্ত্রীকে বহির্বাটির প্রাঙ্গণ পর্যন্ত হাঁটিয়ে গাড়ি চড়াতে পারলেন না। কুলবধূর পক্ষে তখনো তা এত লজ্জাজনক যে বাড়িশুদ্ধ সবাই তাতে বিশেষ আপত্তি প্রকাশ করলেন। অগত্যা পালকি করেই তাঁকে জাহাজে উঠতে হল। কিন্তু দু বৎসর পর ১৮৬৬ সনে তিনি যখন আবার কলকাতা ফিরে এলেন তখন আর কেউ বধূকে পালকি করে গৃহে আসতে বলতে পারলেন না। কিন্তু ঘরের বউকে মেমের মত গাড়ি থেকে সদরে নামতে দেখে সেদিন বাড়িতে যে শোকাভিনয় ঘটেছিল, স্বর্ণকুমারী দেবী বলছেন, তা বর্ণনার অতীত। বম্বে থেকে জ্ঞানদানন্দিনী যে অভিনব সাজসজ্জায় ভূষিত হয়ে এলেন পরে তা-ই বঙ্গনারীর অঙ্গসজ্জার আদর্শ বলে গৃহীত হয়েছিল। কিন্তু সেদিন এই সাজসজ্জা ও আচার-আচরণের ফলে সত্যেন্দ্রনাথ ও জ্ঞানদানন্দিনী নিজেদের বাড়িতেই 'একরূপ একঘরে হইয়া

রহিলেন।' স্বর্ণকুমারী দেবী বলছেন: 'বাড়ির অন্যান্য মেয়েরা বধূঠাকুরাণীর সহিত অসংকোচে খাওয়া-দাওয়া করিতে বা মিশিতে ভয় পাইতেন।'

সত্যেন্দ্রনাথ কিন্তু তাঁর সংস্কারব্রতে অবিচলিতচিত্তে অগ্রসর হতে লাগলেন ; এবং এ বিষয়ে তিনি দু দু বার তাঁর পত্নীকে নিয়ে যে দুঃসাহসিক পরীক্ষা করেছিলেন তা ভাবতেও বিস্ময় বোধ হয়। প্রচলিত আছে যে, সত্যেন্দ্রনাথই প্রথম বাঙালী যিনি গবর্মেণ্ট হাউসে গবর্ণর জেনারেলের 'মজলিসে' পত্নীকে নিয়ে গিয়েছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ 'আমার বাল্যকথা'য় লিখছেন: 'সে কি মহা ব্যাপার! শত শত ইংরাজ মহিলার মাঝখানে আমার স্ত্রী—সেখানে একটিমাত্র বঙ্গবালা—তখন প্রসন্নকুমার ঠাকুর জীবিত ছিলেন। তিনি তো ঘরের বউকে প্রকাশ্যস্থলে দেখে রাগে লজ্জায় সেখান থেকে দৌড়ে পালিয়ে গেলেন।' প্রকৃত ঘটনাটি ছিল আরো চমকপ্রদ। সত্যেন্দ্রনাথ পত্নীকে সঙ্গে নিয়ে যান নি। সেদিন তিনি অসুস্থ ছিলেন, কাজেই নিজে যেতে পারেন নি, একটি মেমের সঙ্গে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন স্ত্রীকে। জ্ঞানদানন্দিনী বলছেন: 'বড় ঠাকুরঝি আমাকে মাথায় সিঁথি প্রভৃতি দিয়ে খুব সাজিয়ে দিলেন, উনি শুয়েছিলেন, তাঁকে নিয়ে গিয়ে আবার দেখালেন। * * * বাড়ির সকলে বললেন যে উনি নিজে গেলে ভাল হত, অন্য লোকের সঙ্গে পাঠানো ভাল হয়নি। শুনেছি আমাকে অনেকে মনে করেছিলেন ভূপালের বেগম, কারণ তিনিই একমাত্র তখন বেরতেন।'[১৩]

স্বাধীনতার ক্ষেত্রে পত্নীকে নিয়ে সত্যেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় পরীক্ষা আরো দুঃসাহসিক। এবার কলিকাতার লাটসাহেবের দরবার নয়, সত্যেন্দ্রনাথ পত্নীকে একলা পাঠিয়ে দিলেন একেবারে বিলাতে। জ্ঞানদানন্দিনী লিখছেন, 'তিনটি ছেলেমেয়ে নিয়ে আমি অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় ১৮৭৭ খ্রীস্টাব্দ আন্দাজ বিলেত যাই, যতদূর মনে আছে। সেই সময় এক ইংরেজ দম্পতী বিলেত যাচ্ছিল। তাদের সঙ্গে উনি আমাকে পাঠিয়ে দিলেন।' জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর তখন বিলাতে। সত্যেন্দ্রনাথ তাঁকে লিখেছিলেন, তিনি তাঁদের নামিয়ে নিতে জাহাজে লোক পাঠিয়েছিলেন। তিনি নাকি বলেছিলেন, 'সত্যেন্দ্র এ কি করলেন? নিজে সঙ্গে এলেন না?' মাস কয় পরে অবশ্য সত্যেন্দ্রনাথ বিলাতে পত্নী ও শিশুদের সঙ্গে মিলিত হন।

এমনি করেই সত্যেন্দ্রনাথ একেকটি বিপ্লবী পদক্ষেপের সাহায্যে বাংলার

নারীসমাজের অবরোধমুক্তি ও স্বাধীনতার পথ রচনা করেছিলেন। স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রী-স্বাধীনতার ক্ষেত্রে সমসাময়িক সংস্কার-আন্দোলনও অবশ্য আনুকূল্য করেছে। মেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারে মহর্ষিদেবও কম উৎসাহী ছিলেন না। ঠাকুর-পরিবারে একাল শুরু হবার পূর্বেও কন্যা ও বধূদের শিক্ষার আয়োজন ছিল। বৈষ্ণবীরাই সে যুগে অন্তঃপুরের শিক্ষয়িত্রী ছিলেন। তারপর কেশবচন্দ্রের অন্তঃপুরে মিশনরী মেয়েরাই সে ভার গ্রহণ করেন। মহর্ষিদেবও তাঁর কন্যা ও বধূদের জন্যে বাঙালী খ্রীস্টান শিক্ষয়িত্রী নিয়োগ করেছিলেন। এমন কি হপ্তায় একদিন মেম এসে তাঁদের বাইবেল পড়িয়ে যেতেন। বেথুন স্কুল প্রতিষ্ঠিত হলে মহর্ষিদেব তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা সৌদামিনীকে সেখানে ভরতি করে দেন।

পরবর্তী অধ্যায়ে সত্যেন্দ্রনাথের প্রেরণায় হেমেন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ শুধু বিদ্যাশিক্ষার দিক দিয়েই নয়, সর্বদিক দিয়েই স্ত্রীস্বাধীনতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন এবং তারই ফলে ঠাকুর-পরিবারের কন্যাদের মধ্যে স্বর্ণকুমারী এবং বধূদের মধ্যে জ্ঞানদানন্দিনী দেবী ও কাদম্বরী দেবীর মত মহীয়সী নারীর আত্মপ্রকাশ সম্ভব হয়েছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর জীবনে সত্যেন্দ্রনাথের প্রভাবের কথা বলতে গিয়ে বলেছেন: 'এ সময়ে আমি কিন্তু পুরাতনপন্থী ছিলাম, তাই মেয়েদের স্বাধীনতা ব্যাপার লইয়া এই গ্রন্থে ['কিঞ্চিৎ জলযোগ' প্রহসন] একটু হাস্যরসের অবতারণা করিয়াছিলাম। * * ইহার কিছুদিন পরে মেজদাদা বিলাত হইতে ফিরিয়া, আমাদের পরিবারে যখন আমূল পরিবর্তনের বন্যা বহাইয়া দিলেন, তখন আমারও মতের পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। তখন হইতে আর আমি অবরোধ প্রথার সমর্থক নহি, বরং ক্রমে ক্রমে একজন সেরা নব্যপন্থী হইয়া উঠিলাম। * * স্ত্রী স্বাধীনতার শেষে আমি এত বড় পক্ষপাতী হইয়া পড়িলাম যে, গঙ্গার ধারের কোন বাগান বাড়িতে সস্ত্রীক অবস্থান কালে আমার স্ত্রীকে আমি নিজেই অশ্বারোহণ পর্যন্ত শিখাইতাম। তাহার পর জোড়াসাঁকো বাড়িতে আসিয়া, দুইটি আরব ঘোড়ায় দুই জনে পাশাপাশি চড়িয়া, বাড়ি হইতে গড়ের মাঠ পর্যন্ত প্রত্যহ বেড়াইতে যাইতাম। ময়দানে পৌছিয়া দুই জনে সবেগে ঘোড়া ছুটাইতাম। প্রতিবাসীরা স্তম্ভিত হইয়া গালে হাত দিত। রাস্তার লোকেরা কৌতূহলে ও বিস্ময়ে মুখব্যাদান করিয়া চাহিয়া, হতভম্ব হইয়া থাকিত। * * এইরূপে

অন্তঃপুরের পর্দা তো উঠাইলামই, সঙ্গে সঙ্গে আমার চোখের পর্দাটিও একেবারে উঠিয়া গেল।"[১৪]

জ্যোতিরিন্দ্র-অঙ্কিত এই চিত্রের মধ্যেই ঠাকুরবাড়ির একালের আলেখ্যটি পরিপূর্ণ রূপে ফুটে উঠেছে। সেকালের শাশুড়ী ছিলেন পালকি-বাহিতা, এ কালের নতুন-বৌ হলেন অশ্বারোহিণী। সেকালের প্রাচীনা গৃহিণী গঙ্গাস্নানে যাওয়ার অনুমতি পেলে বেয়ারারা তাঁকে ঘেরাটোপ মোড়া পালকিসুদ্ধ জলে চুবিয়ে আনত, আর এ কালের নতুন-বৌ আরবি ঘোড়ায় চড়ে স্বামীর সঙ্গে বাড়ি থেকে গড়ের মাঠ পর্যন্ত সান্ধ্যভ্রমণে বহির্গত হন। মা তাঁর মেজ ছেলের মতিগতি দেখে একদিন সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'তুই মেয়েদের নিয়ে মেমদের মত গড়ের মাঠে ব্যাড়াতে যাবি না কি?' বম্বেতে এক ভদ্রমহিলা সত্যেন্দ্রনাথের কাছে কৌতূহল ভরে জানতে চেয়েছিলেন, তাঁর স্ত্রী ঘোড়ায় চড়া শিখেছেন কি না! ঠাকুরবাড়ির মেজ-বৌ হয়ত অতদূর যান নি। কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অনুপ্রেরণায় নতুন-বৌ শাশুড়ীর সেই দুঃস্বপ্নকেও ছাড়িয়ে গেলেন, ভাশুরের সেই স্বপ্নকামনাকে বাস্তবীভূত করে তুললেন। মেমদের মত গড়ের মাঠে শুধু ব্যাড়াতে যাওয়াই নয়, সবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে পথচারীদের স্তম্ভিত ও হতভম্ব করে দিলেন। শ্যামলাল গাঙুলির ন বছরের মেয়ে হলেন ঠাকুরবাড়ির নতুন যুগের অশ্বারোহিণী বীরাঙ্গনা।

৩

কি শক্তিতে কি কৌশলে এই অঘটন ঘটল সাধারণ জীবনের বিচার-বুদ্ধি দিয়ে তা বুঝতে পারা যাবে না। আপাতত অত্যুক্তির মতই হয়তো শোনাবে, কিন্তু একটি দেশে একটি যুগে রবীন্দ্রনাথের মত প্রতিভা নিয়ে একটিমাত্র কবিরই যেমন আবির্ভাব হয় তেমনি সেই প্রতিভার পূর্ণ বিকাশের প্রেরণার জন্যে যে জ্যোতির্ময়ী দিব্যশক্তির প্রয়োজন হয় তিনিও হন অনন্যা, অদ্বিতীয়া। কাদম্বরী দেবীর পিতৃবংশের পরিচয় থেকে জানা যায় যে, তাঁরা ছিলেন সংগীত-রসিক, শিল্পানুশীলনে তাঁদের চারুচর্যা ছিল পুরুষানুক্রমিক। কাদম্বরী দেবী জন্মসূত্রেই শিল্পকলানুরাগিণী ছিলেন। সংগীতে, নাট্যকলায় এবং সাহিত্য-রস-গ্রহণে তাঁর সহজাত পটুত্ব জ্যোতিরিন্দ্র-

নাথের মত নাট্য-সংগীত-সাহিত্যস্রষ্টার সাহচর্য ও প্রেরণায় সূক্ষ্ম নৈপুণ্য অর্জন করেছিল। ঘরে-বাইরে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রভাব প্রসঙ্গে তাঁর জীবনীকার মন্মথনাথ ঘোষ বলেছেন: 'গৃহের বাহিরে তৎকালে তাঁহার যে অসামান্য প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল, গৃহের ভিতরে যে তাহা সহস্রগুণে প্রবল ছিল তাহা বলা বাহুল্য। সাহিত্য ও শিল্পের আলোচনায়, প্রাণোন্মাদিনী সংগীতের অপূর্ব সুর-তরঙ্গে তখন তাঁহাদিগের গৃহ সর্বক্ষণ মুখরিত ও প্লাবিত থাকিত, এবং সেই অপরিসীম আনন্দ ও সৌন্দর্যের ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া তাহার অধিকারী কত নবীন হৃদয়ে তাহা অকাতরে বিতরণ করিয়া সেই ফুটনোন্মুখ হৃদয়গুলিকে বিকশিত করিয়াছিলেন তাহা বলা যায় না।''[৫] প্রভাতকুমারও তাঁর রবীন্দ্রজীবনীতে জ্যোতিরিন্দ্র-প্রসঙ্গে বলেছেন: 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ছিলেন ঠাকুর পরিবারের জ্যোতিঃ-স্বরূপ, সর্ব কর্ম সর্ব আন্দোলনের কেন্দ্র। বিচিত্র বিষয়ের আলোচনা ও চর্চায় ইহার আনন্দ ছিল অপরিসীম, উৎসাহ ছিল অদম্য, সাহস ছিল দুর্জয়। * * চিত্রে সংগীতে নাট্যে ভাষাশিক্ষায় ব্যবসায়ে স্বাদেশিকতায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সর্বতোমুখী প্রতিভা ব্যাপ্ত ছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বহুমুখীনতা রবীন্দ্রনাথের জীবনে গভীরভাবে প্রতিফলিত ও সুন্দররূপে সার্থক হইয়াছিল।''[৬] জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কীর্তি বাংলা সাহিত্যে অবিস্মরণীয় সন্দেহ নেই। কিন্তু এই অসামান্য শিল্পী তাঁর তরুণ যৌবনের 'আশা দিয়ে ভাষা দিয়ে তাহে ভালবাসা দিয়ে' যে 'মানসী প্রতিমা' গড়ে তুলেছিলেন সেই কাদম্বরী দেবীই জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সৃজনীশক্তির চরমোৎকর্ষ।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনীকার কাদম্বরী দেবীকে 'পরমাসুন্দরী কন্যা' রূপে বর্ণনা করেছেন। দ্বারকানাথ ঠাকুরের সৌন্দর্যপ্রিয়তা ছিল সর্বজনবিদিত। ঠাকুরবাড়ির পুরুষদের মত তাঁদের কন্যা ও বধূদেরও সৌন্দর্য ও সুরুচির সুখ্যাতি সুদূরপ্রসারী। কাদম্বরী দেবীও সুন্দরী ছিলেন নিঃসন্দেহ, কিন্তু গৌরবর্ণা ছিলেন না। জ্ঞানদানন্দিনী দেবী বলেছেন: 'আমরা বউয়েরা প্রায় সকলেই শ্যামবর্ণ ছিলুম। শাশুড়ী ননদ সকলেই গৌরবর্ণ ছিলেন। প্রথম বিয়ের পর শাশুড়ী আমাদের রূপটান ইত্যাদি মাখিয়ে রং সাফ করবার চেষ্টা করতেন।' কাদম্বরী দেবীর শ্রী ও লাবণ্যের যে বর্ণনা তাঁর ভক্ত-কবির কণ্ঠে আমরা বার বার শুনেছি তাতে মনে হয়েছে ব্যক্তিত্বে ও আকর্ষণী-শক্তিতে

তিনি ছিলেন সর্বজয়া। যে দুর্লভ ধাতু-প্রকৃতি নিয়ে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মত শিল্পীর পরিমার্জনে তা দিব্যকান্তি লাভ করেছিল। ভবভূতির ভাষায় সেই জ্যোতির্ময়ী নারীলক্ষ্মী সম্পর্কে বলা চলে, 'ইয়ং গেহে লক্ষ্মীরিয়মমৃতবর্তির্নয়নয়োঃ।'

কাদম্বরী দেবীর ব্যক্তিত্বের একদিক তাঁর অশ্বারোহিণী বীরাঙ্গনা মূর্তির মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু পুরুষের প্রেরণাদাত্রী লাবণ্যময়ী গৃহলক্ষ্মীরূপে তাঁর ব্যক্তিত্বের আরেকটি দিকের কথাও আমাদের মনে রাখতে হবে। তাঁর শ্রীময়ী গৃহবধূ-রূপটিও নয়নাভিরাম। নয় বৎসর বয়সে তিনি বধূরূপে ঠাকুরবাড়িতে প্রবেশ করেছিলেন, সেই থেকে ষোলো বৎসরব্যাপী তাঁর সংসার-চিত্রটি প্রতিদিনের সঙ্গ সান্নিধ্য পরিচর্যা ও প্রসাদলাভে ধন্য রবীন্দ্রনাথের চোখে কি ভাবে ধরা দিয়েছিল তা লক্ষ্য করা যেতে পারে। কবি বলেছেন, তাঁর নতুন বৌঠানের পরশমণির ছোঁয়ায় সবই যেন অপরূপ হয়ে উঠত। যে ঠাকুরবাড়ির ছাদ কবির শৈশব জীবনে একদিন ছিল 'বেদের বাসা' বৌদির আবির্ভাবে তাই হয়ে উঠল 'নন্দন কানন'। 'ছেলেবেলা'য় কবি লিখেছেন, ঠাকুরবাড়িতে নতুন বৌ-এর আবির্ভাবে অন্তঃপুরের পুরনো আইন পালটালো। 'হঠাৎ দুর পাহাড় থেকে বর্ষার জল নেমে সাবেক কালের বাঁধের তলা ক্ষইয়ে দেয়, এবার তাই ঘটল। বাড়িতে নতুন আইন চালালেন কর্ত্রী। বৌঠাকরুনের জায়গা হোলো বাড়ির ভিতরের ছাদের লাগাও ঘরে। সেই ছাদে তাঁরি হল পুরো দখল।' [পৃ° ৬১] 'একদিন গোলাবাড়ি, পালকি, আর তেতলার ছাদের খালি ঘরে আমার ছিল যেন বেদের বাসা, কখনো এখানে কখনো ওখানে। বৌঠাকরুন এলেন, ছাদের ঘরে বাগান দিল দেখা। উপরের ঘরে এল পিয়ানো, নতুন নতুন সুরের ফোয়ারা ছুটল।' [পৃ° ৭৮] 'ছাদটাকে বৌঠাকরুন একেবারে বাগান বানিয়ে তুলেছিলেন। পিল্পের উপরে সারি সারি লম্বা পাম্ গাছ, আশে পাশে চামেলি, গন্ধরাজ, রজনীগন্ধা, করবী, দোলন-চাঁপা। ছাদ জখমের কথা মনেই আনেন নি, সবাই ছিলেন খেয়ালী।' [পৃ° ৬৬] 'বৌঠাকরুন জোগাড় করেছিলেন চীন দেশের এক শ্যামা পাখি। কাপড়ের ঢাকার ভিতর থেকে তার শিস উঠত ফোয়ারার মতো। আরো ছিল নানা জাতের পাখি, তাদের খাঁচাগুলো ঝুলত পশ্চিমের বারান্দায়।' [পৃ° ৬৭]

কাদম্বরী দেবীর গৃহিণী-মূর্তির বর্ণনায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন: 'বৌঠাকরুন রাঁধতে পারতেন ভালো, খাওয়াতে ভালোবাসতেন, এই খাওয়াবার শখ মেটাতে আমাকে হাজির পেতেন। ইস্কুল থেকে ফিরে এলেই তৈরি থাকত তাঁর আপন হাতের প্রসাদ। চিংড়ি মাছের চচ্চড়ির সঙ্গে পানতা ভাত যেদিন মেখে দিতেন অল্প একটু লঙ্কার আভাস দিয়ে, সেদিন আর কথা ছিল না।' [পৃ° ৬২]

'পূর্বদিকের চিলে কোঠার ছায়ায় জ্যোতিদাদার কফি খাওয়ার সরঞ্জাম হত সকালে।'...

'দুপুরবেলায় জ্যোতিদাদা যেতেন নিচের তলায় কাছারিতে। বৌঠাকরুন ফলের খোসা ছাড়িয়ে কেটে কেটে যত্ন করে রুপোর রেকাবিতে সাজিয়ে দিতেন। নিজের হাতের মিষ্টান্ন কিছু কিছু থাকত তার সঙ্গে, আর তার উপরে ছড়ানো হত গোলাপের পাপড়ি। গেলাসে থাকত ডাবের জল কিংবা ফলের রস কিংবা কচি তালশাঁস বরফে ঠাণ্ডা করা।'

'সমস্তটার উপর একটা ফুলকাটা রেশমের রুমাল ঢেকে মোরাদাবাদি খুঞ্চেতে করে জল খাবার বেলা একটা দুটোর সময় রওনা করে দিতেন কাছারিতে।' [পৃ° ৭৮-৭৯]

'মাঝে মাঝে জ্যোতিদাদা যেতেন হাওয়া বদল করতে গঙ্গার ধারের বাগানে। * * গঙ্গার ধারের প্রথম যে বাসা আমার মনে পড়ে ছোট সে দোতলা বাড়ি। * * তার কিছুদিন পরে বাসা বদল করা হল মোরান সাহেবের বাগানে। * * ঐ মোরান বাগানের কথায় মনে পড়ে এক একদিন রান্নার আয়োজন বকুলগাছ তলায়। সে রান্নার মসলা বেশি ছিল না, ছিল হাতের গুণ। মনে পড়ে পৈতের সময় বৌঠাকরুন আমাদের দুই ভাইয়ের হবিষ্যান্ন রেঁধে দিতেন, তাতে পড়ত গাওয়া ঘি। ওই তিনদিন তার স্বাদে তার গন্ধে মুগ্ধ করে রেখেছিল লোভীদের।'

'আমার একটা মুশকিল ছিল, শরীরটাকে সহজে রোগে ধরত না। বাড়ির আর আর যে সব ছেলে রোগে পড়তে জানত তারা পেত তাঁর হাতের সেবা। তারা শুধু যে তাঁর সেবা পেত তা নয়, তাঁর সময় জুড়ে বসত। আমার ভাগ যেত কমে।' [পৃ° ৭৯-৮১]

সেবা ও পরিচর্যাময়ী এই নারীলক্ষ্মী এমনি করেই তাঁর পরিবার ও

পরিজনবর্গের মধ্যে তাঁর হৃদয়ের স্বতঃউৎসারিত দাক্ষিণ্য ও লাবণ্যের সুধা ছড়িয়ে দিতেন। তাঁর জীবন যখন ষোলকলায় পূর্ণ হয়েছে তখন ঠাকুর-বাড়িতে 'ভারতী'-গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠা হয়েছে। কাদম্বরী দেবী ছিলেন এই ভারতী-মধুচক্রের মক্ষিরাণী। ভারতীগোষ্ঠীর অন্যতম প্রধান সদস্য ছিলেন কবি অক্ষয় চৌধুরী। তাঁর সহধর্মিণী 'শুভ-বিবাহ'-লেখিকা সে যুগের আর একজন সারস্বত-কন্যা শরৎকুমারী 'ভারতী' প্রসঙ্গে তাঁর 'ভারতীর ভিটা'য় লিখেছেন: 'প্রকৃতপক্ষে 'ভারতী' জ্যোতিবাবুরই মানস-কন্যা। * * প্রতি রবিবারে জ্যোতিবাবু ও রবীন্দ্রনাথ ভারতীর ভাণ্ডার লইয়া আমাদের বাড়িতে আসিয়া 'ভারতী' সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন ও পরে "তাঁহাকে" লইয়া ৺বিহারীলাল চক্রবর্তী মহশয়ের বাটিতে যাইতেন। * * কোন কোন দিন আমরা ৺জানকীবাবুর রামবাগানস্থ বাড়িতে যাইতাম—সেখানে ন বউঠাকুরাণী, নতুন বউ, জ্যোতিবাবু, রবিবাবু প্রভৃতিও আসিতেন। * * 'ভারতী'র জন্মস্থান ৬নং দ্বারকানাথ ঠাকুরের লেন ভবনটি তখন ভারতী উৎসবে নিত্য-মুখরিত। জ্যোতিবাবুর তেতলার ছাদে টবের গাছ সাজাইয়া বাগান করা হইয়াছিল, "তিনি" নাম দিয়াছিলেন 'নন্দন-কানন'। সন্ধ্যার সময় পরিবারস্থ সকলেই সেখানে নিত্যনিয়মিত মিলিত হইতেন। * *'

এই ভারতী-গোষ্ঠীতে কাদম্বরী দেবীর স্থান কি ছিল সে সম্পর্কে শরৎকুমারী লিখছেন: 'ফুলের তোড়ার ফুলগুলিই সবাই দেখিতে পায়, যে বাঁধনে তাহা বাঁধা থাকে, তাহার অস্তিত্বও কেহ জানিতে পারে না। মহর্ষি পরিবারের গৃহলক্ষ্মী শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী ছিলেন এই বাঁধন।'[১৭]

৪

মানুষের সংসারে মূর্তিমতী প্রেরণা-স্বরূপিণী এই শ্রীময়ী প্রাণময়ী ও কল্যাণময়ী নারী তাঁর প্রাণের অনিঃশেষ ঐশ্বর্য ছড়িয়ে তাঁর পরিমণ্ডলকে মধুময় করে রেখেছিলেন। কিন্তু তাঁর হৃদয়-মন্দাকিনীধারা মর্ত্যলীলায় মুখ্যত মুক্ত-ত্রিবেণীতেই নিত্যপ্রবাহিত হত। কাদম্বরী দেবীর সেই প্রাণপ্রবাহিণী গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতীধারায় বিহারীলাল জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের অভিমুখে ভক্তি প্রেম ও প্রীতির অমৃতনির্ঝরিণীরূপে উৎসারিত হয়েছিল। প্রভাতকুমার

রবীন্দ্রজীবনীতে বলেছেন, 'অন্তরঙ্গেরা রহস্যচ্ছলে' কাদম্বরী দেবীকে নাকি 'হেকেটি' বলে ডাকতেন। কবির 'ভগ্নহৃদয়' 'শ্রীমতী হে'র নামে উৎসর্গীকৃত। এই 'শ্রীমতী হে'র রহস্য সন্ধান করতে গিয়ে প্রভাতকুমার বলেছেন: 'আমরা শুনিয়াছি 'হে' কাদম্বরী দেবীর কোনও ছদ্মনামের আদ্যাক্ষর। কেহ কেহ বলেন তাঁহার ডাকনাম ছিল 'হেকেটি'—এক গ্রীক দেবী। অন্তরঙ্গেরা রহস্যচ্ছলে এই নামটিতে তাঁহাকে ডাকিতেন'।[১৮]

'চেম্বার্স—বিংশ শতাব্দী' অভিধানে হেকেটি [Hecate, গ্রীক বানান Hekate] সম্পর্কে লেখা হয়েছে, 'a mysterious goddess,…having power over earth, heaven, and sea'। আজ এ কথা বলা সম্ভব নয় কেন অন্তরঙ্গেরা কাদম্বরী দেবীকে রহস্যচ্ছলে 'হেকেটি' বলে ডাকতেন। বিহারীলাল, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের উপর তাঁর ত্রিমুখী প্রভাবের প্রতি ইঙ্গিত করে তাঁরা এই রহস্য রচনা করেছিলেন কিনা তাঁরাই জানতেন। কিন্তু পবিত্র ও অতিসূক্ষ্ম হৃদয়ানুভূতি নিয়ে রহস্য করা শুধু মানসিক অপকর্ষেরই পরিচায়ক নয়, কখনো কখনো তা জীবনে মর্মান্তিক হয়েই দেখা দেয়। অতি সূক্ষ্ম তারে বাঁধা বিচিত্রতন্ত্রীসমন্বিত বাদ্যযন্ত্রে বে-দরদীর স্থূলহস্তাবলেপ মাত্রেই যেমন তার ছিঁড়ে যায় কাদম্বরী দেবীরও অতি সুকুমার হৃদয়বীণাযন্ত্রের সূক্ষ্মতন্ত্রী এক হৃদয়হীন বে-দরদীর পরুষস্পর্শে চিরদিনের মতই অকালে ছিন্ন হয়ে গেল। মাত্র পঁচিশ বৎসর বয়সে তিনি ইহলীলা সংবরণ করলেন: কী নিগূঢ় অভিমানে, কী মর্মান্তিক বেদনায় এই অজ্ঞাতবেদনা দেবী তাঁর নিজের জীবন নিজের হাতেই গ্রহণ করলেন তা নিশ্চিত করে জানবার আর কোন উপায় নেই। মহর্ষি-ভবনের সেই দিব্য সংগীত চিরদিনের মতই নীরব হয়ে গেছে। স্বামীর উপর প্রিয়জনের উপর সমস্ত অভিযোগ ও অভিমান নীরবে বুকের মধ্যে চেপে রেখে তিনি নিঃশব্দে এই পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করেছেন।

আমরা সংসার-জীবনে কাদম্বরী দেবীর প্রাকৃত-লীলার চিত্র দেখেছি। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রেমের আলোয় তাঁর হৃৎশতদলের উন্মীলনলীলার কথা আমরা বলেছি। শরৎকুমারী দেবীর কণ্ঠে 'মহর্ষি-পরিবারের গৃহলক্ষ্মী' রূপে তাঁর গুণকীর্তনও শুনেছি। কিন্তু এই প্রাকৃত-জীবনের পঁচিশ বৎসরের সুখদুঃখের মধ্যেই কাদম্বরী দেবীর ইহলীলার অবসান হয় নি। তিনি

ছিলেন সারস্বত তীর্থের মূর্তিমতী প্রেরণা। নিজে তিনি কোন কাব্যসৃষ্টি করেছিলেন বলে আমাদের জানা নেই, কিন্তু তাঁর দিব্য প্রেরণায় রবীন্দ্রনাথের মত মহাকবির জীবনে নব নব সৃষ্টির উৎস উন্মুক্ত হয়েছে, এ কথা সত্য। বিহারীলাল তাঁকে 'ব্রহ্মার মানস-সরে প্রফুল্ল নলিনী' রূপেই ধ্যান করেছিলেন। ভারতী-সত্রের সেই কবিগুরুর জীবনে কাদম্বরী দেবীর দিব্য প্রেরণা কি অমর সৃষ্টির উৎসরূপে ক্রিয়াশীল হয়েছিল এবার সে কথা বলেই এ অধ্যায়ের উপসংহার রচনা করব।

৫

'জীবনস্মৃতি'তে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন : 'এই সময়ে বিহারীলাল চক্রবর্তীর সারদামঙ্গল-সংগীত আর্যদর্শন পত্রে বাহির হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। বউ ঠাকুরাণী এই কাব্যের মাধুর্যে অত্যন্ত মুগ্ধ ছিলেন। ইহার অনেকটা অংশই তাঁহার একেবারে কণ্ঠস্থ ছিল। কবিকে প্রায় তিনি মাঝে মাঝে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া খাওয়াইতেন এবং নিজে হাতে রচনা করিয়া তাঁহাকে একখানি আসন দিয়াছিলেন।'[১৯]

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে 'ভারতী'র অন্তরঙ্গ গোষ্ঠীর মধ্যে বিহারীলালই বর্ষিষ্ঠ সদস্য ছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের চেয়ে তিনি ১৪ বৎসরের বড় ছিলেন এবং কাদম্বরী দেবী যখন পঁচিশ বৎসর বয়সে লোকান্তরিত হন তখন বিহারীলালের বয়স পঞ্চাশ বৎসর। বিহারীলালের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্করণে কবির 'সংক্ষিপ্ত জীবনকথা'য় বলা হয়েছে, 'উনিশ বৎসর বয়সে বিহারীলালের বিবাহ হয়। কিন্তু বিবাহের চারি বৎসর পরেই তাঁহার স্ত্রী··· মৃত্যুমুখে পতিত হন। ইহার কিছুকাল পরে বিহারীলালের পিতা পুত্রের পুনরায় বিবাহ দেন। এই পত্নীর নাম 'কাদম্বিনী' দেবী। ইনি বহুবাজার নিবাসী নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় কন্যা। এই লক্ষ্মী-স্বরূপিণী সুরূপা স্ত্রী-লাভ বিহারীলালের জীবনকে সুখময় করিয়া তুলিয়াছিল।' ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সাহিত্যসাধক-চরিতমালায় [২৫] বিহারীলাল প্রসঙ্গে [পৃ. ৮] 'প্রয়াস'-এ উদ্ধৃত যে সংবাদ পরিবেশন করেছেন তাতে দেখা যায়, বিহারীলালের দ্বিতীয়া পত্নীর নাম ছিল কাদম্বরী দেবী। গৃহলক্ষ্মীর সঙ্গে ভক্তপাঠিকার নামগত ঐক্য আত্মভোলা কবির চিত্তকে কি ভাবে রঞ্জিত করেছিল তা ভেবে দেখবার বিষয়।

বিহারীলাল তাঁর 'সাধের আসন' কাব্যের ভূমিকায় বলেছেন, কোন সম্রান্ত সীমন্তিনী 'সারদামঙ্গল' পাঠে সন্তুষ্ট হয়ে স্বহস্তে বুনে একখানি উৎকৃষ্ট আসন তাঁকে উপহার দেন। এই আসনের নাম 'সাধের আসন'। তাতে সুন্দর সুন্দর অক্ষর বুনে সারদামঙ্গল থেকে নিম্নলিখিত শ্লোকার্ধ উদ্ধৃত করা হয়েছে—

হে যোগেন্দ্র! যোগাসনে
ঢুলু ঢুলু ঢু-নয়নে
বিভোর বিহ্বল মনে কাঁহারে ধেয়াও?

আসনদাত্রী কবির কাছে এই প্রশ্নের উত্তর চেয়েছিলেন। কবির সেই উত্তরই কাব্যের আকারে অভিব্যক্ত হয়েছে। এই শ্লোকার্ধটি 'সারদামঙ্গলে' আদিকবি বাল্মীকির প্রেরণাময় মুহূর্তের চিত্র। বাল্মীকির ধ্যানসম্ভূতা সরস্বতীর বর্ণনায় সেখানে কবি লিখেছিলেন:

ব্রহ্মার মানস-সরে
ফুটে ঢলঢল করে
নীলজলে মনোহর স্বর্ণ-নলিনী,
পাদপদ্ম রাখি তায়
হাসি হাসি ভাসি যায়
যোড়শী রূপসী বামা পূর্ণিমা যামিনী! ১।২১॥

কবির উদ্দেশে কাদম্বরী দেবীর জিজ্ঞাসাটি কবির প্রতি অনুরাগময়ী ভক্ত-পাঠিকারই কৌতূহল-সঞ্জাত জিজ্ঞাসা। 'সাধের আসনে'র দশ সর্গে কবি কাকে ধ্যান করেন তারই উত্তর দিয়েছেন। বিহারীলালের আধ-আধ রহস্যময় ভাষায় সে উত্তরের তাৎপর্য কি তা কাব্যরসিকের বিচার্য বিষয়। কিন্তু 'সাধের আসনে'র নবম ও দশম সর্গের নাম 'আসনদাত্রী দেবী' এবং 'পতিব্রতা'। বলাই বাহুল্য, এই দুই সর্গে প্রত্যক্ষভাবে কবি কাদম্বরী দেবীর কথাই বলেছেন। তাঁর আকস্মিক লোকান্তর গমনের পরে 'সাধের আসন' বিরচিত। কবি তাঁর পুণ্য প্রেরণার কথা স্মরণ করে বলেছেন:

সাহিত্য-সংসারে তুমি
সুকুমার ফুলভূমি,
তোমার স্নেহের গুণে কত রকমের ফুল

ফুটে আছে থরে থরে ;
কেমন সৌরভ ভরে
সোহাগ-সমীরে কিবে করিতেছে ঢুলঢুল্। ১।৩॥

* * *

চলিয়া গিয়াছ তুমি,
কি বিষণ্ণ বঙ্গভূমি ;
সে অবধি আজো কেন
দেশে কি হয়েছে যেন !
নিকুঞ্জ-কাননে আর কোন পাখী ডাকে না।
ভাগীরথী-তীর থেকে আর বাঁশী বাজে না !
মানস-সরসে হায় পদ্ম ফোটে হাসে না !
স্বর্গের বীণার ধ্বনি ভেসে ভেসে আসে না !
এদেশে ভারতী দেবী বুঝি প্রাণে বাঁচে না ! ১।৫ ॥

সেই প্রিয় মুখ সব, সেই প্রিয় নিকেতন,
সেই ছাদে তরুরাজি শূন্যে শোভে উপবন,
সেই জাল-ঘেরা পাখী, সেই খুদে হরিণী,
সেই প্রাণ-খোলা গান, সেই মধু যামিনী,
কি যেন কি হয়ে গেছে !
কি যেন কি হারায়েছে !
কেন গো সেথায় যেতে কিছুতে সরে না মন ? ১।৬॥

দোলায়ে ফুলের বন
চোলে গেলে সমীরণ,
সেই ফুল হাসে হায়, সে সৌরভ আসে না ! ১।৭

তুমি প্রভাতের উষা,
স্বর্গের ললাট-ভূষা,

ব্রহ্মার মানস-সরে প্রফুল্ল নলিনী গো!
কেন মা পৃথিবী আসি
শুকায় সুখের হাসি!
সতী সাধ্বী পতিব্রতা,
কই তোর প্রফুল্লতা?
কে ছিঁড়েছে আশালতা? কি মানে মানিনী গো? ১০।৭॥
আজি মা কিসের তরে
হাসি নাই বিম্বাধরে,
মলিন বিষণ্ণ-মুখী, নেত্রে কেন অশ্রুজল?
ভাল মানুষের ভালে
সুখ নাই কোন কালে;
কঠোর নিয়তি, আরো কতই কাঁদাবি বল? ১০।৮॥

এস না ধরায়—আর এস না ধরায়।
পুরুষ কিম্ভূতমতি চেনে না তোমায়।
মনঃ প্রাণ যৌবন—
কি দিয়া পাইবে মন!
পশুর মতন এরা নিতুই নতুন চায়।
এস না ধরায়! ১০।৯॥

তথ্যসন্ধানী এই শ্লোকগুলির মধ্যে যে ইঙ্গিতই খুঁজে বের করুন, আর কাব্যরসিক তার যে রসভাষ্যই করুন না কেন, আধুনিক বাংলা সাহিত্যে এর পূর্বে কোন অনাত্মীয়া নারীকে উপলক্ষ করে কবির ভাবাবেগ আর কখনো এমন দিব্যাবেশে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে নি। আসনদাত্রী তাঁর প্রশ্নের উত্তর শুনে যাবার সুযোগ পান নি। কিন্তু 'সারদা-মঙ্গলে' 'ব্রহ্মার মানস-সরে' শ্লোকে কবি যে সারদা-সূক্ত রচনা করেছিলেন, 'সাধের আসনে'র আসনদাত্রী দেবীর উদ্দেশেও তিনি তারই পুনরুক্তি করে বলেছেন:

তুমি প্রভাতের উষা,
স্বর্গের ললাট-ভূষা,
ব্রহ্মার মানস-সরে প্রফুল্ল নলিনী গো!

বাংলার সারস্বত-সত্রে বিহারীলালের কবিকণ্ঠে তাঁর প্রেরণাদাত্রী রূপে কাদম্বরী দেবী এই বাঙ্ময়ী দেবী-মূর্তিতেই অমর হয়ে রয়েছেন।

॥ উল্লেখ-পঞ্জী ॥

১ কাদম্বরী দেবীর জন্ম ১২৬৬ বঙ্গাব্দের ২১ আষাঢ়, ১৮৫৯ খ্রীস্টাব্দের ৪ জুলাই। দ্রষ্টব্য: 'রবীন্দ্র-প্রতিভা', কানাই সামন্ত। পৃ° ৩৯০।

২ স্ত্রীর প্রতি পত্র। শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। 'পুরাতনী'। পৃ° ৪৮-৪৯।

৩ তদেব। পৃ° ৭৩-৭৪ ও ৮৪-৮৫।

৪ তদেব। পৃ° ১২৬।

৫ প্রাচ্যবিদ্যার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু ও ব্যোমকেশ মুস্তফী, 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস', ব্রাহ্মণকাণ্ড, তৃতীয় ভাগ, পিরালী ব্রাহ্মণ-বিবরণ। পৃ° ৩০৩-৩১০।

৬ 'পুরাতনী'। পৃ° ৩৪-৩৫।

৭ তদেব। পৃ° ১৮৭।

৮ প্রদীপ, ভাদ্র ১৩০৬, পৃ° ৩১৪-১৬, পুরাতনী গ্রন্থে শ্রীপুলিনবিহারী সেন কর্তৃক উদ্ধৃত।

৯ পুরাতনী। পৃ° ২০, ২৩।

১০ তদেব। পৃ° ২৪-২৫।

১১ স্ত্রীর প্রতি পত্র। পুরাতনী। পৃ° ৫৪।

১২ জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর স্মৃতিকথা। পুরাতনী। পৃ° ২৯।

১৩ তদেব। পৃ° ৩৩।

১৪ 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি'। পৃ° ১৩৮।

১৫ শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। পৃ° ৫৬।

১৬ শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। রবীন্দ্র-জীবনী। প্রথম খণ্ড। পৃ° ৫৮।

১৭ শরৎকুমারী চৌধুরাণীর রচনাবলী। সম্পাদক ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকান্ত দাস। পৃ° ৩৭৫।

১৮ রবীন্দ্র-জীবনী। প্রথম খণ্ড। পৃ° ৯৫-৯৬। 'শ্রীমতী হে'র রহস্যোন্মোচন সম্পর্কে শ্রীসজনীকান্ত দাসের অভিমত ষষ্ঠ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

১৯ 'জীবনস্মৃতি', "সাহিত্যের সঙ্গী" অধ্যায়। রবীন্দ্র-রচনাবলী-১৭, পৃ° ৩৪৩।

তৃতীয় অধ্যায়

নির্বাসিত রাজপুত্র

১

রবীন্দ্রনাথের শিশুমানসে কাদম্বরী দেবী প্রথম দেখা দিলেন রূপকথার রাজকন্যা-রূপে। আশি বৎসর বয়সে শৈশবের সেই বিশেষ দিনটির কথা সানুরাগে স্মরণ করে কবি বলেছেন, 'এমন সময় একদিন বাজল সানাই বারোয়াঁ সুরে। বাড়িতে এল নতুন বৌ কচি শামলা হাতে সরু সোনার চুড়ি। পলক ফেলতেই ফাঁক হয়ে গেল বেড়া, দেখা দিল চেনাশোনার বাহির সীমানা থেকে মায়াবী দেশের মানুষ।'[১]

শেষের কথাগুলি বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার মত! 'চেনাশোনার বাহির সীমানা থেকে মায়াবী দেশের মানুষ'!! কিন্তু রবীন্দ্রনাথ নিজেও তো তাই। মানুষের সংসারে সহস্র বৎসরে অমন একটি সন্তানের জন্ম হয়। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের পৌত্র বলে নয়, বাগ্‌দেবীর আশীর্বাদে মণিমাণিক্যখচিত অপার্থিব কল্পনার অনিঃশেষ ঐশ্বর্যলোকে রবীন্দ্রনাথ তো রূপকথার রাজপুত্র। এই রাজপুত্র যেদিন মানুষের হৃদয়-সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট হয়ে উঠেছিলেন, সেদিন শরৎচন্দ্রের কণ্ঠে সারা বাংলার হৃদয়াবেগ ভাষা পেল: 'কবিগুরু, তোমার প্রতি চাহিয়া আমাদের বিস্ময়ের সীমা নাই!'[২] এ বিস্ময় শুধু আমাদেরই নয়, রবীন্দ্রনাথের দিকে তাকিয়ে এ বিস্ময় বিদেশী পরিব্রাজকের চোখেও বার বার ফুটে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ তখনো নোবেল-পুরস্কার পান নি। ১৯১০-১১ খ্রীস্টাব্দে বিখ্যাত জর্মন দার্শনিক কাউণ্ট কাইজারলিং পৃথিবীপরিক্রমা শেষ করে ভারতবর্ষে এসেছিলেন। বিভিন্ন দেশের শ্রেষ্ঠ মনীষিবৃন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তিনি দু খণ্ডে তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্ত প্রকাশ করেন। ভারতবর্ষকে কাইজারলিংয়ের বড় ভাল লেগেছিল। প্রথম খণ্ড তাই কেবল ভারতেরই কথা। তাঁর ভারতকথার পূর্ণাহুতি রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ দিয়ে। যে-সন্ধ্যায় জোড়াসাঁকোর প্রাসাদে তিনি প্রথম রবীন্দ্রনাথকে দেখলেন সেই 'অবিস্মরণীয় সন্ধ্যা' সম্পর্কে কাইজারলিং লিখছেন:

'It was a memorable night. The noble figures of the Tagores, with their delicate, spiritualised faces, in their

picturesquely folded togas, fitted admirably into the lofty hall, hung with its ancient paintings. Abanindranath, the painter of the family, made me think of the types which, once upon a time, were the ornament of Alexandria; Rabindranath, the poet, impressed me like a guest from a higher, more spiritual world. Never perhaps have I seen so much spiritualised substance of soul condensed into one man.'—*The Travel Diary of a Philosopher*, vol. I, pp. 335–6.

বিদেশাগত দার্শনিক-পরিব্রাজকের দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথকে এই পৃথিবীতে উধ্বর্লোকের অতিথি বলেই সেদিন মনে হয়েছে। মনে হয়েছে চেনাশোনার বাহির সীমানা থেকে এক অপরূপ চিৎসত্ত পুরুষ। যাঁকে দেখে বিদেশী ভক্ত বলেছেন, এমনটি বুঝি আর কখনো দেখি নি।

কিন্তু এই রূপকথার রাজপুত্রের শৈশব-জীবন ছিল ভাগ্যবিড়ম্বিত। অন্তঃপুর থেকে নির্বাসিত, সহজাত নারীস্নেহ থেকে বঞ্চিত, ভৃত্যরাজকতন্ত্রে নিগৃহীত, অভিভাবকগণের নিষ্ঠুর অনুশাসন-শৃঙ্খলে অষ্টপ্রহর জর্জরিত, নিতান্ত নিঃসহায় বন্দিদশাতেই শিশুরবির শৈশব অতিক্রান্ত হয়েছে। এই বিড়ম্বিত বন্দিদশার অভিশপ্ত কারাগারে শাপমুক্তির বাণী নিয়ে এলেন কাদম্বরী দেবী। তাঁর সোনার কাঠির স্পর্শে নির্বাসিত রাজপুত্রের কারাগৃহ হল অর্গলমুক্ত। 'এল মানুষের সঙ্গ, মানুষের স্নেহ।'

২

রবীন্দ্রনাথ রাজপুত্র, কিন্তু রাজ্যহীন রাজার অবহেলিত কনিষ্ঠ সন্তানের ভাগ্য ছিল তাঁর। সপ্ততিবর্ষপূর্তি উপলক্ষে জয়ন্তী-অনুষ্ঠানের 'প্রতিভাষণে' সেই ভাগ্যের কথায় কবি বলছেন, 'আমাদের ছিল মস্ত একটা সাবেক কালের বাড়ি, তার ছিল গোটাকতক ভাঙা ঢাল বর্শা ও মরচে-পড়া তলোয়ার-খাটানো দেউড়ি, ঠাকুরদালান, তিন-চারটে উঠোন, সদর-অন্দরের বাগান, সম্বৎসরের গঙ্গাজল ধরে রাখার মোটা মোটা জালা-সাজানো অন্ধকার ঘর। পূর্বযুগের নানা পালপার্বণের পর্যায় নানা কলরবে সাজেসজ্জায় তার মধ্যে দিয়ে একদিন চলাচল করেছিল, আমি তার স্মৃতিরও বাইরে পড়ে গেছি। আমি এসেছি

যখন, এ-বাসায় তখন পুরাতন কাল সন্ত বিদায় নিয়েছে, নতুন কাল সবে এসে নামল, তার আসবাবপত্র তখনো এসে পৌঁছয় নি।

'এ বাড়ি থেকে এদেশীয় সামাজিক জীবনের স্রোত যেমন সরে গেছে তেমনি পূর্বতন ধনের স্রোতেও পড়েছে ভাঁটা। পিতামহের ঐশ্বর্যদীপাবলী নানা শিখায় একদা এখানে দীপ্যমান ছিল, সেদিন বাকি ছিল দহনশেষের কালো দাগগুলো, আর ছাই, আর একটিমাত্র কম্পমান ক্ষীণ শিখা। প্রচুর-উপকরণ-সমাকীর্ণ পূর্বকালের আমোদ-প্রমোদ-বিলাসসমারোহের সরঞ্জাম কোণে কোণে ধূলিমলিন জীর্ণ অবস্থায় কিছু কিছু বাকি যদি বা থাকে তাদের কোনো অর্থ নেই। আমি ধনের মধ্যে জন্মাই নি, ধনের স্মৃতির মধ্যেও না।'[৩]

'জীবনস্মৃতি'তে এরই পরিপূরক বর্ণনা পাওয়া যাবে। সেখানে কবি বলছেন, 'আমাদের শিশুকালে ভোগবিলাসের আয়োজন ছিল না বলিলেই হয়।...আহারে আমাদের শৌখিনতার গন্ধও ছিল না। কাপড়চোপড় এতই যৎসামান্য ছিল যে এখনকার ছেলের পক্ষে তাহার তালিকা ধরিলে সম্মানহানির আশঙ্কা আছে। বয়স দশের কোঠা পার হইবার পূর্বে কোনো-দিন কোনো কারণেই মোজা পরি নাই। শীতের দিনে একটা সাদা জামার উপরে আর-একটা সাদা জামাই যথেষ্ট ছিল। ইহাতে কোনোদিন অদৃষ্টকে দোষ দিই নাই। কেবল, আমাদের বাড়ির দরজি নেয়ামত খলিফা অবহেলা করিয়া আমাদের জামায় পকেট-যোজনা অনাবশ্যক মনে করিলে দুঃখ বোধ করিতাম—কারণ, এমন বালক কোনো অকিঞ্চনের ঘরেও জন্মগ্রহণ করে নাই, পকেটে রাখিবার মতো স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি যাহার কিছুমাত্র নাই; বিধাতার কৃপায় শিশুর ঐশ্বর্য সম্বন্ধে ধনী ও নির্ধনের ঘরে বেশি কিছু তারতম্য দেখা যায় না। আমাদের চটিজুতা একজোড়া থাকিত, কিন্তু পা দুটা যেখানে থাকিত সেখানে নহে। প্রতিপদক্ষেপে তাহাদিগকে আগে আগে নিক্ষেপ করিয়া চলিতাম—তাহাতে যাতায়াতের সময় পদচালনা অপেক্ষা জুতাচালনা এত বাহুল্য পরিমাণে হইত যে পাদুকাসৃষ্টির উদ্দেশ্য পদে পদে ব্যর্থ হইয়া যাইত।'[৪]

ছেলেবেলায় রবীন্দ্রনাথ পিতৃ-সান্নিধ্য খুব বেশি পেয়েছিলেন বলে মনে হয় না। 'জীবনস্মৃতি'তে "পিতৃদেব" অধ্যায়ে লিখেছেন, 'আমার জন্মের কয়েক বৎসর পূর্ব হইতেই আমার পিতা প্রায় দেশভ্রমণেই নিযুক্ত ছিলেন। বাল্যকালে

তিনি আমার কাছে অপরিচিত ছিলেন বলিলেই হয়।' রবীন্দ্রনাথের পিতৃদেব মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ প্রথম যৌবনে অতুল বৈভবের মধ্যেই লালিত-পালিত হয়েছিলেন। কিন্তু প্রিন্স দ্বারকানাথের তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গেই সেই প্রভূত ঐশ্বর্য এক দুর্দিনের বজ্রাঘাতে বিপুল আয়োজন-আড়ম্বর নিয়ে তাঁর চতুর্দিকে সশব্দে ভেঙে পড়তে লাগল। কিন্তু মহর্ষিদেব ছিলেন 'ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ'। পিতৃকৃত সমস্ত ঋণ তিনি শুধু স্বীকারই করলেন না, বিত্তেশ-সমাজে একান্ত দুর্লভ সততার সঙ্গে তিনি সমস্ত ঋণ নিঃশেষে পরিশোধ করলেন। সর্বস্ব-সমর্পণ-করা সেই বিশ্বজিৎ যজ্ঞ সমাপ্ত করে শুরু হল অধ্যাত্মক্ষেত্রে তাঁর তৃষ্ণার্ত আত্মার নিঃসঙ্গ পরিব্রাজকতা। জোড়াসাঁকোর প্রাসাদমালাকে পেছনে ফেলে বার বার তিনি হিমালয়ের নির্জন একাকিত্বে তাঁর অন্তরের সত্যকে খুঁজে পাবার জন্য ছুটে গিয়েছেন। সমাজের প্রচলিত প্রথা তাঁকে ধরে রাখে নি, শাস্ত্র তাঁকে আশ্রয় দেয় নি, চারদিকের অজস্র প্রতিকূলতার মধ্যে তাঁর নিজের পথ তাঁকে সন্ধান করতে হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের জন্মবৎসরে এবং সমসাময়িক দিনগুলিতে তিনি পুরুষানুক্রমিক পারিবারিক ধর্মসংস্কার ও আচারনিষ্ঠা বর্জন করে তাঁর নিজস্ব বিশ্বাস অর্থাৎ নিরাকার অদ্বৈত ব্রহ্মের উপাসনা ও স্বরচিত অনুশাসনাবলী অনুসারেই ক্রিয়াকর্মাদি করতে লাগলেন। ফলে আত্মীয় পরিজন সমাজ—সবার থেকে দূরে তাঁর দুর্গম একলাচলার পথেই মহর্ষিদেব তাঁর সাধনমার্গে অগ্রসর হতে লাগলেন। গার্হস্থ্যধর্মপালনে তিনি কখনোই কোন দিক দিয়ে অবহেলা করেন নি, কিন্তু সংসারের বন্ধন তাঁর কাছে ক্রমশই শিথিল হয়ে আসতে লাগল। সন্তানদের প্রতি পিতৃকর্তব্যপালনেও তিনি কখনো পরাঙ্মুখ হন নি, কিন্তু প্রতিদিনের সান্নিধ্যে পিতাপুত্রের মধ্যে যে সহজ ও মধুর সম্পর্ক গড়ে ওঠে, সে সম্পর্ক থেকে রবীন্দ্রনাথ বঞ্চিতই রইলেন।

দুর্ভাগ্যবশত কবি শৈশবে মাতৃসান্নিধ্যও বিশেষ পান নি বলেই মনে হয়। রবীন্দ্রজননী সারদাসুন্দরী দেবী ছিলেন রত্নগর্ভা। মহর্ষির ঔরসজাত পনেরোটি পুত্র-কন্যার গর্ভধারিণী তিনি। দ্বিজেন্দ্রনাথ সত্যেন্দ্রনাথ জ্যোতিরিন্দ্র-নাথ স্বর্ণকুমারী ও রবীন্দ্রনাথের মত বংশের মুখোজ্জ্বলকারী সন্তানভাগ্যে তিনি সৌভাগ্যবতী মহীয়সী নারী। কিন্তু, রবীন্দ্রজীবনীকার দুঃখ করেই বলেছেন, 'দেবেন্দ্রনাথের ন্যায় মহাপুরুষের পত্নী এবং দ্বিজেন্দ্রনাথ প্রমুখ সন্তানের জননী হইলেও সাহিত্যে তাঁহাকে স্মরণ করিয়া কোনো অমর

সৌধ নির্মিত হয় নাই। তাঁহার কৃতকর্মা পুত্র অথবা বিদুষী কন্যাগণের মধ্যে কেহই তাঁহাদের মাতৃদেবী সম্বন্ধে তেমন-কিছু লিখেন নাই, কেহ কোনো গ্রন্থ মাতৃনামে উৎসর্গও করেন নাই। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বিরাট সাহিত্যে জননী সম্বন্ধে কয়েকটি স্থানে মাত্র সামান্য উল্লেখ করিয়াছেন; মাতৃবিয়োগের সময় রবীন্দ্রনাথ শিশু ছিলেন না, তখন তাঁহার বয়স প্রায় চৌদ্দ বৎসর; সুতরাং মাতৃস্মৃতি ম্লান হইয়া যাইবার কারণ ছিল না। আমাদের মনে হয় সারদা দেবী শেষ জীবনে অসুস্থ থাকায়, মাতাপুত্রের মধ্যে যে স্বাভাবিক মধুর সম্বন্ধ গড়িয়া উঠে তাহা ইঁহাদের ক্ষেত্রে ব্যাহত হইয়াছিল; মাতার স্মৃতি বোধ হয় সেই জন্য এমন ক্ষীণ।'[৫]

কথাটা বিশেষভাবে তলিয়ে দেখা একান্ত প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথের চোদ্দ বৎসর বয়সে তাঁর জননী যখন লোকান্তরিত হন, তখন তাঁর বয়স পঞ্চাশও পেরোয় নি।[৬] মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জন্ম ১৮১৭ খ্রীস্টাব্দে। ১৮৩৪ সনে সতেরো বৎসর বয়সে তাঁর বিবাহ হয়। পত্নীর মৃত্যুশিয়রে দাঁড়িয়ে মহর্ষি বলেছিলেন, 'ছয় বৎসরের সময় এনেছিলেম, আজ বিদায় দিলেম।' এই হিসাব মতে সারদা দেবীর জন্ম ১৮২৮ সনে। কিন্তু তাঁর প্রথম সন্তানের জন্ম হয় ১৮৩৮ সনে। মাত্র দশ বৎসর বয়সে সন্তানবতী হওয়া অস্বাভাবিক। কাজেই 'রবীন্দ্র-কথা'র লেখক খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় অন্যান্য আনুষঙ্গিক হিসাবপত্রের সাহায্যে অনুমান করেছেন যে, সম্ভবত আট বৎসর বয়সেই সারদা দেবীর বিবাহ হয়েছিল। এই হিসাবমতে বারো বৎসরে তাঁর প্রথম সন্তানের জন্মের পর পঁচিশ বৎসরের মধ্যে সারদা দেবী পনেরোটি পুত্রকন্যাকে গর্ভে ধারণ করেন। সন্তানদের বয়সের ব্যবধান কখনো দু বৎসর, কখনো তার চেয়েও কম। কেবল নবম ও দশম সন্তানের মধ্যে ব্যবধান চার বৎসর। অর্থাৎ শেষ দিকে ছটি সন্তানের জন্ম হয়েছে আট বৎসরের মধ্যে। শরৎকুমারী ১৮৫৫, স্বর্ণকুমারী ১৮৫৬, বর্ণকুমারী ১৮৫৮, সোমেন্দ্রনাথ ১৮৫৯, রবীন্দ্রনাথ ১৮৬১ ও বুধেন্দ্রনাথ ১৮৬৩। শেষ সন্তানের জন্মের সময় সারদা দেবীর বয়স ৩৭ বৎসর। জ্যেষ্ঠা কন্যা সৌদামিনী দেবী লিখেছেন, 'আমার মা বহু সন্তানবতী ছিলেন, এইজন্য তিনি আমাদের সকলকে তেমন করিয়া দেখিতে পারিতেন না।'[৭] জ্ঞানদা-নন্দিনী দেবী তাঁর স্মৃতিকথায় বলেছেন, 'আমার শাশুড়ীর একটু স্থূল শরীর ছিল, তাই বেশি নড়াচড়া করতে পারতেন না।'[৮]

প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথের জন্মের সময় তাঁর জননীর বয়স পঁয়ত্রিশ বৎসর। কাজেই বয়স বা স্বাস্থ্যের দিক থেকে স্বাভাবিক নিয়মে সন্তানপালনের অক্ষমতা তাঁর হবার কথা নয়। আসলে সেকালে বড়লোকদের ঘরে সন্তানপালনের রীতিই অন্য ধরনের ছিল। অভিজাতগৃহ সদর ও অন্দর মহলের সুনির্দিষ্ট চৌহদ্দিতে বিভক্ত ছিল। দশ-বারোটি সন্তান নিতান্তই স্বাভাবিক বলে বিবেচিত হত। সন্তানপালনের দায়িত্ব থাকত চাকর-চাকরানীদের হাতে। শিশুদের স্তন্যপানের জন্যে স্বাস্থ্যবতী ধাত্রী নিয়োজিত হত। রবীন্দ্রনাথও ছেলেবেলা ধাইয়ের স্তন্যপান করেই বড় হয়েছেন। তাঁর ধাত্রীমাতার নাম ছিল দিগম্বরী ওরফে দিগ্‌মী।[৯]

সারদা দেবীর সংসারকৃত্য সম্পর্কে খগেন্দ্রনাথের মন্তব্যটি সার্থক। তিনি লিখেছেন, 'মাত্র ১৮ বৎসর বয়সে তিনটি সন্তানের জননী হইয়া তেজস্বিনী শাশুড়ীর অবর্তমানে যে সারদা দেবীকে দেবদ্বিজসমন্বিত নিত্যনৈমিত্তিক কার্য ও উৎসবমুখরিত বৃহৎ সংসারের লোকলৌকিকতা, সামাজিকতা ও যাবতীয় ভার কর্ত্রীরূপে বহন করিতে হয় ও অনতিকাল পরেই দিক্‌পালসম শ্বশুরের তিরোভাবে বিপ্লবের ঝটিকায় নানাবিধ উদ্বেগ সহিতে হয়, সেই পূজনীয়াকে Heroic Lady বলিলে অত্যুক্তি হয় না। পরেও প্রায় ৩০ বৎসর ধরিয়া স্বামীর প্রব্রজ্যা ও শৈলভ্রমণের মধ্যে অপূর্ব ধীরতার সহিত, কথঞ্চিৎ ভগ্নশরীর লইয়া, এই রমণীকে অতগুলি সন্তানসন্ততির শিক্ষা ও পোষণ এবং তাঁহাদের বিবাহাদি ও শিশুপালন প্রভৃতি সকল কার্যেই কল্যাণসাধনে নিরত থাকিতে হয়। যথাসাধ্য নিয়মে, শান্তিতে ও প্রফুল্লতায় যে গৃহটিকে পূর্ণ রাখিয়াছিলেন ইহা তাঁহার কম কৃতিত্ব নয়। তাঁহার বুদ্ধিমত্তা ও আধ্যাত্মিক বলও যে যথেষ্ট ছিল, ইহা হইতে অনুমান করিতে পারি।...হিন্দু নারীর আদর্শে শুধু স্বামীর সুখদুঃখের সঙ্গিনী হইলেই হয় না, সহধর্মিণী হওয়াও যে বাঞ্ছনীয় এ সংস্কার তাঁহার বাল্য, যৌবন ও প্রৌঢ়ত্বের মধ্যে দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল ছিল বলিয়াই সকল পরিবর্তনের ভিতর দিয়া তিনি মনের সহিত দ্বন্দ্ব করিয়া স্বামীর উপদিষ্ট ধর্মপথে যথাসম্ভব নিজেকে চালিত করিয়া ভিতরের শান্তি ও বাহিরের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে সমর্থা হইয়াছিলেন।'[১০]

অবনীন্দ্রনাথও তাঁর কর্তাদিদিমা অর্থাৎ সারদা দেবীর রূপগুণের প্রশংসা করে লিখেছেন, 'তাঁর সেই পাকা চুলে সিন্দুর মাখা যে রূপ চোখে জলজল

করছে, মন থেকে তা মোছবার নয়। সাত সাত ছেলে কর্তাদিদিমার—তাঁকে বলা হত রত্নগর্ভা। কর্তাদিদিমার সব ছেলেরাই কী সুন্দর আর কী রঙ—তাদের মধ্যে রবিকাকাই হচ্ছেন কালো। কর্তাদিদিমা খুব কষে তাঁকে রূপটান সর-ময়দা মাখাতেন।'[১১]

সৌন্দর্যের প্রতি সারদা দেবীর আকর্ষণ সম্পর্কে তাঁর মেজ-বৌমা জ্ঞানদা-নন্দিনী দেবীও লিখেছেন, 'আমার শাশুড়ী বিকেলে মুখ হাত ধুয়ে তক্তপোশের বিছানায় বসে দাসীদের বলতেন অমুকের ছেলে কি মেয়েকে নিয়ে আয়। তারা কোলে করে থাকত, তিনি চেয়ে চেয়ে দেখতেন, নিজে বড় একটা কোলে নিতেন না। যারা সুন্দর তাদেরই ডাকতেন, অন্যদের নয়।'[১২]

সম্ভবত এটি সারদা দেবীর একেবারে শেষ দিককার কথা। তখন তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। তা ছাড়া 'যারা সুন্দর তাদেরই ডাকতেন, অন্যদের নয়'—এটিও অবশ্য পরের ছেলেমেয়েদের সম্পর্কেই প্রযোজ্য। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ছেলেমেয়েদের মধ্যে সবচেয়ে কালো ছিলেন বলে মা তাঁকেও কাছে ডাকতেন না, এ হতেই পারে না। 'সোনার তরী' কাব্যগ্রন্থে 'শৈশব-সন্ধ্যা'র বর্ণনায় কবি বলছেন :

দাঁড়াইয়া অন্ধকারে
দেখিনু নক্ষত্রালোকে, অসীম সংসারে
রয়েছে পৃথিবী ভরি বালিকা বালক,
সন্ধ্যাশয্যা, মার মুখ, দীপের আলোক।

এখানে শৈশব-স্মৃতিতে সন্ধ্যাশয্যা ও দীপের আলোকের সঙ্গে মার মুখখানিও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। মাতৃবিয়োগের পরে চিরদিনের জন্যে মাতৃস্নেহবঞ্চিত হয়ে কবি তাঁর 'জীবনস্মৃতি'তে লিখছেন, 'ইহার পরে বড়ো হইলে যখন বসন্তপ্রভাতে একমুঠা অনতিস্ফুট মোটা মোটা বেলফুল চাদরের প্রান্তে বাঁধিয়া খ্যাপার মতো বেড়াইতাম—তখন সেই কোমল চিক্কণ কুঁড়িগুলি ললাটের উপর বুলাইয়া প্রতিদিনই আমার মায়ের শুভ্র আঙুলগুলি মনে পড়িত ;—আমি স্পষ্টই দেখিতে পাইতাম যে-স্পর্শ সেই সুন্দর আঙুলের আগায় ছিল সেই স্পর্শই প্রতিদিন এই বেলফুলগুলির মধ্যে নির্মল হইয়া ফুটিয়া উঠিতেছে ; জগতে তাহার আর অন্ত নাই—তা আমরা ভুলিই আর মনে রাখি।'[১৩]

মায়ের সেই শুভ্র আঙুলগুলির স্নেহস্পর্শ কবি চিরদিনই অন্তরে অনুভব

করেছেন। কিন্তু এ কথাও সত্য যে, রবীন্দ্রনাথের মত মহাশিশুর চিত্তে মাতৃস্নেহের জন্যে যে অনন্ত তৃষ্ণা ও বুভুক্ষা ছিল তা কোনদিনই পরিতৃপ্ত হয় নি। হঠাৎ-আলোর-ঝলকানির মত এই অতৃপ্তি কচিৎ-কখনো কবিকণ্ঠেও ভাষা পেয়েছে। বহুসন্তানবতী জননীর সন্তান হওয়ার বেদনা 'ছিন্নপত্রে'র একখানি চিঠিতে যেন কবির অজ্ঞাতসারেই উপমানের আকারে প্রকাশিত হয়ে পড়েছে: 'অনেক ছেলের মা যেমন অর্ধমনস্ক অথচ নিশ্চল সহিষ্ণুভাবে আপন শিশুদের আনাগোনার প্রতি তেমন দৃক্‌পাত করেন না, তেমনি আমার পৃথিবী এই দুপুরবেলায় ওই আকাশপ্রান্তের দিকে চেয়ে বহু আদিমকালের কথা ভাবছেন,—আমার দিকে তেমন লক্ষ্য করছেন না, আর আমি কেবল অবিশ্রাম বকেই যাচ্ছি।'[১৪]

রবীন্দ্রনাথ মাকে নিয়ে উল্লেখযোগ্য কাব্যকবিতা বিশেষ কিছু লিখেছেন বলে আমাদের জানা নেই। তাঁর গল্প-উপন্যাস-নাটকে মাতৃচরিত্রের ছায়া কোথাও পড়েছে কি না তা গবেষণার বিষয়। 'গীতাঞ্জলি'র "জননী, তোমার করুণ চরণখানি হেরিনু আজি এ অরুণ-কিরণ রূপে" এই গীতিকবিতাটিই রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ মাতৃবন্দনা। ১৩২৬ বঙ্গাব্দে সুরেশচন্দ্র সমাজপতি-সম্পাদিত "আগমনী"তে যে ছটি ক্ষুদ্র কবিতা 'মাতৃবন্দনা'-রূপে প্রকাশিত হয় তার মধ্যে এই গীতিকবিতাটিও ছিল।[১৫]

৩

এইভাবে পিতামাতার নিত্যসান্নিধ্য ও সহজাত স্নেহস্পর্শ থেকে দূরে রবীন্দ্রনাথের ভাগ্যবিড়ম্বিত শৈশব কেটেছে চাকরদের খবরদারিতে। 'জীবন-স্মৃতি'তে কবি বলেছেন, 'আমরা ছিলাম চাকরদেরই শাসনের অধীন' [পৃ° ৮]। 'বাহির বাড়িতে দোতলায় দক্ষিণপূর্ব কোণের ঘরে চাকরদের মহলে আমাদের দিন কাটিত' [পৃ° ৯]। পারিবারিক ব্যবস্থায় চাকরদের হাতে শিশুদের লালনপালনের ভার দেওয়া রবীন্দ্রনাথ যে কতটা অবাঞ্ছিত মনে করতেন 'জীবনস্মৃতি'র পাঠক তা সহজেই বুঝতে পারবেন। তাঁর জীবনের এই ব্যবস্থাকে তিনি 'ভৃত্যরাজকতন্ত্র' নাম দিয়ে লিখছেন, 'ভারতবর্ষের ইতিহাসে দাসরাজাদের রাজত্বকাল সুখের কাল ছিল না। আমার জীবনের ইতিহাসেও

ভৃত্যদের শাসনকালটা যখন আলোচনা করিয়া দেখি তখন তাহার মধ্যে মহিমা বা আনন্দ কিছুই দেখিতে পাই না। এই সকল রাজাদের পরিবর্তন বারংবার ঘটিয়াছে কিন্তু আমাদের ভাগ্যে সকল-তাতেই নিষেধ ও প্রহারের ব্যবস্থার বৈলক্ষণ্য ঘটে নাই। তখন এ সম্বন্ধে তত্ত্বালোচনার অবসর পাই নাই—পিঠে যাহা পড়িত তাহা পিঠে করিয়াই লইতাম এবং মনে জানিতাম সংসারের ধর্মই এই—বড়ো যে সে মারে, ছোটো যে সে মার খায়' [পৃ° ১৬]।' 'এই আমাদের শিশুকালের শাসনকর্তাদের মধ্যে অনেকেরই স্মৃতি কেবল কিলচড় আকারেই মনে আছে—তাহার বেশি আর মনে পড়ে না' [পৃ° ১৭]।

'ছেলেবেলা'য় কবি 'ভৃত্যরাজকতন্ত্র' সম্পর্কে নতুন টিপ্পনী যুক্ত করেছেন। চাকরদের বড়কর্তার নাম ছিল ব্রজেশ্বর ['জীবনস্মৃতি'তে ব্রজ বাদ দিয়ে শুধু ঈশ্বর]। আর ছোটকর্তার নাম ছিল শ্যাম। শ্যাম বয়সে বালক ছিল বটে, কিন্তু তার 'কড়াপড়া শক্ত হাতের মুঠি'র শাসনে শিশু-রবিকে কম দুর্ভোগ ভুগতে হয় নি! সে দোতলার সেই দক্ষিণপূর্ব ঘরের একটি নির্দিষ্ট স্থানে বসিয়ে কবির চারদিকে খড়ি দিয়ে গণ্ডি কেটে দিত। গম্ভীর মুখ করে তর্জনী তুলে বলে যেত, গণ্ডির বাহিরে গেলেই বিষম বিপদ! এই ভাবেই শ্যামের গণ্ডিতে বন্দী হয়ে রবীন্দ্রনাথকে কাটাতে হয়েছে দিনের পর দিন। বড়কর্তা ব্রজেশ্বর ঠাকুর-পরিবারের এই রাজত্বপ্রাপ্তির পূর্বে ছিল পল্লীর গুরুমহাশয়। শিশুদের জলখাবারের ভার ছিল তার উপর। 'ছেলেবেলা'য় কবি বলছেন, 'এইটে ছিল ব্রজেশ্বরের একটা লাল-চিহ্ন দেওয়া দিনের ভাগ। জলখাবারের বাজার করা ছিল তারি জিম্মায়। তখনকার দিনে দোকানীরা ঘিয়ের দামে শতকরা ত্রিশ চল্লিশ টাকা হারে মুনফা রাখত না, গন্ধে স্বাদে জলখাবার তখনো বিষিয়ে ওঠেনি। যদি জুটে যেত কচুরি সিঙাড়া এমন কি আলুর দম, সেটা মুখে পুরতে সময় লাগত না। কিন্তু যথাসময়ে ব্রজেশ্বর যখন তার বাঁকা ঘাড় আরও বাঁকিয়ে বলত "দেখ বাবু আজ কী এনেছি" প্রায় দেখা যেত কাগজের ঠোঙায় চীনেবাদাম ভাজা। সেটাতে আমাদের যে রুচি ছিল না তা নয়, কিন্তু ওর দরের মধ্যেই ছিল ওর আদর। কোনো দিন টুঁ শব্দ করি নি। এমন কি, যেদিন তালপাতার ঠোঙা থেকে বেরত তিলেগজা সেদিনও না।'[১৬]

শুধু জলখাবারই নয়, আহার্যপ্রদানেও লোভী ব্রজেশ্বরের প্রবঞ্চনা থেকে রেহাই পাওয়ার পথ ছিল না। ব্রজেশ্বর বাইরে অত্যন্ত শুচিসংযত আচারনিষ্ঠ

বিজ্ঞ এবং গম্ভীরপ্রকৃতির লোক হওয়া সত্বেও 'ভিতরে ভিতরে তার আহারের লোভটা ছিল চাপা।' কবি তাঁর ছেলেবেলার আহার-প্রসঙ্গে লিখছেন, 'আমাদের পাতে আগে থাকতে ঠিকমতো ভাগে খাবার সাজিয়ে রাখা তার নিয়ম ছিল না। আমরা খেতে বসলে একটি একটি করে লুচি আলগোছে ছুলিয়ে ধরে জিজ্ঞাসা করত, আর দেব কি। কোন্ উত্তর তার মনের মতো সেটা বোঝা যেত তার গলার সুরে। আমি প্রায়ই বলতুম, চাই নে। তারপরে আর সে পীড়াপীড়ি করত না। দুধের বাটিটার 'পরেও তার অসামান্য রকমের টান ছিল, আমার মোটে ছিল না। শেলফওয়ালা একটা খাটো আলমারি ছিল তার ঘরে। তার মধ্যে একটা বড়ো পিতলের বাটিতে থাকত দুধ আর কাঠের বারকোশে লুচি-তরকারি। বিড়ালের লোভ জালের বাইরে বাতাস শুঁকে শুঁকে বেড়াত।'[১১]

শেষোক্ত বাক্যটির ঈপ্সিত ব্যঞ্জনা কোথায় পৌছবে জানি না, কিন্তু 'ভৃত্যরাজকতন্ত্রে'র চিত্রটি ওতে সম্পূর্ণাঙ্গ হয়ে উঠেছে।

৪

এক দিকে চাকরদের মহলে এই লাঞ্ছনা ও নির্যাতন, অন্য দিকে বিদ্যাভ্যাসের জন্যে অভিভাবকগণের সুকঠিন শাসনও সঙ্গে সঙ্গে সমান তালেই চলেছে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, অভিভাবকগণের ইচ্ছা ছিল পরিবারের শিশুদের 'সহসা সর্ববিদ্যায় পারদর্শী' করে তোলা। তাই 'সকাল থেকে রাত পর্যন্ত পড়াশোনার জাঁতাকল' সারা সপ্তাহ ধরেই চলেছিল। 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থে "নানা বিদ্যার আয়োজন" অধ্যায়ে এবং 'ছেলেবেলা'র ৪৬ থেকে ৫১ পৃষ্ঠায় কবি তাঁর অননুকরণীয় ভাষায় তাঁর বাল্যকালের বিদ্যাভ্যাসের চিত্রটি অঙ্কন করেছেন। 'ছেলেবেলা'র অনুকরণে তার একটি সংক্ষিপ্ত রেখাচিত্র এখানে দেওয়া যেতে পারে:

অন্ধকার থাকতেই বিছানা থেকে উঠে কুস্তির সাজ করতে হত। শহরে এক ডাক-সাইটে পালোয়ান ছিল, এক চোখ কানা বলে তার নাম ছিল কানা পালোয়ান, সে বালকদের কুস্তি লড়াত। কুস্তির আখড়া থেকে মুক্তি পাওয়ার পরই মেডিক্যাল কলেজের এক ছাত্রের কাছে অস্থিবিদ্যার পাঠ নিতে হত।

দেয়ালে ঝুলত একটা আস্ত কঙ্কাল। রাত্রেও শোবার ঘরের দেয়ালে ওটা সাক্ষাৎ বিভীষিকার মত ঝুলতে থাকত। দেউড়ির ঘড়িতে সকাল সাতটা বাজতেই নীলকমল মাস্টার এসে উপস্থিত। বাংলায় পাটিগণিত, বীজগণিত ও রেখাগণিত তিনি পড়াতেন। সাহিত্যে সীতার বনবাস শেষ করার সঙ্গে সঙ্গেই মেঘনাদবধকাব্য শুরু হয়ে গেল। সঙ্গে ছিল প্রাকৃত বিজ্ঞান। সীতানাথ দত্ত বিজ্ঞানশাস্ত্র হাতে কলমে শিক্ষা দিতেন। হেরম্ব তত্ত্বরত্ন পড়াতেন মুগ্ধবোধ। এমনি করে নটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে বেঁটে কালো ভৃত্য গোবিন্দ কাঁধে হলদে রঙের ময়লা গামছা ঝুলিয়ে নিয়ে যেত স্নান করাতে। সাড়ে নটা বাজতেই রোজকার বরাদ্দ ডাল ভাত মাছের ঝোলের বাঁধা ভোজ। রুচি-অরুচির প্রশ্নই উঠত না। আহারান্তে ঘোড়ায়-টানা পালকি গাড়িতে যেতে হত ইস্কুলে—কবি যার নাম দিয়েছেন 'দশটা চারটার আন্দামান'। সাড়ে চারটার পর ইস্কুল থেকে ফিরে এসেই জিমনাষ্টিকের মাস্টারের ইঙ্গিতে ঘণ্টাখানেক ধরে কাঠের ডাণ্ডার উপর ওলটপালট করা। তিনি যেতে না যেতেই ছবি আঁকার মাস্টার এসে উপস্থিত। ক্রমে দিনের মরচে-পড়া আলো মিলিয়ে যেত। পড়ার ঘরে জ্বলে উঠত তেলের বাতি। অঘোর মাস্টার এসে উপস্থিত হতেন। শুরু হত ইংরেজি পড়া। প্যারিসরকারের প্রথম দ্বিতীয় ইংরেজি পাঠ কোনমতে শেষ না হতেই ধরানো হল মকলক্স্ কোর্স অফ রীডিং শ্রেণীর একখানা পুস্তক। একে সন্ধ্যাবেলায় শরীর ক্লান্ত এবং মন অন্তঃপুরের দিকে, তারপরে সেই বইখানার মলাট ছিল কালো ও মোটা, তার ভাষা শক্ত এবং বিষয়গুলির মধ্যে দয়ামায়া ছিল না। কেন না, শিশুদের প্রতি সেকালে মাতা সরস্বতীর মাতৃভাবের কোন লক্ষণ ছিল না।

মোটামুটিভাবে এই হল সোম-শনির ঘানি। রবিবারে তদুপরি ছিল সংগীতশিক্ষার ব্যবস্থা—প্রথমে বিষ্ণু চক্রবর্তী, পরে যদু ভট্টের কাছে নিয়মিত গীতভারতীর অনুশীলন।

আর যাই হোক, স্নেহলেশবর্জিত এই সুকঠিন শাসনকে আদর্শ শিশুশিক্ষা-ব্যবস্থা বলা চলে না। গৃহে যেমন শিক্ষার এই অবস্থা, ইস্কুলেও তেমনই বেত্রপাণি শাসন নিয়ত উদ্যতদণ্ড হয়েই থাকত। ছ থেকে চোদ্দ-পনেরো বৎসর বয়স পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ ইস্কুলে পড়েছেন প্রথমে 'ওরিয়েন্টাল সেমিনারি'তে। সেখানে বৎসর খানেক কাটিয়ে 'নর্মাল স্কুলে'। তারপর

১৮৭২ থেকে ১৮৭৩ 'বেঙ্গল অ্যাকাডেমি'তে। সবশেষে ১৮৭৪ থেকে সেন্ট জেবিয়ার্স স্কুলে প্রায় দু বৎসর। পঠদ্দশায় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গী ছিলেন তাঁর বৎসর-খানেকের বড় দাদা সোমেন্দ্রনাথ আর বৎসর-দুয়েকের বড় ভাগিনেয় সত্যপ্রসাদ। কবি তাঁর ইস্কুল-জীবনের অভিজ্ঞতা ও অবস্থার কথা নানা সময়ে নানা সুযোগে সবিস্তারে বলেছেন। জয়ন্তী-উৎসবের প্রতিভাষণে পাই, 'আমি ইস্কুলপালানো ছেলে, পরীক্ষা দিই নি, পাস করি নি, মাস্টার আমার ভাবীকাল সম্বন্ধে হতাশ্বাস।' বস্তুত তেরো-চোদ্দ বৎসর বয়সেও রবীন্দ্রনাথ নিয়মিত ইস্কুলে যেতেন না, প্রায়ই কামাই করতেন। এবং ১৮৭৫ সনের শেষে দেখা যাচ্ছে, সোমেন্দ্রনাথ উচ্চতর শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হতে পেরেছিলেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ পারেন নি। হয়তো বিদ্যালয়ের বার্ষিক পরীক্ষা তিনি দেনই নি।[১৮]

রবীন্দ্রনাথ কেন 'মাস্টারি শাসনদুর্গে সিঁধকাটা ছেলে'র ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে বাধ্য হলেন তার ইতিহাসও লিপিবদ্ধ রয়েছে তাঁর আত্মকথায়। শৈশবে গৃহশিক্ষার প্রাথমিক স্তর পেরিয়ে কবি প্রথম যে বিদ্যায়তনে প্রবেশ করেছিলেন সেই ওরিয়েন্টাল সেমিনারিতে কী শিক্ষা পেয়েছিলেন তা তাঁর মনে ছিল না, কেবল সেখানকার একটা শাসনপ্রণালীর কথাই মনে ছিল। পড়া বলতে না পারলে ছেলেকে বেঞ্চে দাঁড় করিয়ে তার দুই প্রসারিত হাতের উপর ক্লাসের অনেকগুলি স্লেট একত্র করে চাপিয়ে দেওয়া হত। নর্মাল স্কুলের স্মৃতিও লেশমাত্র মধুর ছিল না, অধিকাংশ ছেলেরই সংস্রব এমন অশুচি ও অপমানজনক ছিল যে, ছুটির ঘণ্টায় রবীন্দ্রনাথ চাকরকে নিয়ে দোতলায় রাস্তার দিকের এক জানলার কাছে একলা বসে কাটিয়ে দিতেন। শিক্ষকদের মধ্যে হরনাথ পণ্ডিতের কথাই শেষজীবনেও বিশেষভাবে মনে ছিল। তিনি এমন কুৎসিত ভাষা ব্যবহার করতেন যে, অশ্রদ্ধাবশত রবীন্দ্রনাথ তাঁর কোনো প্রশ্নেরই উত্তর দিতেন না। সারা বৎসর তিনি তাঁর ক্লাসে সব ছাত্রের শেষে পিছনের বেঞ্চিতে নীরবে বসে থাকতেন। এই হরনাথ পণ্ডিতই "গিন্নি" গল্পে শিবনাথ হয়েছেন। 'জীবনস্মৃতি'র দ্বিতীয় পাণ্ডুলিপিতে দেখা যাচ্ছে ছেলেদের অদ্ভুত নামকরণ বিষয়ে অসামান্য প্রতিভাধর হরনাথ পণ্ডিত একটি ছেলেকে ভেটকি বলে ডাকতেন, 'সে বেচারার গ্রীবার অংশটা কিছু প্রশস্ত ছিল।' শিশু-রবির তৃতীয় বিদ্যায়তন ছিল 'বেঙ্গল অ্যাকাডেমি', ওটি একটি ফিরিঙ্গি ইস্কুল।

'ইহার ঘরগুলা নির্মম, ইহার দেয়ালগুলা পাহারাওয়ালার মতো—ইহার মধ্যে বাড়ির ভাব কিছুই নাই, ইহা খোপওয়ালা একটা বড় বাক্স।' তবু নর্মাল স্কুলের ক্লেদাক্ত পরিবেশ থেকে এখানে এসে রবীন্দ্রনাথ কিছুটা যেন স্বস্তি বোধ করতে পেরেছিলেন। 'জীবনস্মৃতি'তে তিনি লিখেছেন: 'এখানকার ছেলেরা ছিল দুর্বৃত্ত কিন্তু ঘৃণ্য ছিল না, সেইটে অনুভব করিয়া খুব আরাম পাইয়াছিলাম। তাহারা হাতের তেলোয় উল্টা করিয়া ass লিখিয়া 'হেলো' বলিয়া যেন আদর করিয়া পিঠে চাপড় মারিত, তাহাতে জনসমাজে অবজ্ঞা-ভাজন উক্ত চতুষ্পদের নামাক্ষরটি পিঠের কাপড়ে অঙ্কিত হইয়া যাইত; হয়তো-বা হঠাৎ চলিতে চলিতে মাথার উপরে খানিকটা কলা থেঁতলাইয়া দিয়া কোথায় অন্তর্হিত হইত, ঠিকানা পাওয়া যাইত না; কখনো-বা ধাঁ করিয়া মারিয়া অত্যন্ত নিরীহ ভালোমানুষটির মতো অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া থাকিত; দেখিয়া পরম সাধু বলিয়া ভ্রম হইত। এ-সকল উৎপীড়ন গায়েই লাগে, মনে ছাপ দেয় না—এ সমস্তই উৎপাতমাত্র, অপমান নহে। তাই আমার মনে হইল, এ যেন পাঁকের থেকে উঠিয়া পাথরে পা দিলাম—তাহাতে পা কাটিয়া যায় সেও ভালো, কিন্তু মলিনতা হইতে রক্ষা পাওয়া গেল। এই বিদ্যালয়ে আমার মতো ছেলের একটা মস্ত সুবিধা এই ছিল যে, আমরা যে লেখাপড়া করিয়া উন্নতি লাভ করিব, সেই অসম্ভব দুরাশা আমাদের সম্বন্ধে কাহারও মনে ছিল না'[১৯]

কাজেই বেঙ্গল অ্যাকাডেমিতেও পুরোদমে কবি ইস্কুল থেকে পালাতে লাগলেন। সেখান থেকে সেণ্ট জেবিয়ার্স স্কুলে ভরতি করে দেওয়া হল বটে, কিন্তু তাতেও কোন ফল হল না। স্বভাবতই বাড়ির লোকেরা তাঁর হাল ছেড়ে দিলেন। কোনদিন তাঁর কিছু হবে এমন আশা না কবি, না অন্য কেউ মনে করতে পারলেন। দাদারা মাঝে মাঝে এক-আধবার চেষ্টা করে তাঁর আশা একেবারেই ত্যাগ করলেন। একদিন 'বড়দি' তো বলেই ফেললেন, 'আমরা সকলেই আশা করিয়াছিলাম বড়ো হইলে রবি মানুষের মতো হইবে কিন্তু তাহার আশাই সকলের চেয়ে নষ্ট হইয়া গেল।' রবীন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গে 'জীবনস্মৃতি'তে লিখছেন, 'আমি বেশ বুঝিতাম, ভদ্রসমাজের বাজারে আমার দর কমিয়া যাইতেছে কিন্তু তবু যে-বিদ্যালয় চারিদিকের জীবন ও সৌন্দর্যের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন জেলখানা ও হাসপাতাল-জাতীয় একটা নির্মম বিভীষিকা,

তাহার নিত্য-আবর্তিত ঘানির সঙ্গে কোনোমতেই আপনাকে জুড়িতে পারিলাম না।'[২০] অর্থাৎ পঞ্চাশ বৎসর পেরিয়ে ছেলেবেলার ইস্কুল-জীবনকে কবির মনে হয়েছে 'জেলখানা ও হাসপাতাল-জাতীয় একটা নির্মম বিভীষিকা', একটা 'নিত্য-আবর্তিত ঘানি'। এ মনোভাব তাঁর কোনদিনই কাটে নি, আশি বৎসর বয়সে লেখা 'ছেলেবেলা'য় এই 'জেলখানা' হয়েছে 'দশটা-চারটায় আন্দামান।'

৫

অর্থাৎ শৈশবে রবীন্দ্রনাথের অবস্থা ছিল নির্বাসিত ও দ্বীপান্তরিত মানুষের মত। অন্তঃপুর থেকে নির্বাসিত হয়ে রুদ্ধগৃহের এক কোণে ভৃত্যরাজকতন্ত্রে ছোটকর্তা শ্যামের গণ্ডীতে তাঁর বন্দিদশা কাটত নিজেরই গৃহে, আর বিদ্যালয়ে গেলে তাঁর মনে হত পাহারাওয়ালার মত দেয়ালগুলোর মধ্যে তিনি অবরুদ্ধ হয়ে আছেন আন্দামানে দ্বীপান্তরিত অপরাধী আসামীর মত। এই অবাঞ্ছিত ও নিরানন্দ পরিবেশের মধ্যে যে দুটো-একটা সুখস্মৃতি পঞ্চাশোর্ধ্বেও কবির মনকে বিশেষভাবে আবিষ্ট করেছে, তার একটি হল কৈলাস মুখুজ্জের ছড়া, আর একটি ইরাবতী-কথিত অনাবিষ্কৃত রাজপুরীর রহস্য।

ঠাকুর-পরিবারের অনেককালের খাজাঞ্চি ছিল কৈলাস মুখুজ্জে। লোকটি ছিল ভারি রসিক। সে রবীন্দ্রনাথের শৈশবে অতি দ্রুত মস্ত একটা ছড়ার মত বলে শিশু-রবির মনোরঞ্জন করত। সেই ছড়াটার প্রধান নায়ক ছিলেন কবি স্বয়ং এবং তার মধ্যে একটি ভাবী নায়িকার নিঃসংশয় সমাগমের আশা অতিশয় উজ্জ্বলভাবে বর্ণিত থাকত। 'জীবনস্মৃতি'তে কবি লিখছেন, এই যে ভুবনমোহিনী বধূটি ভবিতব্যতার কোল আলো করে বিরাজ করছিল, ছড়া শুনতে শুনতে তার চিত্রটিতে তাঁর মন ভারি উৎসুক হয়ে উঠত। আপাদমস্তক তার যে বহুমূল্য অলঙ্কারের তালিকা পাওয়া গিয়েছিল এবং মিলনোৎসবের যে অভূতপূর্ব সমারোহের বর্ণনা শোনা যেত, তাতে অনেক প্রবীণবয়স্ক সুবিবেচক ব্যক্তির মন চঞ্চল হতে পারত, কিন্তু বালকের মন যে মেতে উঠত এবং চোখের সামনে নানা বর্ণে বিচিত্র আশ্চর্য মুখচ্ছবি দেখতে পেত, তার মূল কারণ ছিল সেই দ্রুত-উচ্চারিত অনর্গল শব্দচ্ছটা ও ছন্দের দোলা। কৈলাস মুখুজ্জের এই

ছড়াটি আটাত্তর বৎসর বয়সে লেখা 'আকাশপ্রদীপ' কাব্যগ্রন্থের "বধূ" কবিতায় অভিনব কাব্যরূপ লাভ করেছে। আম-কাঁঠালের ছায়ায় চতুর্দোলা চড়ে সেই বধূ এসেছে কবির স্বপ্নে, তার 'গলায় মোতির মালা সোনার চরণচক্র পায়ে'—

বালকের প্রাণে
প্রথম সে নারীমন্ত্র আগমনীগানে
ছন্দের লাগাল দোল আধোজাগা কল্পনার শিহরদোলায়,
আঁধার-আলোর দ্বন্দ্বে যে প্রদোষে মনেরে ভোলায়,
সত্য-অসত্যের মাঝে লোপ করি সীমা
দেখা দেয় ছায়ার প্রতিমা।

* * *

সেদিন সে কল্পলোকে বেহারাগুলোর পদক্ষেপে
বক্ষ উঠেছিল কেঁপে কেঁপে,
পলে পলে ছন্দে ছন্দে আসে তারা আসে না তবুও,
পথ শেষ হবে না কভুও।

সেকাল মিলাল। তার পরে বধূ-আগমনগাথা
গেয়েছে মর্মরছন্দে অশোকের কচি রাঙা পাতা ;

* * *

অতিদূর মায়াময়ী বধূর নূপুরে
তন্দ্রার প্রত্যন্তদেশে জাগায়েছে ধ্বনি
মৃদু রণরণি।
ঘুম ভেঙে উঠেছিনু জেগে,
পূর্বাকাশে রক্ত মেঘে
দিয়েছিল দেখা
অনাগত চরণের অলক্তের রেখা।
কানে কানে ডেকেছিল মোরে
অপরিচিতার কণ্ঠ স্নিগ্ধ নাম ধরে—
সচকিতে
দেখে তবু পাই নি দেখিতে।

অকস্মাৎ একদিন কাহার পরশ
রহস্যের তীব্রতায় দেহে মনে জাগাল হরষ ;
তাহারে শুধায়েছিনু অভিভূত মুহূর্তেই,
"তুমিই কি সেই,
আঁধারের কোন্ ঘাট হতে
এসেছ আলোতে!"
উত্তরে সে হেনেছিল চকিত বিদ্যুৎ ;
ইঙ্গিতে জানায়েছিল, "আমি তারি দূত,
সে রয়েছে সব প্রত্যক্ষের পিছে,
নিত্যকাল সে শুধু আসিছে।"

'গলায় মোতির মালা, সোণার চরণচক্র পায়ে'—এই 'নারীমন্ত্র আগমনীগানে'ই শিশু-রবির মানসলোকে রূপকথার রাজকন্যার ঘুম ভেঙেছে। কৈলাস মুখুজ্জের ছড়ায় ছিল তার সোনার কাঠির ছোঁয়া। ইরাবতী-কথিত অনাবিষ্কৃত রাজপুরীর রহস্য ছিল এই রূপকথারই পরিপূরক কাহিনী। ইরাবতী রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা সহোদরা সৌদামিনী দেবীর কন্যা। তারও জন্ম ১৮৬১ সনে। কবির সমবয়স্কা এই বালিকা ছিল তাঁর শৈশবের খেলার সঙ্গিনী। ঠাকুর-বাড়ির উত্তর অংশে এক খণ্ড পোড়ো জমি ছিল, তাকে বলা হত—গোলাবাড়ি। রবীন্দ্রনাথ ছুটির দিনে সুযোগ পেলেই এই গোলাবাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হতেন। রক্ষকদের শাসনের একটুমাত্র রন্ধ্র দিয়ে যেদিন কোনমতে সেখানে তিনি যেতে পারতেন সেদিন তাঁর আনন্দের আর শেষ থাকত না। বাড়িতে আরো একটা জায়গা ছিল, সেটা যে কোথায় কবি তা কোনদিনই খুঁজে বের করতে পারেন নি। ইরাবতী সেই জায়গাটাকে বলত 'রাজার বাড়ি'। কোনো কোনো দিন সে বলত, 'আজ সেখানে গিয়েছিলাম।' কিন্তু একদিনও এমন শুভযোগ হয় নি যখন কবিও তার সঙ্গ ধরতে পেরেছেন। কেবল তিনি এটুকু উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, একটা আশ্চর্য জায়গা, যেখানে খেলাও যেমন আশ্চর্য, খেলার সামগ্রীও তেমনি অপরূপ। কবির মনে হত, সেটা অত্যন্ত কাছে—একতলায় বা দোতলায় কোনো একটা জায়গায় ; কিন্তু কোনো মতেই সেখানে যাওয়া ঘটে উঠত না। কতবার তিনি ইরাবতীকে জিজ্ঞাসা করেছেন, রাজার বাড়ি কি তাঁদের বাড়ির বাইরে? সে বলেছে, না, এই বাড়ির মধ্যেই। কবি

বিস্মিত হয়ে বসে ভাবতেন, বাড়ির সব ঘরই তো তিনি দেখেছেন, কিন্তু সে ঘর তবে কোথায়? রাজা যে কে সে-কথা তিনি কোনদিন জিজ্ঞাসাও করেন নি, রাজত্ব যে কোথায় তা চিরদিনই তাঁর কাছে অনাবিষ্কৃত রয়ে গেছে, কেবল এইটুকু মাত্র পাওয়া গিয়েছে যে, তাঁদের বাড়িতেই আছে সেই রাজার বাড়ি।

অর্থাৎ যে বাড়ি রবীন্দ্রনাথের শৈশবে ছিল তাঁর কারাগার, তাঁর বন্দিশালা, সেই বাড়িতেই রূপকথার রাজপুরী রয়েছে—এই স্বপ্নসংবাদ কবিমানসে বহন করে এনেছিল ইরাবতী। ইরাবতী রূপকথার রাজকন্যা নয়, কিন্তু রূপকথার স্বপ্ন সে এনেছে; সেই স্বপ্ন-সরণিতেই একদিন এল রাজকন্যা। বারোয়াঁ সুরে সানাই বাজল। কাদম্বরী দেবী এলেন ঠাকুর-বাড়িতে, এলেন শিশু-কবির মানসলোকে রাজকন্যার রূপ ধরে, 'গলায় মোতির মালা, সোনার চরণচক্র পায়ে।'

৬

শিশু-রবির জীবনে এল 'মানুষের সঙ্গ, মানুষের স্নেহ'। এই সঙ্গ, এই স্নেহলাভের জন্যেই শিশুচিত্ত এতদিন কাঙাল হয়ে তার শৈশবনিকেতনের প্রতিকূল পরিবেশে বৃথাই মাথা খুঁড়ে মরেছে। 'জীবনস্মৃতি'তে কবি বলেছেন, বাইরের প্রকৃতি যেমন তাঁর কাছ থেকে দূরে ছিল, ঘরের অন্তঃপুরও ছিল ঠিক তেমনি দূরে। বন্দিদশা অতিক্রম করে সেই অন্তঃপুরে ছুটে যাবার জন্যে তাই তাঁর চিত্ত শৈশবে আকুল হয়ে থাকত। নিজের সেই মনোভাব বিশ্লেষণ করে কবি বলেছেন: 'ছোটোবেলায় মেয়েদের স্নেহযত্ন মানুষ না যাচিয়াই পাইয়া থাকে। আলো-বাতাসে তাহার যেমন দরকার এই মেয়েদের আদরও তাহার পক্ষে তেমনি আবশ্যক। কিন্তু আলো-বাতাস পাইতেছি বলিয়া কেহ বিশেষ-ভাবে অনুভব করে না—মেয়েদের যত্ন সম্বন্ধেও শিশুদের সেইরূপ কিছুই না-ভাবাটাই স্বাভাবিক। বরঞ্চ শিশুরা এই প্রকার যত্নের জাল হইতে কাটিয়া বাহির হইবার জন্যই ছটফট করে। কিন্তু যখনকার যেটি সহজপ্রাপ্য তখন সেটি না জুটিলে মানুষ কাঙাল হইয়া দাঁড়ায়। আমার সেই দশা ঘটিল। ছেলেবেলায় চাকরদের শাসনে বাহিরের ঘরে মানুষ হইতে হইতে হঠাৎ এক সময়ে মেয়েদের অপর্যাপ্ত স্নেহ পাইয়া সে জিনিসটাকে ভুলিয়া থাকিতে পারিতাম না। শিশুবয়সে অন্তঃপুর যখন আমাদের কাছে দূরে থাকিত তখন

মনে মনে সেইখানেই আপনার কল্পলোক সৃজন করিয়াছিলাম। যে-জায়গাটাকে ভাষায় বলিয়া থাকে অবরোধ সেইখানেই সকল বন্ধনের অবসান দেখিতাম। মনে করিতাম, এখানে ইস্কুল নাই, মাস্টার নাই, জোর করিয়া কেহ কাহাকেও কিছুতে প্রবৃত্ত করায় না—ওখানকার নিভৃত অবকাশ অত্যন্ত রহস্যময়—ওখানে কারও কাছে সমস্ত দিনের সময়ের হিসাবনিকাশ করিতে হয় না, খেলাধূলা সমস্ত আপন ইচ্ছামতো।...তাহার পরে গলায় সোনার হারটি পরিয়া বাড়িতে যখন নববধূ আসিলেন তখন অন্তঃপুরের রহস্য আরও ঘনীভূত হইয়া উঠিল। যিনি বাহির হইতে আসিয়াছেন অথচ যিনি ঘরের, যাঁহাকে কিছুই জানি না অথচ যিনি আপনার, তাঁহার সঙ্গে ভাব করিয়া লইতে ভারি ইচ্ছা করিত।'[২১]

কিন্তু সে ইচ্ছাপূরণ সহজসাধ্য ছিল না। রবীন্দ্রনাথ সে কথাও 'জীবন-স্মৃতি'তে বলতে ভোলেন নি : 'কোনো সুযোগে কাছে গিয়া পৌঁছিতে পারিলে ছোড়দিদি তাড়া দিয়া বলিতেন, "এখানে তোমরা কী করতে এসেছ, যাও বাইরে যাও।"—তখন একে নৈরাশ্য তাহাতে অপমান, দুই মনে বড় বাজিত।' 'ছেলেবেলা'য় এই ছবিটি আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে : 'দূরে দূরে ঘুরে বেড়াই, সাহস হয় না কাছে আসতে। ও এসে বসেছে আদরের আসনে, আমি যে হেলাফেলার ছেলেমানুষ। দুই মহলে বাড়ি তখন ভাগ করা। পুরুষরা থাকে বাইরে, মেয়েরা ভিতর কোঠায়। নবাবী কায়দা তখনো চলে আসছে। মনে আছে দিদি বেড়াচ্ছিলেন ছাদের উপর নতুন বৌকে পাশে নিয়ে, মনের কথা বলাবলি চলছিল। আমি কাছে যাবার চেষ্টা করতেই এক ধমক। এ পাড়া যে ছেলেদের দাগ-কাটা গণ্ডির বাইরের। আবার শুকনো মুখ করে ফিরে আসতে হবে সেই ছ্যাৎলাপড়া পুরোনো দিনের আড়ালে।'[২২]

'সেই ছ্যাৎলাপড়া পুরোনো দিনের আড়াল' থেকে বেরিয়ে এসে অন্তঃপুরে একদিন বালকের প্রবেশাধিকার ঘটেছিল নববধূ-আগমনের পাঁচ বৎসর পরে। কিন্তু এই দুর্বিষহ পাঁচ বৎসর শিশুচিত্তে নৈরাশ্য, হতাশা ও অতৃপ্তির অবধি ছিল না। এমন কি, নববিবাহিত জ্যোতিদাদার ভাগ্যের সঙ্গে নিজের ভাগ্যের তুলনা করে বারো বছরের বড় অগ্রজের প্রতি ঈর্ষাও যে তাঁর মাঝে মাঝে হত, সে কথাও তিনি ৬৮ বৎসর বয়সে অকপটেই প্রকাশ করেছেন। ১৯২৯ সনের ১৪ই মার্চ জাপানের পথে জাহাজ থেকে এক পত্রে

কবি শ্রীমতী রানী মহলানবিশকে লিখছেন : 'সেদিন হঠাৎ এক সময়ে জানি নে কেন ছেলেবেলাকার একটা ছবি খুব স্পষ্ট করে আমার মনে জেগে উঠল। শীতকালের সকাল বোধ হয় সাড়ে পাঁচটা। অল্প অল্প অন্ধকার আছে। চির-অভ্যাস-মতো ভোরে উঠে বাইরে এসেছি। গায়ে খুব অল্প কাপড়, কেবল একখানা সুতোর জামা এবং ইজের। এইরকম খুব গরীবের মতোই আমাদের বাল্যকাল কেটেছে। ভিতরে ভিতরে শীত করছিল—তাই একটা কোণের ঘর, যাকে আমরা তোষাখানা বলতুম, যেখানে চাকরেরা থাকত, সেইখানে গেলুম। আধা-অন্ধকারে জ্যোতিদাদার চাকর চিন্তে লোহার আঙটায় কাঠের কয়লা জালিয়ে তার উপরে ঝাঁঝরি রেখে জ্যো'দার জন্যে রুটি তোস্ করছে। সেই রুটির উপর মাখন গলার লোভনীয় গন্ধে ভরা। তার সঙ্গে ছিল চিন্তের গুনগুন রবে মধু কানের গান, আর সেই কাঠের আগুন থেকে বড় আরামের অল্প একটুখানি তাত। আমার বয়স বোধ হয় তখন নয় হবে। ছিলুম স্রোতের শ্যাওলার মতো—সংসার-প্রবাহের উপরতলে হালকাভাবে ভেসে বেড়াতুম—কোথাও শিকড় পৌঁছয় নি—যেন কারো ছিলুম না, সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত চাকরদের হাতেই থাকতে হত; কারো কাছে কিছুমাত্র আদর পাবার আশা ছিল না। জ্যোদা তখন বিবাহিত, তাঁর জন্যে ভাববার লোক ছিল, তাঁর জন্যে ভোরবেলা থেকেই রুটি-তোস্ আরম্ভ। আমি ছিলুম সংসার-পদ্মার বালুচরের দিকে, অনাদরের কূলে—সেখানে ফুল ছিল না, ফল ছিল না, ফসল ছিল না—কেবল একলা বসে ভাববার মতো আকাশ ছিল। আর জ্যোদা পদ্মার যে-কূলে ছিলেন সেই কূল ছিল শ্যামল—সেখানকার দূর থেকে কিছু গন্ধ আসত, কিছু গান আসত, সচল জীবনের ছবি একটু-আধটু চোখে পড়ত। বুঝতে পারতুম, ওইখানেই জীবনযাত্রা সত্য। কিন্তু পার হয়ে যাবার খেয়া ছিল না—তাই শূন্যতার মাঝখানে বসে কেবলই চেয়ে থাকতুম আকাশের দিকে।'[২৩]

রবীন্দ্রনাথ যে কেন এক কালে 'দিকশূন্য ভট্টাচার্য' ছদ্মনাম গ্রহণ করেছিলেন এখানে তার ইঙ্গিত রয়েছে। কিন্তু পরিবারে নববধূর আবির্ভাবে অন্তঃপুরের রহস্যময় আকর্ষণ তাঁর শিশুচিত্তে কত দুর্নিবার হয়ে উঠেছিল এবং সেই রহস্যলোকে প্রবেশের জন্যে অনুক্ষণ তাঁর প্রয়াস কী অভিনব রূপ গ্রহণ করত তার কথা আছে 'আকাশ-প্রদীপে'র "কাঁচা আম" কবিতায়। পরিণত

বয়সে চৈত্র মাসের সকালে মৃদু রোদ্দুরে তিনটে কাঁচা আম গাছতলায় পড়ে থাকতে দেখে তাঁর বাল্যকথা মনে পড়েছে। কবি বলছেন :

'সেদিন গেছে যেদিন দৈবে-পাওয়া দুটি-একটি কাঁচা আম
ছিল আমার সোনার চাবি ;
খুলে দিত সমস্ত দিনের খুশির গোপন কুঠুরি ;
আজ সে তালা নেই, চাবিও লাগে না।'

কি করে কাঁচা আম তাঁর জীবনে 'সোনার চাবি' হয়ে এসেছিল তার গোড়াকার কথা কবির কণ্ঠেই শোনা যাক :

'আমার বয়সে এ বাড়িতে যেদিন প্রথম আসছে বউ
পরের ঘর থেকে,
সেদিন যে-মনটা ছিল নোঙর-ফেলা নৌকো
বান ডেকে তাকে দিলে তোলপাড় ক'রে।
জীবনের বাঁধা বরাদ্দ ছাপিয়ে দিয়ে
এল অদৃষ্টের বদান্যতা।
পুরোনো ছেঁড়া আটপৌরে দিনরাত্রিগুলো
খসে পড়ল সমস্ত বাড়িটা থেকে।

* * * *

অত্যন্ত পরিচিতের মাঝখানে
ফুটে উঠল অত্যন্ত আশ্চর্য।
কে এল রঙিন সাজে সজ্জায়,
আলতা পরা পায়ে পায়ে—
ইঙ্গিত করল যে, সে এই সংসারের পরিমিত দামের মানুষ নয়—
সেদিন সে ছিল একলা অতুলনীয়।
বালকের দৃষ্টিতে এই প্রথম প্রকাশ পেল—
জগতে এমন কিছু যাকে দেখা যায় কিন্তু জানা যায় না।
বাঁশি থামল, বাণী থামল না—
আমাদের বধূ রইল
বিস্ময়ের অদৃশ্য রশ্মি দিয়ে ঘেরা।

* * *

তার ডুরে শাড়িটি মনে ঘুরিয়ে দেয় আবর্ত ;

* * *

তার বয়স আমার চেয়ে দুই-এক মাসের
বড়োই হবে বা ছোটোই হবে।

* * *

মন একান্তই চাইত ওকে কিছু একটা দিয়ে
সাঁকো বানিয়ে নিতে।

* * *

তবু এরই মধ্যে দেখা গেল, সস্তা খাজনা চলে
এমন দাবিও আছে ঐ উচ্চাসনার—
সেখানে ওর পিঁড়ে পাতা মাটির কাছে।
ও ভালবাসে কাঁচা আম খেতে
শুল্পো শাক আর লঙ্কা দিয়ে মিশিয়ে।
প্রসাদলাভের একটি ছোট্ট দরজা খোলা আছে
আমার মতো ছেলে আর ছেলেমানুষের জন্যেও

* * *

গাছে চড়তে ছিল কড়া নিষেধ।
হাওয়া দিলেই ছুটে যেতুম বাগানে ;
দৈবে যদি পাওয়া যেত একটিমাত্র ফল
একটুখানি দুর্লভতার আড়াল থেকে,
দেখতুম, সে কী শ্যামল, কী নিটোল, কী সুন্দর,
প্রকৃতির সে কী আশ্চর্য দান।

*

একদিন শিলবৃষ্টির মধ্যে আম কুড়িয়ে এনেছিলুম।
ও বলল, "কে বলেছে তোমাকে আনতে।"
আমি বললুম, "কেউ না।"
ঝুড়িসুদ্ধ মাটিতে ফেলে চলে গেলুম।

আর-একদিন মৌমাছিতে আমাকে দিলে কামড়ে ;
সে বললে, "এমন করে ফল আনতে হবে না।"
চুপ করে রইলুম।

* * *

বয়স বেড়ে গেল।
একদিন সোনার আংটি পেয়েছিলুম ওর কাছ থেকে ;
তাতে স্মরণীয় কিছু লেখাও ছিল।
স্নান করতে সেটা পড়ে গেল গঙ্গার জলে—
খুঁজে পাই নি।'

কিন্তু গঙ্গার জলে নিমজ্জিত সেই স্বর্ণ-অঙ্গুরীয়-প্রসঙ্গ এখনো বহু দূরে। বধূ-আবির্ভাবের পাঁচ বৎসর পরে অন্তঃপুরের নিষিদ্ধ দ্বার কী করে বালক-কবির সামনে উন্মুক্ত হল এবার সে প্রসঙ্গ।

৭

রবীন্দ্রনাথের উপনয়ন হল ১২৭৯ সালের ২৫শে মাঘ ; অর্থাৎ তাঁর এগার বৎসর ন মাস বয়সে। উপনয়ন উপলক্ষে মহর্ষিদেব হিমালয় থেকে কলকাতা এসেছিলেন। ফেরার সময় তিনি রবীন্দ্রনাথকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন। কলকাতা থেকে বোলপুর, সেখান থেকে সাহেবগঞ্জ, দানাপুর, এলাহাবাদ, কানপুর প্রভৃতি স্থানে বিশ্রাম করতে করতে অবশেষে অমৃতসরে পিতা-পুত্র পৌঁছলেন। মাসখানেক সেখানে থেকে চৈত্র মাসের শেষে ড্যালহৌসি পাহাড়। হিমালয়ের শৈলপ্রবাসে মহর্ষির আসন ছিল বক্রোটার সর্বোচ্চ শিখরচূড়ায়। সেখানে পিতৃদেবের সঙ্গে মাস কয়েক অতিবাহিত হবার পর কিশোরী চাটুজ্জের সঙ্গে ১২৮০ সালের আষাঢ় মাসে রবীন্দ্রনাথ জোড়াসাঁকোয় ফিরে এলেন। রাজনারায়ণ বসুকে এক পত্রে মহর্ষিদেব লিখছেন, 'রবীন্দ্রকে একটি জীবন্ত পত্রস্বরূপ করিয়া তোমাদের নিকট পাঠাইয়াছি।'

ক্ষুদ্র ভ্রমণকারী বাড়ি ফিরে কিছুদিন ঘরে ঘরে কেবলই ভ্রমণের গল্প বলে বেড়াতে লাগলেন। প্রবাসী স্বামীর সংবাদবাহী এই জীবন্ত পত্র প্রোষিতভর্তৃকা মহর্ষিজায়ার কাছে যে বিশেষ আদর ও আকাঙ্ক্ষার ধন হয়ে

উঠলেন তা বলাই বাহুল্য। 'জীবনস্মৃতি'তে কবি লিখছেন, পূর্বে যে শাসনের মধ্যে সঙ্কুচিত হয়ে ছিলেন হিমালয়যাত্রার সময়ই তা ভেঙে গিয়েছিল ; যখন ফিরলেন তখন তাঁর অধিকার প্রশস্ত হয়ে গেছে। ফলে বাড়িতে যখন এলেন তখন কেবল যে প্রবাস থেকেই ফিরলেন তা নয়, এতকাল বাড়ির মধ্যে থেকেই যে-নির্বাসনে ছিলেন সেই নির্বাসন থেকে বাড়ির ভিতরে এসে পৌছলেন। অন্তঃপুরের বাধা ঘুচে গেল ; চাকরদের ঘরে আর তাঁকে কুলাল না। মায়ের ঘরের সভায় খুব একটা বড় আসন তিনি দখল করে বসলেন। বাল্যের 'অল্পপরিচিত কল্পনাজড়িত' অন্তঃপুরে এতদিন পরে বহুদিনের প্রত্যাশিত আদর তিনি পেলেন। কবি স্বীকার করেছেন, যা প্রতিদিন পরিমিত-রূপে পেতে পেতে সহজ হয়ে যেত, তাই হঠাৎ একদিনে বাকি-বকেয়া সমেত পেয়ে কিঞ্চিৎ বেসামাল হয়ে যাওয়া তাঁর পক্ষে অস্বাভাবিক ছিল না।

পূর্বেই বলা হয়েছে নতুন বৌ আসার পর থেকে ছাদের রাজ্যে নতুন হাওয়া বইল, নামল নতুন ঋতু। অন্দরমহলের পর্দা আর রইল না। বাড়ির ভিতরে যে ছাদটা ছিল আগাগোড়া মেয়েদের দখলে, যেখানে রোদ পড়ত পুরোপুরি জারক নেবুকে জারিয়ে দিতে, মেয়েরা বসত পিতলের গামলা-ভরা কলাইবাঁটা নিয়ে, টিপে টিপে টপ টপ করে বড়ি দিত চুল শুকোতে শুকোতে, যেখানে কাঁচা আম ফালি করে কেটে কেটে আমসি শুকোনো হত, ছোট বড় নানা সাইজের নানা কাজ করা কালো পাথরের ছাঁচে আমের রস থাকে থাকে জমিয়ে তোলা হত, রোদ খাওয়া শর্ষের তেলে মজে উঠত ইঁচড়ের আচার আর কেয়া খয়ের তৈরি হত সাবধানে, সেই অন্দরমহলের ছাদেও বৌদির সঙ্গলোভী বালক-দেবরের অধিকার ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠিত হতে লাগল। 'ছেলেবেলা'য় কবি বলেছেন, 'বাড়িতে আমি ছিলুম একমাত্র [?] দেওর, বৌদিদির আমসত্ত্ব পাহারা, তা ছাড়া আরো পাঁচ রকম খুচরো কাজের সাথী। পড়ে শোনাতুম বঙ্গাধিপ পরাজয়। কখনো কখনো আমার উপরে ভার পড়ত জাঁতি দিয়ে সুপুরি কাটবার। খুব সরু করে সুপুরি কাটতে পারতুম। আমার অন্য কোনো গুণ যে ছিল, সে কথা কিছুতেই বৌঠাকুরুন মানিতেন না, এমন কি চেহারারও খুঁত ধরে বিধাতার উপর রাগ ধরিয়ে দিতেন। কিন্তু আমার সুপুরিকাটা হাতের

গুণ বাড়িয়ে বলতে মুখে বাধত না। তাতে সুপুরি কাটার কাজটা চলত খুব দৌড় বেগে' [পৃ° ৫৪-৫৫]। 'তর্কে বৌঠাকরুনের কাছে বারবার হেরেছি কেন না তিনি তর্কের জবাব দিতেন না, আর হেরেছি দাবা খেলায়, সে খেলায় তাঁর হাত ছিল পাকা' [পৃ° ৬৯]।

আরো কিছু দিন পরের কথা, সম্ভবত হিমালয় থেকে প্রত্যাবর্তনের পরের যুগের কথা। মহর্ষিদেব তখন জোড়াসাঁকোয় বাস ছেড়েছিলেন। জ্যোতিদাদা এসে বসলেন বাইরের তেতলার ঘরে। রবীন্দ্রনাথও তারই একটি কোণে একটু জায়গা করে নিলেন। ছাদের ঘরে এল পিয়ানো। আর এল একালের বার্নিশ করা বউবাজারের আসবাব। বুকের ছাতি উঠল ফুলে। গরিবের চোখে দেখা দিল হাল আমলের সস্তা আমিরি। দিনের শেষে ছাদের উপর পড়ত মাদুর আর তাকিয়া। একটা রুপার রেকাবিতে বেলফুলের গ'ড়ে মালা ভিজে রুমালে, পিরিচে এক গ্লাস বরফ দেওয়া জল আর বাটাতে ছাঁচি পান। রবীন্দ্রনাথের বৌঠাকরুন গা ধুয়ে চুল বেঁধে তৈরি হয়ে বসতেন। গায়ে একখানা পাতলা চাদর উড়িয়ে আসতেন জ্যোতিদাদা, বেহালাতে লাগাতেন ছড়ি, রবীন্দ্রনাথ ধরতেন চড়া সুরের গান। এই ছাদেই প্রথম উৎসারিত হল কিশোর রবীন্দ্রনাথের গানের ফোয়ারা।

'তখন বঙ্গদর্শনের ধুম লেগেছে, সূর্যমুখী আর কুন্দনন্দিনী আপন লোকের মতো আনাগোনা করছে ঘরে ঘরে। কী হল, কী হবে দেশসুদ্ধ সবার এই ভাবনা।' কবি বলছেন, 'বঙ্গদর্শন এলে পাড়ায় দুপুর বেলায় কারো ঘুম থাকত না। আমার সুবিধে ছিল কাড়াকাড়ি করবার দরকার হত না, কেন না আমার একটা গুণ ছিল আমি ভালো পড়ে শোনাতে পারতুম। আপন মনে পড়ার চেয়ে আমার পড়া শুনতে বৌঠাকরুন ভালোবাসতেন। তখন বিজ্‌লি পাখা ছিল না, পড়তে পড়তে বৌঠাকরুনের হাতপাখার হাওয়ার একটা ভাগ আমি আদায় করে নিতুম।'[২৪]

রবীন্দ্রজীবনে বারো থেকে চোদ্দ বৎসরের এই অধ্যায়—এই কিশোর-কিশোরী লীলা 'আকাশ-প্রদীপে'র "শ্যামা" কবিতায় অনবদ্য কাব্যরূপ পেয়েছে। কবি তাঁর নতুন বৌঠানের কিশোরী-মূর্তির শব্দালেখ্য রচনা করে বলছেন,

উজ্জ্বল শ্যামল বর্ণ, গলায় পলার হারখানি।
চেয়েছি অবাক মানি
তার পানে।
বড়ো বড়ো কাজল নয়ানে
অসংকোচে ছিল চেয়ে
নবকৈশোরের মেয়ে।

*　　*　　*

একখানি সাদা শাড়ি কাঁচা কচি গায়ে,
কালো পাড় দেহ ঘিরে ঘুরিয়া পড়েছে তার পায়ে।
দুখানি সোনার চুড়ি নিটোল দু হাতে,
ছুটির মধ্যাহ্নে পড়া কাহিনীর পাতে
ওই মূর্তিখানি ছিল।

*　　*　　*

দেহ ধরি মায়া
আমার শরীরে মনে ফেলিল অদৃশ্য ছায়া
সূক্ষ্ম স্পর্শময়ী।

*　　*　　*

একদিন পুতুলের বিয়ে,
পত্র গেল দিয়ে।
কলরব করেছিল হেসে খেলে
নিমন্ত্রিত দল। আমি মুখচোরা ছেলে
এক পাশে সংকোচে পীড়িত। সন্ধ্যা গেল বৃথা,
পরিবেষণের ভাগে পেয়েছিনু মনে নেই কী তা।
দেখেছিনু, দ্রুতগতি দুখানি পা আসে যায় ফিরে,
কালো পাড় নাচে তারে ঘিরে।
কটাক্ষে দেখেছি, তার কাঁকনে নিরেট রোদ
দু হাতে পড়েছে যেন বাঁধা। অনুরোধ উপরোধ
শুনেছিনু তার স্নিগ্ধ স্বরে

ফিরে এসে ঘরে
মনে বেজেছিল তারি প্রতিধ্বনি
অর্ধেক রজনী।

*　　*　　*

তারপরে একদিন
জানাশোনা হল বাধাহীন।
একদিন নিয়ে তার ডাকনাম
তারে ডাকিলাম।
একদিন ঘুচে গেল ভয়,
পরিহাসে পরিহাসে হল দোঁহে কথা-বিনিময়।
কখনো বা গড়ে-তোলা দোষ
ঘটায়েছে ছল-করা রোষ।
কখনো বা শ্লেষবাক্যে নিষ্ঠুর কৌতুক
হেনেছিল দুখ।
কখনো বা দিয়েছিল অপবাদ
অনবধানের অপরাধ।
কখনো দেখেছি তার অযত্নের সাজ—
রন্ধনে ছিল সে ব্যস্ত, পায় নাই লাজ।

*　　*　　*

একদিন বলেছিল, "জানি হাত দেখা।"
হাতে তুলে নিয়ে হাত নতশিরে গণেছিল রেখা—
বলেছিল, "তোমার স্বভাব
প্রেমের লক্ষণে দীন।" দিই নাই কোনোই জবাব।
পরশের সত্য পুরস্কার
খণ্ডিয়া দিয়েছে দোষ মিথ্যা সে নিন্দার।

কাব্যরসিককে বলাই বাহুল্য, এটি কবিতা। বাস্তবে আর স্বপ্নে মিশে কবিমানসেই এর জন্ম। এই কিশোর-কিশোরী লীলা একদিন এক কবি-কিশোরের স্বপ্নকামনায় ধরা দিয়েছিল, আর-একদিন আটাত্তর বৎসর বয়সের এক চিরকিশোর দূরে দাঁড়িয়ে অনাসক্ত দৃষ্টিতে তাকে দেখেছেন। কিন্তু

দুজনের কাছেই সেই কিশোরী তার অপরিসীম বিস্ময়ের রহস্য দিয়ে ঘিরে আপনাকে চির-অপ্রাপণীয়া করে রেখেছে। তাই অন্তরঙ্গ সান্নিধ্যের মধ্যেও সে চিরদিনের দূরের মানুষ। তাই তার দিকে তাকিয়ে চির-অতৃপ্ত কবিচিত্ত বলেছে :

তবু ঘুচিল না
অসম্পূর্ণ চেনার বেদনা।
সুন্দরের দূরত্বের কখনো না হয় ক্ষয়,
কাছে পেয়ে না পাওয়ার দেয় অফুরন্ত পরিচয়।

*   *   *

ও যে দূরে ও যে বহুদূরে,
যত দূরে শিরীষের ঊর্ধ্বশাখা যেথা হতে ধীরে
ক্ষীণ গন্ধ নেমে আসে প্রাণের গভীরে।

॥ উল্লেখ-পঞ্জী ॥

১ ছেলেবেলা, পৃ° ৬১।
২ রবীন্দ্র-জয়ন্তী উপলক্ষে মানপত্র। শরৎচন্দ্রের রচনাবলী : ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। পৃ° ২৫৬।
৩ আত্মপরিচয়, পৃ° ৮৫-৮৬।
৪ জীবনস্মৃতি, পৃ° ৭-৮।
৫ রবীন্দ্র-জীবনী, প্রথম খণ্ড, পৃ° ১১।
৬ কবি-জননী সারদা দেবীর মৃত্যু ১২৮১ বঙ্গাব্দের ২৫ ফাল্গুন, ১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দের ৭ মার্চ।
৭ 'পিতৃস্মৃতি', প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩১৮।
৮ পুরাতনী, পৃ° ২৩।
৯ এই সংবাদটি ঠাকুর-পরিবার থেকে কবি শ্রীমতী রাধারাণী দেবী সংগ্রহ করেছেন।
১০ রবীন্দ্র-কথা, পৃ° ৪২।
১১ ঘরোয়া, পৃ° ৬৫-৬৬।

১২ পুরাতনী, পৃ° ৩৬-৩৭।

১৩ জীবনস্মৃতি, পৃ° ১৬৩।

১৪ 'আত্মপরিচয়ে' উদ্ধৃত, পৃ° ২১।

১৫ দ্রষ্টব্য : 'মাতৃবন্দনা' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দেশ ১৩৫৪ আষাঢ় ৬। শ্রীহলধর হালদার [শ্রীপুলিনবিহারী সেন]।

১৬ ছেলেবেলা, পৃ° ৫৮-৫৯।

১৭ তদেব, পৃ° ২৪।

১৮ দ্রষ্টব্য : শনিবারের চিঠি, আশ্বিন ১৩৪৮।

১৯ জীবনস্মৃতি, পৃ° ৩৯।

২০ তদেব, পৃ° ৬৮।

২১ তদেব, পৃ° ৬৪-৬৫।

২২ ছেলেবেলা, পৃ° ৬১।

২৩ পথে ও পথের প্রান্তে, পত্র-সংখ্যা ৩২।

২৪ ছেলেবেলা, পৃ° ৭৯।

চতুর্থ অধ্যায়

নেপথ্যবিধান

১

রবীন্দ্রনাথের তেরো বৎসর দশ মাস বয়সে তাঁর জননীর মৃত্যু হল। মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'কর্তা-দিদিমা আঙুল মটকে মারা যান। বড়োপিসিমার ছোট মেয়ে, সে তখন বাচ্চা, কর্তা-দিদিমার আঙুল টিপে দিতে দিতে কেমন করে একটা আঙুল মটকে যায়। সে আর সারে না, আঙুলে আঙুল-হাড়া হয়ে পেকে ফুলে উঠল। জ্বর হতে লাগল। কর্তা-দিদিমা যান-যান অবস্থা। কর্তা-দাদামশায় ছিলেন বাইরে। কর্তা-দিদিমা বলতেন, তোরা ভাবিস নে, আমি কর্তার পায়ের ধুলো মাথায় না নিয়ে মরব না, তোরা নিশ্চিন্ত থাক্।'[১]

মহর্ষিদেব তখন থাকতেন ডালহৌসি পাহাড়ে, মর্ত্য থেকে বিদায় নেবার আগে জীবনসঙ্গিনীকে শেষ-দেখা দিতে এলেন জোড়াসাঁকোয়। সজ্ঞানে শেষবারের মত পতির পদধূলি নিয়ে পতিব্রতা শেষনিশ্বাস ফেললেন। সারদা দেবীর মৃত্যু ১২৮১ সালের ২৫শে ফাল্গুন। মার অসুস্থতার একেবারে শেষদিকে যখন খুব বাড়াবাড়ি চলছে তার পূর্ব পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ যে ঘরে শুতেন সেই ঘরেই স্বতন্ত্র শয্যায় মার শোবার ব্যবস্থা ছিল। রোগের সময় একবার তাঁকে বোটে করে গঙ্গায় বেড়াতে নিয়ে যাওয়া হয়, তারপর বাড়িতে ফিরে এসে তিনি অন্তঃপুরের তেতলার ঘরে থাকতেন। যে-রাত্রে মার মৃত্যু হয় সেই রাতটির কথা বলতে গিয়ে কবি 'জীবনস্মৃতি'তে বলেছেন, 'আমরা তখন ঘুমাইতেছিলাম, তখন কত রাত্রি জানি না, একজন পুরাতন দাসী আমাদের ঘরে ছুটিয়া আসিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, "ওরে তোদের কী সর্বনাশ হল রে!" তখনই বৌঠাকুরানী তাড়াতাড়ি তাহাকে ভর্ৎসনা করিয়া ঘর হইতে টানিয়া বাহির করিয়া লইয়া গেলেন—পাছে গভীর রাত্রে আচমকা আমাদের মনে গুরুতর আঘাত লাগে এই আশঙ্কা তাঁহার ছিল।'[২]

চিত্রটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার মত। মহর্ষি-পরিবারের কনিষ্ঠা বধূ তখন ষোড়শী কিশোরী। কিন্তু বৎসর দুয়েকের ছোট দেবরের সঙ্গে তাঁর মানসবিকাশে

কত ব্যবধান গড়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ নিজেই তাঁর সেদিনকার যে চিত্র অঙ্কন করেছেন, তাতে তাঁর বালকত্ব ঘোচে নি। কিন্তু মার মৃত্যুসংবাদে পাছে গভীর রাত্রে আচমকা বালকদের মনে গুরুতর আঘাত লাগে এই আশঙ্কায় কাদম্বরী দেবী পুরাতন দাসীকে ভৎর্সনা করে ঘর থেকে টেনে বের করে নিয়ে গেলেন। শুধু যে পুরাতন দাসীকেই ঘর থেকে বের করে দিলেন তা নয়, সদ্য-মাতৃহীন বালকদের সমস্ত ভারও তিনি নিজের হাতে তুলে নিলেন। রবীন্দ্রজীবনে শৈশবের অনাদর ও ঔদাসীন্যের অভিশপ্ত দিনগুলির অবসান হল। ভৃত্যরাজকতন্ত্রের নির্মম বন্দিদশার গণ্ডি তিনি উত্তীর্ণ হলেন। নতুন বৌঠানের স্নেহবৃন্তে শুরু হল তাঁর কৈশোরের স্বপ্নসুন্দর নানা-রঙের দিন। কবি বলেছেন 'বাড়িতে যিনি কনিষ্ঠা বধূ ছিলেন তিনিই মাতৃহীন বালকদের ভার লইলেন। তিনিই আমাদিগকে খাওয়াইয়া পরাইয়া সর্বদা কাছে টানিয়া, আমাদের যে কোনো অভাব ঘটিয়াছে তাহা ভুলাইয়া রাখিবার জন্য দিনরাত্রি চেষ্টা করিলেন। যে-ক্ষতি পূরণ হইবে না, যে-বিচ্ছেদের প্রতিকার নাই, তাহাকে ভুলিবার শক্তি প্রাণ-শক্তির একটি প্রধান অঙ্গ ;—শিশুকালে সেই প্রাণশক্তি নবীন ও প্রবল থাকে, তখন সে কোনো আঘাতকে গভীর ভাবে গ্রহণ করে না, স্থায়ী রেখায় আঁকিয়া রাখে না। এইজন্য জীবনে প্রথম যে মৃত্যু কালো ছায়া ফেলিয়া প্রবেশ করিল, তাহা আপনার কালিমাকে চিরন্তন না করিয়া ছায়ার মতোই একদিন নিঃশব্দে চলিয়া গেল।'[৩]

রবীন্দ্রনাথের এই আত্মবিশ্লেষণ স্বভাবতই পাঠকের মনকে বিশেষভাবে নাড়া দেয়। মাতৃবিয়োগের সময় রবীন্দ্রনাথ নিতান্ত শিশু ছিলেন না ; চৌদ্দ বৎসর বয়সে মাকে হারিয়ে মাতৃবিয়োগের সেই প্রচণ্ড আঘাতের বেদনাকে ভুলে যাওয়া তাঁর মত সূক্ষ্ম-অনুভূতিপ্রবণ কবি-সন্তানের পক্ষে আপাতদৃষ্টিতে অস্বাভাবিক বলেই মনে হয়। যে-মৃত্যু তার কৃষ্ণচ্ছায়া বিস্তার করে জীবনে প্রথম প্রবেশ করল তা আপনার কালিমাকে চিরন্তন না করে ছায়ার মতই একদিন নিঃশব্দে চলে যাবে, এ যেন ভাবতেও কষ্ট হয়। মার স্মৃতি রবীন্দ্রনাথ কোনদিনই ভোলেন নি, সে কথা অবশ্য তিনি তার পরেই ব্যক্ত করেছেন, কিন্তু সদ্য-মাতৃবিয়োগের বেদনাকে তিনি ভুলতে পেরেছিলেন, এ কথাও তিনি অস্বীকার করেন নি। আমাদের মনে হয়, যে-ক্ষতি পূরণ হবে না, যে-বিচ্ছেদের কোন প্রতিকার নেই, তাকে ভোলবার শক্তি শিশুচিত্তে যতই

প্রবল হোক না কেন, শুধু সেই শক্তির দ্বারাই কবি মাতৃশোকের বেদনা ভুলেছিলেন, এ বিশ্লেষণ আংশিক সত্য মাত্র। এর চেয়েও বড় শক্তি সেদিন তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল। ভুলে থাকার শক্তি নয়, ভুলিয়ে রাখার শক্তি। সেই শক্তি সৃষ্টি করেছেন কাদম্বরী দেবী। অনুক্ষণ তিনি তাঁর সঙ্গ ও সান্নিধ্য দিয়ে, খাইয়ে পরিয়ে, সর্বদা কাছে টেনে, সন্ত-হারানো মায়ের অভাব ভুলিয়ে রাখবার জন্মে দিনরাত্রি চেষ্টা করেছেন। রবীন্দ্র-জীবনে সেই কল্যাণী চেষ্টাই সেদিন জয়যুক্ত হয়েছে। নতুন বৌঠানকে পেয়ে রবীন্দ্রনাথ অনুভব করতে পারেন নি যে, তিনি মাকে হারিয়েছেন।

২

মাতৃবিয়োগের পর থেকে সতেরো বৎসর চার মাস বয়সে প্রথমবার বিলাত যাত্রার পূর্ব পর্যন্ত (১৮৭৫ মার্চ থেকে ১৮৭৮ সেপ্টেম্বর) সাড়ে তিন বৎসরকাল কবি-কিশোরের জীবনের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পর্ব। এই পর্বেই তাঁর কবিপ্রতিভা বিকশিত হল। সেই অলোকসামান্য প্রতিভার হৃৎশতদলের উন্মীলন-রহস্যটিও রবীন্দ্র-জীবনের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। দুর্ভাগ্যবশত, এই অধ্যায়টিকে পরিপূর্ণভাবে বোঝবার জন্মে অত্যাবশ্যক উপাদান এবং উপকরণের অভাব আজো রয়েছে। ঘটনাপঞ্জীর দিক দিয়ে দেখা যাচ্ছে, মাতৃবিয়োগের মাস কয়েক পরেই রবীন্দ্রনাথের ইস্কুল-জীবনের অবসান হয়। 'বেঙ্গল একাডেমি'তে ছেলেরা টি'কতে না পারায় তাদের সেণ্ট জেবিয়ার্স স্কুলে ভরতি করে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সেখানেও নিয়মিত ইস্কুল কামাই করতে লাগলেন। ফলে ১৮৭৬ সনে উচ্চতর শ্রেণীতে তিনি আর উত্তীর্ণ হতে পারলেন না। প্রবেশিকার দেউড়ি পেরোতে তখনো বৎসর খানেক বাকি ছিল। কিন্তু বর্তমানের মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরের নবম মান, ভাষান্তরে দ্বিতীয় শ্রেণীতেই, তাঁর বিদ্যালয়ের পড়া অসমাপ্ত অবস্থাতেই সাঙ্গ হল। কনিষ্ঠের এই অবস্থা দেখে ১৮৭৮ সনে সত্যেন্দ্রনাথ পিতৃদেবের কাছে প্রস্তাব করলেন, রবিকে তিনি সঙ্গে করে বিলাত নিয়ে যাবেন। উদ্দেশ্য, সেখানে তাঁকে ব্যারিস্টারি পড়ানো। সে যুগে বিলাতের কোন ইস্কুল থেকে পাস করে বেরোতে পারলেই ব্যারিস্টারি পড়ার যোগ্যতা হত। পরে অবশ্য সে নিয়ম বদলে যায়। তখন থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক-উপাধিধারী হলে তবেই ব্যারিস্টারি পড়বার অধিকার জন্মে।

সত্যেন্দ্রনাথ কনিষ্ঠকে বিলাত থেকে ব্যারিস্টার করে নিয়ে আসার প্রস্তাব যখন করলেন, তার বৎসর দুই পূর্বেই রবীন্দ্রনাথ ইস্কুলে পড়ার পাট চুকিয়ে দিয়েছিলেন। এ দু বৎসর তা হলে তিনি কী করলেন? মনে হয় ততদিনে শিক্ষায়তনের বাইরে সরস্বতীর কমলবনে স্বচ্ছন্দবিহারের আহ্বান তাঁর কবিচিত্তে পৌঁছে গেছে। যেখানে 'রাজহংস কেলি করে স্বর্ণ-নলিনী সনে' সেখানে তাঁর মানসহংসও নব নব কাব্যসৃষ্টির আনন্দ-কেলিতে নিমগ্ন হয়েছে। যখন ইস্কুল-পালানো ছেলের অক্ষমতায় পরিবারের সবাই তাঁকে অপদার্থ বলে মনে করেছেন, তখন নতুন বৌঠান তাঁকে হাত ধরে নিয়ে গেলেন সরস্বতীর কমলবনে, শিক্ষাভবনের অবজ্ঞাত ও অসম্মানিত বালক সারস্বতসত্রের নবদীক্ষিত নবীনকিশোরের মহিমায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠলেন। 'বনফুল'-'কবিকাহিনী'র কবির জন্ম হল।

কিশোর রবীন্দ্রনাথের জীবনে তাঁর জ্যোতিদাদাও তাঁর স্বাধীন আত্মবিকাশে কম সাহায্য করেন নি। সে কথা রবীন্দ্রনাথ অকুণ্ঠ চিত্তে স্বীকার করে বলেছেন: 'সাহিত্যের শিক্ষায়, ভাবের চর্চায়, বাল্যকাল হইতে জ্যোতিদাদা আমার প্রধান সহায় ছিলেন। তিনি নিজে উৎসাহী এবং অন্যকে উৎসাহ দিতে তাঁহার আনন্দ। আমি অবাধে তাঁহার সঙ্গে ভাবের ও জ্ঞানের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতাম—তিনি বালক বলিয়া আমাকে অবজ্ঞা করিতেন না। তিনি আমাকে খুব-একটা বড়ো রকমের স্বাধীনতা দিয়াছিলেন; তাঁহার সংস্রবে আমার ভিতরকার সংকোচ ঘুচিয়া গিয়াছিল। এইরূপ স্বাধীনতা আমাকে আর-কেহ দিতে সাহস করিতে পারিত না—সেজন্য হয়ত কেহ কেহ তাঁহাকে নিন্দাও করিয়াছে। কিন্তু প্রখর গ্রীষ্মের পরে বর্ষার যেমন প্রয়োজন, আমার পক্ষে আশৈশব বাধা-নিষেধের পরে এই স্বাধীনতা তেমনি অত্যাবশ্যক ছিল। সে-সময়ে এই বন্ধনমুক্তি না ঘটিলে চিরজীবন একটা পঙ্গুতা থাকিয়া যাইত।…আমি এ কথা জোর করিয়া বলিতে পারি—স্বাধীনতার দ্বারা যেটুকু উৎপাত ঘটিয়াছে তাহাতে আমাকে উৎপাত নিবারণের পন্থাতেই পৌঁছাইয়া দিয়াছে। শাসনের দ্বারা, পীড়নের দ্বারা, কানমলা এবং কানে মন্ত্র দেওয়ার দ্বারা, আমাকে যাহা কিছু দেওয়া হইয়াছে তাহা আমি কিছুই গ্রহণ করি নাই। যতক্ষণ আমি আপনার মধ্যে আপনি ছাড়া না পাইয়াছি ততক্ষণ নিষ্ফল বেদনা ছাড়া আর-কিছুই আমি লাভ করিতে পারি নাই। জ্যোতি-

দাদাই সম্পূর্ণ নিঃসংকোচে সমস্ত ভালোমন্দর মধ্য দিয়া আমাকে আমার আত্মোপলব্ধির ক্ষেত্রে ছাড়িয়া দিয়াছেন, এবং তখন হইতেই আমার আপন শক্তি নিজের কাঁটা ও নিজের ফুল বিকাশ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে পারিয়াছে। আমার এই অভিজ্ঞতা হইতে আমি যে-শিক্ষালাভ করিয়াছি তাহাতে মন্দকেও আমি তত ভয় করি না, ভালো করিয়া তুলিবার উপদ্রবকে যত ডরাই—ধর্মনৈতিক এবং রাষ্ট্রনৈতিক প্যুনিটিভ পুলিসের পায়ে আমি গড় করি—ইহাতে যে-দাসত্বের সৃষ্টি করে তাহার মতো বালাই জগতে আর কিছুই নাই।'[৪]

কবি-কিশোরের মানস-উন্মীলনে সে-যুগের সাহিত্যের আকাশ থেকেও কম আলোকের প্রেরণা আসে নি। রবীন্দ্রনাথের এগারো বৎসর বয়সে বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশিত হয়; আর তাঁর বয়স যখন ষোলো বৎসর তখন 'ভারতী'-পত্রিকার প্রকাশ। বাড়িতে বড়দা দ্বিজেন্দ্রনাথের 'স্বপ্নপ্রয়াণ' একটা রূপকের অপরূপ রাজপ্রাসাদ হয়ে কবির চোখের সামনে উন্মীলিত হচ্ছে; তার কত রকমের কক্ষ গবাক্ষ চিত্র মূর্তি ও কারুনৈপুণ্য! জ্যোতিদাদার সৃষ্টিলীলা চলছে আরো কাছে, একেবারে প্রতিদিনকার অন্তরঙ্গ সান্নিধ্যের মধ্যে। সঙ্গে আছেন তাঁর অভিন্নহৃদয় বন্ধু কবি অক্ষয় চৌধুরী। বড়দের বৈঠক শেষ করে তিনি বালকদের দলে বালক হয়েই মিশে যেতে পারতেন। কিশোর রবির পড়ার টেবিলে বসে উত্তীর্ণ-সন্ধ্যায় রেড়ির তেলের মিটমিটে আলোয় তিনি ইংরেজি কাব্যের উচ্ছ্বসিত ব্যাখ্যায় এক অভিনব স্বপ্নলোক রচনা করে তুলতেন। 'অবোধবন্ধু'-পত্রিকার পৃষ্ঠায় বিহারীলালের কবিতা সরল বাঁশির সুরে বালকের মনের মধ্যে মাঠের এবং বনের গান বাজিয়ে দিত। এই 'অবোধবন্ধু'র পৃষ্ঠাতেই কবি প্রথম বিদেশী রোমান্সের স্বাদ পেলেন। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য-অনূদিত পৌলবর্জিনী পড়তে পড়তে কবির মন চলে যেত এক অজানা সাগরের তীরে, কোন্ সমুদ্রসমীরকম্পিত নারিকেলের বনে, ছাগলচরা কোন্ পাহাড়ের উপত্যকায়! কলিকাতা শহরের দক্ষিণের বারান্দায় দুপুরের রৌদ্রে সে কী মধুর মরীচিকা বিস্তীর্ণ হত! আর সেই মাথায়-রঙিন-রুমাল-পরা বর্জিনীর সঙ্গে সেই নির্জন দ্বীপের শ্যামল বনপথে একটি বাঙালী বালকের কী প্রেমই না জন্মেছিল!

কিন্তু এহ বাহ্য! যে সোনার কাঠির স্পর্শে কবি-কিশোরের ঘুম ভাঙল,

সে সোনার কাঠি ছিল কাদম্বরী দেবীর হাতে। রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছেন নারীর হ্লাদিনী-শক্তি, তাঁর নিজের জীবনের সেই হ্লাদিনী-শক্তি ছিলেন কাদম্বরী দেবী। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্র-মানসে অধিবাসিত 'দুই নারী'-তত্ত্বকে আর-একবার স্মরণ করা যেতে পারে। দিলীপকুমার রায়ের 'তীর্থংকর' গ্রন্থে দেখা যাচ্ছে, রবীন্দ্রনাথ নারীর দুটি রূপের কথাই বিশেষ করে বলেছেন: গৃহিণী আর হ্লাদিনী। 'মেয়েরা যেখানে গৃহিণী সেখানে বিশেষ গৃহেই তাদের অধিকারের সীমা, যেখানে তারা হ্লাদিনী সেখানে তারা সমস্ত বিশ্বের।' বিশ্বের এই 'শক্তিসঞ্চারিণী' হ্লাদিনীর স্বরূপও বিশ্লেষণ করে কবি বলেছেন, 'পুরুষের চিত্তে শক্তির প্রেরণা সঞ্চার যে-মেয়েদের পক্ষে প্রচুর পরিমাণে স্বাভাবিক, স্বক্ষেত্রে তারা আপন অপ্রতিহত মহিমা অনুভব করতে পারলে তবে তাদের প্রকৃত সার্থক হতে পারে। প্যারিসে যে সকল নারী শালঁ-সভায় মনীষী পুরুষমণ্ডলীকে নিজের মোহিনী-শক্তির দ্বারা টেনে নিয়ে তাদের চিত্তকে আন্দোলিত করে আলাপ-আলোচনার তরঙ্গ তুলতেন তাঁরা এই জাতের। তাঁরা অনেকে বিবাহিতা হলেও গৃহকর্মের গণ্ডিকে স্বভাবতই ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন। সূর্যের আলো সহজেই যেমন গাছের মজ্জায় মজ্জায় প্রাণসঞ্চার করে, তেমনি করেই তাঁরা তাঁদের সমকালবর্তী গুণীদের মনের ভিতর নারীলাবণ্যের কিরণ বিকীর্ণ করে তাঁদের মধ্যে সফলতা সঞ্চার করতেন।'

রবীন্দ্রনাথের মতে এই 'নারীলাবণ্যের কিরণ' পুরুষের আত্মপ্রকাশে—তার মহত্তর সৃষ্টিকর্মে অত্যাবশ্যক। জৈবশরীর এবং মনঃশরীর ভেদে সৃষ্টিকর্ম দ্বিবিধ। জৈবশরীরের সৃষ্টিক্রিয়ায় পুরুষ দাতা, নারী গ্রহীতা। কিন্তু মনঃশরীরের সৃষ্টিক্রিয়ায় তার বিপরীত লীলা, অর্থাৎ সে ক্ষেত্রে নারী দাতা, পুরুষ গ্রহীতা। এই প্রসঙ্গে কবির বক্তব্য তাঁর কণ্ঠেই শোনা প্রয়োজন। কবি বলছেন, 'সৃষ্টিকাণ্ডে যে দ্বৈত আছে তার মধ্যে একদিকে গ্রহণ আর একদিকে দান। সংগীতব্যাপারে সুরসমাবেশ থাকে স্থির, তার মধ্যে চঞ্চল তাল প্রবেশ করে তাকে সক্রিয় করে তোলে, তাকে মূর্তি দেয়, চরিত্র দেয়, সজীব করে। তেমনি জৈব-সৃষ্টিকার্যে পুরুষের শক্তি অপেক্ষাকৃত গৌণভাবে স্ত্রীর সৃষ্টি-শক্তিকে সক্রিয় করে তোলে। কিন্তু স্ত্রীপুরুষের সত্তা শুধু কেবল দেহকে নিয়ে তো নয়! তাদের মনঃশরীর আছে, এই মনঃশরীরের প্রকৃতিতে সাধারণত যে একটি প্রভেদ আছে, তার সত্তা নির্ণয় না করেও তাকে বুঝতে

বাধে না। স্ত্রীপুরুষ পরস্পরকে যে প্রার্থনা করে, তার মধ্যে মনঃশরীরের এই গভীর আহ্বানটি বড় কম নয়। এখানে তাদের মধ্যে যে মিলন হয়, সে মিলনেও সৃষ্টি-শক্তিকে জাগরূক করে। সমাজ-ব্যবস্থা, রাষ্ট্রব্যবস্থা, ধর্মতন্ত্রগঠন, অর্থ-অর্জন, তত্ত্বান্বেষণ, জ্ঞান ও কর্মের যোগসাধন, ভাবকে রসকে রূপদান প্রভৃতি নানা উদ্যোগ নিয়ে মানব-সভ্যতাকে সৃষ্টি করে তোলা মুখ্যভাবে পুরুষের দ্বারা ঘটেছে। এই সৃষ্টিকার্যে মেয়েদের ব্যক্তিরূপের যে প্রভাব সে হচ্ছে পুরুষের চিত্তকে গৌণভাবে সক্রিয় করে তোলা। আমাদের দেশের জ্ঞানীরা স্ত্রীপুরুষের মনোমিলনের এই রহস্যকে স্বীকার করেছেন, তাই মেয়েদের বলেছেন শক্তি অর্থাৎ জৈব-সৃষ্টিতে পুরুষের যে স্থান, মানস-সৃষ্টিতে সেই স্থান মেয়েদের।'[৫]

কবির এই বক্তব্যের মধ্যে মনঃশরীরে স্ত্রীপুরুষের মিলনের রহস্যটির দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা একান্ত প্রয়োজন। আমাদের দেশে শাক্ত ও বৈষ্ণব-তন্ত্রে যাকে বলা হয় 'সাধনসঙ্গিনী' বা 'উত্তরসাধিকা' তার কথাই কবি তাঁর নিজের উপলব্ধির ভাষায় প্রকাশ করেছেন। এবং 'জৈব-সৃষ্টিতে পুরুষের যে স্থান, মানস-সৃষ্টিতে সেই স্থান মেয়েদের'—এই উক্তির দ্বারা কবি বোঝাতে চেয়েছেন যে, মহত্তর মানবসৃষ্টিতে নারী দাতা, পুরুষ গ্রহীতা। অর্থাৎ পুরুষের জীবনচর্যা—তার জ্ঞানসাধনা ও ভাবসাধনার সমস্ত সার্থক সৃষ্টির উৎসমূলে রয়েছে নারীর প্রেরণা। যে নারী পুরুষের সর্ব-কর্ম-চিন্তা-আনন্দের প্রেরণা-স্বরূপিণী, কবি তাঁকেই বলেছেন—হ্লাদিনী।

এই প্রসঙ্গে প্লেটোর এরস-তত্ত্বের কথাও আবার স্মরণ করা যেতে পারে। দিব্য এরস আর জৈব এরসের প্রেরণাভেদে নরনারীর সম্পর্ক দ্বিবিধ। জৈব এরসের প্রেরণায় সুন্দর-সঙ্গমে সন্তান-জননের মধ্য দিয়ে নর-নারী অমরতা কামনা করে। আর দিব্য এরসের প্রেরণাবশে সুন্দরের সঙ্গসুধারসে নিস্নাত হয়ে শিল্পসুন্দর জীবনচর্যা ও জীবনসৃষ্টির মধ্য দিয়ে মানুষ মনঃশরীরে অমরতার অভিলাষী হয়। এই তত্ত্ব বিশ্লেষণ করতে গিয়েই প্লেটো বলেছেন, 'A more spiritual form of the same craving for eternity is the aspiration to win immortal fame by combining with a kindred soul to give birth to sound institutions and rules of life.' নারীর কাছে এই প্রেরণার প্রার্থী হয়েই পুরুষ বলে :

দীপ চাহে তব শিখা, মৌনী বীণা ধেয়ায় তোমার
অঙ্গুলিপরশ ;
তারায় তারায় খোঁজে তৃষ্ণায় আতুর অন্ধকার
সঙ্গসুধারস।

কিশোর কবির জীবনে এই সঙ্গসুধারসের অনিঃশেষ অমৃত-ভাণ্ড নিয়ে আবির্ভূত হলেন কাদম্বরী দেবী। তাই তাঁর অনুক্ষণ সঙ্গ ও সান্নিধ্যের প্রেরণায় বিদ্যায়তনের পলাতক ছাত্র সরস্বতীর বরপুত্র হয়ে উঠলেন। কবিজীবনে কাব্যনির্ঝরিণীর উৎসমুখ চিরদিনের জন্যে নির্বারিত হল।

৩

'জীবনস্মৃতি' পড়ে আমরা জেনেছি যে, কবির ছেলে-বেলায় বাড়ির লোকেরা তাঁর হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন। কোনোদিন তাঁর কিছু হবে এমন আশা অভিভাবকগণের কারো মনেই রইল না। কবিও কোনো-কিছুর ভরসা না রেখে আপন মনে কেবল কবিতার খাতা ভরাতে লাগলেন। 'লেটস ডায়ারি' আর নীলখাতার পৃষ্ঠা ভরে উঠল বালক-কবির বাল্যলীলায়। তার কিছু কিছু রচনা কালের কবল থেকে রক্ষা পেয়ে সাময়িক পত্রিকার পৃষ্ঠায় ইতস্তত ছড়িয়ে আছে। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র ১৭৯৬ শকাব্দের অগ্রহায়ণ (নবেম্বর-ডিসেম্বর, ১৮৭৪) সংখ্যায় "অভিলাষ" নামে একটি কবিতা প্রকাশিত হয়। কবিতাটির নামের তলায় "দ্বাদশ বর্ষীয় বালকের রচিত" এই পরিচয় মুদ্রিত ছিল, রচয়িতার নাম ছিল না। এর পর এই পত্রিকারই ১৭৯৭ শকের আষাঢ় (জুন-জুলাই ১৮৭৫) সংখ্যায় "প্রকৃতির খেদ" নামে আর-একটি কবিতা "বালকের রচিত" বলে মুদ্রিত হয়। লেখা দুটি অনামা হলেও সে দুটি যে কবিরই রচনা এবং "অভিলাষ"-ই যে কবির প্রথম মুদ্রিত রচনা, সে কথা শ্রীসজনীকান্ত দাস ১৩৪৬ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যা 'শনিবারের চিঠি'তে নিঃসংশয়ে প্রমাণ করেন। তখন কবি বেঁচে ছিলেন, তিনি এই তথ্যের যাথার্থ্য স্বীকার করেছিলেন। উপরোক্ত দুটি কবিতার মাঝখানে ১৮৭৫ সনের ২৫ ফেব্রুয়ারি তারিখের (১৪ ফাল্গুন, ১২৮১) 'অমৃতবাজার পত্রিকা'য় প্রকাশিত "হিন্দুমেলার উপহার" রচনাটি আবিষ্কার করেন পরলোকগত ব্রজেন্দ্রন

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়। এ সব ছেলেবেলার রচনা সম্পর্কে কবি লিখেছেন, 'মনের মধ্যে আর কিছুই নাই, কেবল তপ্ত বাষ্প আছে—সেই বাষ্পভরা বুদ্‌বুদ্‌রাশি, সেই আবেগের ফেনিলতা, অলস কল্পনার আবর্তের টানে পাক খাইয়া নিরর্থকভাবে ঘুরিতে লাগিল। তাহার মধ্যে কোনো রূপের সৃষ্টি নাই, কেবল গতির চাঞ্চল্য আছে। কেবল টগবগ করিয়া ফুটিয়া ফুটিয়া ওঠা, ফাটিয়া ফাটিয়া পড়া। তাহার মধ্যে বস্তু যাহা-কিছু ছিল তাহা আমার নহে, সে অন্য কবিদের অনুকরণ; উহার মধ্যে আমার যেটুকু সে কেবল একটা অশান্তি, ভিতরকার একটা দুরন্ত আক্ষেপ। যখন শক্তির পরিণতি হয় নাই অথচ বেগ জন্মিয়াছে তখন সে একটা ভারি অন্ধ আন্দোলনের অবস্থা।'[৬]

বালকের সেই বেগের আবেগকে শক্তির পরিণতির দিকে পরিচালিত করলেন কাদম্বরী দেবী। শিল্পলোকের চারুচর্যা ছিল তাঁর মনঃশরীরের নিত্য-প্রসাধন। সাহিত্যে তাঁর অনুরাগ ছিল সহজাত, বাংলা বই তিনি পড়তেন কেবল সময় কাটাবার জন্যে নয়, সমস্ত সত্তা দিয়েই তিনি সাহিত্যরস উপভোগ করতেন। কাব্যের প্রতি তাঁর সুগভীর অনুরাগ দেখেই বুঝতে পারা যায়, কেবল গল্পের জন্যে গল্প পড়া নয়, কাব্যানুশীলনের অভ্যাসবশে তাঁর বিশদীভূত মনোমুকুরে যথার্থ সহৃদয়ের তন্ময়ীভবনযোগ্যতা জন্মেছিল। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের পৌত্রকে লক্ষ্মীর বিলাসপুরী থেকে তিনি সরস্বতীর পদ্মবনের দিকে ডাক দিলেন, এবং নিজেও তার নিত্যসঙ্গিনী হয়ে রইলেন। সেদিন ঠাকুর-পরিবারে বিহারীলাল কবিগুরুর আসনে প্রতিষ্ঠিত। কাদম্বরী দেবী ছিলেন বিহারীলালের ভক্ত-পাঠিকা। বিহারীলালের মত উৎকৃষ্ট কবিতা লেখার নিত্যপ্রেরণা তিনি জাগিয়ে রাখতেন রবীন্দ্রনাথের চিত্তে। বিহারীলালের তুলনায় রবীন্দ্রনাথের লেখা কিছুই হচ্ছে না, এই পরিহাস ও পরিবাদ-ছলে তিনি কবিকিশোরের মনে বিহারীলালের প্রতি অনুক্ষণ ঈর্ষা জাগিয়ে রাখতেন। সে যুগের মহত্তম কাব্যাদর্শের প্রতি ঈর্ষার বহ্নিস্পর্শেই অনুপ্রাণিত-বালকের চিত্তে আত্মপ্রকাশের আগুন জ্বলে উঠল।

প্রতিভার সেই হোমানলকে প্রোজ্জ্বল রাখার ভারও কাদম্বরী দেবী সানন্দে নিজের হাতেই তুলে নিলেন। সেদিনকার নবীনা কিশোরী নিজের মধ্যে হ্লাদিনী-শক্তির যে লীলা অনুভব করেছিলেন, তারই প্রেরণাবশে বিকাশোন্মুখ কিশোরচিত্তকে নারীর মোহিনী শক্তির সঙ্গ ও সান্নিধ্য দিয়ে

নিত্য নবনবোন্মেষে অনুপ্রাণিত করতে লাগলেন। ঘাটের কোঠায় পৌঁছে রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিজীবনের লীলাসঙ্গিনীর কৈশোরলীলার কথা স্মরণ করে লিখেছেন :

মনে আছে সে কি সব কাজ, সখী,
ভুলায়েছ বারে বারে।
বন্ধ দুয়ার খুলেছ আমার
কঙ্কণ-ঝংকারে।
ইশারা তোমার বাতাসে বাতাসে ভেসে
ঘুরে ঘুরে যেত মোর বাতায়নে এসে,
কখনো আমের নবমুকুলের বেশে,
কভু নবমেঘভারে।
চকিতে চকিতে চল-চাহনিতে
ভুলায়েছ বারে বারে।

[লীলাসঙ্গিনী, পূরবী।

কবিকল্পনায় সমুদ্ভাসিত এই দিব্যপ্রেরণার প্রাকৃত রূপ কী ছিল তা আর জানবার উপায় নেই। 'জীবনস্মৃতি'তে তাঁর জীবনের এই পর্ব সম্পর্কে কবি প্রায় নীরব ; 'ছেলেবেলা'য় তাঁর লেখনী সহজ ভঙ্গিতে অনেকটা মুক্ত হয়েছে বটে, কিন্তু তাতেও রসিকচিত্তের মন ভরে না। স্বভাবতই রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে তার কোনো প্রতিভাস পড়েছে কি না সেদিকে অনুরাগী পাঠকের কৌতূহল উদ্দীপ্ত হয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর শিশুজীবনের প্রাকৃত কাহিনীকে সাহিত্যে প্রতিভাসিত করেছেন 'ডাকঘরে'র অমল-চরিত্রের মধ্যে। শিশু অমল শিশু-রবিরই নাট্যসংকেত। রবীন্দ্র-সাহিত্যে অমল-চরিত্রকে প্রথমে পাই 'নষ্টনীড়ে'। 'নষ্টনীড়ে' অমলের কৈশোরলীলা। 'ডাকঘরে'র শিশু অমলের মতই 'নষ্টনীড়ে'র কিশোর অমলকে কবি নিজের আদলেই গড়েছেন বলে অনুমান করা অসঙ্গত হবে না। বৌঠান চারুলতার প্রেরণায় তার পিসতুতো দেওর অমলের কবিত্ব-উন্মেষ-লীলাই 'নষ্টনীড়ে'র পূর্বভাগের উপজীব্য। বলাই বাহুল্য, 'নষ্টনীড়' একটি ছোটগল্প। প্রত্যক্ষ বাস্তবের উপাদানেই ছোটগল্পের অঙ্গসজ্জা হয়ে থাকে ; কিন্তু কবিপ্রজাপতির কল্পনার জ্যোতিবিচ্ছুরণে তার শিল্পলাবণ্য গড়ে ওঠে, তাই কথাশিল্পীর সৃষ্ট অসংখ্য

চরিত্রের মধ্যে কোন-একটি বিশেষ চরিত্রকে শিল্পীর নিজের জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে দেখার সময় সর্বদাই মনে রাখতে হবে যে, আসলের সঙ্গে তার সবটা লাইনে লাইনে মেলবার কথা নয়, কেন না তার অনেকখানিই মনগড়া। এ কথাও ভুললে চলবে না যে, মূর্তিকে বিশ্লেষণ করতে গেলে কেবল মাটিকেই পাওয়া যায়, শিল্পীর আনন্দকে পাওয়া যায় না। তথাপি যখন আমরা জানতে পারি যে, কবি-জীবনের একটি বিশেষ অন্তরঙ্গ অভিজ্ঞতার অনুরূপ চিত্র তাঁর সৃষ্টিলোকে প্রতিফলিত হয়েছে তখন এ কথা বলা অন্যায় হবে না যে, কবি তাঁর জীবনলব্ধ সত্যকেই শিল্পের সঙ্গতি ও সুষমা দিয়ে সাহিত্যলোকে অধিকতর সত্য করে তুলেছেন। রবীন্দ্রনাথের কৈশোরে হ্লাদিনী শক্তির যে লীলায় তাঁর আত্মোন্মেষ ঘটেছিল সেই লীলাই অমলের কৈশোরকাহিনীতে শিল্পসত্যে বিকশিত হয়ে উঠেছে। বাস্তবে ও কল্পনায় যে পার্থক্য সেই পার্থক্যকে স্মরণ রেখে, জীবনায়ন ও শিল্পায়নের যে ব্যবধান সেই ব্যবধান সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন থেকেই 'চারুলতা ও অমল'-কথাকে কবির কণ্ঠে শোনা যাক :

[চারুলতার স্বামী ভূপতির টাকা ছিল যথেষ্ট এবং দেশটাও তখন ছিল গরম। গ্রহবশত ভূপতি কাজের লোক হয়েই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর মত ধনী লোককে দলে পাবার লোভে তাঁর উৎসাহদাতারও অভাব ছিল না। ভূপতি তাই হলেন সংবাদপত্রের সম্পাদক। অল্পবয়সে সম্পাদকি নেশা ও রাজনৈতিক নেশা অত্যন্ত জোর করেই ধরে ; ভূপতিরও তাই হল। এদিকে অন্তঃপুরে তাঁর বালিকাবধূ চারুলতা ধীরে ধীরে যৌবনে পদার্পণ করল।]

'ধনীগৃহে চারুলতার কোনো কর্ম ছিল না। ফলপরিণামহীন ফুলের মতো পরিপূর্ণ অনাবশ্যকতার মধ্যে পরিস্ফুট হইয়া উঠাই তাহার চেষ্টাশূন্য দীর্ঘ দিনরাত্রির একমাত্র কাজ ছিল। তাহার কোনো অভাব ছিল না।

* * *

'যে সময়ে স্বামী স্ত্রী প্রেমোন্মেষের প্রথম অরুণালোকে পরস্পরের কাছে অপরূপ মহিমায় চিরনূতন বলিয়া প্রতিভাত হয়, দাম্পত্যের সেই স্বর্ণ-প্রভামণ্ডিত প্রত্যূষকাল অচেতন অবস্থায় কখন অতীত হইয়া গেল কেহ জানিতে পারিল না।

* * *

'লেখাপড়ার দিকে চারুলতার একটা স্বাভাবিক ঝোঁক ছিল বলিয়া তাহার

দিনগুলা অত্যন্ত বোঝা হইয়া উঠে নাই। সে নিজের চেষ্টায় নানা কৌশলে পড়িবার বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছিল। ভূপতির পিসতুত ভাই অমল থার্ড্ ইয়ারে পড়িতেছিল, চারুলতা তাহাকে ধরিয়া পড়া করিয়া লইত; এই কর্মটুকু আদায় করিয়া লইবার জন্য অমলের অনেক আবদার তাহাকে সহ্য করিতে হইত।...ভূপতি চারুলতার প্রতি কোনো দাবি করিত না, কিন্তু সামান্য একটু পড়াইয়া পিসতুত ভাই অমলের দাবির অন্ত ছিল না।...তাহার কাছে কেহ কিছু চায় না, অমল চায়—সংসারের সেই একমাত্র প্রার্থীর প্রার্থনা রক্ষা না করিয়া সে থাকিতে পারে না।...এই-সকল ছোটোখাটো শখের খাটুনিতেই তাহার হৃদয়বৃত্তির চর্চা এবং চরিতার্থতা হইত।

'ভূপতির অন্তঃপুরে যে একখণ্ড জমি পড়িয়া ছিল তাহাকে বাগান বলিলে অনেকটা অত্যুক্তি করা হয়।...

'এই ভূখণ্ডের উন্নতিসাধনের জন্য চারু এবং অমলের মধ্যে একটা কমিটি বসিয়াছে। উভয়ে মিলিয়া কিছুদিন হইতে ছবি আঁকিয়া, প্ল্যান করিয়া, মহা উৎসাহে এই জমিটার উপরে একটা বাগানের কল্পনা ফলাও করিয়া তুলিয়াছে।

* * *

'তাহাদের সমস্ত সংকল্পগুলির প্রধান সুখ এবং গৌরব এই ছিল যে, সেগুলি তাহাদের দুজনের মধ্যেই আবদ্ধ।'

[তাদের দুজনের মধ্যে আবদ্ধ স্বপ্নকে অন্য কেউ না জানতে পারে সে-জন্যেই একদিন চারু অমলকে গল্প লেখার জন্যে অনুরোধ জানাল। চারুর ইচ্ছা, তাতে তাদের যুগলমানসের স্বপ্নকামনা ভাষা পাবে, অথচ তারা দুজনে ছাড়া কেউ তা বুঝতে পারবে না। অমল গোপনে গোপনে সাহিত্যচর্চা করত, কিন্তু চারুকে তার লেখা শোনাবার অতিব্যগ্রতাই তাকে এতদিন বাধা দিচ্ছিল। চারুর দিক থেকে আগ্রহ ও উৎসাহ পেয়ে অমল তার লেখা চারুকে পড়ে শোনাল।]

'সেদিন সেই গাছের তলায় অমল সাহিত্যের মাদকরস প্রথম পান করিল; সাকী ছিল নবীনা, রসনাও ছিল নবীন এবং অপরাহ্নের আলোক দীর্ঘ ছায়াপাতে রহস্যময় হইয়া আসিয়াছিল।

* * *

'এখন অমলের লেখাই তাহাদের আলোচনা ও পরামর্শের প্রধান বিষয় হইয়া উঠিল।

*   *   *

'এতদিন দুজনে আকাশকুসুমের চয়নে নিযুক্ত ছিল, এখন কাব্যকুসুমের চাষ আরম্ভ হইয়া উভয়ে আর সমস্তই ভুলিয়া গেল।'

[অমলের সাহিত্যরচনা এবং চারুকে তা পড়ে শোনানো এই যেমন হল দুজনের নিত্যকর্ম, তেমনই এই সৃষ্টিলীলা নিয়েই শুরু হল দুজনের মধ্যে মান-অভিমানের পালা। নূতন গ্রন্থকার মন্মথ দত্তের রচনার প্রতি কৃত্রিম অনুরাগ প্রকাশ করে চারু অমলের মনে ঈর্ষার সৃষ্টি করতে লাগল। তার পরে একদিন সাময়িক পত্রিকার পৃষ্ঠায় হল অমলের আত্মপ্রকাশ। সেই মুদ্রিত রচনা দেখিয়ে বৌদিকে বিস্মিত করে দেবার জন্যে অমল যখন অধীর আগ্রহে উৎকণ্ঠ, তখন এক অজ্ঞাত বেদনায় চারুর চিত্ত ব্যথিয়ে উঠল।]

'কিসে যে সে মনের মধ্যে আঘাত পাইল তাহা বুঝিয়া দেখিবার চেষ্টা করিল ; কোনো সঙ্গত কারণ বাহির হইল না।

'অমলের লেখা অমল এবং চারু দুজনের সম্পত্তি। অমল লেখক এবং চারু পাঠক। তাহার গোপনতাই তাহার প্রধান রস। সেই লেখা সকলে পড়িবে এবং অনেকেই প্রশংসা করিবে, ইহাতে চারুকে যে কেন এতটা পীড়া দিতেছিল তাহা সে ভালো করিয়া বুঝিল না।

'কিন্তু লেখকের আকাঙ্ক্ষা একটিমাত্র পাঠকে অধিক দিন মেটে না। অমল তাহার লেখা ছাপাইতে আরম্ভ করিল। প্রশংসাও পাইল।

'মাঝে মাঝে ভক্তের চিঠিও আসিতে লাগিল। অমল সেগুলি তাহার বৌঠানকে দেখাইত। চারু তাহাতে খুশিও হইল, কষ্টও পাইল। এখন অমলকে লেখায় প্রবৃত্ত করাইবার জন্য একমাত্র তাহারই উৎসাহ ও উত্তেজনার প্রয়োজন রহিল না।...হঠাৎ তাহাদের কমিটির রুদ্ধ দ্বার খুলিয়া বাংলাদেশের পাঠকমণ্ডলী তাহাদের দুজনকার মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইল।'[১]

৪

রবীন্দ্রনাথের প্রথম কাব্যগ্রন্থের নাম 'বনফুল'। 'বনফুল' 'জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব' মাসিক পত্রে ১২৮২ সালের অগ্রহায়ণ থেকে পরবর্তী বৎসরের আশ্বিন-কার্তিক মাসে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। কবির বয়স তখন চৌদ্দ বৎসর উত্তীর্ণ হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতিতে লিখেছেন, 'এ-পর্যন্ত যাহা কিছু লিখিতেছিলাম তাহার প্রচার আপনা-আপনির মধ্যেই বদ্ধ ছিল। এমন সময় জ্ঞানাঙ্কুর নামে এক কাগজ বাহির হইল। কাগজের নামের উপযুক্ত একটি অঙ্কুরোদ্গত কবিও কাগজের কর্তৃপক্ষেরা সংগ্রহ করিলেন। আমার সমস্ত পদ্যপ্রলাপ নির্বিচারে তাঁহারা বাহির করিতে শুরু করিয়াছিলেন।'[৮]

'জ্ঞানাঙ্কুরে' 'বনফুল' প্রকাশের বছর দেড়েক পরে 'ভারতী' পত্রিকার প্রকাশ ১২৮৪ সালের শ্রাবণ মাসে। রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন যোলো বৎসর তিন মাস। 'ভারতী'ই রবীন্দ্র-ভারতীর প্রথম পদ্মাসন। 'অবোধবন্ধু'তে যেমন বিহারীলাল, 'বঙ্গদর্শনে' যেমন বঙ্কিমচন্দ্র, তেমনি 'ভারতী'তেই রবীন্দ্রনাথের নবীন প্রতিভা ধীরে ধীরে উন্মীলিত হয়েছে। 'ভারতী'র প্রথম বর্ষে প্রতি মাসে রবীন্দ্রনাথের একাধিক রচনা প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম মাসেই বেরোল "মেঘনাদবধ কাব্য সমালোচনা" আর "ভিখারিণী" গল্প। সমালোচনাটি অবশ্য কয়েক মাস ধরে চলেছিল। আশ্বিনে শুরু হল রবীন্দ্রনাথের প্রথম উপন্যাস "করুণা"। দুর্ভাগ্যবশত এ উপন্যাস শেষ পর্যন্ত অসমাপ্তই রয়ে গেছে। তারপর 'কবিকাহিনী' কাব্য মুদ্রিত হল পৌষ থেকে চৈত্র মাস পর্যন্ত।[৯]

এই প্রসঙ্গে এই কথা স্মরণীয় যে 'বনফুল' ও 'কবি-কাহিনী' কবিকথা। রবীন্দ্রনাথের এই প্রথম কাহিনী-কাব্য-দ্বয়ের নায়ক দুজন কবি বলেই আমরা কাব্যদ্বয়কে কবিকথা বলি নি। 'হৃদয়-অরণ্যে'র রবীন্দ্রমানসের প্রতিবিম্ব বলেই এই কাব্যকাহিনী দুটি কবিকথার মর্যাদা বহন করছে।

কিন্তু প্রথম বর্ষের 'ভারতী'র রচনাবলী রবীন্দ্রজীবনে আর একটি কারণে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'ভারতী'র প্রথম বর্ষেই কবি তাঁর গীতিকাব্যের অমর সংগীত পরিবেষণ করলেন। ১২৮৪ সালের আশ্বিন থেকে পরবর্তী বৈশাখ পর্যন্ত প্রায় প্রতি মাসে একটি একটি করে ভানুসিংহ ঠাকুরের পদ প্রকাশিত

হতে লাগল। আশ্বিনে "সজনি গো, শাওন গগনে ঘোর ঘনঘটা", অগ্রহায়ণে "গহন কুসুম-কুঞ্জ মাঝে", পৌষে "বজাও রে মোহন বাঁশী", মাঘে "হম সখি দারিদ নারী", ফাল্গুনে "সখি রে পিরীত বুঝব কে" ও "সতিমির রজনী", চৈত্রে "বাদর বরখন, নীরদ গরজন" এবং বৈশাখে প্রকাশিত হল "বার বার সখি বারণ করনু।"[১০]

ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলীতে রবীন্দ্র-জীবনে কাহিনী-কাব্যের পালাবদল হল। এই পদগুলির সৃষ্টির প্রারম্ভ-ইতিহাস সম্পর্কে কবি 'জীবনস্মৃতি'তে বলেছেন, 'একদিন মধ্যাহ্নে খুব মেঘ করিয়াছে। সেই মেঘলাদিনের ছায়াঘন অবকাশের আনন্দে বাড়ির ভিতরে এক ঘরে খাটের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া একটা স্লেট লইয়া লিখিলাম 'গহন কুসুমকুঞ্জ-মাঝে'। লিখিয়া ভারি খুশি হইলাম—তখনই এমন লোককে পড়িয়া শুনাইলাম বুঝিতে পারিবার আশঙ্কামাত্র যাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। সুতরাং সে গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িয়া কহিল, "বেশ তো, এ তো বেশ হইয়াছে।"[১১]

সতেরো বছরের এই রচনাগুলি সম্পর্কে পঞ্চাশ বৎসর বয়সে 'জীবনস্মৃতি' লিখতে বসে কবির আর লেশমাত্রও মায়া ছিল বলে মনে হয় না। তিনি লিখেছেন, 'ভানুসিংহের কবিতা একটু বাজাইয়া বা কষিয়া দেখিলেই তাহার মেকি বাহির হইয়া পড়ে। তাহাতে আমাদের দিশি নহবতের প্রাণগলানো ঢালা সুর নাই, তাহা আজকালকার সস্তা আর্গিনের বিলাতি টুংটাং মাত্র।'

কিন্তু কবির প্রথম গীতিকাব্যসাধনা কেন বেনামে রাধাকৃষ্ণের রূপককে আশ্রয় করে প্রকাশিত হল—এ প্রশ্ন রবীন্দ্র-রসিকের চিত্তে নিশ্চয়ই জাগ্রত হবে। 'জীবনস্মৃতি'র লেখক অবশ্য তার একটি কৈফিয়ত দিয়েছেন। অক্ষয় চৌধুরীর কাছে বালক-কবি চ্যাটার্টনের বিবরণ শুনেই চ্যাটার্টনের মত প্রাচীন কবিদের নকল করে কবি কোমর বেঁধে দ্বিতীয় চ্যাটার্টন হবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে, টমাস চ্যাটার্টন [১৭৫২-১৭৭০] ব্রিস্টল শহরে জন্মগ্রহণ করেন। ছেলেবেলা থেকে মধ্যযুগ তাঁকে বিশেষ ভাবে আকর্ষণ করত। আধুনিক কবিতা তিনি অনেক লিখেছেন, কিন্তু পঞ্চদশ শতাব্দীর রাউলে নামে একজন কল্পিত কবির ছদ্মনাম গ্রহণ করে তিনি প্রাচীন রীতিতে কবিতা লিখেই প্রসিদ্ধি অর্জন করেন। চ্যাটার্টন ওয়ালপোলের পৃষ্ঠপোষকতা লাভের

চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। তারপর লণ্ডনে গিয়ে লেখনীর দ্বারা জীবিকার্জনের জন্যে যথাশক্তি চেষ্টা করে অবশেষে সর্বদিকে হতাশ্বাস হয়ে আঠারো বৎসর বয়সে বিষ পান করে আত্মহত্যা করেন। ক্যাজামিয়ঁা তাঁর 'ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থে চ্যাটার্টন প্রসঙ্গে বলেছেন, 'When all is said, his psychological case remains very significant. In certain respects he is the most romantic man of his age ; his childhood is one long series of obsessing dreams, which unbalance any developing sense he may have possessed of reality ; he yields to the allurement of his visionary existence, half believing in it, and so loses all sense of the value of truth.'[১৫] রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'তাঁহার গল্পটার মধ্যে যে একটা নাটকিয়ানা ছিল সে আমার কল্পনাকে খুব সরগরম করিয়া তুলিয়াছিল।' এই 'নাটকিয়ানা'র দিক দিয়ে উভয় কবির জীবনেও অনেকখানি ভাবগত সাদৃশ্য ছিল। তা ছাড়া অক্ষয় চৌধুরী রবীন্দ্রনাথের কাছে চ্যাটার্টন-প্রসঙ্গ চিত্তাকর্ষক করে তুলেছিলেন কেন তাও চিন্তা করে দেখার বিষয়। চ্যাটার্টনের মতো ছদ্মনামে কবিতা লেখায় উৎসাহিত করা অক্ষয় চৌধুরীর উদ্দেশ্য ছিল, এমন অনুমান করার মতো কোনো তথ্যই আমাদের কাছে এসে পৌছয় নি। কাজেই চ্যাটার্টনের মতো কবিতা লিখবেন, এই কৈফিয়তের মধ্যে ভানুসিংহ ঠাকুরের সব কথা বলা হয় নি। 'জীবনস্মৃতি'তে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, সারদাচরণ মিত্র ও অক্ষয় সরকার-সম্পাদিত 'প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ' তাঁর কাছে ছেলেবেলায় 'একটি লোভের সামগ্রী' ছিল। বৈষ্ণব কবিগণের ব্রজবুলি ভাষায় লেখা রাধাকৃষ্ণ পদাবলী তাঁর কৈশোর-কল্পনাকে বিশেষ-ভাবেই আবিষ্ট করে রেখেছিল। 'বিদ্যাপতির দুর্বোধ বিকৃত মৈথিলী পদগুলি অস্পষ্ট বলিয়াই বেশি করিয়া আমার মনোযোগ টানিত। আমি টীকার উপর নির্ভর না করিয়া নিজে বুঝিবার চেষ্টা করিতাম। বিশেষ কোনো দুরূহ শব্দ যেখানে যতবার ব্যবহৃত হইয়াছে সমস্ত আমি একটি ছোট বাঁধানো খাতায় নোট করিয়া রাখিতাম।' এই কাহিনীতে ব্রজবুলি ভাষার রহস্যময় আকর্ষণের কথাই জানতে পারা গেল। ব্রজবুলির অপূর্ব সংগীত-সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা এইভাবেই কবিমানসে জাগ্রত হয়েছিল অনুমান করা যেতে

পারে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল চ্যাটার্টনের কাহিনী। ব্রজবুলিতে কবি-কিশোর পেলেন আত্মগোপনের ভাষা, চ্যাটার্টনের কাছে পেলেন তার কৌশল। কবিজীবনে শুরু হল নিজেকে গোপন করার ছলনা করে নিজেকে প্রকাশ করার লীলাকৌতুক। ভানু-সিংহের রাধা কবি-কিশোরেরই মানসরাধা। 'বৈষ্ণব কবিতা'য় কবি একদিন যে জিজ্ঞাসাকে কাব্যচ্ছন্দে গ্রথিত করে তুলেছিলেন সেই জিজ্ঞাসাই ভানুসিংহ ঠাকুরের কাছে তাঁর পাঠকেরা করবেন :

> কোথা তুমি পেয়েছিলে এই প্রেমচ্ছবি,
> কোথা তুমি শিখেছিলে এই প্রেমগান
> বিরহ-তাপিত! হেরি কাহার নয়ান,
> রাধিকার অশ্রু-আঁখি পড়েছিল মনে।
> * * এত প্রেমকথা,
> রাধিকার চিত্তদীর্ণ তীব্র ব্যাকুলতা
> চুরি করি লইয়াছ কার মুখ, কার
> আঁখি হতে ?

আসলে 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'কে কবি যতই বৈষ্ণব কবিদের ব্যর্থ নকল বলে প্রচার করুন না কেন, ওর মধ্যে কবির কৈশোর-লীলার স্বপ্নকামনাকেও পাওয়া যাবে। বৈষ্ণব-কল্পনায় প্রেমঘন ভগবান তাঁর আনন্দ-বৃত্তিকে যে শক্তির দ্বারা আস্বাদন করেন, তার নাম হ্লাদিনী। হ্লাদিনীর সার প্রেম, প্রেমের সার মহাভাব, সেই মহাভাবস্বরূপিণী রাধা ঠাকুরাণী। বৈষ্ণব মহাজনের দৃষ্টিতে 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং'; কাজেই রাধাকৃষ্ণ-লীলায় প্রেমস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর আনন্দস্বরূপিণী রাধাঠাকুরাণী অর্থাৎ হ্লাদিনী শক্তিরই প্রেমলীলা ব্যক্ত হয়েছে। ভক্তের সাধনা তাঁর মানসবৃন্দাবনে সেই নিত্যলীলাকেই প্রত্যক্ষ করা। রবীন্দ্রনাথও তাঁর ব্যক্তিসীমায় যে হ্লাদিনীর সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন, ভানুসিংহ ঠাকুরের ছদ্মবেশে তিনি সেই হ্লাদৈকময়ী লীলাসঙ্গিনীর মাধুর্য-লীলাই আস্বাদন করেছেন বৈষ্ণবের নিত্যলীলার রূপককে আশ্রয় করে। 'নষ্টনীড়ে' অমলের লেখা ছিল অমল আর চারু দুজনের সম্পত্তি। তার গোপনতাই ছিল তার প্রধান রস। কিশোর

রবীন্দ্রনাথও নানাভাবে নিজেকে গোপন করে আত্মমানসে তাঁর গোপনচারিণীর লীলারসই আস্বাদন করেছেন।

বাহাত্তর বৎসর বয়সে কবি তাঁর কৈশোরের দিনগুলির বর্ণনায় ব্রজলীলার রূপকই ব্যবহার করে বলেছেন,—

বয়স যখন অল্প ছিল
কর্তব্যের বেড়ায় ফাঁক ছিল যেখানে সেখানে।
তখন যেমন-খুশির ব্রজধামে
ছিল বালগোপালের লীলা।[১৩]

বালগোপালের সেই ব্রজলীলারই কাব্যরসোদ্গার হল ভানুসিংহের পদাবলী। কবিকিশোরের সেই মানসবৃন্দাবনে প্রবেশ করলে দেখতে পাওয়া যাবে প্রেমিক-সত্তায় রবীন্দ্রনাথ ছিলেন অদীক্ষিত বৈষ্ণব। চৈতন্যোত্তর গৌড়ীয় বৈষ্ণবের প্রেমসাধনা তাঁর কবিমানসে কৈশোরলগ্নেই স্ফুরিত হয়েছিল। সে সাধনা ছিল রাগানুগা। রাধাপ্রেম নয়, গোপীপ্রেমই ছিল সেদিন তাঁর সর্বসাধ্যসার। তাই রহঃসখীর অন্তরে অধিবাসিত জ্যোতির্ময় কৃষ্ণপ্রেমই কবিপ্রেমিক ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলীর বিষয়ালম্বন।

॥ উল্লেখপঞ্জী ॥

১ ঘরোয়া, পৃ° ৬৬।

২ জীবনস্মৃতি, পৃ° ১৬২।

৩ তদেব।

৪ তদেব, পৃ° ৮০–৮১।

৫ তীর্থংকর, পৃ° ১২৫।

৬ জীবনস্মৃতি, পৃ° ৮২।

৭ নষ্টনীড়, গল্পগুচ্ছ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ° ৩৪৭–৩৫৯।

এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে, ‘নষ্টনীড়’ ‘ভারতী’তে ১৩০৮ সালের বৈশাখ থেকে অগ্রহায়ণের মধ্যে প্রকাশিত হয়।

৮ জীবনস্মৃতি, রচনাপ্রকাশ।

৯ এই সময়কার অন্যান্য রচনার ধারাবাহিক কালানুক্রমিক পঞ্জী রচনা করেছেন শ্রীসজনীকান্ত দাস তাঁর "রবীন্দ্রনাথ: জীবন ও সাহিত্য" গ্রন্থে। দ্রষ্টব্য ; উক্ত গ্রন্থের "রবীন্দ্র-রচনাপঞ্জী" অধ্যায়, পৃ° ১৯০-২৪৯।

১০ দ্রষ্টব্য : 'প্রভাত রবি', ডক্টর বিজনবিহারী ভট্টাচার্য, পৃ° ১৭৮।

১১ জীবনস্মৃতি, পৃ° ৮৭।

১২ A History of English Literature: Legouis and Cazamian, পৃ° ৯১৯।

১৩ "ফাঁক", 'পুনশ্চ' কাব্যগ্রন্থ। দ্রষ্টব্য : রবীন্দ্ররচনাবলী-১৭, পৃ° ২৪।

পঞ্চম অধ্যায়

বিদেশী পাখি

১

সতেরো বৎসর সাড়ে চার মাস বয়সে রবীন্দ্রনাথ বিলাত যাত্রা করেন। ১৮৭৮ সনের ২০শে সেপ্টেম্বর 'পুনা' জাহাজ বম্বে থেকে বিলাতের পথে সমুদ্রপাড়ি শুরু করে। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ছিলেন তাঁর মেজদা সত্যেন্দ্রনাথ। সত্যেন্দ্রনাথই ছিলেন তাঁর বিলাত যাওয়ার মূলে। প্রবেশিকার দেউড়ি উত্তীর্ণ হবার মধ্যপথেই ছোট ভাইটি ইস্কুলের পাট চুকিয়ে বসে আছেন দেখে সত্যেন্দ্রনাথ পিতৃদেবের অনুমতি নিয়ে তাঁকে বিলাত পাঠিয়ে ব্যারিস্টার করার সংকল্প করলেন। শুরু হল রবীন্দ্রজীবনে সত্যেন্দ্রনাথের পরীক্ষা-নিরীক্ষার যুগ। বিলাত যাওয়ার মাস ছয় পূর্বেই মেজদা তাঁকে নিয়ে গেলেন নিজের কাছে আমেদাবাদে। সেখানে মাস চারেক কাটিয়ে কবি প্রেরিত হলেন বম্বেতে। সেখানেও এক অপূর্ব ও অভিনব পরিবেশে কাটল দু মাস। এই ভাবেই বিলিতি চালচলনের গোড়াপত্তন করে নিয়ে কবিকিশোর যাত্রা করলেন সমুদ্রপারের শ্বেতদ্বীপে। 'ছেলেবেলা'য় জীবনের এই পর্ব সম্পর্কে বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, শিকড় সুদ্ধ তাঁকে উপড়ে নিয়ে আসা হল এক ক্ষেত থেকে আরেক ক্ষেতে।

সত্যেন্দ্রনাথ তখন আমেদাবাদে সেশন জজ। শাহিবাগে ছিল তাঁর বাসা। সেটি ছিল বাদশাহি আমলের বিরাট প্রাসাদ, বাদশাহের জন্যেই তৈরি। সপ্তদশ শতকে শাহজাদা খসরু এই প্রাসাদ নির্মাণ করেন। এই প্রসঙ্গে এ কথা স্মরণীয় যে, পরবর্তী জীবনে বাদশাহ শাজাহান রূপে তিনিই তাজমহলের মর্মর-স্বপ্ন রচনা করেছিলেন। সেই প্রাসাদের প্রাকারপাদমূলে গ্রীষ্মকালের স্বচ্ছতোয়া সবরমতী নদী তার বালুশয্যার এক প্রান্ত দিয়ে কোনমতে বয়ে চলেছে। সেই নদীতীরের দিকে প্রাসাদের সম্মুখভাগে ছিল একটি প্রকাণ্ড খোলা ছাদ। মেজদা চলে যেতেন আদালতে, আর সেই বিরাট প্রাসাদে থাকতেন কবি একা। কেননা, মেজ বৌঠাকরুন জ্ঞানদানন্দিনী দেবী

তাঁর ছেলেমেয়েদের নিয়ে তার কিছুদিন পূর্বেই বিলাত চলে গিয়েছেন। সেই প্রকাণ্ড প্রাসাদের নির্জনতায় কবি একা অকারণ কৌতূহলে শূন্য ঘরে ঘরে ঘুরে বেড়াতেন। সঙ্গীসাথী কেউ কোথাও নেই, শব্দের মধ্যে কেবল শোনা যেত পায়রাগুলির মধ্যাহ্নকূজন।

আমেদাবাদের এই বাদশাহি প্রাসাদ কবিমানসে অতীতাশ্রয়ী ইতিহাস-চেতনাকে উজ্জীবিত করে তুলল। কবি এই প্রথম দেখলেন, চলতি ইতিহাস যেন থেমে গিয়েছে, দেখা যাচ্ছে তার পিছনফেরা বড়ো ঘরোয়ানা। তার সাবেক দিনগুলো যেন যক্ষের ধনের মত মাটির নিচে পোঁতা। জোড়াসাঁকোর প্রাসাদমালায় অনাবিষ্কৃত রাজপুরীতে ছিল রূপকথার রাজপুত্র; আমেদাবাদের বাদশাহি প্রাসাদে কবি রূপকথার অবাস্তব স্বপ্নলোক পেরিয়ে এসে পৌছলেন ইতিহাসের রাজত্বে। বর্তমানের সংকীর্ণ কালসীমা পেরিয়ে কবিকল্পনা অতীতচারী রোমান্স-রসের আস্বাদন পেল প্রথম। শুরু হল সুদূরযাত্রী স্বপ্নাভিসার। সে যেন আজ কত শত বৎসরের কথা! নহবৎখানায় বাজছে রসুনচৌকি দিনে রাত্রে অষ্টপ্রহরের রাগিণীতে। প্রস্তরখচিত রাজপথে ঘোড়ার খুরের শব্দ উঠছে তালে তালে, ঘোড়শোওয়ার তুর্কি ফৌজের চলছে কুচকাওয়াজ, তাদের বর্শার ফলায় রোদ উঠছে ঝকঝকিয়ে। বাদশাহি দরবারের চারদিকে চলেছে সর্বনেশে কানাকানি ফুসফাস। অন্দরমহলে খোলা তলোয়ার হাতে হাবসি খোজারা পাহারা দিচ্ছে। বেগমদের হামামে ছুটছে গোলাবজলের ফোয়ারা, উঠছে বাজুবন্ধ কাঁকনের ঝনঝনি। কিশোরচিত্তে 'ক্ষুধিত পাষাণে'র পটভূমি রচিত হয়েছে। রচিত হয়েছে উদ্গতপক্ষ কবি-বিহঙ্গের স্বপ্নপ্রয়াণের জন্যে ইতিহাসের মহা-নভ-অঙ্গন।

রবীন্দ্রজীবনে তাই আমেদাবাদের শাহিবাগের দান নগণ্য নয়। জোড়াসাঁকোর পারিবারিক চৌহদ্দি পেরিয়ে বারো বৎসর বয়সে যেদিন বালক-কবি পিতৃসান্নিধ্যে হিমালয় যাত্রায় বোলপুর পৌছেছিলেন সেদিন বোলপুরের নারিকেলগাছের তলায় বসে 'পৃথ্বীরাজের পরাজয়' লিখতে গিয়ে তাঁকে কাব্যিক পরিবেশ সৃষ্টি করতে হয়েছিল। 'জীবনস্মৃতি'র খসড়ায় তিনি সেই নাবালক কবির কাব্যভাবুকতার কথা বলতে গিয়ে লিখেছেন, 'তখন শুধু কবিতা লিখিয়াই তৃপ্তি ছিল না তার সঙ্গে রীতিমত কবিত্ব করাও দরকার ছিল। তখন এটুকু বুঝিয়াছিলাম কবিত্ব করিবার কতকগুলি বিশেষ বিধি আছে। তাই

ভোরে উঠিয়া বোলপুর বাগানের প্রান্তে একটি শিশু নারিকেলগাছের তলায় দক্ষিণ মাঠের দিকে পা ছড়াইয়া দিয়া পেন্সিল হাতে আমার খাতা ভরাইতে বসিতাম। ঘরের মধ্যে বসিয়া লিখিলে হয়তো ইহার চেয়ে অনেক বেশি মন স্থির করিয়া লেখা সম্ভব হইত কিন্তু তাহা হইলে নিজের কল্পনায় নিজেকে এমনতর ভয়ংকর কবি বলিয়া ঠেকিত না। প্রভাতের আলোক, উন্মুক্ত আকাশ, উদার প্রান্তর, তরুর ছায়া—এ সমস্ত সেকালে ছাড়িবার জো ছিল না! নবীন কবির ত একটা দায়িত্ব আছে! আমার কেহ দর্শক ছিল না জানি, কিন্তু নিজের কাছে নিজেকে ভুলাইবার প্রয়োজন ছিল। মধ্যাহ্নে খোয়াইয়ের মধ্যে বুনো খেজুরের ঝোপ হইতে ছোট ছোট অখাদ্য খেজুর খাইয়া নিজেকে জনহীন মরুরাজ্যে পথহারা তৃষ্ণার্ত পথিক বলিয়া মনে হইত এবং সকালবেলায় নারিকেল-ছায়ায় খাতা কোলে করিয়া বসিয়া নিজেকে কবি বলিয়া সন্দেহ থাকিত না।'[১]

এখানে রবীন্দ্রনাথ নিজের বাল্যকালের কবিচর্যা সম্পর্কে অপূর্ব রসিকতার সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু বালক-কবি যে কৃত্রিম পরিবেশ সৃষ্টির জন্যে যত্নবান হয়েছিলেন, আমেদাবাদে সেই পরিবেশই আরো রহস্যময় হয়ে তাঁর কাছে আপনা থেকে ধরা দিল। 'জনহীন মরুরাজ্যে পথহারা তৃষ্ণার্ত পথিকে'র চেয়েও রোমাঞ্চকর পটভূমিতে তিনি পদার্পণ করলেন। 'জীবনস্মৃতি'তে কবি লিখেছেন, সেই শাহিবাগ প্রাসাদের চূড়ার উপরকার একটি ছোট ঘরে ছিল তাঁর আশ্রয়। কেবল একটি চাকভরা বোলতার দল ছিল তাঁর সেই ঘরের সঙ্গী। রাত্রে তিনি সেই নির্জন ঘরেই শয়ন করতেন—এক-একদিন অন্ধকারে দু-একটা বোলতা চাক থেকে ছিটকে বেরিয়ে এসে তাঁর শয্যাসঙ্গী হত। তিনি যখন পাশ ফিরতেন তখন তাঁর দেহের চাপে তারা প্রীত হত না বলাই বাহুল্য, এবং পরিণামটি তাঁর পক্ষেও তীব্রভাবেই অপ্রীতিকর হত। কিন্তু শাহিবাগের সেই চূড়ায় শুধু অন্ধকার গৃহে বোলতার দংশনই তাঁর ভাগ্যে ছিল, এ কথা বললে অন্যায় করা হবে। শুক্লপক্ষের গভীর রাত্রে সবরমতী নদীর তীরে সেই প্রকাণ্ড ছাদটায় যে স্বপ্ন নেমে আসত তা কাব্যোন্মেষের পক্ষে কি পরিমাণ সহায়ক হত তা সহজেই অনুমেয়। ঐতিহাসিক স্মৃতি-বিজড়িত সেই প্রাসাদ-চত্বরে জ্যোৎস্নালোকিত নিশীথরাত্রির নির্জনতায় কবিকণ্ঠে নেমে এল সুরের ঝরনাধারা। গীতিকবিতা রচনা করে কবি সেই প্রথম নিজের দেওয়া সুর তাতে

যোজনা করলেন। জোড়াসাঁকোর কিশোর-কবি হলেন আমেদাবাদের নবীন সুরকার। রবীন্দ্রনাথ যত বড় কবি তত বড়ই সুরশিল্পী। তাঁর প্রতিভার এই যুগল-রূপের প্রথম আত্মপ্রকাশ হল আমেদাবাদে। এই সম্পর্কে কবি 'জীবনস্মৃতির খসড়া'য় লিখেছেন, ভাঙা ছন্দে লেখা তাঁর প্রথম গানটি হল—

নীরব রজনী দেখ মগ্ন জোছনায়,
ধীরে ধীরে অতি ধীরে গাও গো।
ঘুমঘোরভরা গান বিভাবরী গায়,
রজনীর কণ্ঠ সাথে সুকণ্ঠ মিলাও গো।[১]

এই গানটি পরে 'ভদ্রছন্দে' রূপান্তরিত হয়ে গানের বইয়ে স্থান পেয়েছে; কিন্তু, কবি বলছেন, 'সেই পরিবর্তনের মধ্যে, সেই সবরমতীনদীতীরের, সেই ক্ষিপ্ত বালকের নিদ্রাহারা গ্রীষ্মরজনীর কিছুই ছিল না।' এই গানটি স্বরচিত সুরসংযোগে গীত কবির প্রথম গান বলে বিশেষ মর্যাদা বহন করে চলেছে। ঘুমঘোরভরা বিভাবরীর কণ্ঠের সঙ্গে কবিকণ্ঠের সংগীতকে মিলিয়ে দিয়ে আমেদাবাদের শাহিবাগও কবিজীবনে অক্ষয় হয়ে রইল। কবি লিখেছেন, '"বলি ও আমার গোলাপবালা" গানটি এমনি আর এক রাত্রে লিখিয়া বেহাগসুরে বসাইয়া গুন গুন করিয়া গাহিয়া বেড়াইতেছিলাম।...আমার ছেলেবেলাকার অনেকগুলি গান এইখানেই লেখা।'[২]

২

কিন্তু আমেদাবাদের চারটি মাস শুধু স্বপ্ন আর সংগীত-রচনার মধ্য দিয়েই অতিবাহিত হয়েছে মনে করলে ভুল করা হবে। এই মাসচতুষ্টয়কে রবীন্দ্র-জীবনের প্রথম প্রস্তুতিপর্ব বলা যেতে পারে। কলিকাতার ইস্কুল-পালানো ছেলে যাচ্ছেন বিদেশের শিক্ষাসত্রে বিদ্যার্থি-জীবনের নবপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে। তারই প্রাথমিক প্রস্তুতিপর্ব আমেদাবাদে শুরু হল। রবীন্দ্রনাথ ইংরেজিতে যে নিতান্তই কাঁচা ছিলেন বিলাতযাত্রার পূর্বে সেটা তাঁর একটা বিশেষ দুর্ভাবনার বিষয় হয়ে উঠল। মেজদাকে তিনি বললেন, ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাস তিনি বাংলায় লিখবেন বলে সংকল্প করেছেন, তার জন্যে বই চাই। মেজদা উচ্চাভিলাষী কিশোরের সামনে রাশি রাশি গ্রন্থ উপস্থিত করলেন।

রবীন্দ্রনাথ সে-সব গ্রন্থের দুরূহতার প্রতি ভ্রূক্ষেপমাত্র না করে অভিধানের সাহায্যে তথ্যসংকলনে আত্মনিয়োগ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে লেখার কাজও চলতে লাগল। 'ভারতী'র পৃষ্ঠায় 'ইংরাজদিগের আদব-কায়দা' [জ্যৈষ্ঠ ১২৮৫], 'স্যাক্সন জাতি ও অ্যাঙ্গলো-স্যাক্সন সাহিত্য' [শ্রাবণ], 'নর্মান জাতি ও অ্যাঙ্গলো-নর্ম্যান সাহিত্য' [ফাল্গুন ১২৮৫, জ্যৈষ্ঠ ১২৮৬] প্রভৃতি প্রবন্ধাবলী এই গ্রন্থাধ্যয়নেরই ফল।

এসব রচনার মধ্যে বিদেশযাত্রীর কৌতূহল বা বিদ্যার্থীর জ্ঞানান্বেষণেরই পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু আমেদাবাদের গদ্যরচনার মধ্যে অন্তত এমন তিনটি লেখা আছে যেগুলিতে সেদিনকার রবীন্দ্রনাথের মানসরহস্যের এক অপ্রত্যাশিত ইঙ্গিত পাওয়া যাবে। 'ভারতী' পত্রিকায় ১২৮৫ বঙ্গাব্দের ভাদ্র, আশ্বিন ও কার্তিক মাসে পর পর তিনটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হল: 'বিয়াত্রীচে, দান্তে ও তাঁহার কাব্য', 'পিত্রার্কা ও লরা' এবং 'গেটে ও তাঁহার প্রণয়িনীগণ'। এই প্রবন্ধত্রয়ে কিশোর রবীন্দ্রনাথ দান্তে, পেত্রার্কা ও গেটের প্রেমের কথাই বিশেষ ভাবে আলোচনা করেছেন। পরিণত জীবনে দান্তে ও গেটে সম্পর্কে তাঁর জ্ঞানের পরিধির কথা বলতে গিয়ে কবি প্রসঙ্গান্তরে বলেছেন :

When I was young I tried to approach Dante, unfortunately through an English translation. I failed utterly, and felt it my pious duty to desist. Dante remained a closed book to me. * * * Then I tried Goethe. But that was too ambitious. With the help of the little German I had learnt, I did go through Faust. I believe I found my entrance to the palace, not like one who has keys for all the doors, but as a casual visitor who is tolerated in some general guest-room, comfortable but not intimate.[8]

এখানে অবশ্য দান্তে ও গেটের কাব্যলোকে অনুপ্রবেশের কথাই কবি বলেছেন। ইংরেজি অনুবাদের মধ্য দিয়ে দান্তের কাব্য তাঁর কাছে বন্ধ-করা গ্রন্থের মতই মনে হয়েছে। অথবা জর্মন ভাষার সামান্য জ্ঞান নিয়ে গেটের ফাউস্ট পড়তে বসে তাঁর এই অনুভূতি হয়েছে যে, তিনি এমন একটি প্রাসাদে প্রবেশ করেছেন যার প্রতিটি কক্ষ উন্মুক্ত করে দেখার চাবি তাঁর হাতে নেই।

কিন্তু আমেদাবাদে বসে তিনি দান্তে, পেত্রার্কা ও গেটে সম্পর্কে যে তিনটি প্রবন্ধ লেখেন তাতে য়ুরোপের এই বিশিষ্ট তিনজন কবির প্রেমের প্রতিই তাঁর অপরিসীম কৌতূহল জাগ্রত ছিল। রবীন্দ্রনাথের এই তিনটি প্রবন্ধ 'ভারতী'র পৃষ্ঠাতেই মুখ লুকিয়ে আছে, কোনো গ্রন্থে তারা স্থান পায় নি। অথচ প্রেম সম্পর্কে কিশোর রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গির বিশ্লেষণে এই প্রবন্ধগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। দান্তে ও বেয়াত্রিচে, পেত্রার্কা ও লরা এবং গেটে ও তাঁর বিচিত্র প্রেমের বিশ্লেষণ সেদিন রবীন্দ্রনাথ কী ভাবে করেছিলেন তা জানতে পারলে তাঁর নিজের প্রেমচেতনা সম্পর্কে আমাদের ধারণা স্পষ্টতর হবে। তাই এই তিনটি প্রবন্ধের প্রয়োজনীয় অংশগুলি উদ্ধৃত করা অত্যাবশ্যক বিবেচনা করি। বেয়াত্রিচের প্রতি দান্তের প্রেম-প্রসঙ্গে কবি লিখেছেন :

'ইতালিয়ার এই স্বপ্নময় কবির জীবনগ্রন্থের প্রথম অধ্যায় হইতে শেষ পর্যন্ত বিয়াত্রীচে। বিয়াত্রীচেই তাঁহার সমুদয় কাব্যের নায়িকা, বিয়াত্রীচেই তাঁহার জীবনকাব্যের নায়িকা। * *

'দান্তে তাঁহার নয় বৎসর হইতেই বিয়াত্রীচেকে ভালবাসিতে আরম্ভ করেন কিন্তু তাঁর প্রেম সাধারণ ভালবাসা নামে অভিহিত হইতে পারে না। বিয়াত্রীচের সহিত তাঁহার প্রেমের আদান প্রদান হয় নাই, নেত্রে নেত্রে নীরব প্রেমের উত্তর প্রত্যুত্তর হয় নাই। অতিদূর সাক্ষাৎ—দূর আলাপ ভিন্ন বিয়াত্রীচের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ ও আলাপ হয় নাই। অতিদূরস্থ দেবীর ন্যায় তিনি দূর হইতে সসম্ভ্রমে বিয়াত্রীচেকে দেখিতেন; অতিদূর হইতে তাঁহার গ্রীবানমিত নমস্কারে আপনাকে দেবানুগৃহীত মনে করিতেন। * *

'ভিটানুওভা কাব্যে দান্তের প্রেমের কাহিনী পড়িলে মনে হয় না, দান্তে বাহিরের কোন বিষয়ে লিপ্ত ছিলেন—মনে হয় তাঁহার চক্ষে সমুদয় জগতের সমষ্টি বিয়াত্রীচে, সংসারে আর কিছু নাই কেবল বিয়াত্রীচে, এ সংসারে আর কিছু করিবার নাই—কেবল বিয়াত্রীচের আরাধনা! * *

'পার্গেটরী কাব্যের শেষভাগে বিয়াত্রীচের সহিত কবির সাক্ষাৎ হইল। * * * * বিয়াত্রীচে তখন তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিয়া কহিলেন, অল্পবয়সে দান্তের হৃদয় ধর্মে ভূষিত ছিল, বিয়াত্রীচে তাঁহার যৌবনময় চক্ষের আলোকে তাঁহাকে সর্বদাই সৎপথে লইয়া যাইতেন। কিন্তু তিনি যখন তাঁহার মর্ত্যদেহ

পরিত্যাগ করিয়া অমর দেহ ধারণ করিলেন, যখন ধূলি-আবরণ হইতে মুক্ত হইয়া পুণ্য ও সৌন্দর্যে অধিকতর ভূষিত হইলেন, তখন তাঁহার প্রতি দান্তের সে ভালবাসা কমিয়া গেল। বিয়াত্রীচের তীব্র ভর্ৎসনায় তিনি অতিশয় যন্ত্রণা পাইলেন। পরে অনুতাপ-অশ্রু বর্ষণ করিয়া ও স্বর্গের নদীতে স্নান করিয়া তিনি পাপ বিমুক্ত হইলেন। তখন তিনি তাঁহার প্রিয়তমা সঙ্গিনীর সহিত স্বর্গদর্শনে চলিলেন।'[৫]

'দান্তের যেমন বিয়াত্রীচে, পিত্রার্কার তেমনি লরা। দান্তের ন্যায় তাঁহার লরাও অপ্রাপ্য; অনধিগম্য। দান্তের ন্যায় তিনি দূর হইতে লরাকে দেখিয়াই আপনাকে কৃতার্থ মনে করিতেন। পিত্রার্কারও লরার সহিত তেমন ভাল কথাবার্তা আলাপ-পরিচয় হয় নাই। লরার ভবনে পিত্রার্কা কখনও যাইতে পান নাই, লরার নিকট হইতে তাঁহার প্রেমের বিন্দুমাত্র প্রত্যুপহার পান নাই। * * * লরার যৌবনের অবসান, লরার মৃত্যু, তাঁহার প্রতি লরার ঔদাসীন্য কিছুই তাঁহার মহান প্রেমকে বিচলিত করিতে পারে নাই। বরঞ্চ লরার মৃত্যু তাঁহার প্রেমকে নূতন বল অর্পণ করে, কেননা এ পৃথিবীতে লরার সহিত তাঁহার সম্পর্ক অতি দূর ছিল, লরার প্রেম তাঁহার অপ্রাপ্য ও তাঁহার প্রেম লরার অগ্রাহ্য ছিল, কিন্তু লরা যখন দেহের সহিত সমাজ-বন্ধন পরিত্যাগ করিয়া গেলেন, তখন পিত্রার্কা অসংকোচে লরার আত্মার চরণে তাঁহার প্রেম উপহার দিতেন ও লরা তাহা অসংকোচে গ্রহণ করিতেছেন কল্পনা করিয়া পরিতৃপ্ত হইতেন। পিত্রার্কা কহিতেছেন—যে-রাত্রে লরা এই পৃথিবীর দুঃখ যন্ত্রণা চিরকালের জন্য পরিত্যাগ করিলেন, তাহার পর-রাত্রে তিনি স্বর্গ হইতে এই শিশিরে (শিশিরসিক্ত পৃথিবীতে) নামিয়া আসিলেন, তাঁহার অনুরক্ত প্রেমিকের নিকট আবির্ভূত হইলেন ও হাত বাড়াইয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, * * * 'চিরকাল তুমি আমার প্রেম পাইয়া আসিয়াছ ও চিরকালই তাহা পাইবে। কিন্তু তোমার প্রেম সংযত করিয়া রাখা আমার উচিত মনে করিতাম। * * * হায়! যখন আমরা ভালবাসি অথচ শঙ্কায় ত্রস্ত থাকি তখন এসব চেষ্টা কি নিষ্ফল! কিন্তু আমাদের সম্ভ্রম বজায় রাখিবার ও ধর্মপথ হইতে ভ্রষ্ট না হইবার এই একমাত্র উপায় ছিল। কতবার আমি রাগের ভান করিয়াছি, তখন হয়তো আমার হৃদয়ে প্রেম যুঝিতেছিল। যখন

দেখিতাম তুমি বিষাদের ভারে নত হইয়া পড়িতেছ, তখন হয়তো তোমার প্রতি সান্ত্বনার দৃষ্টি বর্ষণ করিতাম, হয়তো কথা কহিতাম! দুঃখ এবং ভয়েই নিশ্চয় আমার স্বর পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছিল; তুমি হয়তো তাহা দেখিয়াছ। যখন তুমি রোষে অভিভূত হইয়াছ তখন হয়তো আমি আমার একটি দূর-দৃষ্টির দ্বারা তোমাকে শাসন করিতাম। এই সকল কৌশল, এই সকল উপায়ই আমি অবলম্বন করিয়াছিলাম। এইরূপে কখনও অনুগ্রহ, কখনও দৃঢ়তার দ্বারা তোমাকে কখনও সুখী কখনও বা অসুখী করিয়াছি। যদিও তাহাতে শ্রান্ত হইয়াছিলে, কিন্তু এইরূপে তোমাকে সমুদয় বিপদের বাহিরে লইয়া গিয়াছিলাম। এইরূপে আমাদের উভয়কেই পতন হইতে পরিত্রাণ করিয়াছিলাম এবং এই কথা মনে করিয়া আমি অধিকতর সুখ-উপভোগ করি। * * * তোমার ভালবাসায়, বিশেষত তুমি আমার নামকে যে অমরত্ব দিয়াছ তাহাতে যেমন সন্তুষ্ট হইয়াছিলাম এমন আর কিছুতে না। আমার এই একমাত্র ইচ্ছা ছিল তোমার অতিরিক্ততা কিছু শমিত হয়। আমার কাছে তোমার হৃদয়ের গোপন কাহিনী খুলিতে গিয়া তাহা সমস্ত পৃথিবীর নিকট খুলিয়াছ, এই কারণেই তোমার উপরে আমার বাহ্য-ঔদাসীন্য জন্মে। * * তোমার সহিত আমার এই প্রভেদ ছিল—তুমি প্রকাশ করিয়াছিলে, আমি গোপন করিয়াছিলাম—কিন্তু প্রকাশে যন্ত্রণা যে বর্ধিত হয় ও গোপনে তাহা হ্রাস হয় এমন নহে।'*

'গেটে তাঁহার পঞ্চদশ বৎসর বয়স হইতে মৃত্যুকাল পর্যন্ত ভালবাসিয়া আসিয়াছেন, অথচ বিয়াত্রীচে বা লরার ন্যায় তাঁহার একটি প্রণয়িনীরও নাম করিতে পারিলাম না। দান্তে ও পিত্রার্কার প্রেম প্রেমের আদর্শ, আর গেটের প্রেম পার্থিব অর্থাৎ সাধারণ। শুদ্ধ যে গেটের দুর্বল প্রেম নিরাশা ও উপেক্ষা সহিয়াই স্থির থাকিতে পারে না এমন নহে, সে প্রেমের প্রধান স্বভাব এই যে, তাহার আশা পূর্ণ হইলেই সে আর থাকিতে পারে না। গেটের প্রেম এক দ্বারে নিরাশ হইলে অমনি আরেক দ্বারে যাইত, আবার আশা পূর্ণ হইলেও থাকিত না। গেটের পক্ষে আশাপূর্ণতা ও নৈরাশ্য উভয়ই সমান কার্য করিত; এ প্রেমের উপায় কি? গেটের জীবনে এক-একটি প্রেম-আখ্যান শেষ হইলে, অমনি তাহা লইয়া তিনি নাটক রচনা করিতেন, দান্তে বা

পিত্রার্কার ন্যায় কবিতা লিখিতেন না। বাস্তব ঘটনাই নাটকের প্রাণ, আদর্শ জগৎই কবিতার বিলাসভূমি। যাহা হইয়া থাকে, নাটককারেরা তাহা লক্ষ্য করেন, যাহা হওয়া উচিত কবিদের চক্ষে তাহাই প্রতিভাত হয়। গেটে তাঁহার নিজের প্রেম নাটকে গ্রথিত করিতে পারিতেন, সাধারণ লোকেরা তাহাতে তাঁহার নিজ হৃদয়ের আভাস পাইত। কিন্তু বিয়াত্রীচের প্রতি অভিবাদনে দান্তের হৃদয়ে যে ভাবতরঙ্গ উঠিত, তাহা তিনি কবিতাতেই প্রকাশ করিতে পারিতেন, তাহা দান্তে ভিন্ন আর কাহারো মুখে সাজিত না।

'গেটে কহেন, বাল্যকালে তিনি ফুলের পাপড়ি ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া দেখিতেন তাহা কিরূপে সজ্জিত আছে, পাখীর পালক ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া দেখিতেন তাহা ডানার উপর কিরূপে গ্রথিত আছে। বেটিনা তাঁহার প্রণয়িনীদের মধ্যে একজন। তিনি বলেন, রমণীর হৃদয় লইয়াও গেটে সেইরূপ করিয়া দেখিতেন। তিনি তাহাদের প্রেম উদ্রেক করিতেন এবং প্রেম-কাহিনী সর্বাঙ্গসুন্দর করিবার জন্য কল্পনার সাহায্যে নিজেও কিয়ৎপরিমাণে প্রেম অনুভব করিতেন, কিন্তু সে প্রেম তাঁহার ইচ্ছাধীন, প্রয়োজন অতীত হইলেই সে প্রেম দূর করিতে তাঁহার বড় একটা কষ্ট পাইতে হয় নাই। গেটে নিজেই কহেন, যদি বা প্রেম লইয়া তাঁহার হৃদয়ে কখনও আঘাত লাগিত, সে বিষয়ে একটা নাটক লিখিলেই সমস্ত চুকিয়া যাইত। যতখানি পর্যন্ত ভালবাসিলে কোন আশঙ্কার সম্ভাবনা নাই, গেটে ততখানি পর্যন্ত ভালবাসিতেন, তাহার ঊর্ধ্বে আর নহে।''

বলাই বাহুল্য, এই তিনটি প্রবন্ধ রবীন্দ্রনাথের কিশোরচিত্তে প্রেম-চেতনার দিগ্‌দর্শনী হিসাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কবিকিশোরের দৃষ্টিতে 'দান্তে ও পিত্রার্কার প্রেম প্রেমের আদর্শ, আর গেটের প্রেম পার্থিব অর্থাৎ সাধারণ।' বেয়াত্রিচের প্রতি দান্তে এবং লরার প্রতি পেত্রার্কার অনুরক্তিকে রত্নবেদীতে বসিয়ে সে প্রেমের নিষ্কলুষ দিব্যরূপকেই তিনি মনে মনে ধ্যান করেছেন। দান্তে ও পেত্রার্কার প্লেটোনিক প্রেমই তাঁরও কৈশোরলগ্নে 'পরানুরক্তি'র দিব্যরূপ নিয়ে ধরা দিয়েছিল। স্বর্গলোকনিবাসিনী লরা পেত্রার্কাকে যে পরম আশ্বাসবাণী শুনিয়েছেন তার মধ্যেই তাঁরও স্বপ্নকামনা যেন একটি দৈবনির্দেশের সন্ধান পেয়েছিল।

৩

আমেদাবাদে মাস চারেক অতিক্রান্ত হবার পর জুলাইয়ের শেষার্ধে সত্যেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথকে পাঠিয়ে দিলেন বম্বের একটি প্রগতিশীল পরিবারে গৃহবিদ্যার্থীরূপে। পত্নীর আত্মশক্তি উদ্বোধনের জন্যে সত্যেন্দ্রনাথ দু-দুবার যে দুঃসাহসিক পরীক্ষা করেছিলেন আমরা পূর্বে তার উল্লেখ করেছি। আঠারো বছরের ছোটভাইটিকে নিয়েও সত্যেন্দ্রনাথ অনুরূপ একটি দুঃসাহসিক পরীক্ষা করলেন। তৎকালীন বম্বে তৎকালীন কলকাতার চেয়েও ছিল প্রগতিশীল। সত্যেন্দ্রনাথ নিজে যখন সস্ত্রীক বম্বে বন্দরে পদার্পণ করেছিলেন তখন পত্নীকে নিয়ে ওঠেন একটি পারসী পরিবারে। কর্তার নাম মাণকজী করসদজী। স্বামী-স্ত্রী তিন মাসকাল এই পারসী পরিবারের অতিথি হয়ে ছিলেন। অজ্ঞাত শহরে অপরিচিত পরিবেশ ও লোকজনের মধ্যে সেই পরিবারটিতে স্থান পেয়ে সেদিন তাঁরা অত্যন্ত স্বস্তি অনুভব করেছিলেন। জ্ঞানদানন্দিনী দেবী তাঁর আত্মস্মৃতিতে লিখেছেন, পরিবারের কর্তা তাঁর দুই মেয়েকে দেশে লেখাপড়া শিখিয়ে বিলাতে ঘুরিয়ে এনেছিলেন। তাদের নাম আইমাই ও সিরীনবাই। বলাই বাহুল্য, এই পারসী পরিবারটি বম্বের শুধু একটি অভিজাত ও শিক্ষিত পরিবারই ছিল না, ইংরেজ বড়লোকদেরও সে পরিবারে যাতায়াত ছিল।

এই পরিবারে বাসকালেই বম্বের প্রগতিশীল সজ্জনগণের সঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠতা হয়। সেকালের বম্বের খ্যাতনামাদের অন্যতম ছিলেন ডাক্তার আত্মারাম পাণ্ডুরং। কলকাতায় মহর্ষিদেব যেমন ছিলেন আদিব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা, তেমনি বম্বের 'প্রার্থনা-সমাজে'র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ডাক্তার আত্মারাম। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে প্রার্থনা-সমাজই বম্বের ব্রাহ্মসমাজ। স্বভাবতই ডাক্তার আত্মারামের সঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ ঘনিষ্ঠতা হবার এটি একটি বিশেষ হেতু। আত্মারাম জাতিতে মারাঠি। তাঁদের কৌলিক উপাধি তরখড়কর, বা সংক্ষেপে তরখড়। পিতার নাম পাণ্ডুরং। সুতরাং আত্মারামের পূর্ণ নামরূপ হল ডাক্তার আত্মারাম পাণ্ডুরং তরখড়কর। আত্মারামের ভ্রাতা দাদোবা পাণ্ডুরংও ছিলেন বম্বের সংস্কারপন্থী নব্যসমাজের নেতৃস্থানীয় পুরুষ। বম্বের রামমোহন—বালগঙ্গাধর শাস্ত্রীর তিরোধানের পর শিক্ষিতমণ্ডলীর মধ্যে যে নূতন দল গড়ে উঠল

দাদোবা ছিলেন সেই দলের দলপতি। সত্যেন্দ্রনাথ বলেছেন, বাংলায় যেমন কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, বম্বেতে তেমনি দাদোবা পাণ্ডুরং। দুজনেই সংস্কৃতশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন, দুজনেই খ্রীস্টধর্মতত্ত্ব-বিশারদ। তফাত এই যে, কৃষ্ণমোহন স্বয়ং খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু খ্রীস্টধর্মে দীক্ষা গ্রহণে দাদোবার কোনোদিনই প্রবৃত্তি হয় নি। দাদোবা ছিলেন বম্বের নর্মাল স্কুলের অধ্যক্ষ। এই বিদ্যায়তনের তরুণ বিদ্যার্থীদের নিয়ে তিনি ফ্রিমেসনদের মত গোপনে সমাজ ও ধর্মসংস্কারব্রতে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। প্রথমে 'পরমহংস সভা', পরে প্রার্থনা-সমাজের সত্রতলে দেশের প্রগতিশীল তরুণশক্তিকে সংঘবদ্ধ ও উচ্চাদর্শে পরিচালিত করাই ছিল দাদোবার জীবনব্রত।

এই পাণ্ডুরং-পরিবারেই সত্যেন্দ্রনাথ পাঠিয়ে দিলেন রবীন্দ্রনাথকে। বিলাতযাত্রার অব্যবহিত পূর্ববর্তী দুটি মাস তাঁর কাটল এই মারাঠি-পরিবারে। বহিরাগত অতিথি হিসাবে নয়, অন্তঃপুরের আত্মীয় হিসাবে। এই পরিবারের সদ্যবিলাতফেরতা তরুণী অন্নপূর্ণা তরখড়কর, সংক্ষেপে আনা তরখড় হলেন তরুণ রবির গৃহশিক্ষয়িত্রী। রবীন্দ্রনাথকে বিলিতি আদবকায়দা এবং ইংরেজি কথাবার্তা শেখাবার ভার পড়ল তাঁর উপর। 'ছেলেবেলা'য় রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, 'মেজদাদা মনে করলেন, বিদেশকে যারা দেশের রস দিতে পারে সেই রকম মেয়েদের সঙ্গে আমাকে মিলিয়ে দিতে পারলে হয়তো ঘরছাড়া মন আরাম পাবে। ইংরেজি ভাষা শেখবারও সেই হবে সহজ উপায়।'[৮] অজ্ঞাত ও অপরিচিত বিদেশে দেশের রস পরিবেষণের আনন্দময় কৃত্যপালনে এগিয়ে এলেন তরুণী আনা। অনাত্মীয় পরিবারে বিদেশিনী নারীর সান্নিধ্য রবীন্দ্রজীবনে সেই প্রথম এল। এই দুটি মাস যেন রবীন্দ্রজীবনে একটি ক্রোড়পত্র; কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিলগ্নে তরুণ কবির জীবনে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত আকস্মিক অকালবসন্তের মত।

আমরা বলেছি, ছেলেবেলায় 'অবোধবন্ধু'র পৃষ্ঠাতেই কবি প্রথম বিদেশী রোমান্সের স্বাদ পেয়েছিলেন। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য-অনূদিত পৌলবর্জিনী পড়তে পড়তে বালক-কবির মন চলে যেত এক অজানা সাগরের তীরে, কোন্ সমুদ্রসমীরকম্পিত নারিকেলের বনে, ছাগলচরা কোন্ পাহাড়ের উপত্যকায়! কলিকাতা শহরের দক্ষিণের বারান্দায় দুপুরের রৌদ্রে সে কী মধুর মরীচিকাই না বিস্তীর্ণ হত! আর সেই মাথায়-রঙিন-রুমাল-পরা

বর্জিনীর সঙ্গে সেই নির্জন দ্বীপের শ্যামল বনপথে একটি বাঙালী বালকের কী প্রেমই না গড়ে উঠেছিল! কৈশোর-যৌবনের সন্ধিলগ্নে বিদেশী রোমান্সের গ্রন্থ-নায়িকা বর্জিনীই যেন মূর্তিমতী হয়ে এল আনার মধ্যে। কবি-জীবনে অঘটনঘটনপটীয়সী নিয়তির পরম রহস্য দিয়ে গড়া এই ক্ষণিকা মায়ানায়িকা। যাঁরা জীবনে অসামান্যের স্বাক্ষর নিয়ে এসেছেন, 'অলৌকিক আনন্দের ভার' বিধাতা যাঁদের দিয়েছেন, তাঁদের জীবনে এমন সব ঘটনা ঘটে যা সাধারণের কল্পনারও বাইরে। রবীন্দ্রজীবনে আনা-পর্ব এমনি একটি কল্পনাতীত কাহিনী। বিকশিতযৌবনা সুন্দরী বিদেশিনীর গৃহবিদ্যার্থী-রূপে সাড়ে-সতেরো বৎসরের এক অসামান্য কবি-কিশোরের উপস্থাপনা মহাকবির কল্পনাতেই শুধু সম্ভব। বিশ্বকবির জীবন-মহাকাব্যের স্রষ্টাকেও তাই মহাকবি বলতে হবে।

আনা ছিলেন আত্মারামের বড় মেয়ে। জ্ঞানদানন্দিনী দেবী তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন, 'ডাক্তার আত্মারাম পাণ্ডুরং বলে আর এক মারহাট্টি পরিবারের সঙ্গেও আমাদের খুব ভাব হয়েছিল। আনা, দুর্গা ও মাণিক বলে তাঁর তিনটি মেয়ে ছিল।'[৯] আনা ছিলেন অসাধারণ রূপলাবণ্যময়ী অসামান্যা তরুণী। রবীন্দ্রনাথের চেয়ে বয়সে তিনি বৎসর কয়েকের বড় ছিলেন।[১০] বিলাতে পঠদ্দশায় আনা লিট্‌ল্‌ডেল নামক এক আইরিশ [মতান্তরে স্কচ] যুবকের প্রতি অনুরাগিণী হন। ১৮৭৯ সনের ১৮ই নবেম্বর বম্বেতে লিট্‌ল্‌ডেলের সঙ্গে আনার শুভপরিণয় সম্পন্ন হয়। আনার বয়স তখন চব্বিশ বৎসর, লিট্‌ল্‌ডেলের পঁয়ত্রিশ। লিট্‌ল্‌ডেল তখন বরোদা কলেজের উপাধ্যক্ষ। বিয়ের পর ১৮৮০ সনে আনাও বরোদার রানীর গৃহশিক্ষিকারূপে নিয়োজিত হন। বরোদাতে কিছুকাল থাকার পর লিট্‌ল্‌ডেল দম্পতি এডিনবরা চলে যান। আনা দুটি কন্যার জননী হয়েছিলেন।[১১]

আনার জীবনী সম্পর্কে আর বিশেষ কিছুই জানতে পারা যায় না। ১৮৯১ সনের ৫ই জুলাই এডিনবরাতে ৩৬ বৎসর বয়সে আনার মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর পরে কলিকাতা থেকে প্রকাশিত 'বামাবোধিনী' পত্রিকার ১২৯৮ সালের আশ্বিনে [অক্টোবর ১৮৯১], ৪র্থ কল্প, পঞ্চম ভাগ, ৩২১ সংখ্যায় "আনা বাই (বিবী লিটেলডেল্।)" শিরোনামায় যে শোকসংবাদ সংবলিত সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশিত হয় তাতে বলা হয়েছে, "* * * বোম্বাইয়ের সুপ্রসিদ্ধ সমাজ-

সংস্কারক আত্মারাম পাণ্ডুরাংয়ের বিদুষী কন্যা গত ৫ই জুলাই তারিখে এডিনবরা নগরে মানবলীলা সংবরণ করেন—* * * যে সকল ভারতমহিলা পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় সর্বপ্রথমে সুশিক্ষিতা হন, আনাবাই তাঁহাদিগের মধ্যে একজন। তাঁহার পিতা সদালাপী, উন্নতমনা, মার্জিতবুদ্ধি, জ্ঞানী ও পরম ধার্মিক। ইনি বালিকা কন্যাকে অধ্যয়নার্থে ইংলণ্ডে প্রেরণ করেন। ইহাতে ইনি সমাজের বিরাগভাজন হন। কিন্তু কিছুতেই ভয় পান নাই; জাতিভেদের বন্ধন উল্লঙ্ঘন করিয়া কিছুমাত্র দুঃখিত হন নাই। বুদ্ধিমতী আনা অলৌকিকী শক্তির পরিচায়িকা। ষোড়শ বৎসরে তিনি যেরূপ গুণবতী হইয়া উঠিয়াছিলেন, সেরূপ দৃষ্টান্ত বিরল। ডাক্তার আনন্দীবাই যে অসামান্য মনস্বিতার পরিচয় দেন স্ত্রীকবি বঙ্গ-যুবতী কুমারী তরু দত্ত যে কবিত্বের লালিত্যে অখিল সভ্যজগৎকে বিমুগ্ধ করেন, ইহারও সেই শক্তি ছিল, বিকাশের সম্পূর্ণ সুযোগ হয় নাই। কলিকা প্রস্ফুটিত না হইতে হইতে কালের কঠিন করাঘাতে বিদলিত হইল! গীতবাদ্যে তিনি সুনিপুণা ছিলেন। মাতৃভাষা মহারাষ্ট্রীয় ব্যতীত তিনি ইংরাজী, ফরাসী, জর্মণ ও পর্তুগীজ ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। এই সকল ভাষায় কথোপকথন করিতে পারিতেন। তিনি সংস্কৃতও কিছু কিছু জানিতেন। তাঁহার রীতিনীতি চালচলন এত ভাল ছিল, তিনি এরূপ সদালাপিনী ছিলেন যে, একবার যিনি তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করিয়াছেন, তিনিই তাঁহার হৃদয়গ্রাহিতার প্রশংসাবাদ না করিয়া থাকিতে পারিবেন না। ডবলিন নগরে বরদা কলেজের অধ্যাপক লিটেলডেলের সহিত তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। এই সাক্ষাৎই প্রণয়ের মূল। এই প্রণয়ই পরিণামে পরিণয়ে পরিণত হয়। এই বিবাহে ভারতবাসীদিগের ও ইয়ুরোপীয়-দিগের মধ্যে হুলস্থুল পড়িয়া যায়।

"আনাবাই "নলিনী" স্বাক্ষরিত বিবিধ প্রবন্ধ, ছোট ছোট গল্প ও পদ্য দেশীয় ও বিলাতী সম্বাদপত্র ও সাময়িক পত্রাদিতে লিখিতেন। চিকালগোদা নামক স্থানে মনের মত একটি বাটী নির্মাণ করাইয়া তিনি তাহাতে বাস করিতেন।

"ভুবনবিখ্যাত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাটী হইতে প্রত্যাগমনকালে শকট হইতে পতনে উদরে বেদনা লাগে। এই বেদনাই তাঁহার সাংঘাতিক রোগের মুখ্য কারণ; আনাবাইয়েরও তদ্রূপ। একদা সেকন্দারেবাদে একটি শকট

দুর্ঘটনা হওয়াতে ইনি বিশেষ আঘাতপ্রাপ্ত হন, ইহাই তাঁহার মৃত্যুর কারণ। এই বিষম দুর্ঘটনা দুই বৎসর পূর্বে ঘটে, কিন্তু তদবধি ইহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়। পীড়া নিবন্ধন ইনি গত এপ্রিল মাসে ইয়ুরোপ যাত্রা করেন ; এবং সেখানেই পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হন।"

৪

কথা ছিল রবীন্দ্রনাথ আনার শিক্ষকতায় ইংরেজি ভাষা ও ইংরেজি আদবকায়দা শিখবেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের দিগ্‌বিজয়ী ব্যক্তিত্বে দুদিনের মধ্যেই তরুণী আনা পরাভূত ও বিজিত হলেন। আনার মুগ্ধদৃষ্টির সম্মুখে এই কিশোর শুধু অসামান্ত সুন্দর এক বিদেশী তরুণ হিসাবেই দেখা দিলেন না, এক রহস্যময় আশ্চর্য কবিরূপেও আবির্ভূত হলেন। তাই চক্ষের পলকে সম্পর্ক বদল হল। বিদ্যার্থী বসলেন গুরুর আসনে, আর শিক্ষয়িত্রী হলেন নবীন কবির কাব্য-সংগীত-সৌন্দর্য-মুগ্ধ অনুরাগময়ী প্রিয়শিষ্যা। রবীন্দ্রনাথ আনার কাছে কতটা ইংরেজি ভাষা শিক্ষা করেছিলেন জানা যায় নি, কিন্তু তরুণ কবি স্বরচিত কবিতা ও গান শুনিয়ে মাত্র দু মাস সময়ের মধ্যে এই বিদেশিনীকে বাংলা কাব্যের ভক্ত-পাঠিকায় রূপান্তরিত করে তুলেছিলেন। 'ভারতী'তে তখন রবীন্দ্রনাথের 'কবিকাহিনী' ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ আনাকে 'কবিকাহিনী' অনুবাদ করে শোনাতেন। আনা অনুবাদেই সন্তুষ্ট হন নি, তাঁর প্রিয়কবির কাব্যের সবটুকু রস গ্রহণের জন্যে তিনি প্রীতিভরে বাংলা ভাষা শিখতে শুরু করলেন। 'কবিকাহিনী' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হবার পর, নিশ্চয়ই রবীন্দ্রনাথের নির্দেশে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তার এক খণ্ড আনাকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। প্রাপ্তিসংবাদ দিয়ে আনা জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে যে পত্র লেখেন, তা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। শ্রীসজনীকান্ত দাস এই পত্রখানি আবিষ্কার করে রবীন্দ্রানুরাগী পাঠকসমাজের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন।[১২] আনা লিখেছেন—

Bombay
65, Kandevadi
Novr, 26th [1878]

Dear Sir,

I have to apologise to you for having kept your kind letter of the 11th instant, with the copy of "কবিকাহিনী"

unacknowledged so long ; but various causes, in the shape of illness, have combined to hinder me from doing so till the present moment, and even as I write this, I have fever upon me.

Thank you very much indeed for sending me this entire publication of "কবিকাহিনী", though I have the poem myself in the numbers of 'ভারতী', in which it was first published, and which Mr. Tagore was good enough to give me before going away: and have had it read and translated to me, till I know the poem almost by heart.

You are under a misapprehension when you suppose that I have "learnt" Bengali. I *was* only a beginner, for ill-health has come in the way of my studies, and I have had to cease continuing them.

Believe me
Yours Sincerely
Ana Turkhud.

শারীরিক অসুস্থতা সত্বেও যে অনুরাগবশে এই বিদেশিনী তরুণী 'knew the poem almost by heart' সেই অনুরাগের কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে আশি বছর বয়সে কবি তাঁর 'ছেলেবেলা' গ্রন্থে লিখছেন, 'আমার বিদ্যে সামান্যই, আমাকে হেলা করলে দোষ দেওয়া যেতে পারত না। তা করেন নি। পুঁথিগত বিদ্যে ফলাবার মতো পুঁজি ছিল না, তাই সুবিধে পেলেই জানিয়ে দিতুম যে কবিতা লেখবার হাত আমার আছে। আদর আদায় করবার ঐ ছিল আমার সবচেয়ে বড়ো মূলধন। যাঁর কাছে নিজের এই কবি-আনার জানান্ দিয়েছিলেম, তিনি সেটাকে মেপেজুখে নেননি, মেনে নিয়েছিলেন। কবির কাছ থেকে একটা ডাকনাম চাইলেন, দিলেম জুগিয়ে, সেটা ভালো লাগল তাঁর কানে। ইচ্ছে করেছিলেম সেই নামটি আমার কবিতার ছন্দে জড়িয়ে দিতে। বেঁধে দিলুম সেটাকে কাব্যের গাঁথুনিতে, শুনলেন সেটা ভোরবেলাকার ভৈরবী সুরে, বললেন কবি তোমার গান শুনলে আমি বোধ হয় আমার মরণ দিনের থেকেও প্রাণ পেয়ে জেগে উঠতে পারি। এর থেকে বোঝা যাবে, মেয়েরা যাকে আদর জানাতে চায় তার কথা একটু মধু মিশিয়ে বাড়িয়েই বলে, সেটা খুশি ছড়িয়ে দেবার জন্যেই। মনে পড়ছে

তাঁর মুখেই প্রথম শুনেছিলুম আমার চেহারার তারিফ। সেই বাহবায় অনেক সময় গুণপনা থাকত।

'যেমন একবার আমাকে বিশেষ করে বলেছিলেন, একটা কথা আমায় রাখতেই হবে তুমি কোনোদিন দাড়ি রেখো না—তোমার মুখের সীমানা যেন কিছুতেই ঢাকা না পড়ে। তাঁর এই কথা আজ পর্যন্ত রাখা হয় নি সেকথা সকলেরই জানা আছে। আমার মুখে অবাধ্যতা প্রকাশ পাবার পূর্বেই তাঁর মৃত্যু হয়েছিল।'[১৩]

রবীন্দ্রনাথই আনার নাম দিয়েছিলেন 'নলিনী'। বলাই বাহুল্য, নিজের নামের সঙ্গে মিলিয়ে কবিকৃত এই নামকরণের মধ্যে কবি ও তাঁর প্রিয়শিষ্যার সম্পর্ককল্পনাটি অভিব্যঞ্জিত হয়েছে। কবির এই পর্বের কবিতা ও গানে 'নলিনী' একাধিকবার আবির্ভূতা হয়েছেন। যে গান রচনা করে ভোরবেলাকার ভৈরবী সুরে কবি তাঁর নায়িকাকে শোনালেন সেই গানের পূর্ণ কাব্যরূপ আছে 'শৈশব সংগীতে'।[১৪] সেই 'প্রভাতী' কবিতার গানের রূপটি পাওয়া যাবে 'রবিচ্ছায়া'য়।[১৫] রবির সেই নলিনীগীতিবন্দনা নিয়ে উদ্ধৃত হল :

শুন নলিনী, খোলো গো আঁখি—
ঘুম এখনো ভাঙিল না কি ?
দেখ তোমারি দুয়ার 'পরে
সখী, এসেছে তোমারি রবি।
শুনি প্রভাতের গাথা মোর
দেখ ভেঙেছে ঘুমের ঘোর,
জগৎ উঠেছে নয়ন মেলিয়া নূতন জীবন লভি।
তবে তুমি কি সজনী জাগিবে নাকো আমি যে তোমারি কবি।
প্রতিদিন আসি, প্রতিদিন হাসি, প্রতিদিন গান গাহি—
প্রতিদিন প্রাতে শুনিয়া সে গান ধীরে ধীরে উঠ চাহি।
আজিও এসেছি, চেয়ে দেখ দেখি আর তো রজনী নাহি।
আজিও এসেছি, উঠ উঠ সখী, আর তো রজনী নাহি।
সখী, শিশিরে মুখানি মাজি,
সখী, লোহিত বসনে সাজি,

দেখ বিমল সরসী-আরশির 'পরে অপরূপ রূপরাশি।
থেকে থেকে ধীরে হেলিয়া পড়িয়া
নিজ মুখছায়া আধেক হেরিয়া
ললিত অধরে উঠিবে ফুটিয়া শরমের মৃদু হাসি ॥

ললিত অধরে শরমের সেই মৃদু হাসিটি কিন্তু ছিল বড়ই করুণ। নলিনী কবিকণ্ঠের সেই প্রেমসংগীত শুনে বলেছেন, 'কবি তোমার গান শুনলে আমি বোধ হয় আমার মরণ দিনের থেকেও প্রাণ পেয়ে জেগে উঠতে পারি।' অনুরাগপ্রকাশের এই ভাষায় যে কারুণ্যের স্পর্শ লেগেছে তার হেতু নির্দেশ করা সম্ভব নয়। অধ্যাপক Mario Praz তাঁর 'The Romantic Agony' গ্রন্থে রোমান্টিক কবিমানসের যে স্বরূপ নির্ণয় করেছেন তার সঙ্গে এই বিষণ্ণ-বেদনার যতটুকু মিলই থাক্ না কেন, নলিনীর কবিমানসের দ্বন্দ্ব তার দ্বারা পরিস্ফুট হবে না। রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর হৃদয়ানুরাগের কথা আলোচনার সময় সর্বদাই মনে রাখতে হবে যে, তিনি তখন অধ্যাপক লিট্‌ল্‌ডেলের বাগ্‌দত্তা, তাঁর প্রতি স্বেচ্ছায় প্রতিবদ্ধচিত্তা। এই কথা স্মরণ রাখলে স্বভাবতই মনে প্রশ্ন জাগবে, তাহলে এই বিদেশী কবিকিশোরের প্রতি তাঁর দু মাসের আকর্ষণ স্বপ্ন, না মায়া, না মতিভ্রম? অথবা নিজের রোমান্টিক কবিমানসের বিশ্লেষণে পরবর্তী জীবনে রবীন্দ্রনাথ যে কথা বলেছিলেন: 'যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই, যাহা পাই তাহা চাই না'—নলিনীর হৃদয়ে কি তারই অনুরূপ কোনো অনুভূতি ক্ষণকালের জন্যে বিকশিত হয়ে উঠেছিল? কারণ যাই হোক্ না কেন, যে স্বপ্ন মধুর অথচ ক্ষণস্থায়ী, সেই স্বপ্নকে ক্ষণিকের দুর্লভ সুখস্বপ্ন জেনেই যেন নলিনী তাঁর আত্মপ্রকাশে ঈষৎ-প্রগল্‌ভতা দেখিয়েছিলেন। 'তীর্থংকরে' সেই স্বপ্নোপম প্রেম-কাহিনী কবিকণ্ঠেই ধরে রেখেছেন দিলীপকুমার রায়। শান্তিনিকেতনে একদিন [১৯২৬, ৪ঠা এপ্রিল] দিলীপকুমারকে রবীন্দ্রনাথ আনার গল্প বলেছিলেন। কবি বলছেন:

"একদিন সন্ধ্যাবেলা সে আচমকা এসে হাজির আমার ঘরে। চাঁদনি রাত। চারিদিকে সে যে কি অপরূপ আলো হাওয়া!...কিন্তু আমি তখন কেবলই ভাবছি বাড়ির কথা। ভালো লাগছে না কিছুই। মন কেমন করছে বাংলাদেশের জন্যে, আমাদের বাড়ির জন্যে, কলকাতার গঙ্গার জন্যে। হোমসিকনেস যাকে বলে।

"সে বলে বসল : 'আহা, কি এত ভাবো আকাশপাতাল !'

"তার ধরণধারণ জানা সত্বেও আমার একটু যেন কেমন কেমন লাগল। কারণ সে প্রশ্নটা করতে না করতে একেবারে আমার নেয়ারের খাটের উপরেই এসে বসল।

"কিন্তু কি করি—যা হোক হুঁ হাঁ করে কাজ সেরে দিই। সে কথাবার্তায় বোধ হয় জুৎ পাচ্ছিল না, হঠাৎ বলল : 'আচ্ছা আমার হাত ধরে টানো তো—টাগ্-অফ-ওয়ারে দেখি কে জেতে ?'

"আমি সত্যিই ধরতে পারিনি, কেন হঠাৎ তার এত রকম খেলা থাকতে টাগ্-অফ-ওয়ারের কথাই মনে পড়ে গেল। এমন কি আমি এ-শক্তিপরীক্ষায় সম্মত হতে না হতে সে হঠাৎ শ্লথভাবে হারমানা সত্বেও আমার না হল পুলক-রোমাঞ্চ না খুলল রসজ্ঞ দৃষ্টিশক্তি। এতে সে নিশ্চয়ই আমার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বিশেষ রকম সন্দিহান হয়ে পড়েছিল।

"শেষে একদিন বলল তেমনি আচমকা : 'জানো, কোনো মেয়ে ঘুমিয়ে পড়লে যদি তার দস্তানা কেউ চুরি করতে পারে তবে তার অধিকার জন্মায় মেয়েটিকে চুমো খাওয়ার ?'

"বলে খানিক বাদে আমার আরাম কেদারায় নেতিয়ে পড়ল নিদ্রাবেশে। ঘুম ভাঙতেই সে চাইল পাশে তার দস্তানার দিকে। একটিও কেউ চুরি করেনি।"[১৬]

রবীন্দ্রজীবনীকার বলেছেন, আনার দস্তানাচুরির কৌতুককাহিনীই একটি গানের জন্ম দিয়েছে।[১৭] সেই গানটি হল :

আমি স্বপনে রয়েছি ভোর, সখী, আমারে জাগায়ো না।
আমার সাধের পাখি যারে নয়নে নয়নে রাখি
তারি স্বপনে রয়েছি ভোর, আমার স্বপন ভাঙায়ো না।
কাল ফুটিবে রবির হাসি, কাল ছুটিবে তিমির রাশি—
কাল আসিবে আমার পাখি, ধীরে বসিবে আমার পাশ।
ধীরে গাহিবে সুখের গান, ধীরে ডাকিবে আমার নাম।
ধীরে বয়ান তুলিয়া নয়ান খুলিয়া হাসিবে সুখের হাস।
আমার কপোল ভরে শিশির পড়িবে ঝরে—
নয়নেতে জল, অধরেতে হাসি, মরমে রহিব মরে।

তাহারি স্বপনে আজি মুদিয়া রয়েছি আঁখি—
কখন আসিবে প্রাতে আমার সাধের পাখি,
কখন জাগাবে মোরে আমার নামটি ডাকি ॥

রবীন্দ্রকাব্যলোকের এই ক্ষণিকাকে নিয়ে আরো কয়েকটি কবিতা ও গান রয়েছে রবীন্দ্র-সদনে রক্ষিত 'মালতী' পুঁথিতে। 'শৈশব সংগীতে' 'ফুলের ধ্যান', 'অপ্সরা-প্রেম' ও 'প্রভাতী',—নলিনীকে নিয়ে লেখা এই তিনটি কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল। 'মালতী' পুঁথির অপ্রকাশিত কবিতাবলীর মধ্যে 'দামিনীর আঁখি কিবা ধরে জ্বল জ্বল বিভা' শীর্ষপংক্তিক কবিতায় কবি বলছেন :

ও আমার নলিনী লো—লাজমাখা নলিনী—
অনেকের আঁখি 'পরে সৌন্দর্য বিরাজ করে
তোর আঁখি 'পরে প্রেম—নলিনী গো নলিনী।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, আলোচ্য কবিতাটি কবির স্বরচিত নয়, 'মুর'-এর একটি কবিতার অনুবাদ। বৈশিষ্ট্য এই যে, অনূদিত কবিতায় নলিনী নামটি কবি যোজনা করে দিয়েছেন। এ সব কবিতার সাক্ষ্য থেকে বোঝা যায় যে, এই বিদেশিনী তরুণী কবিকিশোরের চিত্তেও নবরোমান্স রচনা করেছিলেন। 'তীর্থংকরে' কবি বলেছেন, "সে মেয়েটিকে আমি ভুলি নি বা তার সে আকর্ষণকে কোনো লঘু লেবেল মেরে খাটো করে দেখি নি কোনদিন। আমার জীবনে তার পরে নানান অভিজ্ঞতার আলোছায়া খেলে গেছে—বিধাতা ঘটিয়েছেন কত যে অঘটন—কিন্তু আমি একটা কথা বলতে পারি গৌরব করে যে, কোনো মেয়ের ভালবাসাকে আমি কখনো ভুলেও অবজ্ঞার চোখে দেখি নি—তা সে ভালবাসা যে-রকমই হোক না কেন। প্রতি মেয়ের স্নেহ বল, প্রীতি বল, প্রেম বল আমার মনে হয়েছে একটা প্রসাদ—Favour : কারণ আমি এটা বারবারই উপলব্ধি করেছি যে প্রতি মেয়ের ভালবাসা, তা সে যে রকমের ভালবাসাই হোক না কেন—আমাদের মনের বনে কিছু না কিছু আফোটা ফুল ফুটিয়ে রেখে যায়—সে ফুল হয়তো পরে ঝরে যায় কিন্তু তার গন্ধ যায় না মিলিয়ে।"[১৮]

'ছেলেবেলা'য় নলিনী-প্রসঙ্গের উপসংহারে কবির হৃদয়ানুভূতি আরো শুচিশুভ্র, আরো সুন্দর। কবি সেখানে বলছেন :

'আমাদের ঐ বটগাছটাতে কোনো কোনো বছরে হঠাৎ বিদেশী পাখি এসে বাসা বাঁধে। তাদের ডানার নাচ চিনে নিতে নিতেই দেখি তারা চলে গেছে। তারা অজানা সুর নিয়ে আসে দূরের বন থেকে। তেমনি জীবনযাত্রার মাঝে মাঝে জগতের অচেনা মহল থেকে আসে আপন-মানুষের দূতী, হৃদয়ের দখলের সীমানা বড়ো করে দিয়ে যায়। না ডাকতেই আসে, শেষকালে একদিন ডেকে আর পাওয়া যায় না। চলে যেতে যেতে বেঁচে থাকার চাদরটার উপরে ফুলকাটা কাজের পাড় বসিয়ে দেয়, বরাবরের মতো দিন রাত্রির দাম দিয়ে যায় বাড়িয়ে।'[১১]

রবীন্দ্রজীবনে এই 'বিদেশী পাখি' দূরের বন থেকে অজানা সুর নিয়ে ক্ষণকালের জন্যেই এসেছিল। কিন্তু জগতের অচেনা মহল থেকে আপন-মানুষের দূতী-রূপিণী এই তরুণী কবির হৃদয়ের দখলের সীমানা বড় করে দিয়ে গিয়েছিলেন। বরাবরের মত দিনরাত্রির দাম দিয়েছিলেন বাড়িয়ে। কবি-কিশোরের এই ঈষৎ-প্রগল্‌ভা নায়িকা তাঁর হাত ধরে কৈশোর-যৌবনের সন্ধিলগ্নের সিংহদ্বার উত্তীর্ণ করে দিলেন। কবিকিশোর যৌবনে পদার্পণ করে সাত-সমুদ্র তেরো নদী পেরিয়ে উনবিংশ-শতকীয় ভারতপুত্রের রূপকথার রাজ্য শ্বেতদ্বীপে উপনীত হলেন।

৫

রবীন্দ্রনাথের উত্তর জীবনে আনা কবিমানসে কিভাবে বিরাজমানা ছিলেন তা জানবার কৌতূহল হওয়া খুবই স্বাভাবিক। কবিজীবনে আনার আবির্ভাবের পূর্বেই নলিনী নামটির আবির্ভাব ঘটেছিল। রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থের নাম 'কবিকাহিনী'। রচনার দিক দিয়ে 'বনফুল' পূর্ববর্তী হলেও গ্রন্থাকারে প্রকাশের দিক দিয়ে 'কবিকাহিনী'ই অগ্রগামী। প্রথমে এই চতুঃসর্গে বিভক্ত কাব্যগ্রন্থটি ধারাবাহিকভাবে 'ভারতী' পত্রিকার প্রথম বর্ষে, ১২৮৪ সালে, পৌষ থেকে চৈত্র—এই চার মাসে প্রকাশিত হয়। বিলাত-যাত্রার সময় 'ভারতী'র সংখ্যাগুলি কবির কাছে ছিল; তিনি সেইগুলিই আনাকে পড়তে দিয়েছিলেন। তারই স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে আনার চিঠিতে।

'কবিকাহিনী' রবীন্দ্রনাথের 'Alastor'. চার সর্গে বিভক্ত নাতিদীর্ঘ এই

কাব্যগ্রন্থ। শেলির 'অ্যালাস্টর'-এর মত একেও বলা চলে 'the Spirit of Solitude.' স্বপ্নের মতো বাল্যকাল অতিবাহিত করে

যৌবনে যখনি কবি করিল প্রবেশ,
প্রকৃতির গীতধ্বনি পাইল শুনিতে,
বুঝিল সে প্রকৃতির নীরব কবিতা।
প্রকৃতি আছিল তার সঙ্গিনীর মত।

এইভাবে সেই তরুণ কবি 'প্রকৃতি-বন্দনা-গান' গেয়ে জীবন কাটাত। যৌবনে পদার্পণ করে তার মনে হল,

মনের মন্দির মাঝে, প্রতিমা নাহিক যেন
শুধু এ আঁধার গৃহ রয়েছে পড়িয়া।

প্রকৃতির কোলে লালিত কবির কেবলি মনে হতে লাগল 'মানুষের মন চায় মানুষের মন।' অবশেষে তার জীবনে একদিন এল বনবালিকা নলিনী। নলিনী করুণাময়ী। সে কবিকে জিজ্ঞাসা করল তার তরুণ হৃদয় বিষাদময় কেন? কি দুঃখে উদাস হয়ে সে কেবল ঘুরে বেড়াচ্ছে? কবি উত্তরে বলল, 'প্রাণের শূন্যতা কেন ঘুচিল না বালা?' করুণাময়ীর চিত্ত দ্রবীভূত হল:

বালার কপোল বাহি, নীরবে অশ্রুর বিন্দু
স্বর্গের শিশির সম পড়িল ঝরিয়া,
সেই এক অশ্রুবিন্দু, অমৃতধারার মত
কবির হৃদয় গিয়া প্রবেশিল যেন।

সেই বনভূমিতে কবি ও নলিনী পরস্পর পরস্পরের সঙ্গী হল। যেন 'দুইজন প্রকৃতির বালক বালিকা।'

যেন তারা সুকোমল ফুলের সুরভি শুধু
যেন তারা অপ্সরার সুখের সংগীত।

কিছুদিন এই ভাবে কেটে যাবার পর আবার কবির মন বিষাদে পূর্ণ হয়ে উঠল। নলিনীর কোনো ত্রুটি নেই। তার হৃদয়ে প্রেমের জ্যোৎস্নাধারা যতটুকু ছিল সব ঢেলে দিয়েও 'কবির সমুদ্র-হৃদি' সে পূরণ করতে পারল না। অবশেষে একদিন অন্তরে অপরিতৃপ্ত ভালবাসা নিয়ে কবি নলিনীর কাছে বিদায় গ্রহণ করে পৃথিবী ভ্রমণে বেরল। নলিনীকে বলে গেল:

এইখানে থাক তুমি, ফিরিয়া আসিয়া পুনঃ—
ওই মধুমুখখানি করিব চুম্বন।

বিদায়লগ্নে নলিনী দেবতার কাছে প্রার্থনা জানাল, কবি যেখানেই যাক্ আর যেখানেই থাকুক, সে আমরণ যেন তারই অর্চনা করতে পারে। কবি কত দেশ দেশান্তর ভ্রমণ করল। কিন্তু তার প্রাণে এক নূতন অতৃপ্তি দেখা দিল :

একাকী যাহাই আগে দেখিত সে কবি,
তাহাই লাগিত তার কেমন সুন্দর,
এখন কবির সেই একি হোলো দশা,
যে প্রকৃতি-শোভা-মাঝে নলিনী না থাকে
ঠেকে তা শূন্যের মত কবির নয়নে,
নাইক দেবতা যেন মন্দির-মাঝারে।

কাজেই পৃথিবীর শূন্য মন্দিরে দেবতাকে দেখতে না পেয়ে কবি ফিরে এল তাদের অরণ্য-কুটীরে। সেখানে এতদিন নলিনী একা মৃত্যুর পদধ্বনি শুনছিল। তার একটিমাত্র বাসনা ছিল, মৃত্যুর আগে যেন সে শেষবারের মতো কবিকে দেখতে পায়। কিন্তু তার সে সাধ অপূর্ণই রয়ে গেল। কবি যখন ফিরে এসে তার নাম ধরে ডাকল তখন সে চিরনিদ্রায় অভিভূত হয়েছে।

হৃদয়ে রাখিয়া তারে, পাগলের মত কবি
কহিল কাতর স্বরে "নলিনী" "নলিনী"!
স্পন্দহীন, রক্তহীন অধর তাহার
অধীর হইয়া ঘন করিল চুম্বন।

নলিনীর বিরহ কবির অসহ্য হয়ে উঠল। তার পরদিন থেকে কেউ আর তাকে সে বনে দেখতে পেল না।

'কবিকাহিনী'র চতুর্থ অর্থাৎ শেষ সর্গ শুরু হয়েছে কবির সুদীর্ঘ স্বগতোক্তি দিয়ে। প্রেম ও জীবন, মৃত্যুর পরে প্রেমের রূপায়ণ, জীবনে প্রেমের স্থান—কবিকিশোরের মানসলোকে বিলসিত এ সব তত্ত্বচিন্তাই কবির স্বগতোক্তির বিষয়ীভূত হয়েছে। কবির মনে প্রশ্ন জেগেছে, জীবনে প্রেম কি শুধু ক্ষণকালের স্বপ্নমাত্র? 'কালের সমুদ্রে শুধু বিম্বটির মত?'

যাহার মোহিনী মূর্তি হৃদয়ে হৃদয়ে
শিরায় শিরায় আঁকা শোণিতের সাথে,
যতকাল রব বেঁচে যার ভালবাসা
চিরকাল এ হৃদয়ে রহিবে অক্ষয়,
সে বালিকা, সে নলিনী, সে স্বর্গপ্রতিমা,
কালের সমুদ্রে শুধু বিম্বটির মত
তরঙ্গের অভিঘাতে জন্মিল মিশিল ?

এই কঠিন প্রশ্নের উত্তর কবি নিজের অন্তরেই খুঁজে পেল। তাই সে বলছে :

দেহকারাগার মুক্ত সে নলিনী এবে
সুখে দুখে চিরকাল সম্পদে বিপদে,
আমারই সাথে সাথে করিছে ভ্রমণ।
চিরহাস্যময় তার প্রেমদৃষ্টি মেলি,
আমারি মুখের পানে চাহিয়া চাহিয়া।
রক্ষক দেবতা সম আমারি উপরে
প্রশান্ত প্রেমের ছায়া রেখেছে বিছায়ে।

অর্থাৎ, কবির কল্পনায় নলিনী শুধু যে মরণের পরপারে গিয়েও কবির চিরসাথী হয়েই রইল এমন নয়, "রক্ষক দেবতা" অর্থাৎ "Guardian Angel"-এরই মতো সে কবিকে প্রেম দিয়ে ঘিরে রইল। কবির বিশ্বাস সেও মৃত্যুর পরে তার সঙ্গে মিলিত হবে :

দেহ-কারাগার মুক্ত হইলে আমিও
তাহার হৃদয় সাথে মিশাব হৃদয়।

হিমাদ্রির স্তব্ধ অন্ধকার গহ্বরে বসে কবি সময়ের পদক্ষেপ গুণতে লাগল। বাইরে কত পরিবর্তন, কিন্তু কবির অন্তরে নলিনীর মূর্তি অপরিবর্তনীয়।

এমন অন্তরে তারে রেখেছি লুকায়ে,
মরমের মর্মস্থলে করিতেছি পূজা,
সময় পারে না সেথা কঠিন আঘাতে
ভাঙিবারে এ জনমে সে মোর প্রতিমা,
হৃদয়ের আদরের লুকানো সে ধন !

ক্রমে কবি যৌবনের সীমা ছাড়িয়ে বার্ধক্যে উপনীত হল। পৃথিবীর মানুষের

দিকে চেয়ে তার মনে হল, "কি দারুণ অশান্তি এ মনুষ্যজগতে।" তাই বিশ্বদেবতার কাছে তার অন্তরের প্রার্থনা :

কবে দেব এ রজনী হবে অবসান ?
স্নান করি প্রভাতের শিশিরসলিলে,
তরুণ রবির করে হাসিবে পৃথিবী !

কবি সেই ভাবী পৃথিবীর স্বপ্ন দেখতে লাগ্‌ল—

যেই দিন এক প্রেমে হইয়া নিবদ্ধ
মিলিবেক কোটি কোটি মানব হৃদয়।

এই ভাবে পৃথিবীর দুঃখে করুণার অশ্রু বিসর্জন করতে করতে, আর ভাবী পৃথিবীর সুন্দর ও সুমঙ্গল শান্তির কথা ভাবতে ভাবতে—

একদিন হিমাদ্রির নিশীথ বায়ুতে
কবির অন্তিম শ্বাস গেল মিশাইয়া !
হিমাদ্রি হইল তার সমাধিমন্দির।

৬

এই হল কবিকিশোরের 'কবিকাহিনী'র কাব্যকথা। নলিনীই তরুণ কবির স্বপ্নলোকবাসিনী প্রথম কবিমানসী। আনা যখন কবির কাছে একটি নাম চাইলেন তখন এই নলিনী নামটিকেই তিনি তাঁকে সমর্পণ করলেন। রবির সঙ্গে নলিনীর সম্পর্কের কবিপ্রসিদ্ধি তো রয়েছেই, কাজেই কানে-কানে ডাকা নামটির মধ্যেই স্ফুরিত হল পূর্বরাগের প্রথম ভাষা। লাজুক কবি যে-কথা মুখ ফুটে বলতে পারলেন না তা বলা হল 'কবিকাহিনী'র মধ্য দিয়ে। স্বপ্ন এল বাস্তবের রূপ নিয়ে। মাত্র দু মাস সময়, কিন্তু ওইটুকু সময়ের মধ্যেই আনা 'কবিকাহিনী'র প্রায়-সবটাই কণ্ঠে নিয়েছিলেন, এর তাৎপর্য অনুধাবন করা কষ্টসাধ্য নয়। রবীন্দ্রনাথ শুধু আনাকেই বাংলা ভাষা শেখান নি, নিজেও যথাসম্ভব আয়ত্ত করেছিলেন মারাঠী ভাষা। তুকারামের কয়েকটি অভঙ্গ তিনি মেজদার সাহায্যে বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন। কিন্তু দুটি মাসের স্বপ্ন স্বপ্নই রয়ে গেল। এক বৎসর পরে অধ্যাপক লিট্‌ল্‌ডেলের সঙ্গে আনার বিয়ে হল। রবীন্দ্রনাথ তখন বিলাতে। এই সংবাদে তিনি কি মর্মাহত হয়েছিলেন ?

রবীন্দ্র-কাব্যলোকে 'নলিনী'র দ্বিতীয় আবির্ভাব 'ভগ্নহৃদয়' নাট্যকাব্যে। 'জীবনস্মৃতি'তে কবি লিখেছেন বিলাতেই ভগ্নহৃদয়ের পত্তন হয়েছিল। কতকটা ফিরবার পথে, আর কতকটা দেশে ফিরে এসে তা সম্পূর্ণ হয়। 'কবিকাহিনী'র নলিনীর সম্পূর্ণ রূপান্তর হয়েছে 'ভগ্নহৃদয়ে'। কাব্যের পাত্রপাত্রীগণের পরিচয় দিতে গিয়ে কবি নলিনী সম্পর্কে লিখেছেন "এক চপল-স্বভাবা কুমারী"। 'ভগ্নহৃদয়' বৃহদায়তন গ্রন্থ। তাতে অনেক চরিত্র। মন-দেওয়া-নেওয়ার অনেক কাহিনী তার মধ্যে জটিল রূপ ধারণ করেছে। এই নাট্যকাহিনীতেও আছে কবি আর নলিনী। দূর থেকে নলিনীকে দেখে কবি বলছে:

পূর্ণিমা-রূপিণী বালা! কোথা যাও কোথা যাও।
একবার এই দিকে মুখানি তুলিয়া চাও।

* * *

আমার এ লঘুপাখা কল্পনার মেঘগুলি
তোমার প্রতিমা, বালা, মাথায় লয়েছে তুলি ;
তোমার চরণ-জ্যোতি পড়িয়া সে মেঘ পরে
শত শত ইন্দ্রধনু রচিয়াছে থরে থরে! সর্গ ৬॥

নবম সর্গে নলিনী তার সখীগণকে বলছে:

কি হল আমার? বুঝি বা সজনি
হৃদয় হারিয়েছি!
প্রভাত-কিরণে সকাল বেলাতে
মন লোয়ে সখি গেছিনু খেলাতে,
মন কুড়াইতে, মন ছড়াইতে,
মনের মাঝারে খেলি বেড়াইতে,
মন-ফুল দলি চলি বেড়াইতে,
সহসা সজনি, চেতনা পাইয়া
সহসা সজনি দেখিনু চাহিয়া,
রাশি রাশি ভাঙা হৃদয়-মাঝারে
হৃদয় হারিয়েছি!

৭

নলিনীর তৃতীয় আবির্ভাব 'নলিনী' গদ্যনাট্যে। ১২৯১ সালের বৈশাখে প্রকাশিত এই 'অকিঞ্চিৎকর' গদ্যনাট্যখানি নলিনীর নামানুসারেই নামাঙ্কিত। নীরদ, নবীন, নীরজা ও নলিনী—এই চতুরঙ্গ হৃদয়সংবাদই নলিনী নাটিকার উপজীব্য। এখানেও নলিনী "মূর্তিমতী চপলতা"। নীরদ নবীনকে বলছে, "এমন মধুর সন্ধে বেলায় কেমন ক'রে যে তুমি ঐ মূর্তিমতী চপলতার সঙ্গে আমোদ করে বেড়াচ্ছিলে আমি তাই বসে ভাবছিলুম।..." উত্তরে নবীন বলছে, "সে আমাকে হৃদয় দিক আর নাই দিক আমার তাতে কি আসে যায়? আমি তার যতটুকু মধুর তা উপভোগ করব না কেন? তার মিষ্টি হাসি মিষ্টি কথা পেতে আপত্তি কি আছে!..."

'নলিনী'র সংশোধিত গীতিনাট্যরূপ হল 'মায়ার খেলা'। 'মায়ার খেলা'র প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপনে কবি বলেছেন, "ইহার আখ্যানভাগ কোন সমাজ-বিশেষে দেশবিশেষে বদ্ধ নহে। সংগীতের কল্পরাজ্যে সমাজনিয়মের প্রাচীর তুলিবার আবশ্যক বিবেচনা করি নাই। কেবল বিনীত ভাবে ভরসা করি এই গ্রন্থে সাধারণ মানবপ্রকৃতিবিরুদ্ধ কিছু নাই। আমার পূর্বপরিচিত একটি অকিঞ্চিৎকর গদ্যনাটিকার সহিত এই গ্রন্থের কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে। পাঠকেরা ইহাকে তাহারি সংশোধন-স্বরূপে গ্রহণ করিলে বাধিত হইব।"

'নলিনী'র চরিত্র-চতুষ্টয় হয়েছে 'মায়ার খেলা'র প্রপঞ্চ-পঞ্চক। শান্তা, প্রমদা, অমর, কুমার ও অশোক। সাতটি দৃশ্যে বিভক্ত এই গীতিনাট্যের বিষয়বস্তু কবি নিজেই গ্রন্থারম্ভে বলে দিয়েছেন। "মায়াকুমারীগণ কুহক শক্তিপ্রভাবে মানবহৃদয়ে নানাবিধ মায়া সৃজন করে। হাসি, কান্না, মিলন, বিরহ, বাসনা, লজ্জা, প্রেমের মোহ এই সমস্ত মায়াকুমারীদের ঘটনা একদিন নববসন্তের রাত্রে তাহারা স্থির করিল, প্রমোদপুরে যুবকযুবতীদের নবীন হৃদয়ে নবীন প্রেম রচনা করিয়া মায়ার খেলা খেলিবে।

"নবযৌবন বিকাশে গ্রন্থের নায়ক অমর সহসা হৃদয়ের মধ্যে এক অপূর্ব আকাঙ্ক্ষা অনুভব করিতেছে। সে উদাসভাবে জগতে আপন মানসীমূর্তির অনুরূপ প্রতিমা খুঁজিতে বাহির হইতেছে। এদিকে শান্তা আপন প্রাণমন অমরকেই সমর্পণ করিয়াছে। কিন্তু চিরদিন নিতান্ত নিকটে থাকাতে শান্তার

প্রতি অমরের প্রেম জন্মিতে অবসর পায় নাই। অমর শান্তার হৃদয়ের ভাব না বুঝিয়া চলিয়া গেল। * * *

"প্রমদার কুমারী-হৃদয়ে প্রেমের উন্মেষ হয় নাই। সে কেবল মনের আনন্দে হাসিয়া খেলিয়া বেড়ায়। সখীরা ভালোবাসার কথা বলিলে সে অবিশ্বাস করিয়া উড়াইয়া দেয়। অশোক ও কুমার তাহার নিকটে আপন প্রেম ব্যক্ত করে, কিন্তু সে তাহাতে ভ্রূক্ষেপ করে না। মায়াকুমারীগণ হাসিয়া বলিল, তোমার এ গর্ব চিরদিন থাকিবে না।

প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে,
কে কোথা ধরা পড়ে কে জানে।"[২০]

সত্যসত্যই প্রমদার গর্ব থাকল না। প্রেমের ফাঁদে ধরা পড়ল অমর আর প্রমদা। কিন্তু মায়াকুমারীদের খেলাঘরে নায়ক-নায়িকারা অসহায় ক্রীড়নক মাত্র। অমর যখন প্রমদার নিকট আপনার প্রেম ব্যক্ত করল প্রমদা কিছু বলার আগেই সখীরা এসে অমরকে প্রচুর ভৎর্সনা করল। সরলহৃদয় অমর প্রকৃত অবস্থা কিছু না বুঝে হতাশ্বাস হয়ে ফিরে গেল। প্রমদার এই আপাত-প্রত্যাখ্যানের ফলে অমরের 'অসুখী অশান্ত আশ্রয়হীন হৃদয়' সহজেই শান্তার প্রতি ফিরল। দীর্ঘ বিরহে এবং আর-সবার প্রেম হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে অমর শান্তার প্রতি নিজের এবং নিজের প্রতি শান্তার 'অচ্ছেদ্য গূঢ় বন্ধন' অনুভব করার অবসর পেল। শান্তার নিকটে এসে সে আত্মসমর্পণ করল। মিলনোৎসবে অমর যখন শান্তার গলায় মালা পরিয়ে দিচ্ছে ঠিক সেই মুহূর্তে সেখানে প্রমদার আবির্ভাব। তার নিতান্ত করুণ দীনভাব দেখে আত্মবিস্মৃত অমরের হাত থেকে বরমাল্য খসে পড়ল। শান্তার মনে হল অমর আর প্রমদার হৃদয় গোপনে প্রেমের বন্ধনে বাঁধা আছে। শান্তা অমর আর প্রমদার মিলন সংঘটনে প্রবৃত্ত হল। কিন্তু প্রমদা মিলনের মালা প্রত্যাখ্যান করে বলল, 'আমার বেলা গেছে, খেলা ফুরিয়েছে। এ মালা তোমরাই পর।' অমর শান্তাকে বলল, 'আমি মায়ার চক্রে পড়ে নিজের সুখ নষ্ট করেছি, এখন আমার এই ভগ্ন সুখ এই ম্লান মালা কাকে দেব, কে আমাকে গ্রহণ করবে।' উত্তরে শান্তা বলল, 'তোমার দুঃখের ভার আমিই বহন করব। তোমার সাধের ভুল প্রেমের মোহ দূর হয়ে জীবনের সুখ-নিশা অবসান হয়েছে—এই ভুলভাঙা দিবালোকে তোমার মুখের দিকে চেয়ে

আমার হৃদয়ের গভীর প্রশান্ত সুখের কথা তোমাকে শোনাব।' এই ভাবেই অমর আর শান্তার মিলন হল।

বলাই বাহুল্য, 'মায়ার খেলা'র অমর ও প্রমদাই 'নলিনী' নাটকের নবীন ও নলিনীর পরিশোধিত রূপ। 'কবিকাহিনী' 'ভগ্নহৃদয়' 'নলিনী' ও 'মায়ার খেলা'র নায়ক-নায়িকার মধ্যে তরুণ কবির হৃদয়-রহস্যের সন্ধান পাওয়া যাবে। 'কবিকাহিনী' সম্পর্কে কবি নিজেই 'জীবনস্মৃতি'তে বলেছেন, 'নিজের অপরিস্ফুটতার ছায়ামূর্তিটাকেই খুব বড়ো' করে সেখানে দেখানো হয়েছে। 'ভগ্নহৃদয়' প্রসঙ্গে 'জীবনস্মৃতি'তে কবি পুনরায় বলেছেন, তাঁর পনেরো-ষোলো থেকে বাইশ-তেইশ বছর পর্যন্ত বয়সের রচনায় 'অপরিণত মনের প্রদোষালোকে' আবেগগুলা 'পরিমাণবহির্ভূত অদ্ভুতমূর্তি' ধারণ করে একটা 'নামহীন পথহীন অন্তহীন অরণ্যের ছায়ায়' ঘুরে বেড়াত।[১] কবির হৃদয়-অরণ্যের এই ছায়ামূর্তিগুলির রূপায়ণে কল্পনার অনুরঞ্জন যতই থাক্ না কেন, কবিজীবনের সঙ্গে তাদের মিলিয়ে নেওয়া মোটেই কষ্টসাধ্য নয়। নিজের প্রতি আনার অনুরাগ এবং এক বৎসর পরে লিট্ল্ডেলের সঙ্গে আনার বিবাহকে কবি কি চোখে দেখেছিলেন তার আভাস রয়েছে 'ভগ্নহৃদয়' ও 'নলিনী'র নলিনী এবং 'মায়ার খেলা'র প্রমদার মধ্যে। সেদিন নলিনী ভগ্নহৃদয় কবির কাছে 'মূর্তিমতী চপলতা' বলে প্রতিভাত হলেও জীবনের অপরাহ্ণ-লগ্নে কবি যখন নিজ জীবনের সেই কিশোর-প্রেমের নায়িকাকে স্মরণ করেছেন তখন গদ্যে-পদ্যে অনুরাগের ভাষাই কবিকণ্ঠে উচ্ছ্বাসভরে উৎসারিত হয়েছে।

৮

আমরা আনাকে বলেছি কবিজীবনের 'ক্ষণিকা মায়ানায়িকা'। 'পূরবী'র "ক্ষণিকা" কবিতাটি আনার উদ্দেশে কবির শ্রেষ্ঠ কাব্যতর্পণ। 'পূরবী'র "কিশোর প্রেম" সম্পর্কে নিঃসংশয় হবার মতো কোন আভ্যন্তরীণ প্রমাণ আমাদের কাছে নেই, কিন্তু কবিমানসে যিনি চিরদিনের ধ্রুবতারা তিনি যে আকাশের নীল যবনিকার অন্তরালে হারিয়ে-যাওয়া 'আনন্দের হারানো কণিকা' নন তা বলাই বাহুল্য। ধ্রুবতারা নয়, 'ভীরু দীপশিখা' তার উপমান।

এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে, কাবতাটি রচিত হয় হারুনা-মারু জাহাজে ১৯২৪ সনের ৬ অক্টোবর তারিখে। আমরা প্রথম অধ্যায়ে 'পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি' থেকে তার পূর্বদিন লেখা কবির দিনপঞ্জীর যে অংশ উদ্ধার করেছি তাতে কবি বলছেন, "মন কাঁদছে, মরবার আগে গা-খোলা ছেলের জগতে আর একবার শেষ ছেলেখেলা খেলে নিতে, দায়িত্বহীন খেলা। আর, কিশোর বয়সে যারা আমাকে কাঁদিয়েছিল, হাসিয়েছিল, আমার কাছ থেকে আমার গান লুঠ করে নিয়ে ছড়িয়ে ফেলেছিল, আমার মনের কৃতজ্ঞতা তাদের দিকে ছুটল। তারা মস্ত বড়ো কিছুই নয়; তারা দেখা দিয়েছে কেউ বা বনের ছায়ায়, কেউ বা নদীর ধারে, কেউ বা ঘরের কোণে, কেউ বা পথের বাঁকে।...তাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললুম, 'আমার জীবনে যারা সত্যিকার ফসল ফলিয়েছে সেই আলোর, সেই উত্তাপের দূত তোমরাই। প্রণাম তোমাদের। তোমাদের অনেকেই এসেছিলে ক্ষণকালের জন্য, আধো-স্বপ্ন আধো-জাগার ভোরবেলায় শুকতারার মতো, প্রভাত না হতেই অস্ত গেল।"

আগের দিন লেখা এই ডায়ারির সঙ্গে পরের দিন লেখা কবিতাটির ভাব-সঙ্গতি বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। কবিতায় কবি বলছেন:

ভেবেছিনু গেছি ভুলে; ভেবেছিনু পদচিহ্নগুলি
পদে পদে মুছে নিল সর্বনাশী অবিশ্বাসী ধূলি।
আজ দেখি সেদিনের সেই ক্ষীণ পদধ্বনি তার
আমার গানের ছন্দ গোপনে করেছে অধিকার;
দেখি তারি অদৃশ্য অঙ্গুলি
স্বপ্নে অশ্রুসরোবরে ক্ষণে ক্ষণে দেয় ঢেউ তুলি।

দিলীপকুমারের 'তীর্থংকরে' কবি-কথিত আনা-কাহিনীতে একটি চাঁদনী রাতের কথা কবি কৌতুকের ভঙ্গিতেই বলেছেন। সেদিন সন্ধ্যাবেলা আনা আচমকা কবির ঘরে হাজির হয়ে একেবারে তাঁর নেয়ারের খাটের উপরে বসে টাগ্-অফ-ওয়ারে কবিকে আহ্বান করেছিলেন। সেই হাতটানাটানিতে কবি সেদিন পরাজিত হয়েছিলেন, কিন্তু তার কথা তিনি কোনদিনই ভুলতে পারেন নি। কবিতায় আছে:

সেদিন ঢেকেছে তারে কী এক ছায়ার সংকোচন,
নিজের অধৈর্য দিয়ে পারে নি তা করিতে মোচন।

তার সেই ত্রস্ত আঁখি, সুনিবিড় তিমিরের তলে
যে-রহস্য নিয়ে চলে গেল, নিত্য তাই পলে পলে
মনে মনে করি যে লুণ্ঠন।
চিরকাল স্বপ্নে মোর খুলি তার সে অবগুণ্ঠন॥

হে আত্মবিস্মৃত, যদি দ্রুত তুমি না যেতে চমকি,
বারেক ফিরায়ে মুখ পথমাঝে দাঁড়াতে থমকি,
তাহলে পড়িত ধরা রোমাঞ্চিত নিঃশব্দ নিশায়
দুজনের জীবনের ছিল যা চরম অভিপ্রায়।
তাহলে পরম লগ্নে, সখী
সে ক্ষণকালের দীপে চিরকাল উঠিত আলোকি॥

হে পান্থ, সে পথে তব ধূলি আজ করি যে সন্ধান;—
বঞ্চিত মুহূর্তখানি পড়ে আছে, সেই তব দান।

* * *

গেল না ছায়ার বাধা; না-বোঝার প্রদোষ-আলোকে
স্বপ্নের চঞ্চল মূর্তি জাগায় আমার দীপ্ত চোখে
সংশয়-মোহের নেশা;—সে মূর্তি ফিরিছে কাছে কাছে
আলোতে আঁধারে মেশা,—তবু সে অনন্ত দূরে আছে
মায়াচ্ছন্ন লোকে।
অচেনার মরীচিকা আকুলিছে ক্ষণিকার শোকে॥

'তীর্থংকরে'র বর্ণনায় কবি আনাকে বলেছেন 'মারাঠি ষোড়শী'। কবির সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের লগ্নে আনার সত্যকার বয়স যাই হোক না কেন, কবির দৃষ্টিতে তিনি চিরদিনের ষোড়শী। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "তার স্তাবক-সংখ্যা নিতান্ত কম ছিল না।"[২২] আনাকে নিয়ে কবির নিজের স্বপ্নকামনা কতদূর পৌঁছেছিল তা অবশ্য সঠিক জানবার উপায় নেই। কিন্তু যা ছিল দুজনের জীবনের চরম অভিপ্রায় তা ব্যর্থ হওয়ায় কবি বলেছেন "বঞ্চিত মুহূর্তখানি পড়ে আছে, সেই তব দান।" আমাদের মনে হয় সেই বঞ্চিত মুহূর্তের কথা স্মরণ করেই কবি 'প্রান্তিকে'র সপ্তম কবিতায় বলেছেন:

অনভিজ্ঞ নবকৈশোরের
কম্পমান হাত হতে খলিত প্রথম বরমালা
কণ্ঠে ওঠে নাই, তাই আজিও অক্লিষ্ট অমলিন
আছে তার অস্ফুট কলিকা। সমস্ত জীবন মোর
তাই দিয়ে পুষ্পমুকুটিত।

কবিমানসে আনা চিরদিন 'অক্লিষ্ট অমলিন' 'অস্ফুট কলিকা'র রূপ নিয়েই বিরাজমানা ছিলেন।

॥ উল্লেখপঞ্জী ॥

১ বিশ্বভারতী পত্রিকা, কার্তিক-পৌষ ১৩৫০, পৃ° ১১৩-১১৪।

২ তদেব, পৃ° ১২১।

৩ তদেব।

৪ রাধাকৃষ্ণন ও ম্যুরহেড সম্পাদিত Contemporary Indian Philosophy, পৃ° ২৯।

৫ ভারতী, ভাদ্র ১২৮৫, পৃ° ২০১-২১২।

৬ তদেব, আশ্বিন ১২৮৫, পৃ° ২৭২-২৭৯।

৭ তদেব, কার্তিক ১২৮৫।

৮ ছেলেবেলা, পৃ° ৮৮-৮৯।

৯ পুরাতনী, পৃ° ৩১।

১০ শ্রীএস. বি. যোশী মনে করেন আনার জন্ম ১৮৫৫ সনে। অর্থাৎ তিনি রবীন্দ্রনাথের চেয়ে ছ বছরের বড়। মারাঠি মাসিক পত্রিকা 'মনোহর'-এর সেপ্টেম্বর ১৯৬১ সংখ্যায় যোশীর প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছে। এ সংবাদ অমিতাভ চৌধুরীর লেখা 'আপন-মানুষের দূতী'—[আনন্দবাজার, ৩রা অগ্রহায়ণ, ১৩৬৮, রবিবারের সংখ্যা]—এই প্রবন্ধ থেকে সংকলিত।

১১ এই অংশের তথ্য অমিতাভ চৌধুরীর উল্লিখিত আনন্দবাজারের প্রবন্ধ থেকে সংগৃহীত।

১২ দ্রষ্টব্য: 'রবীন্দ্রনাথ: জীবন ও সাহিত্য' গ্রন্থ, শ্রীসজনীকান্ত দাস। পৃ° ২৪৫-২৪৬।

১৩ ছেলেবেলা, পৃ° ৮৯-৯০।

১৪ রবীন্দ্র-রচনাবলী, অচলিত সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, পৃ° ৪৯১

১৫ গীতবিতান, পৃ° ৮৬৫।

১৬ তীর্থংকর, দিলীপকুমার রায়, পৃ° ১৪৪-১৪৫।

১৭ রবীন্দ্রজীবনী, প্রথম খণ্ড, পৃ° ৭৫।

১৮ তীর্থংকর, পৃ° ১৪৫।

১৯ ছেলেবেলা, পৃ° ৯০।

২০ দ্রষ্টব্য : রবীন্দ্র-রচনাবলী-১, পৃ° ২২৮।

২১ রবীন্দ্র-রচনাবলী-১৭, পৃ° ৩৭৩।

২২ তীর্থংকর, পৃ° ১৪৪।

ষষ্ঠ অধ্যায়

কচ ও দেবযানী

১

আঠারো শো আটাত্তর খ্রীস্টাব্দের বিশে সেপ্টেম্বর [১২৮৫ ৫ই আশ্বিন] বম্বে থেকে 'পুনা' জাহাজ যোগে রবীন্দ্রনাথ মেজদা সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে বিলাত রওনা হলেন। কবিজীবনে দেশের মাটি ছেড়ে এই প্রথম বিদেশযাত্রা। বম্বে থেকে এডেন বন্দরে পৌঁছতে লাগল ছ দিন। এডেন থেকে সুয়েজে যেতে দিন পাঁচেক। রবীন্দ্রনাথেরা ছিলেন ওভারল্যাণ্ড বা ডাঙাপেরনো যাত্রী। তাই লোহিত সাগরের বন্দর সুয়েজে নেমে রেল-পথে যেতে হল মিশরের মধ্য দিয়ে ভূমধ্যসাগরের বন্দর আলেকজান্দ্রিয়ায়। সেখান থেকে চার পাঁচ দিন পরে 'মঙ্গোলিয়া' স্টীমারে ইতালির বন্দর ব্রিন্দিসি। তারপর আল্পস্ পর্বতমালা পেরিয়ে ফ্রান্স হয়ে ইংলণ্ড। প্রথম বার প্যারিসে রবীন্দ্রনাথ একদিনেরও বেশি থাকতে পারেন নি। লণ্ডনে পৌঁছেও মাত্র ঘণ্টাখানেক ছিলেন। মেজো বৌঠান তাঁর পুত্রকন্যা নিয়ে লণ্ডন থেকে পঞ্চাশ মাইল দূরে সাসেক্সের সমুদ্রতীরে ব্রাইটন শহরে বাস করছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ ছোটভাইকে নিয়ে প্রথমে সেখানে গিয়েই উঠলেন কিছুদিন সেখানে কাটাবার পর রবীন্দ্রনাথকে ব্রাইটনের একটি পাবলিক স্কুলে ভরতি করিয়ে দেওয়া হল। কিন্তু মেজো বৌঠানের স্নেহবৃন্তে থেকে পড়াশোনা বিশেষ এগোচ্ছে না দেখে সত্যেন্দ্রনাথের বন্ধু তারকনাথ পালিত রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে এলেন লণ্ডনে। রিজেন্ট পার্কের সামনে একটি বাসায় তাঁকে একলা ছেড়ে দেওয়া হল। সেখানে কিছুদিন একজন শিক্ষক তাঁকে লাটিন ভাষা শেখাবার চেষ্টা করলেন। তারপর রবীন্দ্রনাথ বার্কার নামক একজন শিক্ষকের গৃহশিষ্য হলেন। বার্কার বাড়িতে ছাত্রদের পরীক্ষার জন্যে প্রস্তুত করে দিতেন। কিন্তু সেই প্রস্তুতি-পর্বও বেশিদিন চলতে পারল না। মেজো বৌঠান তখন ব্রাইটন ছেড়ে ডেভনশায়ারে টর্কিনগরে বাসা বদল করেছেন। রবীন্দ্রনাথের ডাক পড়ল সেখানে। টর্কির পাহাড়ে, সমুদ্রে, ফুলবিছানো প্রান্তরে, পাইন বনের ছায়ায় দুটি লীলাচঞ্চল শিশু সুরেন্দ্রনাথ

আর ইন্দিরাকে নিয়ে কবিকিশোরের দিনগুলি বেশ আনন্দেই কাটছিল। কিন্তু অভিভাবকগণ তাঁকে কাব্য করতে বিলাত পাঠান নি, পাঠিয়েছেন ব্যারিস্টার হতে। সুতরাং কর্তব্যের পেয়াদা তাঁকে সেই কাব্যিক পরিবেশ থেকে ডেকে নিয়ে এল আবার লণ্ডনে। এবারে ডাক্তার স্কট নামক একজন ভদ্র-গৃহস্থের ঘরে জুটল তাঁর আশ্রয়। পালিতমশাই তাঁকে লণ্ডন য়ুনিভার্সিটি কলেজে ভরতি করিয়ে দিলেন। প্রথমবার বিলাতপ্রবাসে তাই কবির দিনগুলি কাটল ব্রাইটন, লণ্ডন ও টর্কিতে। মাঝখানে শীতের কটি দিন কেটেছে কেণ্টের টনব্রিজ ওয়েল্‌স্‌ শহরে। 'ছেলেবেলা'য় কবি বলেছেন, তিনি লণ্ডন য়ুনিভার্সিটিতে পড়তে পেরেছিলেন মাত্র তিন মাস। সত্যেন্দ্রনাথ ছুটি নিয়ে গিয়েছিলেন বিলাতে। তাঁর দেশে ফেরবার সময় হল। মহর্ষিদেব লিখে পাঠালেন, রবীন্দ্রনাথকেও তাঁদের সঙ্গে দেশে ফিরতে হবে। পিতৃদেবের এই আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত নির্দেশ শিরোধার্য করে রবীন্দ্রনাথ ফিরে এলেন ভারতের মাটিতে। ফিরে এলেন আঠারো শো আশি খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের প্রথম বিলাতপ্রবাস মাত্র সতেরো মাস স্থায়ী হয়েছিল। বোম্বাই থেকে রওনা হলেন সতেরো বৎসর পাঁচ মাস বয়সে। আর কলকাতায় যখন ফিরলেন তখন তাঁর বয়স আঠারো বৎসর ন মাস।

বিলাতে ব্যারিস্টারি পড়তে গিয়ে উদ্যোগ-পর্বের প্রাথমিক স্তর উত্তীর্ণ না হবার পূর্বেই এই প্রত্যাবর্তন রবীন্দ্র-জীবনের একটি ব্যর্থ অধ্যায় বলেই আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে। কিন্তু কৈশোর-যৌবনের সন্ধিলগ্নে কবিমানসের বিবর্তন ও উন্মীলনের দিক দিয়ে এই সতেরো মাসের পর্বটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। রবীন্দ্রনাথ একটি বিশেষ দেশের বিশেষ কালের কবি হয়েও পরবর্তী জীবনে বিশ্বমানবের বাণীদূত, অর্থাৎ কবি-সার্বভৌম-রূপে দেখা দিয়েছেন। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার মাটিতে মহাকাল তাঁর ঘর বেঁধে দিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি সর্বদেশ ও সর্বকালের মানবসাধনতীর্থের পথে পথে মাধুকরীবৃত্ত কবি-পরিব্রাজকে রূপান্তরিত হলেন। এই অর্থেই রবীন্দ্রনাথ বিশ্বকবি। বহির্ভারতে বিশ্বকবির প্রথম নীড় রচিত হয়েছে ব্রাইটন-লণ্ডন-টর্কিতে। 'উৎসর্গ' কাব্যগ্রন্থে "প্রবাসী" কবিতায় কবি বলেছেন :

সব ঠাঁই মোর ঘর আছে, আমি সেই ঘর মরি খুঁজিয়া
দেশে দেশে মোর দেশ আছে, আমি সেই দেশ লব যুঝিয়া।

পরবাসী আমি যে দুয়ারে চাই—
তারি মাঝে মোর আছে যেন ঠাঁই,
কোথা দিয়া সেথা প্রবেশিতে পাই সন্ধান লব বুঝিয়া।
ঘরে ঘরে আছে পরমাত্মীয়, তারে আমি ফিরি খুঁজিয়া॥

পৃথিবীর দেশে দেশে নিজের দেশকে খুঁজে পাওয়া, প্রবাসের ঘরে ঘরে পরমাত্মীয়ের সন্ধান করা—কবিচেতনার এই নব-অভ্যুদয়ের প্রত্যুষলগ্ন হল প্রথম বিলাতপ্রবাসের সতেরো মাস। একটি বিশেষ দেশের ভাবভূমি থেকে মহাপৃথিবীর মাটি ও আকাশে নবজন্মলাভের শুভক্ষণ ওই অচিরস্থায়ী পর্বেই দেখা দিয়েছে। সর্বমানবচিত্তের মহাদেশে বিশ্বকবির এই নব-জন্মের সূতিকাগৃহ হল ব্রাইটন-লণ্ডন-টর্কি।

২

শ্বেতদ্বীপ ইংলণ্ডকে আমরা বলেছি ঊনবিংশ শতকীয় ভারতপুত্রের রূপকথার দেশ। সেখানে ছিল নবজন্মোত্তর য়ুরোপের জীবনস্বরূপিণী ঘুমন্ত রাজকন্যা। সাম্রাজ্যবাদী রাক্ষসের রূপোর কাঠির যাদুমন্ত্রে সে ছিল হৃতচেতনা। সাত-সমুদ্র তেরো-নদী পেরিয়ে মানবপ্রেমের সোনার কাঠি ছুঁইয়ে সেই নিশ্চেতনা রাজকন্যার ঘুম ভাঙানোই ছিল ভারতপুত্রের স্বপ্নকৃত্য। রাক্ষসপুরীতে মানবকন্যার সেই উদ্ধারসাধনব্রতে চারিচক্ষুর মিলনে প্রাচ্য-প্রতীচ্যের যে গ্রন্থিবন্ধন হল তারই যৌতুক হিসাবে সে পেল য়ুরোপের ভাবরাজ্যের অর্ধেক রাজত্ব। ভাবরাজ্যে প্রাচ্য-প্রতীচ্যের এই মিলন, এই দেওয়া আর নেওয়ার প্রাথমিক ভূমিকা রচিত হয়েছিল ইংরেজি সাহিত্যের মাধ্যমে। 'জীবনস্মৃতি'তে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'তখনকার দিনে আমাদের সাহিত্যদেবতা ছিলেন শেক্‌সপীয়র, মিলটন ও বায়রন।'[১] কিন্তু এ কথাও সত্যি যে, সেদিন ইংরেজি সাহিত্য থেকে আমরা যে পরিমাণে মাদক পেয়েছি সে পরিমাণে খাদ্য পাই নি। তারও কারণ বিশ্লেষণ করে কবি বলেছেন, 'সেদিনকার ইংরেজ লেখকদের লেখার ভিতরকার যে জিনিসটা আমাদের খুব নাড়া দিয়েছিল সেটা হৃদয়াবেগের প্রবলতা। হৃদয়াবেগকে একটা আতিশয্যে নিয়ে গিয়ে তাকে একটা বিষম অগ্নিকাণ্ডে শেষ করা, ইংরেজি সাহিত্যের

একটা বিশেষ স্বভাব। এ সাহিত্যে ভালোমন্দ সুন্দর-অসুন্দরের বিচারই মুখ্য ছিল না—মানুষ আপনার হৃদয়প্রকৃতিকে তার অন্তঃপুরের সমস্ত বাধা মুক্ত করে দিয়ে তার উদ্দাম শক্তির যেন চরম মূর্তি দেখতে চেয়েছিল।' রবীন্দ্রনাথ সেদিনকার ইংরেজি সাহিত্যকে এই ভাবেই বিশ্লেষণ করে বলেছেন সেই সাহিত্যনিহিত হৃদয়াবেগের উদ্দামতা তাঁর বাল্যকালে চারদিক থেকেই আঘাত করেছে। সেই প্রথম জাগরণের দিন সংযমের দিন নয়, উত্তেজনারই দিন।[২]

কিন্তু ইংরেজি সাহিত্যের এই মাদকতার মধ্যেই প্রতীচ্যের জীবনসাধনার সত্য পরিচয় উদ্‌ঘাটিত হয় নি। ইরেজ-চরিত্রেরও যে পরিচয় তার সাহিত্যে ধরা পড়েছে সেটিও পূর্ণসত্য নয়, অর্ধসত্য। ইংরেজের দৈনন্দিন বাস্তব জীবনে হৃদয়াবেগের আতিশয্য একেবারেই চাপা থাকে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, সম্ভবত সেই কারণেই তার সাহিত্যে তার আধিপত্য এত বেশি। ইংরেজ জীবনের এই সংযম ও শক্তিমত্তার সঙ্গে পরিচিত হতে হলে তাকে তার প্রতিদিনের জীবনসাধনার মধ্যেই জানতে হবে। কাজেই ইংরেজি সাহিত্যের মধ্য দিয়ে প্রাচ্য-প্রতীচ্যের মিলনের যে ভূমিকা রচিত হয়েছিল তাকে পূর্ণতায় পৌঁছে দেবার জন্যেই অত্যাবশ্যক ছিল ইংরেজের জন্মভূমিতে তার প্রতিদিনকার বাস্তব পরিবেশে তাকে সত্য করে জানা। রবীন্দ্রজীবনে সেই জানার প্রথম সুযোগ এল তাঁর আঠারো বৎসর বয়সের বিলাতপ্রবাসের সতেরো মাসে। ইংরেজ-জীবনের এমন অন্তরঙ্গ সান্নিধ্য তিনি আর কখনো পান নি। তাই এই সুযোগকে প্রথম এবং শেষ সুযোগও বলা যেতে পারে। এ সম্পর্কে কবি নিজে বলেছেন, 'সেই প্রথম বয়সে যখন ইংলণ্ডে গিয়েছিলেম, ঠিক মুসাফেরের মতো যাই নি। অর্থাৎ রাস্তা দিয়ে চলতে চলতে বাহির থেকে চোখ বুলিয়ে যাওয়া বরাদ্দ ছিল না। ছিলেম অতিথির মতো, ঘরের মধ্যে প্রবেশ পেয়েছিলুম। সেবা পেয়েছি, স্নেহ পেয়েছি, কোথাও কোথাও ঠকেছি, দুঃখ পেয়েছি। কিন্তু তারপরে আবার যখন সেখানে গিয়েছি, তখন সভায় থেকেছি, ঘরে নয়।'[৩]

৩

রবীন্দ্রনাথের এই প্রথম বিলাতপ্রবাসের কথা তিনি বলেছেন 'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র', 'জীবনস্মৃতি' এবং 'ছেলেবেলা'য়। ইতস্তত দুটি একটি চিঠিপত্র এবং প্রাসঙ্গিক আলোচনাতেও কিছু কিছু সংবাদ পাওয়া যায়। কিন্তু রবীন্দ্রজীবনের এই পর্বটি সবচেয়ে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে 'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র' গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে। 'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র' প্রথমে 'য়ুরোপ-যাত্রী কোন বঙ্গীয় যুবকের পত্র' এই নামে 'ভারতী' পত্রিকায় ১২৮৬ বঙ্গাব্দের বৈশাখ থেকে পৌষ ও ফাল্গুন মাসে এবং ১২৮৭ বঙ্গাব্দের বৈশাখ থেকে শ্রাবণ মাসে প্রকাশিত হয়। এই পত্রাবলী প্রথমে অন্তরঙ্গ ঘরোয়া ভাষায় আত্মীয়-স্বজনগণকেই লেখা হয়েছিল, 'ভারতী'তে প্রকাশের পর অবশ্য কোনো কোনো পত্রে পাঠকসমাজের প্রতিও লক্ষ্য রাখতে হয়েছে। 'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র' গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ ভগ্নীপতি সারদাপ্রসাদ ১২৮৮ বঙ্গাব্দের কার্তিক মাসে—কবির বিলাত থেকে প্রত্যাবর্তনের এক বৎসর আট মাস পরে। ১৩১১ বঙ্গাব্দে রবীন্দ্র-গ্রন্থাবলীর হিতবাদী সংস্করণেও গ্রন্থখানি সমগ্রভাবেই রক্ষিত হয়েছিল; কিন্তু পরবর্তী কালে বয়ঃসন্ধির এই রচনার প্রতি কবির আর তেমন মমতা ছিল না। বহুকাল গ্রন্থাকারে অপ্রচলিত রাখার পর ১৩৪৩ বঙ্গাব্দে গ্রন্থখানিকে কেটে ছেঁটে 'পাশ্চাত্য ভ্রমণের' অঙ্গীভূত করা হয়। কবির নির্মম হস্তের এই পরিমার্জনে গ্রন্থখানি ইতিহাসের পংক্তি থেকে সাহিত্যের পংক্তিতে উপনীত হয়েছে সন্দেহ নেই; কিন্তু তাতে তার আসল মূল্যই নষ্ট হয়েছে। 'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্রে'র যথার্থ মূল্য কবির প্রথম বিলাত-প্রবাসের সতেরো মাসের অধুনা-দুষ্প্রাপ্য ইতিহাসের উপকরণ হিসাবেই। ওতে এক দিকে যেমন কবির অন্তরতম আত্মকথা অকুণ্ঠ ভঙ্গিতে লিপিবদ্ধ রয়েছে অন্য দিকে তেমনি ইঙ্গবঙ্গ সমাজ, স্ত্রী-স্বাধীনতা এবং 'পারিবারিক দাসত্ব' সম্পর্কে তাঁর নূতন নূতন চিন্তা বলিষ্ঠ ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। হতে পারে স্ত্রী-স্বাধীনতা এবং পারিবারিক দাসত্ব সম্পর্কে জ্যেষ্ঠভ্রাতা দ্বিজেন্দ্রনাথের সম্পাদকীয় টিপ্পনীর প্রত্যুত্তরে কনিষ্ঠের ভাষা কোনো কোনো ক্ষেত্রে সংযম ও শালীনতার সীমানা লঙ্ঘন করেছে; কিন্তু আঠারো বৎসর বয়সে অলোকসামান্য প্রতিভার প্রথম আত্মপ্রকাশের মুহূর্তে ওই ভাষাই

স্বাভাবিক ছিল। 'জীবনস্মৃতি'তে কবি অবশ্য সত্যদর্শনের কষ্টিপাথরে যাচাই করে গ্রন্থখানির নিন্দা করেছেন। তাঁর সেদিনকার বক্তব্য হল: 'এই চিঠিগুলির অধিকাংশই বাল্যবয়সের বাহাদুরি। অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া তর্ক করিয়া রচনার আতসবাজি করিবার এই প্রয়াস।'[৪] আঠারো বৎসরের সেই মনকে অন্য প্রসঙ্গে বিশ্লেষণ করে কবি আবার বলেছেন, 'বাল্যও নয় যৌবনও নয়, বয়সটা এমন একটা সন্ধিস্থলে যেখান থেকে সত্যের আলোক স্পষ্ট পাবার সুবিধা নেই। একটু একটু আভাস পাওয়া যায় এবং খানিকটা খানিকটা ছায়া। এই সময়ে সন্ধ্যাবেলাকার ছায়ার মতো কল্পনাটা অত্যন্ত দীর্ঘ এবং অপরিস্ফুট হয়ে থাকে। সত্যকার পৃথিবী একটা আজগুবি পৃথিবী হয়ে ওঠে।'[৫] কিন্তু আঠারো বৎসর সম্পর্কে ত্রিশ বৎসরের এই আত্মবিশ্লেষণও সম্পূর্ণ সত্য নয়। 'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্রে'র যথার্থ মূল্য কবির দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে পঁচাত্তর বৎসর বয়সে। গ্রন্থখানিকে পরিমার্জিত করতে বসে কবির মনে হয়েছে: 'লেখার জঙ্গলগুলো সাফ করবামাত্র দেখা গেল, এর মধ্যে শ্রদ্ধা বস্তুটাই ছিল গোপনে, অশ্রদ্ধাটা উঠেছিল বাহিরে আগাছার মতো নিবিড় হয়ে। আসল জিনিসটাকে তারা আচ্ছন্ন করেছিল, কিন্তু নষ্ট করে নি।'[৬]

প্রকৃতপক্ষে 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্রে'ই প্রথম আত্ম-সমীক্ষণের আলোকে কবিমানস আলোকিত হল। এই গ্রন্থেই প্রথম কবির চোখে ফুটে উঠল সেই বিশ্লেষণী দৃষ্টি যা একই সঙ্গে দূরবীক্ষণ এবং অণুবীক্ষণের কাজ করে। বহির্লোকের মত অন্তর্লোক থেকেও খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে অনুরক্ত অথচ অনাসক্ত দৃষ্টিতে জীবন ও জগৎকে কবি দেখতে পেলেন। দেখতে পেলেন আপন হৃদয়-অরণ্যের দ্রষ্টা ও ভোক্তা দুই পাখিকে। এই দেখার প্রথম আনন্দ 'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্রে' উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে।

তাই আঠারো বৎসর বয়সে তাঁর জীবনের কারিগর যখন বিদেশী মালমসলা দিয়ে তাঁকে নূতন করে গড়ে তুলেছিলেন তখন পূর্ব-পশ্চিমের রাসায়নিক মিশ্রণে যে যৌগিক সত্তার উদ্ভব হল তার বিচিত্র মৌলিক উপাদানগুলি তিনি অভ্রান্ত দৃষ্টিতেই বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন। তেমনি শ্বেতাঙ্গ-সমাজের ভাল মন্দ দুটো দিকই তাঁর চোখে সমান ভাবে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। এক দিকে ব্রাইট ও গ্ল্যাডস্টোনের মধ্যে তিনি দেখেছেন ইংরেজ-চরিত্রের রাষ্ট্রচেতনার ঐশ্বর্যকে আর অধ্যাপক হেনরি মরলির মধ্যে খুঁজে পেয়েছেন

তার সারস্বত সাধনার মহিমাকে ; অন্য দিকে তেমনি পার্লামেন্টের অধিবেশনে অসহিষ্ণু সদস্যবৃন্দের অভদ্র আচরণের মধ্যে কিংবা সামাজিক নাচের সভায় বিলাসিনী নারীর কণ্ঠলগ্ন পুরুষের উচ্ছল উদ্দামতায় দেখতে পেয়েছেন ইংরেজ-চরিত্রের অন্ধকার দিকটিকেও। একদিকে ভদ্রগৃহস্থ-ঘরে সেবাময়ী নারীর কল্যাণী শ্রেয়সী মূর্তিটিকে যেমন চিনতে পেরেছেন, অন্য দিকে তেমনি বিলাসিনীদের স্বরূপ বিশ্লেষণেও তাঁর দৃষ্টি কদাচিৎ বিভ্রান্ত হয়েছে। সেই দৃষ্টিতে বয়ঃসন্ধির বিহ্বলতা হয়তো খানিকটা ছিল, কিন্তু তাকেও ছাপিয়ে উঠেছিল আঠারো বছরের পক্ষে অপ্রত্যাশিত এক বিবিক্ত মনের অভ্রান্ত পরিচয়। বিলাতের শীতে রবীন্দ্রনাথ প্রত্যহ ভোরবেলা বরফ-গলা জলে স্নান করতেন, কিন্তু কোনদিনই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন নি। চিকিৎসাশাস্ত্রের সেই দুর্জ্ঞেয় রহস্য যাঁর আয়ত্তাধীন ছিল তাঁর মনের স্বাস্থ্য বিদেশের বিলাস-ভবনে ভেঙে পড়েছিল এমন আশঙ্কা নিতান্তই অমূলক।

৪

য়ুরোপ-প্রবাসীর প্রথম পত্রে আছে বম্বে থেকে লণ্ডন পর্যন্ত যাত্রার অভিনব অভিজ্ঞতার কথা। সুয়েজ থেকে ট্রেনে করে যাওয়ার সময় মিশরের ধুলোয় তাঁর চুলের অবস্থা বর্ণনা করে কবি বলেছেন, 'চুলে হাত দিতে গিয়ে দেখি, চুলে এমন এক স্তর মাটি জমেছে যে, মাথায় অনায়াসে ধানচাষ করা যায়।' তেমনি প্যারিস শহরে টার্কিশ বাথে স্নান ও অঙ্গমর্দনের অভিজ্ঞতায় বলেছেন, 'টার্কিশ বাথে স্নান করা আর শরীরটাকে ধোপার বাড়ি দেওয়া এক কথা।' দ্বিতীয় পত্রে বিলাত সম্পর্কে কবির প্রাথমিক ধারণার কথা লিপিবদ্ধ করেছেন। লিখেছেন, বিলাত এসে তিনি অনেক বিষয়ে নিরাশ হয়েছেন। তাঁর আশা ছিল দেখবেন, এই ক্ষুদ্র দ্বীপের এক প্রান্ত থেকে আর-এক প্রান্ত টেনিসনের বীণাধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে, যেখানেই থাকেন না কেন, গ্ল্যাডস্টোনের বাগ্মিতা, ম্যাক্‌স্‌মুলারের বেদ-ব্যাখ্যা, টিণ্ড্যালের বিজ্ঞানতত্ত্ব, কার্লাইলের গভীর চিন্তা, বেনের দর্শনশাস্ত্র শুনতে পাবেন। মনে করেছিলেন যেখানে যান না কেন, দেখবেন intellectual আমোদ নিয়েই আবালবৃদ্ধ-বনিতা উন্মত্ত ; কিন্তু আসলে দেখলেন, ইংলণ্ডের মেয়েরা

বেশভূষায় লিপ্ত, পুরুষেরা কাজকর্ম করছে, সংসার যেমন চলে থাকে তেমনি চলছে, কেবল রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে যা কিছু গোলমাল শোনা যায়। মেয়েদের সম্পর্কে তাঁর প্রথম অভিজ্ঞতায় মনে হয়েছে, পুরুষদের মন-ভোলানোই যেন তাদের জীবনের একমাত্র ব্রত। তা ছাড়া ইংরেজদের অনুক্ষণ ব্যস্তভাব এবং জীবিকার জন্যে প্রাণপণ যোঝাযুঝিও তাঁর একেবারেই ভাল লাগে নি। তৃতীয় পত্রে ব্রাইটনে সামাজিক মেলামেশার কথাই বিশেষ ভাবে বলা হয়েছে। তাতে রয়েছে 'ফ্যান্সি-বল,' 'নাচের নিমন্ত্রণ' ইত্যাদির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বর্ণনা। কবি বলেছেন, 'সত্যি কথা বলতে কি, আমার নাচের নেমন্তন্নগুলো বড় ভাল লাগে না।'...'আমি নূতন লোকের সঙ্গে বড় মিলেমিশে নিতে পারি নে, যে নাচে আমি একেবারে সুপণ্ডিত সে নাচও নতুন লোকের সঙ্গে নাচতে পারি নে।' -অবশ্য যাদের সঙ্গে বিশেষ আলাপ আছে তাদের সঙ্গে নাচতে যে তাঁর মন্দ লাগে না, সে কথা বলতেও তিনি কুণ্ঠিত হন নি। চতুর্থ পত্রে হাউস অব কমন্সের এক অধিবেশনে যোগদান করার পর সেখানকার অভিজ্ঞতা সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে। রাজনীতির দলাদলি এবং দলগত অন্ধ আনুগত্য তাঁকে বড়ই আঘাত দিয়েছিল।

পঞ্চম পত্র 'ভারতী'র ভাদ্র ও আশ্বিন মাসে প্রকাশিত হয়। ওতেই ইঙ্গবঙ্গ সমাজ সম্পর্কে তাঁর তীব্র মন্তব্যযুক্ত আলোচনা প্রকাশিত হয়েছিল। 'কি কি মসলার সংযোগে বাঙালী বলে একটা পদার্থ ক্রমে বেঙ্গ্‌লো অ্যাঙ্গ্‌লিক্যান কিংবা ইঙ্গবঙ্গ নামে একটা খিচুড়িতে পরিণত হয়'—তার কথাই কবি সবিস্তারে বলেছিলেন। মধুচক্রে সেই লোষ্ট্র-নিক্ষেপের ফলে সেযুগে প্রচণ্ড গুঞ্জন উত্থিত হয়েছিল। কিন্তু ইঙ্গবঙ্গের আচার-আচরণ সম্পর্কে এই তিক্ত মন্তব্যের পশ্চাতে ছিল কবির স্বজাতি-প্রীতি। বাঙালীরা 'বিলাতের কামরূপে রূপান্তর গ্রহণ করে' যে সব অশোভন ও অন্যায় আচরণ করতেন তাতে শুধু তাঁদেরই যশোহানি হত না, তাঁরা তাঁদের স্বদেশ ও স্বজাতির ওপরও কলঙ্ক আনয়ন করতেন। তাই কবি লিখছেন, 'আমার একান্ত ইচ্ছা, ভবিষ্যতে যে-সকল বাঙালীরা বিলেতে আসবেন তাঁরা যেন আমার এই পত্রটি পাঠ করেন।'

ইঙ্গবঙ্গ-চরিত্রের স্বরূপ-উদ্‌ঘাটনে রবীন্দ্রনাথ যে লিপিকুশলতা এবং পর্যবেক্ষণশক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন তা নিন্দা নয়, উচ্চ প্রশংসাই দাবি করে

আলোচনাটি আরো উপাদেয় হয়ে উঠেছে এই কারণে যে, ইঙ্গবঙ্গীয় মেজাজ তাঁর নিজের মধ্যে সঞ্চারিত হলে তাঁর সম্ভাব্য রূপটি কি হবে, তাই দিয়েই তিনি পত্রখানির সূত্রপাত করেছেন। তিনি লিখছেন, 'এই বেড়াল বনে গেলেই বনবেড়াল হয়। তোমাদের সেই বন্ধু যে 'হংস মধ্যে বকো যথা' হয়ে তোমাদের মধ্যে থাকত, যার বুদ্ধির অভাব দেখে তোমরা অত্যন্ত ভাবিত ছিলে, ইস্কুলের মাস্টাররা যাকে পিটিয়ে পিটিয়ে ঘোড়া করবার আশা একেবারে পরিত্যাগ করেছিলেন, সেই যখন এ বন থেকে ফিরে যাবে তখন তার ফুলোনো লেজ, বাঁকানো ঘাড়, নখালো থাবা দেখে তোমরা আধখানা হয়ে পিছু হটে হটে দেয়ালের এক কোণে গিয়ে আশ্রয় নেবে। এ বিলেত-রাজ্য থেকে ফিরে গেলে পর বিক্রমাদিত্যের সিদ্ধ-বেতালের মতো আমার সঙ্গে সঙ্গে একটি 'Oberon' ফিরবে, সে তোমাদের প্রতি লোকের চোখে এমন একটি মায়ারস নিংড়ে দেবে যে, আমাকে যদি গর্দভ-মুখোষিত 'Bottom'-এর মতোও দেখতে হয়, তবু তোমরা মুগ্ধ হয়ে যাবে।''

এই মন্তব্যটি শুধু লিপিকৌশলেই অপূর্ব নয়, ওর মধ্যে অনাসক্ত আত্ম-সমালোচনার যে দৃষ্টিভঙ্গিটি ফুটে উঠেছে তাই ওর শ্রেষ্ঠ গুণ। বিলাতপ্রবাসে রবীন্দ্রনাথ সর্বদা নিজের সম্বন্ধে যে কতটা সচেতন ছিলেন মন্তব্যটি তারই অন্যতম সার্থক নিদর্শন। ইঙ্গবঙ্গ-চরিত্র সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের এই অপূর্ব রচনাটি পাঠ করে 'ভারতী'-সম্পাদক দ্বিজেন্দ্রনাথ যে বিশেষ আনন্দিত হয়েছিলেন তার প্রমাণ তিনি ইঙ্গবঙ্গ-চরিত্র ব্যাখ্যান করে শিখরিণী ছন্দে একটি কবিতা লিখে রবীন্দ্রনাথকে পাঠিয়েছিলেন। কনিষ্ঠের সুরে সুর মিলিয়ে বড়দা লিখছেন :

> বিলাতে পালাতে ছটফট·করে নব্য-গৌড়ে,
> অরণ্যে যে জন্যে গৃহগ-বিহগ-প্রাণ দৌড়ে।
> স্বদেশে কাঁদে সে, গুরুজন-বশে কিচ্ছু হয় না—
> বিনা হ্যাট্‌টা কোট্‌টা ধুতি-পিরহনে মান রয় না।
> পিতা মাতা ভ্রাতা নব-শিশু অনাথা ছট্ কোরে
> বিরাজে জাহাজে মসি-মলিন কোর্তা বুট্ পোরে।
> সিগারে উদ্‌গারে মুহু মুহু মহা ধূমলহরী,
> সুখ-স্বপ্নে আপ্নে বড় চতুর মানে হরি হরি।

ফিমেলে ফী মেলে অনুনয় করে বাড়ি ফিরিতে—
কি তাহে, উৎসাহে মগন তিনি সাহেবগিরিতে।
বিহারে নীহারে বিবিজন সনে স্কেটিঙ করি,
বিষাদে প্রাসাদে দুখিজন রহে জীবন ধরি।
ফিরে এসে দেশে গল-কলর (collar)-বেশে হটহটে,
গৃহে ঢোকে রোখে, উলগ-তনু দেখে বড় চটে।
মহা-আড়ী শাড়ী নিরখি, চুল দাড়ী সব ছিঁড়ে,
ছুটা-লাথে ভাতে ছরকট করে আসন পিঁড়ে।[৮]

৫

রবীন্দ্রনাথ অসংকোচে বিলাতের 'ফ্যাশনেবল' বা বিলাসিনী মেয়েদের সঙ্গে মিশেছেন, কিন্তু তাঁর মধ্যে ইঙ্গবঙ্গীয় মনোভাব যে সংক্রামিত হয় নি তার কারণ তাঁর মেজদা ও মেজো বৌঠানের সান্নিধ্য ও অভিভাবকত্বে তাঁর বিলাত-প্রবাসের সংকটকাল উত্তীর্ণ হয়েছে। ব্রাইটনে পৌঁছেই তাঁর চোখে পড়েছিল, 'আমাদের গৃহিণী তাঁর দিশি বস্ত্র পরে ছেলেপিলে নিয়ে অন্নপূর্ণার মত বিরাজ করছেন।' এই অন্নপূর্ণার পাশেই শুভংকর শিবও বিরাজমান ছিলেন; যদিও তাঁর কথা রবীন্দ্রনাথ তাঁর পত্রাবলীতে বিশেষ উল্লেখ করেন নি, কিন্তু তিনি ও তাঁর বন্ধু তারকনাথ যে বিলাতের ভদ্রসমাজের অন্তরঙ্গ পরিচয় লাভের উপযুক্ত সুযোগ রবীন্দ্রনাথের জন্যে সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু বিলাতের যেসব বিলাসিনী মেয়েদের 'ফড়িঙের মত ঘাসে ঘাসে লাফালাফি করে জীবনের বসন্তকাল কাটে' তাদের সঙ্গে মেলামেশার অবাধ অধিকার পেয়েও যে তিনি ভেসে যান নি তার আর একটি কারণ তাঁর অন্তর্মুখী আত্মলীনতা। আচার-ব্যবহারে রবীন্দ্রনাথ চিরদিনই সংযত ও অনুচ্ছ্বসিত। নিজের এই বৈশিষ্ট্যের বিশ্লেষণ করে তিনি এক জায়গায় লিখেছেন, 'দুর্ভাগ্যক্রমে আমি কথোপকথনশাস্ত্রে তেমন বিচক্ষণ নই, এখানে যাকে উজ্জ্বল (bright) বলে তা নই, অনর্গল গল্প হাসি আসে না, ও আকারে ইঙ্গিতে কথার আভাসে আমি জানিয়ে দিতে পারি নে যে, আমার চকোরনেত্র তাঁর রূপের জ্যোৎস্না ও আমার কর্ণচাতক তাঁর বাক্যধারা পান করে স্বর্গ-সুখ ভোগ করছে। বরঞ্চ

এক এক সময় তাঁরা আমার গম্ভীর মুখ ও সংক্ষিপ্ত কথাবার্তা শুনে তার উল্টো স্থির করেন।'

তা ছাড়া ভদ্রপরিবারের সুরুচিসম্পন্ন ও সংযমসুন্দর পরিবেশে তিনি ইংরেজ-জীবনের স্নিগ্ধমধুর রূপটি প্রত্যক্ষ করেছিলেন বলেই নৃত্যকক্ষের প্রজাপতিপনায় কোনদিনই বিমূঢ় ও বিভ্রান্ত হন নি। নৃত্য ও সুরার মাদক-বিহ্বলতায় নয়, ইংলণ্ডের সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে নরনারীর অকুণ্ঠ মেলামেশার মধ্যে তিনি জীবনের এক মহত্তর রূপের ইঙ্গিত পেয়েছিলেন। সমাজে ও পরিবারে নারীর এই শৃঙ্খলমুক্ত স্বাধীনসত্তার গুণগান তাঁর কণ্ঠে হয়তো একটু মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। এবং সেখানেই শুরু হয়েছিল 'ভারতী'র পৃষ্ঠায় অগ্রজ ও অনুজের বাদ-প্রতিবাদ। ইংরেজের সামাজিক অনুষ্ঠানে মেয়ে-পুরুষে একত্র মিলে যে আমোদ-প্রমোদ করা হয় রবীন্দ্রনাথ তাকেই স্বাভাবিক বলে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছিলেন, 'মেয়েদের সমাজ থেকে নির্বাসিত করে দিয়ে আমরা কতটা সুখ ও উন্নতি থেকে বঞ্চিত হই তা বিলাতের সমাজে এলে বোঝা যায়।' * * আমাদের আমোদ-প্রমোদের প্রতি কটাক্ষ করে তিনি এ কথাও বলতে কুণ্ঠিত হন নি যে, 'বিলেতের নিমন্ত্রণসভা গুণীদের উৎসাহ দেবার প্রধান স্থান।' সর্বশুদ্ধ জড়িয়ে সেখানকার মেশামেশির ভাব তরুণ কবির দৃষ্টিতে অতি সুন্দর বলেই প্রতিভাত হয়েছিল। বক্রকটাক্ষ করে তিনি বলেছিলেন, 'বাইনাচ দেখে, গান শুনে ও লুচি সন্দেশ হজম বা বদহজম করে যে ফল হয় তার চেয়ে এখানকার সমাজে মিশলে যে মনের কত উন্নতি হয় তা আমি এই ক্ষুদ্র চিঠির মধ্যে বর্ণনা করতে পারি নে।'

বিলাতী সমাজের তৎকালীন স্ত্রী-স্বাধীনতা সম্পর্কে অনুজের এ-সব উক্তির প্রতিবাদে দ্বিজেন্দ্রনাথ প্রবন্ধের পাদটীকায় তাঁর টিপ্পনীও যুক্ত করে দিতে লাগলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল: 'স্ত্রী-স্বাধীনতা বিষয়ে অতি সাবধানে কথাবার্তা কহা উচিত। ইংলণ্ডে গেলেই বঙ্গীয় ইউরোপ-যাত্রীদের চর্মচক্ষে কি যে এক বিস্ময়জনক ছবি পড়ে, তাহাতে করিয়া তাঁহাদের জ্ঞানচক্ষুর উন্মীলন একেবারেই বন্ধ হইয়া যায়।'

বয়সে একুশ বৎসরের বড় জ্যেষ্ঠাগ্রজের সঙ্গে কনিষ্ঠের এই বাদপ্রতিবাদ আপাতদৃষ্টিতে অশোভন বলেই মনে হবে। মনে হবে, কনিষ্ঠের বক্রোক্তি-ভাষণ তাঁর অসংযত দুর্বিনীত এবং স্পর্ধিত মনোভাবেরই পরিচায়ক। এই

বাদপ্রতিবাদ শুরু হয় গ্রন্থের ষষ্ঠ পত্র থেকে। ছিয়াশি বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ সংখ্যার 'ভারতী'তে সেই পত্রখানি প্রকাশিত হয়েছিল। পৌষের পর 'ভারতী'তে লেখা বন্ধ ছিল। মাঘ মাসে রবীন্দ্রনাথ দেশে ফিরে এলেন। ফাল্গুনে তিনি তাঁর কৈফিয়ত দিতে গিয়ে প্রতিপক্ষের যুক্তিকে নূতন করে জোরালো ভাষায় আক্রমণ করলেন। চৈত্রে আবার লেখা বন্ধ রইল। বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে বিতর্কের পালাবদল হল। স্ত্রী-স্বাধীনতার বদলে এল 'পারিবারিক দাসত্বে'র কথা। আমাদের পরিবারে গুরুভক্তি ও অন্ধবশ্যতার উপর তরুণ কবি কটাক্ষ করলেন। গুরুভক্তির দৌরাত্ম্য থেকে মুক্ত করে পারিবারিক সম্পর্ককে তিনি প্রীতির স্বর্গে পরিণত করার দাবি উত্থাপন করলেন। তিনি লিখলেন, 'দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের আবার একটা-আধটা গুরুলোক নয়, পদে পদে গুরুলোক। এইরকম ছেলেবেলা থেকে গুরুভারে অবসন্ন হয়ে একটি মুমূর্ষু জাতি তৈরি হচ্ছে।' তাঁর সনির্বন্ধ অনুনয় হল: 'একটা ঘোড়া বা একপাল গোরুকে যেখানে ইচ্ছে চালিয়ে বেড়াও তাতে হানি নেই, কেন না, তাতে বড় জোর তাদের শরীরের কষ্ট হবে, কিন্তু তাতে তাদের মনোবৃত্তির বিকাশ ও বিচারশক্তি পরিস্ফুটনের কোন ব্যাঘাত হবে না, কিন্তু কোন মানুষকে সে রকম কোর না, বিশেষত তোমার নিজের ভাই, নিজের ছেলেকে।' তাঁর যুক্তির উপসংহারে কবি লিখলেন, 'আমাদের সমাজের আপাদমস্তক দাসত্বের শৃঙ্খলে বদ্ধ। আমরা পারিবারিক দাসত্বকে দাসত্ব নাম দিই নে; কিন্তু নামের গিলটি করে আমরা বড় জোর দাসত্বের লোহার শৃঙ্খলকে সোনার আকার ধরাতে পারি, কিন্তু তার শৃঙ্খলত্ব ঘোচাতে পারি নে; তার যা কুফলতা তা থেকে যাবে।'

পূর্বেই বলা হয়েছে, এ লেখা রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় ফিরে এসেই লিখেছিলেন। অগ্রজ-অনুজের মধ্যে সহজাত সম্পর্কের কেন্দ্র যে সাময়িকভাবে বিচলিত হয়েছিল তারও কিছু কিছু প্রমাণ 'ভারতী'র পৃষ্ঠায় রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ লিখলেন, 'আমাদের পরিবারে পরকে আপনার করে নিতে হয়, কেন না আপনার সকলে পর।' সঙ্গে সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রনাথ মন্তব্যটিকে তারকাচিহ্নিত করে পাদটীকায় লিখলেন, 'বিলাত থেকে ফিরে এলে অধিকাংশেরই এইরূপ দশা ঘটে!' কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁর ব্যক্তিগত উপলব্ধিকে আঁকড়েই ধরে রইলেন। দেখা যাচ্ছে ১২৮৭ বঙ্গাব্দের চৈত্র সংখ্যার 'ভারতী'তে 'পারিবারিক

দাসত্ব' বলে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল।[১] প্রবন্ধলেখকের নাম নেই, কিন্তু তা যে রবীন্দ্রনাথেরই লেখা সে সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশমাত্র নেই। এই প্রবন্ধের শেষে 'ভারতী'-সম্পাদকও তাঁর মতামত বিস্তৃতভাবে প্রকাশ করেছিলেন।

আসলে অগ্রজ ও অনুজের এই বিতর্কের মধ্য দিয়ে প্রাচীনপন্থা ও নবীনপন্থার সংঘাতই পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। এবং রবীন্দ্রনাথের সৌভাগ্য যে, স্পষ্ট মতভেদ সত্ত্বেও 'ভারতী'-সম্পাদক তাঁর সমস্ত বক্তব্যকে 'ভারতী'তে প্রকাশের সুযোগ দিয়েছেন। পারিবারিক ক্ষেত্রে এই স্বাধীনতা পেয়েছিলেন বলেই পারিবারিক দাসত্বের বিরুদ্ধে অমন ভাবে মুক্তকণ্ঠ হওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্র-জীবনের একটি উত্তরহীন প্রশ্নের কথাও মনে পড়ে। পুত্রকে বিলাতে ব্যারিস্টারি পড়তে পাঠিয়ে মহর্ষিদেব কেন অসময়ে অপ্রত্যাশিত ভাবে তাঁকে ফিরে আসতে নির্দেশ দিয়েছিলেন? রবীন্দ্র-জীবনীকার লিখেছেন, ''ভারতী'র পত্রধারা তাঁহার এই আকস্মিক প্রত্যাবর্তন-আদেশের জন্য দায়ী কিনা তাহার সঠিক প্রমাণ দিতে পারিব না, তবে আমাদের সন্দেহ হয় তরুণ কবির প্রগল্‌ভতায় অভিভাবকগণ অসন্তুষ্ট হইয়াই তাঁহাকে ফিরিয়া আসিবার জন্য পত্র দেন।' আমরা মনে করি, মহাকালের সাক্ষ্য এই অনুমানের বিরুদ্ধেই দাঁড়াবে। কারণ, 'ভারতী'তে ১২৮৬ বঙ্গাব্দের বৈশাখ থেকে কার্তিক পর্যন্ত যে পত্রাবলী প্রকাশিত হয়েছিল তার মধ্যে 'প্রগল্‌ভতা'র পরিচয় অল্পই ছিল। অগ্রহায়ণেই প্রথম স্ত্রী-স্বাধীনতা নিয়ে জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠের মধ্যে বিতর্কের সূত্রপাত হল। পূর্বেই বলেছি, মাঘ মাসে রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় ফিরে আসেন। ফিরে আসার পূর্বে নয়, পরেই বিতর্ক জোরালো আকার ধারণ করে। তা ছাড়া রবীন্দ্রনাথের এই দৃষ্টিভঙ্গি যদি অভিভাবকগণের আপত্তিরই কারণ হবে তা হলে তাঁরা দেশে ফিরে আসার পরও এ ভাবে 'ভারতী'তে তাঁর বক্তব্য প্রকাশের সুযোগ দিলেন কেন? উপরন্তু, দেশে ফিরে আসার কুড়ি মাস পরে জ্যেষ্ঠভগ্নীপতি 'ভারতী'র পত্রাবলী, কাটছাঁট না করেই, দ্বিজেন্দ্রনাথের মন্তব্যসহ, গ্রন্থাকারে প্রকাশ করা অসমীচীন মনে করলেন না কেন? আমাদের বিশ্বাস, লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্রনাথের পড়াশোনা তেমন এগোচ্ছিল না বলেই তাঁকে দেশে ফিরিয়ে আনা হয়েছিল। 'ছেলেবেলা'য় রবীন্দ্রনাথ

লিখেছেন, 'এর মধ্যে ভাগ্যের খেলা এই দেখতে পাই যে, গেলুম রীতিমত নিয়মে কিছু বিদ্যা শিখে নিতে ; কিছু কিছু চেষ্টা হোতে লাগল কিন্তু হয়ে উঠল না। * * ইস্কুল মহলের আশে পাশে ঘুরেছি, বাড়িতে মাস্টার পড়িয়েছেন, দিয়েছি ফাঁকি। যেটুকু আদায় করেছি সেটা মানুষের কাছাকাছি থাকার পাওনা। * * আমার বিদেশের শিক্ষা প্রায় সমস্তটাই মানুষের ছোঁওয়া লেগে।'[১০]

৬

রবীন্দ্রনাথের প্রথম বিলাতপ্রবাসের সত্যকার সারস্বত অবদান হল তাঁর বিপুলায়তন পত্রসাহিত্যের সূচনা। রবীন্দ্রনাথ-লিখিত প্রায় চল্লিশ হাজার চিঠিপত্র রবীন্দ্রসদনে সংকলিত হয়েছে। তাঁর 'ছিন্নপত্র' বা 'ছিন্নপত্রাবলী' 'জীবনস্মৃতি'রই পরিপূরক গ্রন্থ। শুধু তাই নয়, তাঁর চিঠিপত্রকেই সুবিন্যস্ত করে সাজিয়ে দিলে তাঁর জীবনী-রচনার প্রাথমিক কৃত্য সম্পূর্ণ হয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভ্রমণের অনেক কাহিনীই পত্রাকারে লিপিবদ্ধ হয়ে আছে। 'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র' তাঁর আদিসৃষ্টি বলেই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই জাতীয় রচনাই তাঁর আত্মপ্রকাশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাহন।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "চিঠির দ্বারা পৃথিবীতে একটা নূতন আনন্দের সৃষ্টি হয়েছে। * * * চিঠিতে মানুষকে দেখবার এবং পাবার জন্য আরো একটা যেন নূতন ইন্দ্রিয়ের সৃষ্টি হয়েছে। আমার মনে হয়, যারা চিরকাল অবিচ্ছেদে চব্বিশ ঘণ্টা কাছাকাছি আছে, যাদের মধ্যে চিঠি-লেখালেখির অবসর ঘটে নি, তারা পরস্পরকে অসম্পূর্ণ করেই জানে।"[১১] শুধু তাই নয়, চিঠি-লেখার ব্যাপারে যে লেখে শুধু তারই কৃতিত্ব নয়, যে লেখায় তারও একটা বড়ো ভূমিকা রয়েছে বলে রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেছেন। তাই তিনি বলেছেন, "আমাদের যা শ্রেষ্ঠ প্রকাশ সে আমরা কাউকে কেবল নিজের ইচ্ছা অনুসারে দিতে পারি নে। * * * নিজের যা সর্বোৎকৃষ্ট, কজনই বা তা নিজে ধরতে বা পৃথিবীতে রেখে যেতে পেরেছে। আমরা দৈবক্রমে প্রকাশিত হই ; ইচ্ছা করলে, চেষ্টা করলে, প্রকাশিত হতে পারি নে। * * * কারো কারো এমন একটি অকৃত্রিম স্বভাব আছে যে, অন্যের ভিতরকার সত্যটিকে সে অত্যন্ত

সহজেই টেনে নিতে পারে। সে তার নিজের গুণে। যদি কোনো লেখকের সবচেয়ে অন্তরের কথা তার চিঠিতে প্রকাশ পাচ্ছে [বলে মনে হয়] তাহলে এই বুঝতে হবে যে, যাকে চিঠি লেখা হচ্ছে তারও একটি চিঠি লেখাবার ক্ষমতা আছে।"[১২]

স্বভাবতই আমাদের জিজ্ঞাসা—'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র' কাকে লেখা? প্রথম প্রকাশের ভূমিকায় বলা হয়েছে, "বন্ধুদের দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া এই পত্রগুলি প্রকাশ করিলাম। প্রকাশ করিতে আপত্তি ছিল—কারণ, কয়েকটি ছাড়া বাকি পত্রগুলি ভারতীর উদ্দেশে লিখিত হয় নাই।"[১৩] পত্রগুলি যে অন্তরঙ্গ ঘরোয়া ভাষায় লেখা তার পরিচয় গ্রন্থের সর্বত্রই ছড়িয়ে আছে। প্রথম পত্রের প্রথম অনুচ্ছেদেই এই অন্তরঙ্গ সুরটি ধরা পড়েছে। রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, "আস্তে আস্তে আমাদের চোখের সামনে ভারতবর্ষের শেষ তটরেখা মিলিয়ে গেল। চারি দিকের লোকের কোলাহল সহিতে না পেরে আমি আমার নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লেম। গোপন করবার বিশেষ প্রয়োজন দেখছি নে, আমার মনটা বড়োই কেমন নির্জীব অবসন্ন ম্রিয়মাণ হয়ে পড়েছিল, কিন্তু দূর হোক্‌গে—ওসব করুণ রসাত্মক কথা লেখবার অবসরও নেই ইচ্ছেও নেই; আর লিখলেও, হয় তোমার চোখের জল থাকবে না, নয় তোমার ধৈর্য থাকবে না।" অর্থাৎ, প্রবাসযাত্রার এই প্রারম্ভ-পত্রখানি এমন একজনকে লেখা যার চোখে প্রবাসজনিত বিচ্ছেদে চোখের জল তরুণ লেখক প্রত্যাশা করছেন। এই পত্রাবলীর তেরোখানি পত্রের অনেকগুলিই যে এই একই পাত্রীকে লেখা তা অনুমান করা কষ্টসাধ্য নয়। দ্বিতীয় পত্রে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "এদের মেয়েতে মেয়েতে যেসব গল্প চলে তা শুনলে তোমার ভারী মজা হবে।"[১৪] তৃতীয় পত্রও একই ব্যক্তিকে লেখা, এবং এই পত্রে 'ফ্যান্সি বল'-এর বর্ণনায় যে পরিহাস-রস উচ্ছলিত হয়ে উঠেছে তাতে সহজেই অনুমান করা যায় যে পত্ররচনার পাত্রীটি পরম পরিহসনীয়া। রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, "এক-একটা বিবির নাচের বিরাম নেই, দু-তিন ঘণ্টা ধরে ক্রমাগত তার পা চলছে। সকলেরই মুখে হাসি, মন অধিকার করবার যত প্রকার গোলাগুলি আছে বিবিরা তা অকাতরে নির্দয়ভাবে বর্ষণ করছেন। কিন্তু ভয় কোরো না, আমাদের মতো পাষাণ হৃদয়ে তার একটু আঁচড়ও পড়ে নি।"[১৫] চতুর্থ পত্রের পাত্র বা পাত্রী অনিশ্চিত। পঞ্চম পত্রের

সম্বোধন বহু-বচনের। 'সকলে অবধান করো।' কিন্তু এখানেও যে রসিকতা সৃষ্টি হয়েছে তার গৌণকর্মের কেন্দ্রবর্তিনী হয়ে আছেন প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় পত্রেরই পাত্রীটি। ইঙ্গবঙ্গদের চেহারা ও চরিত্র বর্ণনায় অপূর্ব রসিকতা সৃষ্টি করে লেখক লিখছেন, "এ বিলেত-রাজ্য থেকে ফিরে গেলে পর বিক্রমাদিত্যের সিদ্ধ-বেতালের মতো আমার সঙ্গে সঙ্গে একটি 'Oberon' ফিরবে, সে তোমাদের প্রতি লোকের চোখে এমন একটি মায়া-রস নিংড়ে দেবে যে, আমাকে যদি গর্দভ-মুখোষিত 'Bottom'-এর মতোও দেখতে হয়, তবু তোমরা মুগ্ধ হয়ে যাবে।"[১৩] বলাই বাহুল্য, এ রসিকতার মুখ্য পাত্রী বৌ-ঠাকরুণ। পত্র প্রথমে বহু-বচনাত্মক সম্বোধন দিয়ে শুরু হলেও শেষে তা একবচনে পরিণত হয়েছে। পত্রের উপসংহারে বড়দার শিখরিণী ছন্দে লেখা 'বিলাতে পালাতে ছটফট করে নব্যগৌড়ে' শীর্ষক কবিতাটি উদ্ধার করে কবি লিখেছেন, "এ কবিতাটি যদি সংস্কৃত ছন্দে না পড়তে পারো, তা হলে এর মস্তক ভক্ষণ করা হবে। অতএব, নিতান্ত অক্ষম হলে বরঞ্চ একজন ভট্টাচার্যের কাছে পড়িয়ে নিয়ো, তা যদি না পারো তবে এ কবিতাটি তুমি না হয় পোড়ো না।"[১৭] ষষ্ঠ পত্র কোনো পুরুষ-আত্মীয়কে লেখা। কবি লিখছেন, "তোমার মতো সুপুরুষ এখানকার মতো রূপমুগ্ধ দেশে এলে এখানকার হৃদয়রাজ্যে এত ভাঙচুর লোকসান করতে পার যে, সে একটা নিদারুণ করুণরসোদ্দীপক ব্যাপার হয়ে ওঠে।"[১৮] সপ্তম, অষ্টম ও নবম পত্রের পাত্রী 'তুমি'। নবম পত্রে স্ত্রী-স্বাধীনতা সম্পর্কে নিজের মতামত ব্যক্ত করে উপসংহারে কবি লিখছেন, "তোমার নিজের মতের সঙ্গে মিলল না বলে তুমি হয়তো বলবে 'বিলেতে গিয়ে লোকটার মাতা ঘুরে গিয়েছে।' এ কথা বললে কোনো যুক্তি না দেখিয়ে আমার সমস্ত কথাগুলো এক তোপে উড়িয়ে দিতে পারো। কিন্তু আমি তোমাদের বিশেষ করে বলছি, বিলেতে এসে কারু যদি মাথা না ঘুরে থাকে তো সে তোমাদের এই বিনীত দাসের।"[১৯] 'তোমাদের এই বিনীত দাসে'র—এই বাক্যাংশটির বাগ্ভঙ্গি বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার মতো। দশম পত্রটি 'ভারতী'র জন্যেই লেখা বলে মনে হয়। একাদশ পত্রের শেষ অনুচ্ছেদে আবার 'তুমি'র উদ্দেশে মৃদু রসিকতা সৃষ্টির চেষ্টা লক্ষণীয়। দ্বাদশ পত্রের ইঙ্গিত রয়েছে গ্রন্থের ১৯৫ পৃষ্ঠায়। কবি লিখছেন, "তুমি হচ্ছ কবি মানুষ, ছড়াটড়া লিখে থাক, তুমি

এখানে এলে বাস্তবিক তোমার লাগত ভালো।" ছড়াটড়া লেখেন ঠাকুর-পরিবারের সেই পাত্র বা পাত্রীটি কে তা অনুমানসাপেক্ষ। কিন্তু গ্রন্থের ত্রয়োদশ অর্থাৎ অন্তিম পত্রটির উপান্ত অনুচ্ছেদে যে সরস পরিহাসটুকু উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে তাতে 'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্রে'র উদ্দিষ্টা 'তুমি'র পরিচয় সম্পর্কে সংশয়াতীত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার সুযোগ রয়েছে। লণ্ডনে ডাক্তার স্কটের পরিবারে Miss J প্রসঙ্গে কবি লিখছেন, প্রথম-প্রথম কুমারী 'জে' তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা কয়েছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর মুখ দেখার মতো সাহস তাঁর হয় নি। হয়তো তাঁর ভয় হয়েছিল যে, কী অপূর্ব ছাঁচে ঢালা মুখই না জানি তিনি দেখবেন। সেই প্রসঙ্গেই কবি লিখেছেন, "তার পরে যখন আমার মুখ দেখলেন তখন? তখন কী? আমার তো বিশ্বাস, তখন তাঁর মাথা ঘুরে গিয়েছিল। তোমরা হয়তো বিশ্বাস করবে না যে এই মুখ দেখে কোনো চক্ষুষ্মান ব্যক্তির মাথা ঘুরতে পারে। কিন্তু সেটা তোমাদের ঘোরতর কুসংস্কার। ওই তো সুমুখের আয়নায় আমার মুখটা দেখতে পাচ্ছি। কেন, কী মন্দ? এ মুখ দেখে তোমাদের কারো মাথা ঘোরে নি সত্যি, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি—তোমাদের মাথা আছে?"[২০] এ রসিকতা পারিবারিক অন্তরঙ্গজনদের মধ্যে সমবয়স্কা বৌঠাকরুণদেরই করা যায়। এই প্রসঙ্গে 'জীবনস্মৃতি'র "বিলাত" অংশে কবির একটি উক্তি তুলনীয়। সেখানে তিনি বলছেন, "বাড়িতে আমার দর্পহরণ করিবার জন্য যাঁহার প্রবল অধ্যবসায় ছিল—তিনি বিশেষ করিয়া আমাকে এই কথাটি বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যে, আমার ললাট এবং মুখশ্রী পৃথিবীর অন্য অনেকের সহিত তুলনায় কোনোমতে মধ্যমশ্রেণীর বলিয়া গণ্য হইতে পারে।"[২১] 'জীবনস্মৃতি'র "সাহিত্যের সঙ্গী" অধ্যায়ের শেষ অনুচ্ছেদে তাঁর কাব্যসাধনা এবং গানের কণ্ঠ সম্পর্কে নতুন বৌঠানের মতামত ব্যক্ত করেও কবি লিখেছেন, "আমার অহংকারকে প্রশ্রয় দিলে তাহাকে দমন করা দুরূহ হইবে, একথা তিনি নিশ্চয় বুঝিতেন—তাই কেবল কবিতা সম্বন্ধে নহে আমার গানের কণ্ঠ সম্বন্ধেও তিনি আমাকে কোনোমতে প্রশংসা করিতে চাহিতেন না, আর দুই-একজনের সঙ্গে তুলনা করিয়া বলিতেন, তাহাদের গলা কেমন মিষ্ট।"[২২] দেবরের রূপগুণ সম্পর্কে এই ব্যাজস্তুতিকারিণী নতুন বৌঠানই 'য়ুরোপ-প্রবাসী'র অন্তিম পত্রের পরিহাসের পাত্রী। চতুর্থ, ষষ্ঠ, দশম ও দ্বাদশ পত্র ছাড়া বাকি পত্রগুলি

তাঁকেই লেখা। পত্র-রচনা সম্পর্কে 'ছিন্নপত্র' থেকে উদ্ধৃত কবির মন্তব্যগুলি পুনরায় স্মরণীয়। চিঠির দ্বারা পৃথিবীতে যে একটা নূতন আনন্দের সৃষ্টি হয়েছে তার সন্ধান রবীন্দ্রনাথ এই প্রথম পেলেন। 'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্রে' তাঁর 'ভিতরকার সত্যটি' যে অত্যন্ত সহজে প্রকাশিত হতে পেরেছে তা সম্ভব হয়েছে নতুন বৌঠানেরই আকর্ষণের গুণে।

৭

বিলাতপ্রবাসে তরুণ কবি মানুষের ছোঁওয়া পেয়েছেন নানা ভাবে নানা দিক থেকে। সেই ছোঁওয়া যে সর্বদাই প্রীতিপ্রদ ছিল তা নয়। 'জীবন-স্মৃতি'তে ভারতবর্ষের একজন উচ্চ ইংরেজ কর্মচারীর বিধবা স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ হওয়ার ফলে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যে একটি প্রহসন 'রুবি'র প্রবাস-বাসের সঙ্গে জড়িত হয়েছিল তার কথা তিনি বিস্তারিত করেই বলেছেন।

কিন্তু বিলেতে মানুষের কাছাকাছি থাকার সবচেয়ে বড় পাওনা কবি পেয়েছিলেন লণ্ডনে ডাক্তার স্কটের পরিবারে। পত্রাবলীর শেষ পত্রে সেই কাহিনী লিপিবদ্ধ করেই তিনি তাঁর প্রবাস-কথার পূর্ণাহুতি দিয়েছেন। 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থেও ডাক্তার স্কটের পরিবারে তাঁর অন্তরঙ্গ সান্নিধ্যের কথা যথেষ্ট গুরুত্ব পেয়েছে। প্রথম বিলাতপ্রবাসের শেষ কয়েক মাস তাঁর অতিবাহিত হয়েছে লণ্ডন-নিবাসী এই ভদ্র গৃহস্থের ঘরে একেবারে ঘরের লোকের মত। 'জীবনস্মৃতি'র পাঠক সে ইতিহাসের অনেকখানিই পেয়েছেন। 'ভারতী'র পৃষ্ঠা থেকে সে ইতিহাসের পরিপূরক কাহিনী পুনরুদ্ধার করা যেতে পারে।

এই পরিবারের বাসিন্দা ছিলেন ডাক্তার স্কট, তাঁর স্ত্রী, তাঁদের চার মেয়ে, দুই ছেলে, তিন দাসী ও টোবি বলে একটি কুকুর। রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে সবশুদ্ধ জনসংখ্যা দাঁড়াল তেরো। এই পরিবারে রবীন্দ্রনাথের প্রাথমিক অভ্যর্থনাটি বড়ই অদ্ভুত হয়েছিল। 'ডাক্তার স্কটের মেজ মেয়ে পরে বলেছিলেন, প্রথম যখন তাঁরা শুনলেন যে, একজন ভারতবর্ষীয় ভদ্রলোক তাঁদের মধ্যে বাস করতে আসছে, তাঁদের ভারি ভয় হয়েছিল।—'ব্যক্তিটা কি রকম হবে না জানি। তার সাক্ষাতে আবার কি রকম আদব কায়দা

রেখে চলতে হবে ? আমাদের কথা সে ভাল করে বুঝতে পারবে কি না, ও তার কথা আমরা ভাল করে বুঝতে পারব কি না'—এই রকম নানাবিধ ভাবনায় তাঁদের তো রাতে ঘুম হয় না। যেদিন আমার আসবার কথা সেই দিন মেজ ও ছোট মেয়ে তাঁদের এক আত্মীয়ের বাড়িতে পালিয়ে গিয়েছিলেন। প্রায় এক হপ্তা বাড়িতে আসেন নি। তারপর হয়তো তাঁরা শুনলেন যে, একটা পোষমানা জীব তাঁদের বাড়িতে এসেছে, সে ব্যক্তির চেহারা দেখে বোধ হয় না তার কখনো মানুষের মগজের লাড়ু, মানুষের ঠ্যাংয়ের শিককাবাব্‌ বা খোকাখুকী ভাজা খাওয়া অভ্যাস ছিল, মুখে ও সর্বাঙ্গে উল্কি নেই, ঠোঁট বিঁধিয়ে অলঙ্কার পরে নি, তখন তাঁরা বাড়িতে ফিরে এলেন।'

বলাই বাহুল্য, অল্পদিনের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথ এই পরিবারে একেবারে ঘরের লোকের মত হয়ে গেলেন। মিসেস স্কট তাঁকে আপন ছেলের মতই স্নেহ করতেন। এই মধ্যবিত্ত পরিবারের কল্যাণময়ী এই গৃহলক্ষ্মীর মধ্যে কবি নারীত্বের যে মহিমা দেখেছিলেন, আমাদের দেশের সাধ্বীগৃহিণীর সঙ্গেই তিনি সশ্রদ্ধ ভাষায় তার তুলনা করেছেন।

এই পরিবারের দুটি ছোট শিশু এথেল ও টমের তিনি হলেন আংকল্‌ আর্থার। এমন কি পরিবারের বিশ্বস্ত কুকুরটির সঙ্গেও তাঁর গভীর ভাব হয়ে গেল। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'ছোট্ট কুকুরটি। তার ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া রোঁয়া। রোঁয়াতে চোক মুখ ঢাকা। * * সকালবেলায় ব্রেকফাস্টের সময় তার তিনটি বিস্কুট বরাদ্দ আছে। সে বিস্কুটগুলি নিয়ে সে খাবার ঘরে বসে থাকে, যতক্ষণ না আমি গিয়ে বিস্কুটগুলি নিয়ে তার সঙ্গে খানিকটা খেলা করি, একবার তার মুখের থেকে কেড়ে নিই, একবার গড়িয়ে দিই, ততক্ষণ তার খাওয়া হয় না। আমি খেলা না করলে সে কোনমতেই খেতে রাজি হয় না। আমাকে সে বড় ভালবাসে। আগে আগে যখন আমার উঠতে দেরি হত, সে তার বরাদ্দ বিস্কুট নিয়ে আমার শোবার ঘরের কাছে বসে ঘেউ ঘেউ করত। কিন্তু গোল করলে আমি বিরক্ত হতুম, সে এখন আর ঘেউ ঘেউ করে না। আস্তে আস্তে পা দিয়ে দরজা ঠেলে ; যতক্ষণ না আমি দরজা খুলে দিই চুপ করে বাইরে বসে থাকে। দরজা খুলে ঘর থেকে বেরোলেই সে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে লেজ নেড়ে সুপ্রভাত সম্ভাষণ

করে; তার পরে একবার বিস্কুটের দিকে চায়, একবার আমার মুখের দিকে চায়।'

ডাক্তার স্কটের মেজো ও সেজো দুটি মেয়েই রবীন্দ্রনাথের অনুরক্ত হয়েছিল। তীর্থংকরে দিলীপকুমারকে পরবর্তী জীবনে কবি বলেছেন, দুটি মেয়েই যে তাঁকে ভালবাসত সে কথা আজ তাঁর কাছে একটুও ঝাপসা নেই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের নিজের দিক দিয়ে সেজো মেয়েকেই তাঁর বেশি ভাল লাগত বলেই মনে হয়। বাড়ির মধ্যে সেজো মেয়েটিই ছিলেন গাইয়ে বাজিয়ে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'আমি ইতিমধ্যে অনেক ইংরেজি গান শিখেছি। আমি গান করি। মিস ক—বাজান। মিস ক—আমাকে অনেকগুলি গান শিখিয়েছেন। কিন্তু প্রায় সন্ধ্যাবেলায় আমাদের একটু আধটু পড়াশুনো হয়। আমরা পালা করে ছ-দিনে ছ-রকমের বই পড়ি। বই পড়তে পড়তে এক একদিন প্রায় সাড়ে-এগারোটা বারোটা হয়ে যায়। ছেলেরা এখন শুতে গেছে।' 'জীবনস্মৃতি'তে কবি লিখেছেন, ডাক্তার স্কটের একটি মেয়ে তাঁর কাছে বাংলা শিখবার জন্যে উৎসাহ প্রকাশ করেছিলেন। সম্ভবত সেজো মেয়ের মধ্যেই কবি এই উৎসাহ সঞ্চারিত করেছিলেন। ১২৮৭ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠের 'ভারতী'তে "দুদিন" বলে যে কবিতাটি প্রকাশিত হয় এই মেয়েটিই তার আলম্বন-স্বরূপিণী। 'সন্ধ্যাসংগীতে' এই কবিতাটি সংকলিত হয়েছে। 'ভারতী'র যে স্তবকটি 'সন্ধ্যাসংগীতে' বাদ দেওয়া হয়েছে সেই স্তবকটি হল—

একখানা ভাঙা লঘু মেঘের মতন
কত গিরি হতে গিরি বেড়াতেছি ফিরি ফিরি
যেদিকে লইয়া যায় অদৃষ্ট-পবন।
আসিলাম একবার শুভ দৈব বলে
ফুলে ফুলে ভরা এক হরিত অচলে।
রহিনু দুদিন—
সাঁঝের কিরণ পিয়া—নির্ঝরের জলে গিয়া
ইন্দ্রধনু নিরমিয়া খেলিলাম কত,
ডুবে গেনু জোছনায়, আঁধার পাখার গায়
বসালেম তারা শত শত।
ফুরালো দুদিন—

সহসা আরেক দিকে বহিল পবন
দুদিনের খেলাধুলা ফুরালো আমার
আবার আরেক দিকে চলিনু আবার।[২৩]

এই কবিতায় কবি নিজের অনুরাগ প্রকাশ করে আবেগভরে লিখেছেন—

সুকুমার কুসুমটি—জীবন আমার—
বুক চিরে হৃদয়ের হৃদয় মাঝার
শত বর্ষ রাখি যদি দিবস রজনী
মেটে না মেটে না তবু তিয়াষ আমার ;—
শত ফুলদলে গড়া সেই মুখ তার,
স্বপনেতে প্রতি নিশি হৃদয়ে উদিবে আসি,
এলানো কুন্তলজাল, আকুল নয়নে।
সেই মুখ সঙ্গী মোর হইবে বিজনে।
* * *
ক্ষুদ্র এ দুদিন তার শত বাহু দিয়া
চিরটি জীবন মোর রহিবে বেষ্টিয়া।

৮

স্কট-দুহিতা মিস কে-র উদ্দেশে নিবেদিত এথেল ও টমের আংকল্ আর্থারের এই প্রণয়োচ্ছ্বাস কিশোর-মনের স্বপ্নকামনাকেই ভাষা দিয়েছে। 'দুদিনে'র কবি কল্পনা করেছেন, বর্ষে বর্ষে শত শত ঘটনা জীবনের উপর দিয়ে পার হয়ে যাবে। হয়তো একদিন সন্ধ্যায় কবি একটি নদীর ধারে বসে আছেন, এমন সময় হৃদয়খানি হুহু করে উঠবে, মানস-আকাশে মেঘাচ্ছন্ন স্মৃতি উজ্জ্বল হয়ে দেখা দেবে—একটি মুখের ছবি, একটি গানের ছত্র, দু-একটি সুর মনে পড়বে। তারপর বিস্মৃতির বাঁধ ভেঙে বিগত দিনের কথাগুলি বন্যার মতন মনকে প্লাবিত করে দেবে। 'দুদিনে'র 'দিক্‌শূন্য ভট্টাচার্য'[২৪] বুঝতে পারেন নি যে, দুদিনকে চিরদিন ধরে রাখা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়! যতই সে বলে 'যেতে নাহি দিব', ততই তাকে 'যেতে দিতে হয়',—কেন না 'বার বার কারো পানে ফিরে চাহিবার নাই যে সময়, নাই নাই'।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই দুদিনের কিশোরী-সঙ্গিনীর কোন নামকরণ করেছিলেন কি না নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয়। কবিতার একটি পরিত্যক্ত স্তবকের একটি পংক্তিতে কবি বলেছিলেন, 'কোমলা যুঁথীর এক পাপড়ি খসিল।' কোমলা যুঁথীর খসে-পড়া পাপড়ির সুরভি কিন্তু কবিমানসকে আরো কিছুদিন আমোদিত করে রেখেছিল। 'জীবনস্মৃতি'তে কবি বলেছেন, 'বিদায়কালে মিসেস স্কট আমার দুই হাত ধরিয়া কাঁদিয়া বলিলেন, "এমন করিয়াই যদি চলিয়া যাইবে তবে এত অল্পদিনের জন্য তুমি কেন এখানে আসিলে?"—লণ্ডনে এই গৃহটি এখন আর নাই—এই ডাক্তার পরিবারের কেহবা পরলোকে কেহবা ইহলোকে কে কোথায় চলিয়া গিয়াছেন তাহার কোন সংবাদই জানি না কিন্তু সেই গৃহটি আমার মনের মধ্যে চির-প্রতিষ্ঠিত হইয়া আছে।'[২০]

এই পরিবার সম্পর্কে এবং বিশেষ করে 'মিস কে—' সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের কৌতূহল বিলাত থেকে দেশে ফিরে আসার পরও তাঁর মনে জাগ্রত ছিল। ১৮৯০ খ্রীস্টাব্দে দ্বিতীয় বার বিলাতে গিয়ে ১০ই সেপ্টেম্বর লণ্ডনে পৌঁছেই পরদিন সকালবেলা তিনি ছুটে গিয়েছিলেন স্কট-পরিবারের সন্ধানে। কবি লিখেছেন, 'প্রথমে লণ্ডনের মধ্যে আমার সর্বাপেক্ষা পরিচিত বাড়ির দ্বারে গিয়ে আঘাত করা গেল। যে দাসী এসে দরজা খুলে দিলে তাকে চিনি নে। তাকে জিজ্ঞাসা করলুম আমার বন্ধু বাড়িতে আছেন কি না। সে বললে তিনি এ বাড়িতে থাকেন না। জিজ্ঞাসা করলুম কোথায় থাকেন? সে বললে, আমি জানি নে, আপনারা ঘরে গিয়ে বসুন, আমি জিজ্ঞাসা করে আসছি। পূর্বে যে ঘরে আমরা আহার করতুম সেই ঘরে গিয়ে দেখলেম সমস্ত বদল হয়ে গেছে—সেখানে টেবিলের উপর খবরের কাগজ এবং বই—সে ঘর এখন অতিথিদের প্রতীক্ষাশালা হয়েছে। খানিকক্ষণ বাদে দাসী একটি কার্ডে লেখা ঠিকানা এনে দিলে। আমার বন্ধু এখন লণ্ডনের বাইরে কোনো এক অপরিচিত স্থানে থাকেন। নিরাশ হৃদয়ে আমার সেই পরিচিত বাড়ি থেকে বেরোলুম।' ['য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি,' ১১ সেপ্টেম্বর, ১৮৯০]। এ সম্পর্কে অন্যত্র কবি আরো অন্তরঙ্গ সুরে লিখছেন, 'একবার ইচ্ছে হল, অন্তঃপুরের সেই বাগানটা দেখে আসি; আমার সেই গাছগুলো কত বড় হয়েছে। আর সেই ছাতের উপরকার দক্ষিণমুখো কুঠরি, আর সেই ঘর এবং সেই

আর একটা ঘর!' কিন্তু 'সেই ঘর এবং সেই আর একটা ঘরে'র গৃহবাসিনীর সন্ধান কবি জীবনে আর কখনো পান নি।

হৃদয়াবেগের কথা বাদ দিয়েও কবিজীবনে মিস কে-র একটি বিশেষ আসন আছে। কবি বলেছেন তাঁর বিদেশের শিক্ষা প্রায় সমস্তটাই মানুষের ছোঁয়া লেগে। প্রথম বার বিলাতে গিয়ে কবি ব্যারিস্টার হতে পারেন নি বটে, কিন্তু এই যাত্রার একটা বড় লাভ হল য়ুরোপীয় সংগীতের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ পরিচয়। এই সংগীত-শিক্ষায় মিস কে-র দান নগণ্য নয়। ইউরোপ-প্রবাসীর শেষ পত্র লেখা হয় ১৮৮০ খ্রীস্টাব্দের ১লা জানুয়ারি। সেদিন তিনি লিখেছেন, 'আমি ইতিমধ্যে অনেক ইংরেজি গান শিখেছি। আমি গান করি। মিস ক—বাজান। মিস ক—আমাকে অনেকগুলি গান শিখিয়েছেন।' এই চিঠি লেখার পরেও কবি মাসাধিককাল স্কট-পরিবারে ছিলেন; সুতরাং মিস কে-র কাছে কবির সংগীত-শিক্ষা এর পরেও আরো কিছুদূর অগ্রসর হয়েছিল। রবীন্দ্র-সংগীতে য়ুরোপীয় সংগীতের প্রভাবের কথা যখনই আলোচিত হবে তখনই কবির কৈশোর লগ্নের এই কিশোরী-শিক্ষয়িত্রীকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা কর্তব্য।

হৃদয়াবেগের দিক দিয়ে অবশ্য কবির এই কৈশোর-অনুভূতিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া সমীচীন হবে না। কিশোর-মনের স্বপ্নবিলাসের ঊর্ধ্বে তাদের স্থান নয়। দিক্‌শূন্য ভট্টাচার্যের 'দুদিন' কবিতার জন্মকথা এ সম্পর্কে বিশেষ আলোকপাত করবে। রবীন্দ্র-ভবনে রক্ষিত মালতী পুঁথিতে 'ফুরালো দুদিন' শীর্ষক একটি কবিতার পাণ্ডুলিপি রয়েছে। 'দুদিন' কবিতাটি তারই সংস্কৃত রূপ। প্রথম পাঠটি ('ফুরালো দুদিন') বম্বেতে রচিত এবং তার মধ্যে বিচ্ছেদের কথাই প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে। কবিতাটি কোথাও প্রকাশিত হয় নি। পরে স্কট-কুমারীর স্মরণে কবি তারই রূপান্তর ঘটিয়ে 'ভারতী'তে প্রকাশ করেন।[২৬]

স্বভাবতই মনে প্রশ্ন জাগবে, তা হলে 'দুদিন' কবিতার প্রেরণাদাত্রী কে? যে স্বপ্ন বম্বেতে শুরু হয়েছে সেই স্বপ্নই লণ্ডনে অন্য পাত্রীকে আশ্রয় করে সঞ্চারিত হতে দেখা গেল। একই কবিতার উৎস-সন্ধানে নায়িকা-বদলের এই রহস্যের সূত্রনির্দেশ বিশেষ কৌতুকাবহ। আসলে কল্পনাপ্রবণ কিশোর-মনের বিশেষ প্রবণতা থেকেই সুখ-দুঃখের ওই আত্যন্তিক

উচ্ছ্বাস উৎসারিত হয়েছে। ১২৮৬ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন সংখ্যার 'ভারতী'তে 'প্রেম-মরীচিকা' বলে একটি গান প্রকাশিত হয়। তাতে কবি বলছেন—

ও কথা বোলো না তারে কভু সে কপট নারে
আমার কপাল-দোষে চপল সেজন।
অধীর হৃদয় বুঝি শান্তি নাহি পায় খুঁজি,
সদাই মনের মতো করে অন্বেষণ।
ভালো সে বাসিত যবে করে নি ছলনা!
মনে মনে জানিত সে সত্য বুঝি ভালবাসে—
বুঝিতে পারে নি তাহা যৌবন-কল্পনা।

* * *

প্রেম-মরীচিকা হেরি ধায় সত্য মনে করি,
চিনিতে পারে নি সে যে আপনার মন।[২১]

এই 'প্রেম-মরীচিকা' সম্পর্কে কবির আত্মমানসের অপূর্ব বিশ্লেষণ রয়েছে ১২৮৭ সালের আশ্বিন সংখ্যা 'ভারতী'তে প্রকাশিত 'অকারণ কষ্ট' প্রবন্ধে। কিশোর রবীন্দ্রনাথের এই প্রবন্ধটি তাঁর তৎকালিক মনোভাবের অভ্রান্ত দিগ্‌দর্শনী হিসাবে অপরিসীম গুরুত্ব বহন করে। 'সন্ধ্যাসংগীত' পর্বের দুঃখবাদ নিয়ে নানা দিক দিয়ে নানারকম বিচার-বিশ্লেষণ হয়েছে। কবির প্রথম যৌবনের সেই দুঃখবাদের হেতু-নির্দেশে 'অকারণ কষ্ট' প্রবন্ধটিই সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য। কবিকণ্ঠেই তাঁর জীবনারম্ভের দুঃখবাদের নিদানকথা শোনা যাক—

'অকারণ কষ্ট নামে একটা রোগ আছে অনেকে হয়ত তাহা জানেন না। জন্মান্ধতার ন্যায় এই রোগ সারিবার নহে। * *

'অনেকে হয়ত জানেন না যে, তাঁহারা যে কষ্ট পাইতেছেন, তাহার যথার্থ কোনো কারণ নাই। * * যাহাকে তাঁহারা কারণ মনে করেন তাহা মন ভুলাইবার ওজর মাত্র। তাঁহাদের মনের স্বাভাবিক অবস্থাই কষ্ট পাওয়া। ঘটনাগুলি তাহার উপলক্ষ মাত্র। ঘটনাগুলি তাঁহাদের দুঃখের কারণ নহে দুঃখের আশ্রয়। * * আসল কথা এই যে, তাঁহাদের দুঃখের নিজের একটা বাড়িঘর নাই, এই জন্য সে ঘর খুঁজিয়া বেড়ায়, একটা দুয়ার দেখিলে অমনি তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া অসংকোচে নিজের ঘরকন্না

ফাঁদিয়া বসে। * * যেমন দুঃখের সম্বন্ধে সুখের সম্বন্ধেও সেইরূপ। যখন একটা সুখের কারণ ঘটে, সেটাকে অত্যন্ত প্রকাণ্ড করিয়া দেখেন, ও একেবারে উন্মত্ত হইয়া উঠেন। * * তাঁহারা যে নিজে জানিয়া শুনিয়া ইচ্ছা করিয়া আপনাকে প্রবঞ্চনা করেন তাহা নহে। তাঁহাদের মন তাহার নিজের চক্ষে নিজে ধূলা দেয়, ইহাতে তাঁহাদের কোন হাত নাই, তাঁহারা জানিতেও পারেন না। তাঁহাদের সমস্ত জীবনটাই একটি মহাভুল। ভুল লইয়াই তাঁহারা কাঁদেন, ভুল লইয়াই তাঁহারা হাসেন, ভুলই তাঁহাদের মনের ক্রীড়া, ভুলই তাঁহাদের মনের আহার। 'সে ভুল প্রাণের ভুল, মর্মে বিজড়িত মূল।' ভুলের উপরেই তাঁহাদের জীবনের ভিত্তি স্থাপিত। [এর পর 'প্রেম-মরীচিকা' গানটি প্রবন্ধের দৃষ্টান্ত হিসাবে উদ্ধার করে কবি লিখছেন] অর্থাৎ যথার্থ ভালবাসা না হইতেই অকারণ-কষ্টগ্রস্তেরা কল্পনা করে যে, তাহারা ভালবাসিতেছে। * * এ জীবনে ইহারা এমন কাহাকেও ভালবাসিতে পারিবে না, যাহার ভালবাসায় ইহাদের অধিকার আছে। অর্থাৎ যাহাকে ভালবাসিলে ইহাদের সুখী হইবার সম্ভাবনা আছে তাহাকে ইহারা ভালবাসিতে পারিবে না। ভালবাসিয়া সুখ না পাইলেই তবে ইহারা অপেক্ষাকৃত সুখে থাকিতে পারিবে।'[২৮]

অর্থাৎ সুখই হোক আর দুঃখই হোক, মিলনের আনন্দই হোক আর বিচ্ছেদের বেদনাই হোক, তাকে অকারণে বাড়িয়ে দেখাই অকারণ-কষ্টগ্রস্তদের স্বভাব। যথার্থ ভালবাসা না হতেই তারা কল্পনা করে যে তারা ভালবাসছে। এক কথায় সবই কৈশোরের স্বপ্নাবেশে রচিত, সবই আত্মগত ভাবোচ্ছ্বাস।

৯

'অকারণ কষ্ট' প্রবন্ধটি শুধু কবির আত্মবিশ্লেষণই নয়; নিগূঢ় অর্থে ওটি কবির কৈফিয়তও বটে। রবীন্দ্রনাথ প্রায় দু বৎসর আমেদাবাদ বম্বে ও বিলাতে কাটিয়ে এসেছেন, এই দু বৎসরের নিজের অনুভূতি ও আচরণ সম্পর্কে এই কৈফিয়ত তাঁরই প্রাপ্য যাঁকে কবি তাঁর মানস-আকাশের ধ্রুবতারা বলে মনে করেছেন। 'অকারণ কষ্টে'র এক স্থানে কবি বলছেন—

'এরূপ লোকদের কি কেহই মমতা করিবে না? সন্ধ্যাবেলায় যখন একলাটি বসিয়া একটি তারার দিকে চাহিতে চাহিতে ইহাদের চক্ষে জল আসে, তখন কি কেহই ইহাদের দোসর হইবার নাই? কেহই কি এক মুহূর্তের জন্য পাশে বসিয়া বলিবে না "আহা কাঁদিও না।" যখন স্তব্ধ জ্যোৎস্নারাত্রে বসন্তসমীরে ইহাদের হৃদয় হাহা করিতে থাকে তখন জ্যোৎস্নাও হাসিবে, বসন্ত রাত্রিও হাসিবে, কিন্তু এমন কি একটি হৃদয় থাকিবে না যে কাঁদিবে?'

ভাববাচ্যে প্রকাশিত কাঙালের মত মমতালাভের এই করুণ আবেদনের লক্ষ্য কে তা বুঝতে কষ্ট হয় না। প্রবাস-জীবনের দিনগুলিতে গদ্যে ও পদ্যে অন্তরঙ্গভাবে নিজের কথা বলার ভাষা কবি প্রথম খুঁজে পেয়েছিলেন। 'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্রে'ই হোক আর একাধিক গান ও কবিতার মধ্য দিয়েই হোক, কবি অকপটে নিজের মনোভাব ও আচরণের কথা অসংকোচে ব্যক্ত করেছেন। ভালমন্দ-নির্বিশেষে নিজের মানসলোককে এভাবে সম্পূর্ণ অনাবৃত করার মধ্যে আত্মপ্রকাশের যে আনন্দই থাক্, অন্তরঙ্গ আত্মজনের কাছে তার জন্যে কৈফিয়ত দিতেই হবে। 'য়ুরোপ-প্রবাসী'র উৎসর্গে কবি জ্যোতিদাদাকে সম্বোধন করে লিখেছেন, 'ইংলণ্ডে যাঁহাকে সর্বাপেক্ষা অধিক মনে পড়িত, তাঁহারই হস্তে এই পুস্তকটি সমর্পণ করিলাম।' বলাই বাহুল্য, জ্যোতিদাদার হাত দিয়ে কবির এই অঞ্জলি গিয়ে পৌঁছেছে নতুন বৌঠানেরই হাতে। তাঁকে প্রবাস-জীবনে শুধু যে সর্বাপেক্ষা অধিক মনে পড়িত তাই নয়, তাঁর প্রতি অনুরক্তির একাগ্র ঐকান্তিকতার ফলেই প্রবাসের অসংখ্য মোহবন্ধনের জাল থেকে কবি সহজেই মুক্ত হয়ে আসতে পেরেছেন। 'ভগ্নহৃদয়' কাব্যখানির সূত্রপাত হয় বিলাতে; দেশে প্রত্যাবর্তনের পর ১২৮৭ সালের কার্তিক থেকে এই নাট্যকাব্যখানি 'ভারতী'তে প্রকাশিত হতে থাকে। কার্তিকের 'ভারতী'তে 'ভগ্নহৃদয়ে'র উৎসর্গ-সংগীতটি গ্রন্থের প্রারম্ভেই মুদ্রিত হয়েছিল। ছায়ানটে গ্রথিত এই গীতি-উপহারে কবি লিখেছেন—

তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা।
এ সমুদ্রে আর কভু হব নাক পথহারা।
যেথা আমি যাই নাকো, তুমি প্রকাশিত থাকো
আকুল এ আঁখি পরে ঢাল গো আলোকধারা।

ও মুখানি সদা মনে জাগিতেছে সঙ্গোপনে
আঁধার হৃদয়মাঝে দেবীর প্রতিমা পারা।
কখনো বিপথে যদি, ভ্রমিতে চায় এ হৃদি
অমনি ও মুখ হেরি সরমে সে হয় সারা।
চরণে দিনু গো আনি এ ভগ্ন-হৃদয়খানি
চরণ রঞ্জিবে তব এ হৃদি-শোণিতধারা।[২৯]

মালতী-পুঁথির সাক্ষ্য থেকে দেখা যাচ্ছে এই কবিতাটিরও প্রথম খসড়া বম্বেতেই রচিত হয়েছে। এ থেকে নিঃসংশয়েই প্রমাণিত হচ্ছে যে, কবির মানস-আকাশের এই ধ্রুবতারার আলোতেই বিদেশ-প্রবাসে তাঁর মনের গতিপথ নির্ণীত হয়েছে। নতুন বৌঠানের উদ্দেশে রচিত এই গানটি প্রকাশের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ব্রহ্মসংগীতের পর্যায়ভুক্ত হয়েছিল। বলাই বাহুল্য, ব্রহ্মসংগীতে শেষ দুটি পংক্তি বাদ গিয়েছে এবং ষষ্ঠ পংক্তির 'আঁধার হৃদয়মাঝে দেবীর প্রতিমা পারা' স্থলে বসেছে 'তিলেক অন্তর-হলে না হেরি কূলকিনারা।' কবিকিশোরের 'আঁধার হৃদয়মাঝে দেবীর প্রতিমা পারা' যে নারীমূর্তি প্রতিষ্ঠিতা ছিলেন তাঁর প্রতি তদ্গত চিত্তের হৃদয়ানুভূতির মধ্যে ব্রহ্মোপাসক তাঁর ভক্তি-নিবেদনের ভাষা খুঁজে পেয়েছিলেন। তাতেই প্রমাণিত হয় যে, নতুন বৌঠানের প্রতি কিশোর রবীন্দ্রনাথের অনুভূতি ছিল ব্রহ্মস্বাদ-সহোদর। অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রতি একান্ত-নির্ভর ভক্তের ঐকান্তিক পরানুরক্তির সঙ্গেই তা উপমেয়। সে গভীরতার সঙ্গে কিশোর-মনের কোন লীলাচপল লঘু-রোমান্সই তুলনার যোগ্য হতে পারে না।

'তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা' ব্রহ্মসংগীতে পরিণত হওয়ার ফলে রবীন্দ্রনাথ 'ভগ্নহৃদয়' গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় নূতন উপহার-কবিতা রচনা করেছিলেন। ভাষার দিক দিয়ে পৃথক হলেও একই অনুভূতির প্রকাশ সেখানে পাওয়া যাবে। কবি লিখেছেন—

১

হৃদয়ের বনে বনে সূর্যমুখী শত শত
ওই মুখ পানে চেয়ে ফুটিয়া উঠেছে যত।
বেঁচে থাকে বেঁচে থাক্, শুকায় শুকায়ে যাক্,
ওই মুখ পানে তারা চাহিয়া থাকিতে চায়,

বেলা অবসান হবে, মুদিয়া আসিবে যবে
ওই মুখ চেয়ে যেন নীরবে ঝরিয়া যায়!

জীবন-সমুদ্রে তব জীবন-তটিনী মোর
মিশায়েছি একেবারে আনন্দে হইয়ে ভোর,
সন্ধ্যার বাতাস লাগি ঊর্মি যত উঠে জাগি,
অথবা তরঙ্গ উঠে ঝটিকায় আকুলিয়া,
জানে বা না জানে কেউ, জীবনের প্রতি ঢেউ
মিশিবে—বিরাম পাবে—তোমার চরণে গিয়া।

হয়ত জান না, দেবি, অদৃশ্য বাঁধন দিয়া
নিয়মিত পথে এক ফিরাইছ মোর হিয়া।
গেছি দূরে, গেছি কাছে, সেই আকর্ষণ আছে,
পথভ্রষ্ট হই নাক তাহারি অটল বলে,
নহিলে হৃদয় মম ছিন্ন ধূমকেতু সম
দিশাহারা হইত সে অনন্ত আকাশ তলে!

আজ সাগরের তীরে দাঁড়ায়ে তোমার কাছে
পরপারে মেঘাচ্ছন্ন অন্ধকার দেশ আছে;
দিবস ফুরাবে যবে সে দেশে যাইতে হবে,
এ পারে ফেলিয়া যাব আমার তপন শশী,
ফুরাইবে গীত গান, অবসাদে ম্রিয়মান,
সুখ শান্তি অবসান কাঁদিব আঁধারে বসি!

স্নেহের অরুণালোকে খুলিয়া হৃদয় প্রাণ,
এ পারে দাঁড়ায়ে, দেবি, গাহিনু যে শেষ গান,

তোমার মনের ছায় সে গান আশ্রয় চায়,
একটি নয়ন জল তাহারে করিও দান।
আজিকে বিদায় তবে, আবার কি দেখা হবে,
পাইয়া স্নেহের আলো হৃদয় গাহিবে গান?

কবিতাটি 'শ্রীমতী হে'-কে উৎসর্গীকৃত। 'শ্রীমতী হে' যে কাদম্বরী দেবীরই সংকেতনামা, সে কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। এই প্রসঙ্গের উপর নূতন আলোকপাত করেছেন শ্রীসজনীকান্ত দাস। তিনি 'রবীন্দ্রনাথ: জীবন ও সাহিত্য' গ্রন্থে লিখছেন, ""হে" কে, কবিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তিনি পাল্টা প্রশ্ন করিলেন, তোমার কি মনে হয়? বলিলাম, হেমাঙ্গিনী। 'অলীকবাবু'তে আপনি অলীকবাবু ও কাদম্বরী দেবী হেমাঙ্গিনী সাজিয়াছিলেন। সেই নামের আড়ালের সুযোগ আপনি গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি স্বীকার করিলেন, ইহাই সত্য; অন্য সব অনুমান মিথ্যা।"[৩০] এই কবিতায় জীবনসমুদ্রে জীবনতটিনী মিশিয়ে দেবার যে রূপকল্প কবি ব্যবহার করেছেন 'প্রভাত-সংগীতে'র "নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে" তা নূতন ব্যঞ্জনা পেয়েছে। সে আলোচনার স্থান এ নয়। কিন্তু এখানেও কবি স্পষ্ট করেই বলেছেন যে, তাঁর হৃদয়কমলাসনে অচলপ্রতিষ্ঠ সেই দেবীর অদৃশ্য বাঁধন, তাঁর সেই নিগূঢ় আকর্ষণের ফলেই কবি বিদেশের নানা প্রলোভনের মধ্যেও কখনো পথভ্রষ্ট হন নি।

॥ উল্লেখ-পঞ্জী ॥

১ জীবনস্মৃতি, পৃ° ১১৪।
২ দ্রষ্টব্য, জীবনস্মৃতি, পৃ° ১১৪-১১৫।
৩ রবীন্দ্র-রচনাবলী-১, পৃ° ৫২৬-৫২৭।
৪ জীবনস্মৃতি, পৃ° ৯৮।
৫ তদেব, পৃ° ১১২।
৬ রবীন্দ্র-রচনাবলী-১, পৃ° ৫২৬।
৭ ভারতী, ভাদ্র ১২৮৬, পৃ° ২১৭।
৮ তদেব, আশ্বিন ১২৮৬, পৃ° ২৬৪।

৯ তদেব, চৈত্র ১২৮৭, পৃ° ৫৫৩-৫৬৮।

১০ ছেলেবেলা, পৃ° ৯৩-৯৪।

১১ ছিন্নপত্র, পৃ° ২৬৬

১২ তদেব, পৃ° ২৪৫।

১৩ 'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র' রবীন্দ্র-শতবর্ষপূর্তি সংস্করণ, 'প্রথম প্রকাশের ভূমিকা'।

১৪ তদেব। পৃ° ২১।

১৫ তদেব। পৃ° ২৮।

১৬ তদেব। পৃ° ৪৯-৫০।

১৭ তদেব। পৃ° ৮৪।

১৮ তদেব। পৃ° ৯৩।

১৯ তদেব। পৃ° ১৫৭।

২০ তদেব। পৃ° ২১১।

২১ রবীন্দ্র-রচনাবলী-১৭। পৃ° ৩৬০।

২২ তদেব। পৃ° ৩৪৪।

২৩ ভারতী, জ্যৈষ্ঠ ১২৮৭, পৃ° ৫৯।

২৪ 'দুর্দিন' কবিতা 'ভারতী'তে শ্রীদিক্‌শূন্য ভট্টাচার্য ছদ্মনামেই প্রকাশিত হয়েছিল।

২৫ জীবনস্মৃতি পৃ° ১০৪-১০৫।

২৬ দ্রষ্টব্য, রবীন্দ্র-জীবনী-১, পাদটীকা পৃ° ৭৯।

২৭ রবিচ্ছায়া, ১৫ ; দ্রষ্টব্য গীতবিতান, পৃ° ৮৬৬।

২৮ ভারতী, আশ্বিন ১২৮৭, পৃ° ২৮৭-২৯১।

২৯ ভারতী, ১২৮৭, পৃ° ৩৩৭।

৩০ দ্রষ্টব্য, উক্ত গ্রন্থ, পৃ° ২৪৬।

সপ্তম অধ্যায়

'নন্দনকাননে' 'পুনর্বসন্ত'

১

প্রথম বিলাতপ্রবাসের পর রবীন্দ্রনাথ জোড়াসাঁকোয় ফিরে এলেন ১২৮৬ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসে, অর্থাৎ ১৮৮০ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারিতে। আমেদাবাদ, বম্বে ও বিলাতে সবশুদ্ধ প্রায় দু বৎসর তাঁর এই প্রবাস-জীবন। রবীন্দ্র-জীবনীকার বলেছেন, 'তিনি গিয়াছিলেন লাজুক বালক, ফিরিলেন প্রগল্ভ যুবক।'[১] কৈশোর-যৌবনের সন্ধিলগ্নের এই পরিবর্তন কিন্তু অস্বাভাবিক নয়। তবু বিদেশের আলো-হাওয়ায় নবীন প্রতিভার আত্মবিকাশ যতটা স্বতঃস্ফূর্ত হতে পেরেছে, পারিবারিক গণ্ডিতে অবরুদ্ধ থাকলে ততটা হওয়া হয়তো সম্ভব ছিল না। তা ছাড়া বিলাতি সমাজের অন্তরঙ্গ সান্নিধ্যে এসে তাঁর কথাবার্তায়, আচারে ও আচরণে, এমন কি চিন্তা ও স্বপ্নেও অভিনবত্ব দেখা দিয়েছিল। 'জীবনস্মৃতি'তে কবি নিজেই বলেছেন, বিলাত থেকে ফিরে আসার পর তিনি যখন স্বজন-সমাজে বিলাতি গান গেয়ে বেড়াতে লাগলেন তখন সবাই বললেন, তাঁর গলা এমন বদল হল কেন, কেমন যেন 'বিদেশী রকমের', 'মজার রকমের' হয়েছে। এমন কি তাঁর কথা কইবার গলারও যে কেমন একটু স্বর বদল হয়ে গিয়েছে, তাও আত্মীয়স্বজনের নজরে পড়ল।[২] শুধু স্বরই নয়, বহির্জগতের জীবনালোকে তাঁর বক্তব্যও যে অভিনবত্ব পেয়েছে, সে সত্যও 'ভারতী'র পৃষ্ঠায় ক্রমশ উজ্জ্বলতর হতে লাগল।

সাংসারিক দিক দিয়ে তরুণ রবির আপাতব্যর্থ বিদ্যার্থিজীবনের এই অমিতাক্ষর যতিপতনে তাঁর অভিভাবকস্থানীয়দের কেউ কেউ হয়তো ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন, কিন্তু কবির নিজের মনে পরাজয়ের গ্লানি বিন্দুমাত্রও ছিল, এমন আভাস কোথাও পাওয়া যায় নি। বরং বেশ কিছুদিন বাইরে কাটিয়ে আবার ঘরে ফিরে আসার আনন্দই তাঁকে অভিভূত করে রেখেছিল। সেই আনন্দের কথা পরে কবির একখানি চিঠিতে অভিব্যক্ত হয়েছে। কবি লিখেছেন, 'যৌবনের আরম্ভ-সময়ে বাংলাদেশে ফিরে এলেম। সেই ছাদ, সেই চাঁদ, সেই দক্ষিণে বাতাস, সেই নিজের মনের বিজন স্বপ্ন, সেই ধীরে

ধীরে ক্রমে ক্রমে চারদিক থেকে প্রসারিত সহস্র বন্ধন, সেই সুদীর্ঘ অবসর, কর্মহীন কল্পনা, আপন মনে সৌন্দর্যের মরীচিকা রচনা, নিষ্ফল দুরাশা, অন্তরের নিগূঢ় বেদনা, আত্মপীড়ক অলস কবিত্ব— ।'[৩]

প্রবাস থেকে প্রত্যাবর্তনের পরবর্তী যৌবনারম্ভের সেই দিনগুলি সম্পর্কে এর চেয়ে সুন্দর ও সার্থক বিশ্লেষণ আর হতে পারে না। 'সেই ছাদ, সেই চাঁদ, সেই দক্ষিণে বাতাস!' এ যেন নিঃসীম নভোবিহার শেষ করে কুলায়-প্রত্যাশী পাখির নীড়ে ফেরা! 'ভারতী'র কবি ফিরলেন 'ভারতীর ভিটা'য় ; ফিরলেন জোড়াসাঁকোর তেতলার ছাদের 'নন্দন-কাননে', ফিরলেন তাঁরই কাছে 'ইংলণ্ডে যাঁহাকে সর্বাপেক্ষা অধিক মনে পড়িত'।

কাদম্বরী দেবী যে রবীন্দ্রনাথকে ফিরে পেয়ে আনন্দিত হয়েছিলেন, তা বলাই বাহুল্য। প্রবাসের দিনগুলিতে রবির যেমন তাঁকেই সর্বদা সবচেয়ে বেশি মনে পড়ত, তাঁর পক্ষেও তেমনি এই দু বৎসরের বিচ্ছেদ কম দুর্বিষহ ছিল না। "নষ্টনীড়" গল্পে অমল বিলাত চলে যাওয়ার পর চারুলতার প্রতিটি মুহূর্ত যে ব্যাকুল উৎকণ্ঠা ও দুঃসহ প্রতীক্ষায় অতিবাহিত হয়েছিল তার কথা আমরা কবির লেখনীমুখে জানতে পেরেছি। 'নন্দনকাননে'র নিত্যসঙ্গী রবির অভাবে কাদম্বরী দেবীর হৃদয়বেদনা চিরদিনের মত অব্যক্তই রয়ে গেছে। কেবল 'ভারতী'র অন্তরঙ্গ-গোষ্ঠীর সদস্যবৃন্দের অন্যতমা শরৎকুমারীর 'ভারতীর ভিটা' প্রবন্ধে এটুকুমাত্র জানা গেছে যে, রবীন্দ্রনাথ বিলাত চলে যাওয়ার পর জোড়াসাঁকোর তেতলার ছাদের 'নন্দনকানন' প্রায় পরিত্যক্ত হয়েই পড়েছিল। কেন না, শরৎকুমারী লিখেছেন, 'অসুস্থতাবশত শ্রীযুক্ত জ্যোতিবাবু সস্ত্রীক দীর্ঘকালের জন্য স্টীমারে জলযাত্রা করিলেন।' অবশ্য 'দীর্ঘকালের জন্য এই জলযাত্রা'র অবসান রবীন্দ্রনাথের প্রত্যাবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে বা পরেই হয়েছে। সেই ছাদ, সেই চাঁদ, সেই দক্ষিণে বাতাসে আবার প্রাণ ফিরে এল। রবির আবির্ভাবে 'নন্দনকানন' আবার আনন্দোৎসবে উজ্জ্বল ও সুন্দর হয়ে উঠল। কিছুদিনের মধ্যেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথের লেখা, আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রথম গীতিনাটিকা 'মানময়ী'র অভিনয় সানন্দে সম্পন্ন হল। এই মিলনান্ত গীতিনাটিকার অভিনয়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, কাদম্বরী দেবী ও রবীন্দ্রনাথ তিনটি প্রধান চরিত্রে অবতীর্ণ হলেন। বলাই বাহুল্য, অভিনয় নিতান্তই অভিনয় ; কিন্তু বিশেষ ঘটনা-সন্নিবেশে তা কখনো কখনো অভাবনীয় তাৎপর্য

নিয়ে দেখা দেয়। অবনীন্দ্রনাথের ভগিনী শ্রীমতী সুনয়নী দেবী বলেছেন, 'আত্মীয় স্বজন নিয়ে অভিনয় হত বলে মনের মতো পার্ট না পেলে মান-অভিমান চলত। সে এক মহা হাঙ্গামা। আবার অভিনয়ের মধ্যেও এক-একজনকে ঠাট্টা করা হত। তা নিয়েও কম হাঙ্গামা হত না।'[৪]

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর 'মানময়ী' গীতি-নাটিকাকে ঈষৎ সংশোধিত করে পরে তার নামকরণ করেন 'পুনর্বসন্ত'। রবীন্দ্রনাথ প্রবাস থেকে ফিরে আসার পরে ঠাকুর-পরিবারে 'মানময়ী'র অভিনয়োৎসবের মধ্য দিয়ে সেদিন 'নন্দন-কাননে' যেন পুনর্বসন্তেরই আবির্ভাব হল। এই সংগীত-সাধনা এবং গীতিনাট্য সৃষ্টি ও অভিনয়ের নব নব প্রেরণা ও উৎসাহের সার্থক পরিণতি হিসাবেই রবীন্দ্রনাথ 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র কবিনাট্যকার রূপে আবির্ভূত হলেন। কাজেই কবি-জীবনে এই পর্বাধ্যায়ও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

২

রবীন্দ্রপ্রতিভায় কাব্য নাটক ও সংগীতের ত্রিবেণীসংগম ঘটেছে। কবি-জীবনে এই সংগমতীর্থের উৎসমুখ প্রথম কি ভাবে উৎসারিত হল তার রহস্যসন্ধান রবীন্দ্র-মানসের উন্মীলন-প্রসঙ্গে অপরিহার্য। এবং এই আলোচনায় ঠাকুরবাড়ির পারিবারিক আবহাওয়ার কথাও প্রথমেই এসে পড়ে। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-পরিবারকেও নবজন্মোত্তর বাংলার সাহিত্য সংগীত ও নাট্যকলার ত্রিবেণীতীর্থ বলা যেতে পারে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ চারুকলার সাধনায় কোনদিনই কাউকে নিরুৎসাহ করেন নি। কিন্তু ঠাকুর-পরিবারের এই বিশেষ আবহাওয়া সৃষ্টিতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও গুণেন্দ্রনাথের নামই সবার আগে মনে পড়ে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর জীবনস্মৃতিতে বলেছেন, তাঁরা দুজনে ছিলেন হরিহরাত্মা। উভয়ে মিলে কি ভাবে গীতিনাট্য-ভারতীকে পরিবারে প্রতিষ্ঠিত করলেন তার বর্ণনা দিতে গিয়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বলছেন :

'একদিন কথা হইল, আমাদের ভিতর Extravaganza নাট্য নাই। আমি তখনই Extravaganza প্রস্তুত করিবার ভার নিলাম। পুরাতন 'সংবাদ প্রভাকর' হইতে কতকগুলি মজার মজার কবিতা জোড়াতাড়া দিয়া একটা 'অদ্ভুতনাট্য' খাড়া করিয়া, তাহাতে সুর বসাইয়া ও-বাড়ির বৈঠকখানায়

মহা উৎসাহের সহিত তাহার মহলা আরম্ভ করিয়া দিলাম। * * একদিন আমাদের বারাণ্ডার আড্ডায় কথা উঠিল—সেকালে কেমন 'বসন্ত-উৎসব' হইত। আমি বলিলাম—'এসো না, আমরাও একদিন সেকেলে ধরণে বসন্ত উৎসব করি।' অমনি গুণুদাদার কল্পনা উত্তেজিত হইয়া উঠিল। একদিন এক বসন্ত-সন্ধ্যায় সমস্ত উদ্যান বিবিধ রঙীন আলোকে আলোকিত হইয়া নন্দনকাননে পরিণত হইয়া উঠিল। পিচ্‌কারী আবীর কুঙ্কুম প্রভৃতি প্রয়োজনীয় সমস্ত সরঞ্জাম উপস্থিত হইয়া গেল। খুব আবীরখেলা হইতে লাগিল। তারপর গান বাজনা আমোদ প্রমোদও কিছুমাত্র বাদ গেল না। ইহাতে অনেকগুলি টাকাও খরচ হইয়া গেল।'[৫]

এই পরিবেশেই ঠাকুরবাড়িতে জোড়াসাঁকো নাট্যশালার প্রতিষ্ঠা হল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও গুণেন্দ্রনাথ উভয়ে মিলে নাটকীয় দলের সৃষ্টি করলেন। অভিনয়, তার আয়োজন, অভিনয়ের উপযোগী নাটক নির্বাচন প্রভৃতি কার্য নির্বাহের জন্যে একটি সমিতি গঠিত হল। সমিতির নাম হল 'কমিটি অব ফাইভ।' তার সদস্যপঞ্চক হলেন কৃষ্ণবিহারী সেন, গুণেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, কবি অক্ষয় চৌধুরী এবং মহর্ষিদেবের অন্যতম জামাতা যদুনাথ মুখোপাধ্যায়। এঁদের উদ্যোগে ঠাকুরবাড়িতে মধুসূদনের 'কৃষ্ণকুমারী' ও 'একেই কি বলে সভ্যতা'র অভিনয় হল। তরুণদের এই উৎসাহ দেখে 'বড়োর দল'ও ক্রমশ এদিকে আকৃষ্ট হলেন। গণেন্দ্রনাথ স্বয়ং সানন্দে এগিয়ে এসে হলেন কর্ণধার। ভাল নাটক রচনার জন্যে পাঁচ শত টাকা পুরস্কার ঘোষিত হল। রামনারায়ণ তর্করত্ন 'নবনাটক' লিখে দিলেন। ১৮৬৭ খ্রীস্টাব্দের ৫ই জানুয়ারি ঠাকুরবাড়িতে মহাসমারোহে 'নবনাটকে'র অভিনয় হল। কলিকাতার বহু বিশিষ্ট সামাজিকগণের উপস্থিতিতে এই নাটকের অভিনয় সম্পর্কে নানা রকম সরস গল্প চার দিকে ছড়িয়ে পড়ল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর জীবনস্মৃতিতে সাড়ম্বরে তার উল্লেখ করে বলেছেন: 'তারপর যেদিন প্রকাশ্য অভিনয় হইবে, সেদিন এক অভাবনীয় কাণ্ড উপস্থিত হইল। যাহারা স্ত্রীলোকের ভূমিকা লইয়াছিল, অভিনয়ের ঠিক পূর্বেই তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ দর্শকমণ্ডলীর সম্মুখীন হইবার ভয়ে, সাজঘরে ঘন ঘন মূর্ছা যাইতে লাগিল। ভাগ্যক্রমে আমাদের বাড়ির ডাক্তার দ্বারিবাবু উপস্থিত ছিলেন, তিনি তাহাদিগকে তোয়াজ করিয়া অল্প সময়ের মধ্যেই খাড়া করিয়া

তুলিলেন। প্রথমটা লজ্জা ও সংকোচে কতকটা সবারই বাধ'-বাধ' ঠেকিতেছিল, কিন্তু দুই একবার অবতীর্ণ হইয়া সকলেরই সে জড়সড় ভাবটা কাটিয়া গিয়া ক্রমে ক্রমে ভাব ভঙ্গী বেশ সহজ ও সরল হইয়া আসিল। কেবল স্ত্রীবেশে সজ্জিত আমার কবিবন্ধু অক্ষয় চৌধুরী শেষ মুহূর্তে কিছুতেই সাহস করিয়া দর্শকমণ্ডলীর সম্মুখীন হইতে পারিলেন না। আমাদের অনুরোধ উপরোধ সবই ব্যর্থ হইল। কি করা যায়, অগত্যা তাঁহাকে বাদ দিতে হইল।'[৬]

এই অভিনয়ের সময় মহর্ষিদেব জোড়াসাঁকোতে ছিলেন না। নাটোর থেকে তিনি গণেন্দ্রনাথকে এক পত্রে লিখলেন, 'প্রাণাধিক গণেন্দ্রনাথ, তোমাদের নাট্যশালার দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়াছে, সমবেত বাদ্য দ্বারা অনেকের হৃদয় নৃত্য করিয়াছে, কবিত্বরসের আস্বাদনে অনেকে পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছে। নির্দোষ আমোদ আমাদের দেশের যে একটি অভাব, তাহা এই প্রকারে ক্রমে ক্রমে দূরীভূত হইবে। পূর্বে আমার সহৃদয় মধ্যম ভায়ার [গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুরের] উপরে ইহার জন্য আমার অনুরোধ ছিল, তুমি তাহা সম্পন্ন করিলে। কিন্তু আমি স্নেহপূর্বক তোমাকে সাবধান করিতেছি যে, এ প্রকার আমোদ যেন দোষে পরিণত না হয়। সদ্‌ভাবের সহিত এ আমোদকে রক্ষা করিলে আমাদের দেশে সভ্যতার বৃদ্ধি হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।'

এই পত্রের সাক্ষ্য থেকে নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হচ্ছে যে মহর্ষিদেব নির্দোষ আমোদ হিসাবে তাঁর পরিবারে নাট্যাভিনয়ের আয়োজনে আপত্তি তো করেনই নি, উপরন্তু প্রথমে তিনি এর ভার মধ্যমানুজ গিরীন্দ্রনাথের উপর অর্পণ করেছিলেন এবং পরে যখন গণেন্দ্রনাথ এ বিষয়ে কৃতকার্য হলেন তখন তিনি তাঁকে সাধুবাদই জানিয়েছেন।

কিন্তু জোড়াসাঁকো নাট্যশালার উদ্দীপনা কিছু দিনের মধ্যেই স্তিমিত হয়ে এল। 'নবনাটক' অভিনয়ের মাস ছয় পরে আমেদাবাদ থেকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ আক্ষেপের সুরে তাঁর গুনুদাদাকে লিখেছেন যে, জোড়াসাঁকো নাট্যশালা বিস্মৃতির অতল অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়েছে। তাঁদের সেই 'ঈটিং ক্লাবে'র কথাও আর কেউ স্মরণ করে না!

৩

ঠাকুর-বাড়িতে পারিবারিক নাট্যাভিনয়ের দ্বিতীয় যুগ শুরু হল জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নিজের রচিত নাটক নিয়ে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রথম গ্রন্থ 'কিঞ্চিৎ জলযোগ' প্রহসন প্রকাশিত হয় ১৮৭২ খ্রীস্টাব্দে। তাঁর দ্বিতীয় প্রহসন 'এমন কর্ম আর করব না'র প্রকাশকাল ১৮৭৭ খ্রীস্টাব্দ। এই প্রহসনেই প্রথম রবীন্দ্রনাথ রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হন। তখন তিনি সবে ষোল বৎসর বয়স অতিক্রম করেছেন। 'রবীন্দ্র-কথা'র লেখক বলেছেন, 'বিবাহ-উৎসব' গীতিনাট্যে রবীন্দ্রনাথ একটি স্ত্রীভূমিকায়ও অভিনয় করেছিলেন। বিবাহ-উৎসব কোনদিন মুদ্রিত হয় নি। 'কবির গানে'র আদর্শে বাড়ির একটি বিবাহ উপলক্ষে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ দুজনে মিলে এই গীতিনাট্য রচনা করেন। বিবাহের সপক্ষে ও বিপক্ষে কতকগুলি গানেরই মালা গেঁথে এর অঙ্গসজ্জা। রবীন্দ্রনাথ বিবাহের স্বপক্ষদলের একটি স্ত্রীভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। খগেন্দ্রনাথের অনুমান ১৮৭৭ খ্রীস্টাব্দেরই কাছাকাছি কোন সময়ে 'বিবাহোৎসব' গীতাভিনীত হয়েছিল।'

কিন্তু প্রকৃত অভিনয় রবীন্দ্রনাথ প্রথম করেন 'এমন কর্ম আর করব না'র নায়ক অলীকবাবুর ভূমিকায়। প্রসঙ্গত একথাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে এই প্রহসননাট্যে নায়িকা হেমাঙ্গিনীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হন কাদম্বরী দেবী। সম্ভবত তাঁর জীবনেও সেই প্রথম অভিনয়। তা ছাড়া নরনারীর মিলিত অভিনয় হিসাবেও 'এমন কর্ম আর করব না' বিশেষ গুরুত্ব অর্জন করেছে। পরবর্তী যুগে ভদ্রমণ্ডলীতে মিলিত অভিনয়ের রীতি আমাদের সমাজে যতই প্রচলিত হোক না কেন, সেদিন তা ছিল একটি বিপ্লবী পদক্ষেপের মত। অবশ্য জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-পরিবারের সে অভিনয় ছিল নিতান্তই ঘরোয়া। অভিনয়ে যাঁরা অংশ গ্রহণ করেছেন শুধু তাঁরাই নন, যাঁরা দর্শকমণ্ডলীভুক্ত ছিলেন তাঁরাও পরিবারের আত্মীয়স্বজন এবং একান্ত-ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধবস্থানীয় অন্তরঙ্গগোষ্ঠীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলেন।

'এমন কর্ম আর করব না'র নায়ক-নায়িকা হেমাঙ্গিনী-অলীকবাবুর প্রণয়-প্রহসনের গল্পাংশটি ছিল বিশেষ কৌতুকাবহ। কৃষ্ণনগরের সত্যসিন্ধুবাবু তাঁর মেয়ে হেমাঙ্গিনীর জন্যে একটি সৎপাত্রের সন্ধানে মেয়েকে নিয়ে কলকাতা

এসেছেন। মেয়ে বড় হয়েছে, কিন্তু মনের মতো ছেলে না পেলে তিনি মেয়ের বিয়ে দেবেন না, এই তাঁর পণ। সত্যসিন্ধু পাকেচক্রে অলীকবাবুর খপ্পরে পড়ে গেলেন। অলীকেরই ভাড়া করা এক বিরাট বাড়ির একাংশে কন্যাসহ সত্যসিন্ধুর স্থান হল। হেমাঙ্গিনী নভেলপড়া নায়িকা। বঙ্কিমচন্দ্রের সদ্যপ্রকাশিত উপন্যাসগুলির রোমান্টিক নায়িকাদের প্রণয়কলায় তার প্রেমের স্বপ্ন রঙিন হয়ে উঠেছে। হেমাঙ্গিনী অলীকবাবুর প্রেমে পড়ে গেল। কিন্তু মুশকিল হয়েছে এই যে, কে তার বাবার কাছে বলে দিয়েছে যে, অলীকবাবু আর সকল রকমে লোক ভাল, কেবল দোষের মধ্যে ভুলেও তাঁর মুখ দিয়ে একটি সত্যি কথা বেরোয় না। অথচ নভেলপড়া নায়িকা উপন্যাস থেকে এই শিক্ষা পেয়েছে যে, 'যার সঙ্গে ভালবাসা হয়, তাকে ভালবাসার চিঠি গোপনে পাঠাতে হয়' ; তাই প্রসন্ন চাকরানীর হাত দিয়ে সে অলীককুমারকে প্রেমপত্র পাঠালে। বলাই বাহুল্য, হেমাঙ্গিনীর সেই প্রেমপত্রখানি নভেলিয়ানার চূড়ান্ত নিদর্শন। সে লিখলে, 'স্বামিন্!—কি বলিলাম? আমি কি এখন আপনাকে এরূপ সম্বোধন করিতে পারি? কে বলে পারি না? অবশ্য পারি। সমাজ ইহার জন্য আমাকে তিরস্কার করিতে পারে, পৃথিবীর সমস্ত লোক আমার নিন্দা দেশ বিদেশে পরিঘোষণা করিতে পারে, পিতা মাতা আমাকে জন্মের মত পরিত্যাগ করিতে পারে, কিন্তু এরূপ মধুর সম্বোধন করিতে কেহই আমাকে বিরত করিতে পারিবে না। আমি জগতের সমক্ষে, চন্দ্রসূর্যকে সাক্ষী করিয়া মুক্তকণ্ঠে স্পষ্টাক্ষরে বলিব, তুমিই আমার স্বামী ; শতবার বলিব, সহস্রবার বলিব, লক্ষবার বলিব, তুমিই আমার স্বামী।'

এই অপূর্ব প্রণয়-সম্ভাষণের মধ্যেই হেমাঙ্গিনী-চরিত্রটির মর্মলোক নির্বারিত হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস পড়ে সে-যুগের শিক্ষিত তরুণীদের চিত্তে যে দিবাস্বপ্ন রচিত হয়েছিল তার উপর একটু রঙ ফলিয়ে এখানে প্রহসনকার উপাদেয় রসিকতার সৃষ্টি করেছেন। প্রহসনের গল্পরূপটিও সুগ্রথিত। হেমাঙ্গিনী ও অলীককুমারের প্রণয়-ব্যাপারের মুখ্য পরিকররূপে দেখা দিয়েছে প্রসন্ন আর গদাধর। জগদীশ মুখুজ্জের মোসাহেব গদাধরকে তিনি বলেছিলেন যে, যদি সে বিধবা বিয়ে করতে পারে তাহলে তাকে পাঁচ হাজার টাকা দেবেন। সেই অর্থের লোভে গদাধর এ-বাড়ির চাকরানী প্রসন্নকে বিধবা বিয়েতে রাজি করিয়েছিল। কিন্তু প্রসন্ন বললে, তার দিদিঠাকরুনের বিয়ে

না হলে সে বিয়ে করতে পারবে না। কেন না দিদিঠাকরুন তাকে বলেছেন যে তাঁর নিজের বিয়ে হয়ে গেলে পর তিনি প্রসন্নর বিয়ের খরচপত্র সব দেবেন। এই সূত্রে গদাধর শুনতে পেলে যে, দিদিঠাকরুনের বিয়েতে একটি বাগড়া পড়েছে—একটা মিথ্যে কথা ধরা পড়লেই অলীকবাবুর সঙ্গে সত্যসিন্ধুবাবু তাঁর মেয়ের বিয়ে দেবেন না। গদাধর তাই প্রসন্নর সঙ্গে পরামর্শ করে স্থির করলে যে, অলীকবাবুর মিথ্যে কথা যেই ধরা পড়বার মত হবে অমনি তাঁকে কোন-রকম করে বাঁচিয়ে দিতে হবে। রাজা-উজীর-মারা অলীককুমার এক একটি সংকট রচনা করছেন, আর গদাধর তাদের রূপ ধরে সত্যসিন্ধুর কাছে উপস্থিত হচ্ছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অলীককুমারের অলীক স্বপ্নগুলি জগদীশবাবুর আবির্ভাবে হাতে-নাতে ধরা পড়ল; এবং তিনি নাকে খৎ দিয়ে 'এমন কর্ম আর করব না'—বলতে বলতে মঞ্চ থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন।

এই প্রহসনে ঠাকুরবাড়ির ঘরোয়া অভিনয়ে সত্যসিন্ধুর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।[৮] কিশোর রবীন্দ্রনাথ নিজের অভিনয়কুশলতার নিঃসংশয় প্রমাণ দিয়েছিলেন অলীকবাবুর চরিত্ররূপায়ণে। কিন্তু সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল হেমাঙ্গিনীর ভূমিকায় কাদম্বরী দেবীর অভিনয়। প্রণয়-প্রহসনের প্রেমোচ্ছল নায়িকার আবেগগর্ভ অত্যুক্তির আদিরসকে হাস্যরসে রূপান্তরিত করে তোলার কঠিন ভূমিকাটিতে অভিনয় করা মোটেই সহজসাধ্য ছিল না। এই প্রসঙ্গে 'নবনাটক' অভিনয়ের কথা স্মরণীয়। সে দিন স্ত্রীভূমিকায় কবি অক্ষয় চৌধুরী শেষ পর্যন্ত দর্শকবৃন্দের সম্মুখে উপস্থিত হবার মতো সাহস কিছুতেই সঞ্চয় করতে পারেন নি। তার তুলনায় নরনারীর মিলিত মঞ্চাভিনয়ে হেমাঙ্গিনীর মতো চরিত্রকে রূপায়িত করে তোলা কতটা শক্তিসাপেক্ষ তা কল্পনা করা যেতে পারে।

'এমন কর্ম আর করব না' পরে 'অলীকবাবু' নামে প্রচলিত হয়। এই প্রহসন রবীন্দ্রনাথের প্রিয় ছিল। তিনি একাধিকবার তার অভিনয়ের আয়োজন করেছেন। তাঁর প্রযোজনায় পরবর্তীকালে [কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুর পরে] হেমাঙ্গিনীকে আর পাদপ্রদীপের সম্মুখে আনা হয় নি, তাকে নেপথ্যে রেখেই অভিনয় সম্পন্ন হয়েছে। নায়িকাকে নেপথ্যে রাখার এই রীতি 'বৈকুণ্ঠের খাতা' প্রহসনেও রবীন্দ্রনাথ সাফল্যের সঙ্গে অনুসরণ করেছেন।

বৈকুণ্ঠের খাতায় বৈকুণ্ঠ-চরিত্রসৃষ্টিতে সত্যসিন্ধুর সঙ্গে সত্যসিন্ধুর ভূমিকাভিনেতা দ্বিজেন্দ্রনাথও মিলিত হয়ে আছেন বলেই মনে হয়।

৪

'অলীকবাবু' থেকে 'মানময়ী' জোড়াসাঁকোর নাট্যসাধনার আরেকটি নূতন পদক্ষেপ। মানময়ীতে নাট্যভারতীর সঙ্গে মিলিত হয়েছেন গীতভারতী। মানময়ী গীতিনাটিকা। শুধু গীতিনাটিকা বললেই এর সবটুকু পরিচয় দেওয়া হয় না, 'দস্তুরভাঙা গীতিবিপ্লবের প্রলয়ানন্দে' এর সুরগুলির সৃষ্টি হয়েছিল 'জীবনস্মৃতি'তে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'জ্যোতিদাদা তখন প্রত্যহই প্রায় সমস্ত-দিন ওস্তাদি গানগুলাকে পিয়ানো যন্ত্রের মধ্যে ফেলিয়া তাহাদিগকে যথেচ্ছ মন্থন করিতে প্রবৃত্ত ছিলেন। তাহাতে ক্ষণে ক্ষণে রাগিণীগুলির এক-একটি অপূর্ব মূর্তি ও ভাবব্যঞ্জনা প্রকাশ পাইত। যে-সকল সুর বাঁধা নিয়মের মধ্যে মন্দগতিতে দস্তুর রাখিয়া চলে তাহাদিগকে প্রথাবিরুদ্ধ বিপর্যস্তভাবে দৌড় করাইবামাত্র সেই বিপ্লবে তাহাদের প্রকৃতিতে নূতন নূতন অভাবনীয় শক্তি দেখা দিত এবং তাহাতে আমাদের চিত্তকে সর্বদা বিচলিত করিয়া তুলিত। সুরগুলা যেন নানা প্রকার কথা কহিতেছে এইরূপ আমরা স্পষ্ট শুনিতে পাইতাম। আমি ও অক্ষয়বাবু অনেক সময়ে জ্যোতিদাদার সেই বাজনার সঙ্গে সঙ্গে সুরে কথাযোজনার চেষ্টা করিতাম। কথাগুলি যে সুপাঠ্য হইত তাহা নহে. তাহারা সেই সুরগুলির বাহনের কাজ করিত।'[১]

রবীন্দ্রনাথ তখন সদ্য বিলাত থেকে ফিরে এসেছেন। প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি তেতলার ছাদে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সৃষ্ট এই সুরলোকে প্রবেশ করলেন। এতদিন জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সুরসৃষ্টিতে ভাষা দিতেন অক্ষয় চৌধুরী; এবার তাতে যোগ দিলেন তরুণ রবীন্দ্রনাথ। তিনি এই গীতিনাটিকার শেষ সংগীতটি লিখে দিলেন: 'আয় তবে সহচরী, হাতে হাতে ধরি ধরি।' অল্পদিনের মধ্যেই 'মানময়ী'র অভিনয়ও সম্পন্ন হল।

মানময়ী একটি ক্ষুদ্র গীতিনাটিকা। এর আখ্যানভাগ গ্রন্থের 'পূর্বাভাসে' লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে: 'উর্বশী ইন্দ্রের প্রতি মান করিয়াছে। অনেক সাধ্য-সাধনাতেও সে মান ভাঙ্গিল না। মান ভাঙ্গাইবার

জন্য মদনকে রতি অনুরোধ করেন। মদন উর্বশীর নিকট উপস্থিত হইয়া ফুলবাণ মারে, তাহাতে উর্বশীর মান ভাঙ্গিয়া যায় ও সে ইন্দ্রের জন্য অধীর হয়। এদিকে বসন্ত মদনকে মদ খাওয়াইয়া তাহার ফুলবাণ চুরি করিয়া তাহাকেই মারে। মদন তাহাতে উর্বশীর প্রেমে মত্ত হইয়া তাহার সহিত প্রেমালাপ করিতেছে, বসন্ত এমন সময় দুষ্টামি করিয়া উর্বশীর পদানত মদনের কাছে রতিকে ডাকিয়া আনে। রতি মদনকে তিরস্কার করিতে করিতে চলিয়া যায় মদনও তাহাকে শান্ত করিবার জন্য তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যায়। পরে উর্বশীর মান ভঙ্গের জন্য তাহাকে উপহাসপূর্বক সকলে উল্লাস করিতে করিতে ইন্দ্রের সহিত মিলন করাইতে লইয়া গেল।'

'মানময়ী'র প্রথম অভিনয়ের তারিখ সঠিক জানা যায় নি। প্রভাতকুমার লিখেছেন, 'ইহাতে রবীন্দ্রনাথ মদনের, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ইন্দ্রের ও তাঁহার পত্নী কাদম্বরী দেবী উর্বশীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হন বলিয়া শুনিয়াছি।'[১০]

হেমাঙ্গিনীর ভূমিকায় কাদম্বরী দেবীর অভিনয়দক্ষতার পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল, উর্বশীর ভূমিকায় কণ্ঠসংগীতে তিনি নূতন শক্তির পরিচয় দিলেন। কেন না 'মানময়ী'র সংগীতাংশে মদন এবং উর্বশীই মুখ্যস্থান অধিকার করে রয়েছে। পূর্বেই বলা হয়েছে সেকালের বিখ্যাত সংগীতবিদ জগমোহন গাঙ্গুলির পৌত্রী বংশপরম্পরাসূত্রেই সংগীতের সহজাত শক্তির অধিকারিণী ছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সহযোগিতায় তা পরিশীলিত হয়েছিল। রবীন্দ্রকণ্ঠের সঙ্গে মিলিত হয়ে তা নব নব সুরের ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করতে লাগল। নাট্যাভিনয়ের প্রয়োজনে পুনঃপুনঃ মহড়ার মধ্য দিয়ে শুধু যে এই সংগীতচর্চা চলতে লাগল তা নয়, নব নব সুরসৃষ্টির আনন্দবেগেই তা অন্তর থেকে উৎসারিত হতে লাগল। অনুমান করা যেতে পারে, দেশী ও বিলাতি সুর মিশিয়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ বাংলা সংগীতের যে নবযুগ সৃষ্টি করেছেন তার বহু গান কাদম্বরী দেবীর নারীকণ্ঠের মাধুরীতেই প্রথম পরিপূর্ণ গীতিসত্তায় জন্মলাভ করেছিল। কিশোর-রবিকে কাদম্বরী দেবীই তাঁর অনুক্ষণ সঙ্গ ও সান্নিধ্য দিয়ে কাব্যরচনার প্রথম প্রেরণা দিয়েছিলেন। নবযুগের সুরস্রষ্টা তরুণ রবির সংগীত-সাধনায়ও তাঁর প্রেরণা অবিস্মরণীয়।

৫

এই পর্বের সার্থক পরিণতিতেই রবীন্দ্রনাথ 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র গীতি-নাট্যকার রূপে আবির্ভূত হলেন। বাংলা গীতিনাট্য-সৃষ্টিরও তা নবতর পর্যায়। মানময়ীতে গান ছাড়া গদ্যে কথাবার্তা ছিল। কিন্তু 'বাল্মীকি-প্রতিভা'তে কথাবার্তা অর্থাৎ নাট্যকাহিনীও গানের সুরেই রচিত হয়েছে। 'জীবনস্মৃতি'তে কবি লিখেছেন, 'এই দেশী ও বিলাতি সুরের চর্চার মধ্যে বাল্মীকি-প্রতিভার জন্ম হইল। ইহার সুরগুলি অধিকাংশই দেশি, কিন্তু এই গীতিনাট্যে তাহাকে তাহার বৈঠকি মর্যাদা হইতে অন্যক্ষেত্রে বাহির করিয়া আনা হইয়াছে; উড়িয়া চলা যাহার ব্যবসায় তাহাকে মাটিতে দৌড় করাইবার কাজে লাগান গিয়াছে। যাঁহারা এই গীতিনাট্যের অভিনয় দেখিয়াছেন তাঁহারা আশা করি এ-কথা সকলেই স্বীকার করিবেন যে, সংগীতকে এইরূপ নাট্যকার্যে নিযুক্ত করাটা অসংগত বা নিষ্ফল হয় নাই। বাল্মীকি-প্রতিভা গীতিনাট্যের ইহাই বিশেষত্ব, সংগীতের এইরূপ বন্ধনমোচন ও তাহাকে নিঃসংকোচে সকলপ্রকার ব্যবহারে লাগাইবার আনন্দ আমার মনকে বিশেষভাবে অধিকার করিয়াছিল। বাল্মীকি-প্রতিভার অনেকগুলি গান বৈঠকি-গান-ভাঙা, অনেকগুলি জ্যোতিদাদার রচিত গতের সুরে বসানো এবং গুটি তিনেক গান বিলাতি সুর হইতে লওয়া। আমাদের বৈঠকি গানের তেলেনা অঙ্গের সুরগুলিকে সহজেই এইরূপ নাটকের প্রয়োজনে ব্যবহার করা যাইতে পারে—এই নাট্যে অনেক স্থলে তাহা করা হইয়াছে। বিলাতি সুরের মধ্যে দুইটিকে ডাকাতদের মত্ততার গানে লাগানো হইয়াছে এবং একটি আইরিশ সুর বনদেবীর বিলাপগানে বসাইয়াছি। বস্তুত, বাল্মীকি-প্রতিভা পাঠযোগ্য কাব্যগ্রন্থ নহে, উহা সংগীতের একটি নূতন পরীক্ষা—অভিনয়ের সঙ্গে কানে না শুনিলে ইহার কোন স্বাদগ্রহণ সম্ভবপর নহে। য়ুরোপীয় ভাষায় যাহাকে অপেরা বলে, বাল্মীকি-প্রতিভা তাহা নহে—ইহা সুরে নাটিকা; অর্থাৎ সংগীতই ইহার মধ্যে প্রাধান্য লাভ করে নাই, ইহার নাট্যবিষয়টাকে সুর করিয়া অভিনয় করা হয় মাত্র—স্বতন্ত্র সংগীতের মাধুর্য ইহার অতি অল্প স্থলেই আছে।'[১১]

বিদ্বজ্জন সমাগম সভার বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে ঠাকুরবাড়িতে 'বাল্মীকি-

প্রতিভা'র প্রথম অভিনয় হয়েছিল ১২৮৭ বঙ্গাব্দের ১৬ই ফাল্গুন শনিবার। সেদিন ঠাকুরবাড়িতে কলিকাতার বহু বিদ্বজ্জনের সমাগম হয়েছিল। তাতে বঙ্কিমচন্দ্র, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রমুখ মনীষিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। নাট্যমঞ্চে সাধারণের সমক্ষে রবীন্দ্রনাথের সেই প্রথম অভিনয়। এর পূর্বের সমস্ত অভিনয়ই ছিল ঘরোয়া, নিতান্তই পারিবারিক চৌহদ্দিতে সীমাবদ্ধ। 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র ভাব ও সুরস্রষ্টা, গীতিনাট্যকার এবং বাল্মীকির ভূমিকাভিনেতা হিসাবে তরুণ রবি সেদিন যে সংবর্ধনা পেলেন তা তাঁর যশোমণ্ডিত জীবনেও ছিল অভূতপূর্ব। গুরুদাস তখন হাইকোর্টের উদীয়মান ব্যবহারজীবী। তিনি আবেগের উচ্ছ্বাসবশে রবীন্দ্রবন্দনামূলক একটি গানই রচনা করে ফেললেন। কবির পঞ্চাশৎ বর্ষের সম্বর্ধনার দিনে তিনি তাঁর গানটি জনসমাজে প্রকাশ করেন। 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র স্রষ্টাকে বন্দনা করে গুরুদাস লিখেছিলেন :

উঠ বঙ্গভূমি, মাতঃ ঘুমায়ে থেকো না আর,
অজ্ঞানতিমিরে তব সুপ্রভাত হল হেরো।
উঠেছে নবীন রবি, নব জগতের ছবি,
নব 'বাল্মীকি-প্রতিভা' দেখাইতে পুনর্বার।
হেরো তাহে প্রাণ ভরে, সুখতৃষ্ণা যাবে দূরে,
ঘুচিবে মনের ভ্রান্তি, পাবে শান্তি অনিবার।
'মণিময় ধূলারাশি' খোঁজ যাহা দিবানিশি,
ও ভাবে মজিলে মন খুঁজিতে চাবে না আর।

পরিতৃপ্ত রসিকচিত্তের এই উচ্ছ্বাস থেকেই অনুমান করা যেতে পারে সেদিন রবীন্দ্রনাথ কি অসামান্য সমাদর লাভ করেছিলেন। বিহারীলালের ভক্ত-পাঠিকা বালক-রবির কবিতা পড়ে কোনদিনই খুশি হতে পারেন নি। কিন্তু এই অভিনয়ের দিনে যখন 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র কবির কীর্তি সারদামঙ্গলের যশোগানকেও ছাপিয়ে উঠল তখন তিনি তাঁর দিব্যপ্রেরণার এই সার্থক পরিণতি দেখে, মুখ ফুটে কি বলেছিলেন তা আমাদের জানা নেই, কিন্তু অন্তরে অন্তরে যে পরম পরিতৃপ্তি লাভ করেছিলেন তা বলাই বাহুল্য।

৬

'বাল্মীকি-প্রতিভা' অভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রজীবনের এই পর্বটি শেষ হয়ে এল। বিলাত থেকে ফিরেছিলেন ১২৮৬ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসে। দ্বিতীয়বার বিলাত যাবার জন্যে জোড়াসাঁকো থেকে যাত্রা করলেন ১২৮৮ বঙ্গাব্দের ৯ বৈশাখ। এই চৌদ্দ মাসের পর্বটির মাঝখানে একটি ক্রোড়পত্র আছে। 'জীবনস্মৃতি'তে বলা হয়েছে, পিতৃনির্দেশে দেশে ফিরে আসার ফলে ইংলণ্ডে ব্যারিস্টারি পড়া অসমাপ্ত রেখেই চলে আসতে হয়েছিল; তাই তাঁর বন্ধুগণের কেউ কেউ দুঃখিত হয়ে তাঁকে পুনরায় বিলাত পাঠাবার জন্যে মহর্ষিদেবকে অনুরোধ করলেন। মহর্ষিদেব তখন মসুরি পাহাড়ে। সেখান থেকে তিনি ১২৮৭ বঙ্গাব্দের ৮ই ভাদ্র রবীন্দ্রনাথকে বিলাত-যাত্রার অনুমতি দিয়ে এক পত্রে লিখলেন, 'প্রাণাধিক রবি, আগামী সেপ্টেম্বর মাসে ইংলণ্ডে যাওয়া স্থির করিয়াছ এবং লিখিয়াছ যে আমি "ব্যারিস্টার হইব।" তোমার এই কথার উপরে নির্ভর করিয়া তোমাকে ইংলণ্ড যাইতে অনুমতি দিলাম। তুমি সৎপথে থাকিয়া কৃতকার্য হইয়া দেশেতে যথাসময়ে ফিরিয়া আসিবে, এই আশা অবলম্বন করিয়া থাকিলাম। সত্যেন্দ্র পাঠাবস্থাতে যতদিন ইংলণ্ডে ছিলেন, ততদিন · টাকা করিয়া প্রতিমাসে পাইতেন। তোমার জন্য মাসে…টাকা নির্ধারিত করিয়া দিলাম। ইহা যত পাউণ্ড হয় তাহাতেই তথাকার তোমার যাবতীয় খরচ নির্বাহ করিয়া লইবে। বারে প্রবেশের ফী এবং বার্ষিক চেম্বার ফী আবশ্যক মতে পাইবে। তুমি এবার ইংলণ্ডে গেলে প্রতিমাসে ন্যূনকল্পে একখানা করিয়া আমাকে পত্র লিখিবে। তোমার থাকার জন্য এবং পড়ার জন্য সেখানে যাইয়া যেমন যেমন ব্যবস্থা করিবে তাহার বিবরণ আমাকে লিখিবে। গত বারে সত্যেন্দ্র তোমার সঙ্গে ছিলেন, এবার মনে করিবে আমি তোমার সঙ্গে আছি। আমার স্নেহ জানিবে।'[১৭]

যে-কারণেই হোক, সেপ্টেম্বর মাসে রবীন্দ্রনাথের রওনা হওয়া সম্ভব হয় নি। কিন্তু তাঁর মন যে দূরযাত্রায় প্রস্তুত হয়েছিল তার প্রমাণ 'ভারতী'তে পৌষ মাসে প্রকাশিত সুদীর্ঘ "পথিক" কবিতাটি। কবিমানসের বিবর্তনে 'পথিক' 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে'র পূর্বাভাস বহন করে এনেছিল। ১৩১০ সালে মোহিতচন্দ্র সেনসম্পাদিত কাব্যগ্রন্থে 'শৈশব-সংগীতে'র এই শেষ কবিতা থেকে উদ্ধৃতি

আহরণ করে 'যাত্রা'-খণ্ড সংকলিত করা হয়। এই যাত্রাখণ্ডের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন,

কেবল তব মুখের পানে চাহিয়া
বাহির হনু তিমির রাতে তরণীখানি বাহিয়া।

বলাই বাহুল্য, যে-মুখে কবি তাঁর জীবনের ধ্রুবতারাকে দেখেছেন এ মুখও তাঁরই।

দ্বিতীয়বার বিলাতযাত্রা আরো ছ-মাস পিছিয়ে গেল। কেন গেল তার কারণ জানবার মতো কোনো উপাদান রবীন্দ্র-জীবনে রক্ষিত হয় নি। ছ-সাত মাস পরে পরবর্তী বৈশাখে রবীন্দ্রনাথ বিলাতের উদ্দেশে রওনা হলেন। সে যাত্রায় তাঁর সঙ্গী ছিলেন তাঁর ভাগিনেয় সত্যপ্রসাদ। কিন্তু তাঁর ব্যারিস্টার হওয়ার পুনরাবেদন পিতৃদেবের কাছে মঞ্জুর হলেও জীবনদেবতার কাছে মঞ্জুর হয় নি। তাই মাদ্রাজের ঘাট পর্যন্ত পৌঁছেই তাঁকে ফিরে আসতে হল। এই অপ্রত্যাশিত প্রত্যাবর্তনের প্রসঙ্গ-বর্ণনায় কবি 'জীবনস্মৃতি'তে বলেছেন, 'ঘটনাটা যত বড় গুরুতর, কারণটা তদনুরূপ কিছুই নহে; শুনিলে লোকে হাসিবে এবং সে হাস্যটা ষোলো-আনা আমারই প্রাপ্য নহে, এইজন্যই সেটাকে বিবৃত করিয়া বলিলাম না।'[১৩] কারণটি হাস্যোদ্দীপক সন্দেহ নেই। সত্যপ্রসাদ তখন সদ্য-বিবাহিত। ঘরের টান তাঁর পক্ষে এতই প্রবল হল যে তিনি আর সম্মুখের দিকে অগ্রসর হতে চাইলেন না, বাধ্য হয়ে রবীন্দ্রনাথকেও ফিরে আসতে হল।

কলকাতা ফিরে এসে কবি অপরাধীর মতো ভয়ে ভয়ে পিতৃদেবের কাছে মসুরিতে গেলেন। মহর্ষি কিন্তু বিন্দুমাত্র বিরক্তি প্রকাশ করলেন না। বরং তিনি যেন মনে মনে খুশিই হয়েছিলেন। পিতৃদেবের কাছ থেকে ফিরে এসে রবীন্দ্রনাথ আশ্রয় নিলেন চন্দননগরের গঙ্গাতীরে। জ্যোতিদাদা ও নতুন বৌঠান তখন সেখানেই মোরান সাহেবের বাগান-বাড়িতে রয়েছেন। চন্দন-নগরের গঙ্গাতীরবর্তী এই মোরান সাহেবের বাগান-বাড়ি রবীন্দ্রজীবনে অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। এখানেই কবির একবিংশতিতম বর্ষ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও কাদম্বরী দেবীর নিরবচ্ছিন্ন সঙ্গ ও সাহচর্যে অতিক্রান্ত হয়েছে। উত্তীর্ণ-কৈশোর কবি-জীবনে যৌবনের সেই প্রথম আবির্ভাবের স্বপ্নসুন্দর দিনরাত্রিগুলি নব-নব সৃষ্টিপ্রেরণায় একটি সহস্রদল পদ্মের মত পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে।

॥ উল্লেখ-পঞ্জী ॥

১ রবীন্দ্রজীবনী-১, পৃ° ৮১-৮২।

২ জীবনস্মৃতি, পৃ° ১২১।

৩ তদেব, গ্রন্থ-পরিচয়, পৃ° ২০৫।

৪ 'শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সঙ্ঘে'র উদ্যোগে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত রবীন্দ্রনাথের শতবার্ষিকী উৎসবে সভানেত্রীর ভাষণ : 'রবিকার জন্মদিনে।'

৫ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি, পৃ° ৭১-৭২।

৬ তদেব, পৃ° ১০৭-১০৮।

৭ দ্রষ্টব্য : রবীন্দ্র-কথা, পৃ° ১৯২-১৯৩।

৮ দ্রষ্টব্য : রবীন্দ্র-কথা, পৃ° ১৯৩।

৯ জীবনস্মৃতি, পৃ° ১২৩।

১০ রবীন্দ্রজীবনী-১, পৃ° ৮২।

১১ জীবনস্মৃতি, পৃ° ১২১।

১২ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পত্রাবলী, শ্রীপ্রিয়নাথ শাস্ত্রী, পৃ° ২০৮-২০৯।

১৩ জীবনস্মৃতি, পৃ° ১২৮।

অষ্টম অধ্যায়

মোরান সাহেবের বাগানবাড়ি

১

চন্দননগরের গঙ্গাতীরে মোরান সাহেবের বাগান-বাড়িতে কবিজীবনের একবিংশবর্ষটি নানা কারণেই অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে। কবি নিজেকে বলেছেন গাঙ্গেয়। তখনো তাঁর জীবনে পদ্মার ডাক আসে নি। গঙ্গাই তখনো কবিধাত্রী। ছেলেবেলায় একাধিক বার তিনি জ্যোতিদাদা ও নতুন বৌঠানের সঙ্গে এসেছেন গঙ্গাতীরে। মাঝে মাঝে জ্যোতিদাদা সস্ত্রীক যেতেন হাওয়া বদল করতে গঙ্গার ধারের বাগানে; কবিও তাঁদের সঙ্গী হতেন। চন্দননগরে প্রথম প্রথম যে বাড়িতে তাঁরা থাকতেন সেটা ছিল শহরের একপ্রান্তে একটা জীর্ণপ্রায় ছোট দোতলা বাড়ি। কিন্তু বিলাত-যাত্রার আরম্ভ-পথ থেকে যখন তিনি ফিরে এলেন তখন জ্যোতিদাদা আর নতুন বৌঠান বাসাবদল করে রয়েছেন মোরান সাহেবের বিখ্যাত হর্ম্যশোভিত বাগান-বাড়িতে। রবীন্দ্রনাথ সানন্দে তাঁদের সঙ্গ নিলেন এই রহস্যময় প্রাসাদে। 'ছেলেবেলা'য় কবি তাকে রাজবাড়ির সঙ্গেই তুলনা করেছেন। রঙিন কাঁচের জানলা দেওয়া উঁচু নীচু ঘর, মার্বেল পাথরে বাঁধা মেজে, ধাপে ধাপে গঙ্গার উপর থেকেই সিঁড়ি উঠেছে লম্বা বারান্দায়। বাড়িটি রহস্যময় এই জন্যে যে তার ঘরগুলি ছিল অসমতল। কোনটি উচ্চতলে, কোনটি দু চার ধাপ সিঁড়ি বেয়ে নীচে। ঘাটের উপরেই ছিল বৈঠকখানা। তার শার্সিগুলিতে ছিল রঙিন ছবিওয়ালা কাঁচ বসানো। 'জীবনস্মৃতি'তে তার দুটি বিশেষ ছবির কথা কবি উল্লেখ করেছেন। একটি ছবি ছিল, নিবিড় পল্লবে বেষ্টিত গাছের শাখায় একটি দোলা—সেই দোলায় রৌদ্রছায়াখচিত নিভৃত-নিকুঞ্জে দুজনে দুলছে। আর একটিতে ছিল এক দুর্গপ্রাসাদের সোপান-শ্রেণীতে উৎসববেশে সজ্জিত নরনারীর মেলা। এই দুটি ছবি সেই গঙ্গাতীরের আকাশকে যেন ছুটির সুরে ভরে তুলত। যেন কোন্ দূরদেশের, কোন্ দূরকালের উৎসব আপনার শব্দহীন কথাকে আলোর মধ্যে ঝলমল করে মেলে

দিত—আর কোথাকার একটি চিরনিভৃত ছায়ায় যুগলদোলনের রসমাধুর্য নদীতীরের বনশ্রেণীর মধ্যে একটি অপরিস্ফুট গল্পের বেদনা সঞ্চার করে দিত।

এই প্রাসাদের সর্বোচ্চ চূড়ায় ছিল চারদিক-খোলা একটি বৃত্তাকার গৃহ। সেখান থেকে দেখা যেত ঘন বকুল গাছের আগডালের চিকন পাতায় আলোর ঝিলিমিলি। চারদিক থেকে দুরন্ত বাতাসের লীলা সেখানে বাধা পেত না, আর ছাদের উপর থেকে মনে হত মেঘের মেলা যেন আকাশের পাশের আঙিনাতেই। এই অপূর্ব পরিবেশে, প্রকৃতির এই অবারিত আঙিনায় 'সন্ধ্যাসংগীতে'র কবি তাঁর কাব্যবধূর বাসর-ঘর রচনা করলেন। তরুণ প্রেমিকের অর্ধস্ফুট আধো-আধো ভাষায় গীতিকাব্যলক্ষ্মীকে আবাহন করে কবি লিখলেন:

অনন্ত এ আকাশের কোলে
টলমল মেঘের মাঝার,
এইখানে বাঁধিয়াছি ঘর
তোর তরে, কবিতা আমার।

* * *

গলাটি জড়ায়ে ধরি মোর
বসে রবি কোলের উপর।
এলোমেলো কেশপাশ লয়ে
বসে বসে খেলিব হেথায়,
উষার অলক দুলাইয়া
সমীরণ যেমন খেলায়!
চুমিয়া চুমিয়া ফুটাইব
আধফোটা হাসির কুসুম,
মুখ লয়ে বুকের মাঝারে
গান গেয়ে পাড়াইব ঘুম!
কৌতুকে করিয়া কোলাকুলি
আসিবে মেঘের শিশুগুলি,
ঘিরিয়া দাঁড়াবে তারা সবে
অবাক হইয়া চেয়ে রবে!

তাই তোরে ডাকিতেছি আমি
কবিতা রে আয় একবার,
নিরিবিলি দুটিতে মিলিয়া
র'ব হেথা, বধূটি আমার।'[১]

অনন্ত আকাশের কোলে টলমল মেঘের মাঝারে চন্দননগরের হর্ম্যশিখরের সেই আলস্যে আনন্দে অনির্বচনীয়, বিষাদে ও ব্যাকুলতায় জড়িত, স্নিগ্ধ শ্যামল নদীতীরের কলধ্বনিকরুণ দিনরাত্রিগুলি কবিমানসে অনবদ্য স্বপ্নের ডালি নিয়ে উপস্থিত হল। বাংলা দেশের এই আকাশভরা আলো, এই দক্ষিণের বাতাস, এই গঙ্গার প্রবাহ, এই রাজকীয় আলস্য, এই আকাশের নীল ও পৃথিবীর সবুজের মাঝখানকার দিগন্তপ্রসারিত উদার আকাশের মধ্যে এই মধুর আত্মসমর্পণ কবির পক্ষে তৃষ্ণার জল ও ক্ষুধার খাদ্যের মতোই অত্যাবশ্যক ছিল। প্রকৃতির এই অকৃপণ দাক্ষিণ্যের মধ্যে আকাশচারী দিব্য-বিহঙ্গের সেই স্বপ্ন-নীড়টিকে অনুক্ষণ সঙ্গসুধায় ভরে রেখেছিলেন কাদম্বরী দেবী। 'জীবনস্মৃতি'তে "গঙ্গাতীরে"র সেই স্বপ্নমধুর দিনগুলির কথা স্মরণ করে আবেগভরে কবি লিখেছেন :

'আমার গঙ্গাতীরের সেই সুন্দর দিনগুলি গঙ্গার জলে উৎসর্গ-করা পূর্ণ-বিকশিত পদ্মফুলের মতো একটি একটি করিয়া ভাসিয়া যাইতে লাগিল। কখনো বা ঘনঘোর বর্ষার দিনে হারমোনিয়ম যন্ত্রযোগে বিদ্যাপতির 'ভরাবাদর মাহভাদর' পদটিতে মনের মতো সুর বসাইয়া বর্ষার রাগিণী গাহিতে গাহিতে বৃষ্টিপাতমুখরিত জলধারাচ্ছন্ন মধ্যাহ্ন খ্যাপার মত কাটাইয়া দিতাম; কখনো বা সূর্যাস্তের সময় আমরা নৌকা লইয়া বাহির হইয়া পড়িতাম—জ্যোতিদাদা বেহালা বাজাইতেন, আমি গান গাহিতাম; পূরবী রাগিণী হইতে আরম্ভ করিয়া যখন বেহাগে গিয়া পৌঁছিতাম তখন পশ্চিমতটের আকাশে সোনার খেলনার কারখানা একেবারে নিঃশেষে দেউলে হইয়া গিয়া পূর্ববনান্ত হইতে চাঁদ উঠিয়া আসিত। আমরা যখন বাগানের ঘাটে ফিরিয়া আসিয়া নদী-তীরের ছাদটার উপরে বিছানা করিয়া বসিতাম তখন জলে স্থলে শুভ্র শান্তি, নদীতে নৌকা প্রায় নাই, তীরের বনরেখা অন্ধকারে নিবিড়, নদীর তরঙ্গহীন প্রবাহের উপর আলো ঝিকমিক করিতেছে।'[২]

২

'রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনে চন্দননগরের স্থান' সম্পর্কে চন্দননাগরিক হরিহর শেঠ বলেছেন, 'যেমন বুদ্ধের বুদ্ধত্বলাভে বুদ্ধগয়া, শ্রীরামকৃষ্ণের সিদ্ধিলাভে দক্ষিণেশ্বর, তেমনি রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনের উন্মেষে চন্দননগর ধন্য' হয়েছে।[৩] বলাই বাহুল্য, কথাটাতে অত্যুক্তির সুর লেগেছে। কিন্তু 'জীবনস্মৃতি'তে কবি নিজেই লিখেছেন, তাঁর কাব্য লেখার ইতিহাসের মধ্যে এই সময়টাই তাঁর পক্ষে সবচেয়ে স্মরণীয়। এই চন্দননগর-পর্বই কবিজীবনে 'সন্ধ্যাসংগীতে'র পর্ব। 'সন্ধ্যাসংগীতে'র পূর্ববর্তী কবিতাগুলিকে কবি কাঁচা বয়সে পরের লেখা মকশ-করা কপিবুকের লেখার সঙ্গে তুলনা করে বলেছেন, 'সেই কপিবুক যুগের চৌকাঠ পেরিয়েই প্রথম দেখা দিল 'সন্ধ্যাসংগীত'। 'সন্ধ্যাসংগীতে'ই আমার কাব্যের প্রথম পরিচয়।' এই 'সন্ধ্যাসংগীতে'র কবিতা রচনার পালা শুরু হয়েছে প্রথম বার বিলাত-প্রবাস থেকে প্রত্যাবর্তনের পর থেকেই, অর্থাৎ প্রায় বৎসরখানেক পূর্বে। কিন্তু 'সন্ধ্যাসংগীতে'র শেষ পালা সাঙ্গ হল চন্দননগরে।

মনে হয় পুরো একটি বছর কবি চন্দননগরে কাটালেন।[৪] এই পর্বে গদ্য ও পদ্যে অজস্র রচনা তাঁর লেখনীমুখে সৃষ্টি হয়েছে। 'ভারতী'তে প্রকাশিত ১২৮৮ বঙ্গাব্দের বৈশাখ থেকে ১২৮৯ বঙ্গাব্দের বৈশাখ পর্যন্ত কবির রচনাবলীর একটা তালিকা থেকে তাঁর সৃষ্টির অজস্রতা বুঝতে পারা যাবে। বৈশাখে বেরোল বস্তুগত ও ভাবগত কবিতা [প্রবন্ধ], বৈশাখেই কবি বিলাত-যাত্রার আরম্ভপথ থেকে ফিরে এসে চন্দননগরে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। জ্যৈষ্ঠের 'ভারতী'তে বেরোল জুতাব্যবস্থা [প্রবন্ধ], সংগীত ও ভাব [প্রবন্ধ], তারকার আত্মহত্যা [কবিতা], যথার্থ দোসর [প্রবন্ধ], চীনে মরণের ব্যবসায় [প্রবন্ধ]। আষাঢ়ে গোলামচোর [প্রবন্ধ], সংগীতের উৎপত্তি ও উপযোগিতা [প্রবন্ধ], সুখের বিলাপ [কবিতা], নিমন্ত্রণ-সভা [প্রবন্ধ], সম্পাদকের বৈঠকে ভিক্টর হ্যুগো, ব্রাউনিং-জায়া ও মুরের কবিতার অনুবাদ। শ্রাবণে কাব্যের অবস্থা পরিবর্তন [প্রবন্ধ], জাতীয়তার নিবেদনে অনতি-জাতীয়তার বক্তব্য [প্রবন্ধ], আশার নৈরাশ্য [কবিতা], প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ (বিদ্যাপতি) [প্রবন্ধ], চর্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় [প্রবন্ধ], 'বিবিধ প্রসঙ্গে'র

অন্তর্ভুক্ত মনের বাগানবাড়ি, গরিব হইবার সামর্থ্য, কিস্তওয়ালা, দয়ালু মাংসাশী [নিবন্ধনিচয়] ও ভানুসিংহের কবিতা [মরণরে তুহুঁ মম শ্যাম সমান।] ভাদ্রে দারোয়ান [প্রবন্ধ], শিশির [কবিতা], প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ (উত্তর প্রত্যুত্তর) [প্রবন্ধ], 'বিবিধ প্রসঙ্গে'র শূন্য, স্ত্রৈণ, জমা-খরচ, মনোগণিত, নৌকা, বসন্ত ও বর্ষা [নিবন্ধনিচয়]। আশ্বিনে ডি প্রোফণ্ডিস [প্রবন্ধ] এবং 'বিবিধ প্রসঙ্গে'র ফল ফুল, মাছ ধরা, ইচ্ছার দাম্ভিকতা, অভিনয়, খাঁটি বিনয়, ধরা কথা, অন্ত্যেষ্টিসৎকার, দ্রুতবুদ্ধি [নিবন্ধনিচয়]। কার্তিকে শুরু হল বৌঠাকুরাণীর হাট [উপন্যাস]; এক বৎসর পরে পরবর্তী আশ্বিনে এই উপন্যাসখানি শেষ হয়েছে। কার্তিকে বৌঠাকুরাণীর হাট ছাড়া বেরিয়েছে পরাজয় সংগীত [কবিতা], জীবন ও বর্ণমালা [প্রবন্ধ] এবং সম্পাদকের বৈঠকে বিভিন্ন ইংরেজি কবিতার অনুবাদ। অগ্রহায়ণে বিদ্যাপতির পরিশিষ্ট [প্রবন্ধ], অদ্বৈতবাদ ও আধুনিক ইংরাজ কবি [প্রবন্ধ], গান সমাপন [কবিতা], রেলগাড়ি [প্রবন্ধ]। পৌষে এক-চোখো সংস্কার [প্রবন্ধ], কবিতা সাধনা [কবিতা], অনুগ্রহ [কবিতা], 'বিবিধ প্রসঙ্গে'র ছোট ভাব, জগতের জন্ম-মৃত্যু, অসংখ্য জগৎ, জগতের জমিদারি [নিবন্ধনিচয়]। মাঘে সংগীত ও কবিতা [প্রবন্ধ], 'বিবিধ প্রসঙ্গে'র লজ্জাভূষণ, ঘর ও বাসাবাড়ি, নিরহংকার আত্মম্ভরিতা, আত্মময় আত্মবিস্মৃতি, বেশী দেখা ও কম দেখা, আত্মীয়ের বেড়া [নিবন্ধনিচয়], সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় [প্রবন্ধ], মহাস্বপ্ন [কবিতা]। ফাল্গুনে 'বিবিধ প্রসঙ্গে'র আত্মসংসর্গ, বধিরতার সুখ, প্রাতঃকাল ও সন্ধ্যাকাল, বন্ধুত্ব ও ভালবাসা, আদর্শ প্রেম [নিবন্ধনিচয়]; সংগ্রাম সংগীত [কবিতা], চণ্ডিদাস ও বিদ্যাপতি [প্রবন্ধ], গান [কেন গো সে যেন মোরে করে না বিশ্বাস ?]। চৈত্রে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় [কবিতা], 'বিবিধ প্রসঙ্গে'র প্রকৃতি পুরুষ, জগৎপীড়া নিবন্ধদ্বয়। ১২৮৯ বঙ্গাব্দের বৈশাখে বেরিয়েছে আমিহারা [কবিতা] এবং 'বিবিধ প্রসঙ্গে'র অনধিকার, অধিকার ও উপভোগ নিবন্ধত্রয়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে 'বিবিধ প্রসঙ্গে'র ক্ষুদ্র প্রবন্ধগুলি 'ভারতী'তে ৮৮ বঙ্গাব্দের শ্রাবণে প্রথম প্রকাশিত হয়, মাঝখানে কার্তিক ও অগ্রহায়ণ এই দুটি মাস বন্ধ থেকে ধারাবাহিক ভাবে পরবর্তী বৈশাখে 'বিবিধ প্রসঙ্গ' সমাপ্ত হয়েছিল।

উপরের সুদীর্ঘ রচনাপঞ্জী থেকেই বুঝতে পারা যাবে, চন্দননগরে কবিমানসে

বিচিত্র চিন্তা কল্পনা ও হৃদয়াবেগের উর্মিমালা ভেসে বেড়াচ্ছিল। গুরুগম্ভীর সাহিত্য-সমাজ ও রাষ্ট্রনীতি-চিন্তার পরিচয় যেমন রয়েছে একাধিক প্রবন্ধে, তেমনি তাঁর সৃজনীপ্রতিভায় ধরা দিয়েছে তাঁর প্রথম বিরাট কীর্তি 'বৌঠাকুরাণীর হাট' উপন্যাস। সঙ্গে সঙ্গে চলছে আত্মগত ভাবোচ্ছ্বাসের লহরীলীলা। তদ্গতচিত্ত কবি নিজের মানসলোকের অতল গভীর রহস্যে অবগাহন করে তুলে আনছেন ভাবনা-কল্পনার বিচিত্র-রত্নরাজি। একদিকে রয়েছে তাঁর বহির্মুখী চিত্তের ভাববিচিত্রা, অন্যদিকে আছে অন্তর্মুখী হৃদয়াবেগের স্বগতোক্তিমালা। এই বৎসরের কবিতাগুলি 'সন্ধ্যাসংগীতে'র সাজি পূর্ণ করেছে। আর স্বগতভাষী গদ্যনিবন্ধগুলি সংকলিত হয়েছে কবির প্রথম প্রবন্ধগ্রন্থ 'বিবিধ প্রসঙ্গে'। রবীন্দ্র-জীবনীকার বলেছেন, 'সন্ধ্যাসংগীতের কবিতাগুলি মনঃসংযোগ সহকারে পাঠ করিলে বুঝা যাইবে যে, বিচিত্র মান-অভিমান রাগ-অনুরাগের দ্বন্দ্ব হইতে যে বিষাদ সৃষ্টি হয় তাহাই এই লিরিক বা সংগীতে মূর্তি পাইয়াছে।'[৫] 'বিবিধ প্রসঙ্গে'র প্রবন্ধগুলি 'সন্ধ্যাসংগীতে'র দোসর। 'সন্ধ্যাসংগীতে' পদ্যের ভাষায় কবির যে হৃদয়াবেগ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে, সেই হৃদয়াবেগেরই আলো-আঁধারি লীলা গদ্যভঙ্গিতে ধরা পড়েছে 'বিবিধ প্রসঙ্গে'। এই প্রসঙ্গে কবি নিজেই তাঁর 'জীবনস্মৃতি'তে বলেছেন, 'যখন সন্ধ্যাসংগীত লিখিতেছিলাম তখন খণ্ড খণ্ড গদ্য 'বিবিধ প্রসঙ্গ' নামে বাহির হইতেছিল। আর প্রভাতসংগীত যখন লিখিতেছিলাম কিংবা তাহার কিছু পর হইতে ওইরূপ গদ্য লেখাগুলি 'আলোচনা' নামক গ্রন্থে সংগৃহীত হইয়া ছাপা হইয়াছিল এই দুই গদ্যগ্রন্থে ['বিবিধ প্রসঙ্গ' ও 'আলোচনা'] যে প্রভেদ ঘটিয়াছে তাহা পড়িয়া দেখিলেই লেখকের চিত্তের গতি নির্ণয় করা কঠিন হয় না।'[৬] এই প্রভেদের আর একটি ইঙ্গিত পাওয়া যাবে রচনাবলী-সংস্করণে 'প্রভাতসংগীতে'র ভূমিকা-রূপে প্রকাশিত 'কবির ভণিতা'য়। সেখানে কবি বলছেন, 'সন্ধ্যাসংগীতের পর্বে আমার মনে কেবলমাত্র হৃদয়াবেগের গদ্‌গদভাষী আন্দোলন চলছিল। প্রভাতসংগীতের ঋতুতে আপনা-আপনি দেখা দিতে আরম্ভ করেছে একটা-আধটা মননের রূপ।' এখানে 'সন্ধ্যাসংগীতে'র কবিতাবলী সম্পর্কে কবির যে বক্তব্য তাই সমভাবে প্রযোজ্য 'সন্ধ্যাসংগীতে'র দোসর 'বিবিধ প্রসঙ্গে'র গদ্য-রচনাবলী সম্পর্কে। কবিমানসে বিলসিত 'হৃদয়াবেগের গদ্‌গদভাষী আন্দোলন' থেকেই তাদের উদ্ভব।

৩

এই পর্বের আদিতে একটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ আছে, প্রবন্ধটির নাম "যথার্থ দোসর"। দুর্ভাগ্যবশত কবি এই প্রবন্ধটিকে কোন গ্রন্থে স্থান দেন নি। প্রবন্ধটি বেরিয়েছিল ১২৮৮ বঙ্গাব্দের 'ভারতী'র জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায়। অর্থাৎ চন্দননগর-বাসের গোড়াতেই প্রবন্ধটির জন্ম। প্রেম সম্পর্কে কবির মনে সেদিন কী চিন্তা ও কল্পনা জেগেছিল তার সাক্ষ্য হিসাবে প্রবন্ধটি অপরিসীম গুরুত্ব বহন করে। এদিক দিয়ে "যথার্থ দোসর"কে 'বিবিধ প্রসঙ্গে'র পূর্বরঙ্গও বলা যেতে পারে।

শেলির একটি কবিতার অনুবাদ দিয়ে কবি প্রবন্ধটির আরম্ভ করে তৎকালীন ইংরেজি গীতিকাব্যের ভাব-বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে বলেছেন, 'আধুনিক ইংরেজী কবিতার মধ্যে আশ্রয়প্রয়াসী হৃদয়ের বিলাপসংগীত প্রায় শুনা যায়।' এই চমকপ্রদ বাক্য দিয়েই প্রবন্ধটির আরম্ভ। কবি বলেছেন, 'আধুনিক ইংরেজ কবিরা অসন্তোষ ও অতৃপ্তির রাগিণীতেই অধিকাংশ গান গাহিয়া থাকেন। যাহা ছিল ও হারাইয়া গিয়াছে, তাহার জন্য যে কেহ বিলাপ করিবেন তাহাতে আশ্চর্য নাই; কিন্তু যাহা ছিল না, যাহা পাইতেছি না, অথচ যাহা জানি না, তাহার জন্যই সম্প্রতি একটা বিলাপধ্বনি উঠিয়াছে। কিছুতেই একটা আশ্রয় মিলিতেছে না. এই একটা ভাব; যেন একটা আশ্রয় আছে, আমি জানি, তাহার ঠিক রাস্তাটা খুঁজিয়া পাইতেছি না বলিয়া মিলিতেছে না, দিক্‌ভ্রম ঘুচিলেই মিলিবে, এইরূপ একটা বিশ্বাস। * * * এখনকার কবিরা দেখিতেছেন, প্রেমে তৃপ্তি নাই, সে অতৃপ্তি নিরাশার অতৃপ্তি নহে, অভাবের অতৃপ্তি। তাঁহারা কাহাকে ভালবাসিবেন খুঁজিয়া পান না, অথচ হৃদয়ে ভালবাসার অভাব নাই। * * * ক্রমে ক্রমে এখন এমন হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, কবিরা ভালবাসিতেছেন, অথচ ভালবাসিবার লোক নাই। এক ব্যক্তির সহিত মিলনের জন্য অত্যন্ত ঔৎসুক্য, অথচ তাহার সঙ্গে কোন জন্মে দেখা সাক্ষাৎ, আলাপ পরিচয়. জানা শোনা পর্যন্ত হয় নি। মন যেন কে একজনকে ভালবাসিতেছে, অথচ নিজে তাহার সম্বন্ধে কিছুমাত্র জানে না। * * * এখন কবিরা দেখিতেছেন, হৃদয় প্রেমের অতিথিশালা নহে, হৃদয় প্রেমের জন্মভূমি। প্রেম একটি পাত্র অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছে। * * * একটি হৃদয়ের জন্য

একটি হৃদয় গঠিত হইয়া আছেই। তাহারা পরস্পর পরস্পরের জন্য। শতক্রোশ ব্যবধানে, এমন কি, জগৎ হইতে জগতান্তরের ব্যবধানেও তাহাদের মধ্যে একটা আকর্ষণ থাকে। তাহাদের মধ্যে দেখা শুনা হউক বা না হউক, জানা শুনা থাকুক বা না থাকুক, তাহাদের উভয়ের মধ্যে যেমন সম্বন্ধ, তেমন কোন দুই পরিচিত ব্যক্তির, কোন দুই বন্ধুর মধ্যে নাই। ঘটনাচক্রে পড়িয়া তাহারা বিচ্ছিন্ন, কিন্তু তাহারা বিবাহিত। তাহাদের অনন্ত দাম্পত্য। * * * দুই দুইটি করিয়া হৃদয় আছে, প্রকৃতি নিজে পৌরোহিত্য করিয়া যাহাদের বিবাহ দিয়াছেন। তাহাদের বিবাহবন্ধন বিচ্ছিন্ন হইবার নহে। হৃদয় যে একটি প্রেমের পাত্র চায়, সে প্রেমের পাত্র আর কেহ নহে, সেই নির্দিষ্ট হৃদয়। হয়তো পৃথিবীতে তাহার সহিত দেখা শুনা হইল না, কবে যে হইবে তাহার স্থিরতা নাই। * * * তোমার জন্য যে হৃদয় নির্দিষ্ট রহিয়াছে, তোমার মনের এমনি ধর্ম যে, তাহাকে তুমি ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারিবে না, এবং সেও তোমাকে ভালবাসিবে, প্রকৃতি এমনি উপায় করিয়া রাখিয়া দিয়াছেন। কিন্তু তবে কেন সংসারে প্রণয় লইয়া এত গোলযোগ হয়। তবে কেন 'প্রকৃত স্রোত প্রশান্ত ভাবে বহে না?' যতক্ষণে না আমাদের যথার্থ দোসরকে পাই, ততক্ষণে তাহার সহিত যাহার কোন বিষয়ে মিল আছে, আমরা তাহার প্রতিই আকৃষ্ট হই। এমনো সচরাচর হইয়া থাকে, প্রথমে একজনকে ভালবাসিলাম, তাহার কিছুদিন পরে আর তাহাকে ভাল বাসিলাম না, এমন কি আর একজনকে ভাল বাসিলাম। তাহার কারণ এই যে, প্রথমে তাহার সহিত আমার প্রকৃত দোসরের সাদৃশ্য দেখিয়া তাহার প্রতি অনুরক্ত হইলাম, কিন্তু কিছুদিন নিরীক্ষণ করিয়া করিয়া তাহার বৈসাদৃশ্যগুলি একে একে চক্ষে পড়িতে লাগিল, ও অবশেষে তাহার অপেক্ষা সদৃশতর লোককে দেখিতে পাইলাম, আমার ভালবাসা স্থান পরিবর্তন করিল। * * * এই সকল কারণেই প্রেমে এত গোলযোগ বাধে। এই সকল কারণেই আমরা (তাহার দোষ থাকুক বা গুণ থাকুক) একজনকে অন্ধভাবে ভালবাসি, অথচ কেন ভালবাসি তাহা ভাবিয়া পাই না, সে আমাদের প্রতি সহস্র নির্যাতন করুক, সহস্র অন্যায় ব্যবহার করুক, কিছুতেই তাহাকে না ভালবাসিয়া থাকিতে পারি না। * * * কিন্তু মিল আছেই। এমন বস্তু নাই যাহার মিল নাই। এ জগৎ মিলের রাজ্য, প্রতি বর্ণের মিল আছে, প্রতি সুরের মিল আছে, প্রতি হৃদয়েরও মিল আছে।

এ জগৎ মিত্রাক্ষরের কবিতা। এত মিল, এত অনুপ্রাস কোন কবিতাতেই নাই। * * * মনের মানুষ পাইবার জন্য যেরূপ দুর্দান্ত ইচ্ছা, অথচ সংসারে মনের মানুষ লইয়া এত অশ্রুপাত, হৃদয়ের এত রক্তপাত করিতে হয় যে, মনে হয় একদিন বোধ করি আসিবে, যেদিন মনের মানুষ মিলিবে, অথচ এত কাঁদিতে হইবে না। হৃদয়ের প্রতিমার নিকট হৃদয়কে বলিদান দিতে হইবে না। ভালবাসা ও সুখ, ভালবাসা ও শান্তি এক পরিবারভুক্ত হইয়া বাস করিবে। এ সংসারে লোক ভালবাসে, অথচ ভালবাসার সমগ্র প্রতিদান পায় না, ইহা বিকৃত অবস্থা, অসম্পূর্ণ অবস্থা। এ অসম্পূর্ণ অবস্থা একদিন-না-একদিন দূর হইবে। * * * হৃদয়ে সেই দোসরের একটি অশরীরী প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহাকেই ভালবাস, তাহার সহিত কথোপকথন কর। তাহাকে বল, হে আমার প্রাণের দোসর, আমার হৃদয়ের হৃদয়, আমি সিংহাসন প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি, কবে তুমি আসিবে? এ সিংহাসনে যদি আর কাহাকেও বসাইয়া থাকি, তবে তাহা ভ্রমক্রমে হইয়াছে; কিছুতেই সন্তোষ হয় নাই, কিছুতেই তৃপ্তি হয় নাই, তাই তোমার জন্য অপেক্ষা করিয়া বসিয়া আছি।"

উদ্ধৃত অংশে প্রবন্ধটির যে সার সংকলন করা হয়েছে তাতেই তার সামগ্রিক ভাবরূপটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কবি শেলি, এডুইন আর্নল্ড ও ক্রিশ্চিনা রসেটির কবিতার স্ব-কৃত অনুবাদ উদ্ধার করে বক্তব্যকে বলিষ্ঠ করেছেন এবং প্রবন্ধশেষে আর্থার ও'শানেসির [Arthur O'Shaughnessy] কবিতা থেকে দীর্ঘ উদ্ধৃতি দিয়ে তাঁর মূল বক্তব্যের উপসংহার রচনা করেছেন। রবীন্দ্রমানসের উপর সমকালীন ইংরেজি রোমান্টিক কাব্যের প্রভাব কত গূঢ়সঞ্চারী ছিল তার বিচারপ্রসঙ্গে প্রবন্ধটি অপরিহার্য। তরুণ কবির প্রেম-চেতনার বিবর্তনের দিক দিয়েও "যথার্থ দোসরে"র তাৎপর্য দূরপ্রসারী।

৪

'বিবিধ প্রসঙ্গে'র বেশির ভাগ রচনাই এই একই সূত্রে গাঁথা। লীরিকধর্মী এই মন্ময় রচনাগুলি 'পুষ্পাঞ্জলি'-'লিপিকা'র অগ্রদূত। "বসন্ত ও বর্ষা", "প্রাতঃকাল ও সন্ধ্যাকাল" প্রভৃতি লেখা ভাবুকতার দিক দিয়ে রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ রচনাবলীর পর্যায়ভুক্ত। কিন্তু মূলত 'বিবিধ প্রসঙ্গ' 'সন্ধ্যাসংগীত'-পর্বের

কবিমানসের কড়চা। 'সন্ধ্যাসংগীতে' যে মান-অভিমান রাগ-অনুরাগের দ্বন্দ্বে কবিচিত্ত আন্দোলিত হয়েছে 'বিবিধ প্রসঙ্গ' যেন তারই সহজবোধ্য গদ্যভাষ্য। কবি নিজেই বলেছেন, 'ইহা একটি মনের কিছুদিনকার ইতিহাস মাত্র।' * * * 'আমার হৃদয়ে প্রত্যহ যাহা জন্মিয়াছে যাহা ফুটিয়াছে, তাহা পাতার মত ফুলের মত তোমাদের সম্মুখে প্রসারিত করিয়া দিলাম। ইহারা আমার মনের পোষণকার্যের সহায়তা করিয়াছে, তোমাদেরও হয়তো কাজে লাগিতে পারে।'[৮]

কবি স্বয়ং যাকে বলেছেন 'একটি মনের কিছুদিনকার ইতিহাস', [অন্যত্র, 'এ গ্রন্থ মনের ইতিহাসের এক অংশ'] আমরা তাকেই বলতে চেয়েছি, কবি-মানসের কড়চা। চন্দননগরে মোরান সাহেবের বাগান-বাড়িতে কাদম্বরী দেবীর নিরবচ্ছিন্ন সঙ্গ ও সান্নিধ্যের মধ্যে তাঁরই অনুরক্ত ভক্তকবির চিত্তে নবযৌবনের যে বিচিত্র ভাবরশ্মি বিচ্ছুরিত হয়েছিল 'বিবিধ প্রসঙ্গে' রয়েছে তারই আলোছায়ার লীলা। গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় কবি প্রবন্ধগুলির ক্রম ভেঙে দিয়ে তাদের পুনর্বিন্যস্ত করেছিলেন। কিন্তু কবিমানসের ক্রমবিবর্তনের ধারাটি স্পষ্টতর ভাবে ধরা সহজ হবে বলে আমরা 'ভারতী'তে প্রকাশিত ক্রমটিই অনুসরণ করব।

'ভারতী'তে প্রকাশের প্রথম দিকে প্রবন্ধগুলির শিরোনামা দেওয়া ছিল না। ১, ২, ৩ সংখ্যা দিয়ে 'বিবিধ প্রসঙ্গ' এই শিরোনামাতেই তাদের গ্রথিত করে দেওয়া হত। শেষের তিন কিস্তি অর্থাৎ ফাল্গুন, চৈত্র ও বৈশাখে প্রবন্ধগুলির পৃথক পৃথক নামকরণ করা হয়েছিল। প্রথম কিস্তি যখন ১২৮৮ বঙ্গাব্দের শ্রাবণে শুরু হয় তখন তার আদিতে ছোট্ট একটি ভূমিকা ছিল। ভূমিকাতে কবি লিখেছিলেন, 'স্মরণ হইতেছে, ফরাসীস্ পণ্ডিত পাস্কাল একজনকে একটি দীর্ঘ পত্র লিখিয়া অবশেষে উপসংহারে লিখিয়াছেন, মার্জনা করিবেন, সময় অল্প থাকাতে বড় চিঠি লিখিতে হইল, ছোট চিঠি লিখিবার সময় নাই। আমাদের হাতে যখন বিশেষ সময় থাকিবে তখন মাঝে মাঝে সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ পাঠকদের উপহার দিব।' অর্থাৎ প্রবন্ধগুলি সংক্ষিপ্ত বা স্বল্পায়তন হলেও হালকা ভাবে লিখিত নয়। কবিমানসে অধিবাসিত হয়ে প্রকাশের পূর্বে তারা প্রচুর সময় নিয়েছে। গীতিকবিতা যেমন আয়তনে বা অবয়বে ক্ষুদ্র, কিন্তু কবির হৃদয়কাননে বিকশিত সেই ভাবপুষ্পগুলির

প্রস্ফুটনের একটি নিগূঢ় ইতিহাস থাকে, আত্মমগ্ন এই লীরিক প্রবন্ধগুলিও তেমনি আকারে সংক্ষিপ্ত কিন্তু তারা তরুণ কবির হৃদয়রাজ্যে সযত্নলালিত ভাব ও ভাবনারই সংহত বাণীরূপ। তা ছাড়া একবিংশ-বর্ষ-বয়স্ক কবি-প্রেমিকের মহাশিল্পশালায় যে মৌলিক উপাদানগুলি তাঁর মানসগঠনে ক্রিয়াশীল হয়েছিল 'বিবিধ প্রসঙ্গে'র মধ্যেই তাদের অভ্রান্ত সন্ধান পাওয়া যাবে। সেদিনকার তরুণ কবির প্রেমচেতনার স্বরূপনির্ণয়ে এই রচনাগুলির মূল্য অপরিসীম। কেন না, এরাই সে ইতিহাসের মুখ্য সাক্ষী। কবি তাঁর মনের সেই দিনগুলির 'ইতিহাস' গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় লিখেছিলেন, 'পাঠকদের মধ্যে এইরূপ আমার কতকগুলি অপরিচিত বন্ধু আছেন, আমার হৃদয়ের ইতিহাস পড়িতে তাঁহাদের ভাল লাগিতেও পারে। তাঁহারা আমার লেখা লইয়া অকারণ তর্কবিতর্ক অনর্থক সমালোচনা করিবেন না, তাঁহারা কেবল আমাকে চিনিবেন ও পড়িবেন। যদি এ কল্পনা মিথ্যা হয় তো হউক, কিন্তু ইহারই উপর নির্ভর করিয়া আমার লেখা প্রকাশ করি। নহিলে কেবলমাত্র শকুনি গৃধিনীদের দ্বারা ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিবার জন্য নির্মমতার অনাবৃত শ্মশান-ক্ষেত্রের মধ্যে নিজের হৃদয়খানা কে ফেলিয়া রাখিতে পারে?'[১] কবির এই ঐকান্তিক কামনার প্রতি লক্ষ্য রেখে 'ভারতী'তে প্রকাশিত ধারাবাহিকতা রক্ষা করে 'বিবিধ প্রসঙ্গে'র মূল বক্তব্যগুলি নিম্নে সঞ্চয়ন করা হল :

শ্রাবণ ১২৮৮

ভালবাসা অর্থে আত্মসমর্পণ নহে। ভালবাসা অর্থে, নিজের যাহা কিছু ভাল তাহাই সমর্পণ করা। হৃদয়ে প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করা নহে; হৃদয়ের যেখানে দেবত্রভূমি, যেখানে মন্দির, সেইখানে প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করা।

যাহাকে তুমি ভালবাস, তাহাকে ফুল দাও, কাঁটা দিও না; তোমার হৃদয়-সরোবরের পদ্ম দাও, পঙ্ক দিও না। হাসির হীরা দাও, অশ্রুর মুক্তা দাও, হাসির বিদ্যুৎ দিও না, অশ্রুর বাদল দিও না। প্রেম হৃদয়ের সারভাগ মাত্র। হৃদয় মন্থন করিয়া যে অমৃতটুকু উঠে তাহাই। অসুর আসিয়া খায়, কিন্তু তাহাকে দেবতার ছদ্মবেশে খাইতে হয়। যাহাকে তুমি দেবতা বলিয়া জান, তাহাকেই তুমি অমৃত দাও, যাহাকে দেবতা বলিয়া বোধ হইতেছে, তাহাকেই অমৃত দাও। কিন্তু এমন মহাদেব সংসারে আছেন, যিনি দেবতা বটেন, কিন্তু যাঁহার ভাগ্যে অমৃত জুটে নাই, সংসারের সমস্ত বিষ

তাঁহাকে পান করিতে হইয়াছে, আবার এমন রাহুও আছে যে অমৃত খাইয়া থাকে।

* * *

এমন এক একজনকে আমার চোখের সামনে আমার মনের প্রতিবেশী করিয়া রাখা উচিত, যে আমার আদর্শ মনুষ্য। সে যে সত্যকার আদর্শ মনুষ্য এমন না হইতে পারে; তাহার মনের যতটুকু আদর্শ ভাব সেইটুকুই সে আমার কাছে প্রকাশ করিয়াছে। তাহার সঙ্গে আমার অন্য কোন কাজকর্মের সম্পর্ক নাই, কেনা-বেচার সম্বন্ধ নাই, দলিল-দস্তাবেজের আত্মীয়তা নাই। আমি তাহার নিকট আদর্শ, সে আমার নিকট আদর্শ। আমার মনের বাগান-বাড়ি তাহার জন্য ছাড়িয়া দিয়াছি, সে তাহার বাগানটি আমার জন্য রাখিয়াছে।

* * *

সত্যকার আদর্শ লোক সংসারে পাওয়া দুঃসাধ্য। ভালবাসার একটি মহান্ গুণ এই যে, সে প্রত্যেককে নিদেন একজনের নিকটেও আদর্শ করিয়া তুলে। এইরূপে সংসারে আদর্শ ভাবের চর্চা হইতে থাকে। ভালবাসার খাতিরে লোককে মনের মধ্যে ফুলের গাছ রোপণ করিতে হয়, ইহাতে তাহার নিজের মনের স্বাস্থ্য সম্পাদন হয়, আর তাহার মনোবিহারী বন্ধুর স্বাস্থ্যের পক্ষেও ইহা অত্যন্ত উপযোগী। * * * যাঁহাদের হৃদয়-কাননের ফুল শুকাইয়াছে, ফুলগাছ মরিয়া গিয়াছে, চারিদিকে কাঁটাগাছ জন্মিয়াছে, এমন সকল অনুর্বর-হৃদয় বিজ্ঞ বৃদ্ধেরাই ভালবাসার নিন্দা করেন। [মনের বাগান-বাড়ি। এই প্রবন্ধ দিয়েই গ্রন্থের আরম্ভ, গ্রন্থের মূল স্বরটি ওর মধ্যেই উচ্চারিত।]

ভাদ্র ১২৮৮

এক বিরহিণী আমাদের জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইয়াছেন, বিরহের পক্ষে বসন্ত গুরুতর কি বর্ষা গুরুতর? এ বিষয়ে তিনি অবশ্য আমাদের অপেক্ষা ঢের ভাল বুঝেন। * *

বসন্ত উদাসীন, গৃহত্যাগী। বর্ষা সংসারী, গৃহী। বসন্ত আমাদের মনকে চারিদিকে বিক্ষিপ্ত করিয়া দেয়, বর্ষা তাহাকে একস্থানে ঘনীভূত করিয়া রাখে। বসন্তে আমাদের মন অন্তঃপুর হইতে বাহির হইয়া যায়, বাতাসের উপর ভাসিতে থাকে, ফুলের গন্ধে মাতাল হইয়া জ্যোৎস্নার মধ্যে ঘুমাইয়া পড়ে;

আমাদের মন বাতাসের মত, ফুলের গন্ধের মত, জ্যোৎস্নার মত, লঘু হইয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। বসন্তে বহির্জগৎ গৃহ-দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া আমাদের মনকে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যায়। বর্ষায় আমাদের মনের চারিদিকে বৃষ্টিজলের যবনিকা টানিয়া দেয়, মাথার উপরে মেঘের চাঁদোয়া খাটাইয়া দেয়। মন চারিদিক হইতে ফিরিয়া আসিয়া এই যবনিকার মধ্যে এই চাঁদোয়ার তলে একত্র হয়। * * বর্ষাকালে আমাদের "আমি" গাঢ়তর হয়; আর বসন্তকালে সে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে।

এখন দেখা যাক, বসন্তকালের ও বর্ষাকালের বিরহে প্রভেদ কি। বসন্তকালে আমরা বহির্জগৎ উপভোগ করি; উপভোগের সমস্ত উপাদান আছে, কেবল একটি পাইতেছি না; উপভোগের একটা মহা অসম্পূর্ণতা দেখিতেছি। সেই জন্যই আর কিছুই ভাল লাগিতেছে না। এত দিন আমার সুখ ঘুমাইয়াছিল, আমার প্রিয়তম ছিল না; আমার আর কোন সুখের উপকরণও ছিল না। কিন্তু জ্যোৎস্না, বাতাস ও সুগন্ধে মিলিয়া ষড়যন্ত্র করিয়া আমার সুখকে জাগাইয়া তুলিল; সে জাগিয়া দেখিল, তাহার দারুণ অভাব বিদ্যমান। সে কাঁদিতে লাগিল। এই রোদনই বসন্তের বিরহ। [স্মরণীয়: 'রোদনভরা এ বসন্ত' গান]

বর্ষাকালে বিরহিণীর সমস্ত "আমি" একত্র হয়, সমস্ত "আমি" জাগিয়া উঠে, দেখে যে বিচ্ছিন্ন "আমি" একক "আমি" অসম্পূর্ণ। সে কাঁদিতে থাকে। সে তাহার নিজের অসম্পূর্ণতা পূর্ণ করিবার জন্য কাহাকেও খুঁজিয়া পায় না। চারিদিকে বৃষ্টি পড়িতেছে, অন্ধকার করিয়াছে; কাহাকেও পাইবার নাই, কিছুই দেখিবার নাই; কেবল বসিয়া বসিয়া অন্তর্দেশের অন্ধকারবাসী একটি অসম্পূর্ণ, সঙ্গীহীন "আমি"র পানে চাহিয়া চাহিয়া কাঁদিতে থাকে। ইহাই বর্ষাকালের বিরহ। বসন্তকালে বিরহিণীর জগৎ অসম্পূর্ণ, বর্ষাকালে বিরহিণীর "স্বয়ং" অসম্পূর্ণ। বর্ষাকালে আমি আত্মা চাই, বসন্তকালে আমি সুখ চাই। সুতরাং বর্ষাকালের বিরহ গুরুতর। এ বিরহে যৌবন মদন প্রভৃতি কিছু নাই, ইহা বস্তুগত নহে। মদনের শর বসন্তের ফুল দিয়া গঠিত, বর্ষার বৃষ্টিধারা দিয়া নহে। [বসন্ত ও বর্ষা]

এক একজন লোক আছে, তাহারা যতক্ষণ একলা থাকে ততক্ষণ কিছুই নহে, একটা শূন্য (০) মাত্র, কিন্তু একের সহিত যখনি যুক্ত হয়, তখনি দশ

(১০) হইয়া পড়ে। একটা আশ্রয় পাইলে তাহারা কি না করিতে পারে! সংসারে শত সহস্র 'শূন্য' আছে, বেচারীদের সকলেই উপেক্ষা করিয়া থাকে, তাহার একমাত্র কারণ, সংসারে আসিয়া তাহারা উপযুক্ত 'এক' পাইল না, কাজেই তাহাদের অস্তিত্ব না থাকার মধ্যেই হইল। [শূন্য]
আশ্বিন ১২৮৮

ভাবের সরোবরে আমরা জাল ফেলিয়া মাছ ধরিতে পারি না; ছিপ ফেলিয়া ধরিতে হয়। মাছ ধরিবার জাল আবিষ্কার হয় নাই, জানি না, কোন কালে হইবে কি না। * * আমরা পরের মনঃসরোবর হইতেও মাছ তুলিয়া থাকি। আমার এক সহচর আছেন, তাঁহার পুষ্করিণী আছে, কিন্তু ছিপ নাই। অবসর মত আমি তাঁহার মন হইতে মাছ ধরিয়া থাকি, খ্যাতিটা আমার। নানাপ্রকার কথোপকথনের চার ফেলিয়া তাঁহার মাছগুলাকে আকর্ষণ করিয়া আনি, ও খেলাইয়া খেলাইয়া জমিতে তুলি। [মাছ ধরা]
পৌষ ১২৮৮

* * জগৎ একটি বই নয়। কিন্তু প্রতি লোকের এক একটি যে পৃথক্ জগৎ আছে, তাহাই গণনা করিয়া দেখ দেখি! কত সহস্র জগৎ! * * আমার জগৎ যতই প্রকাণ্ড, যতই মহান্ হউক না কেন, "আমি" বলিয়া একটি ক্ষুদ্র বালুকণার উপর তাহার সমস্তটা গঠিত। আমার সহিত সে জন্মিয়াছে, আমার সহিত সে লয় পাইবে। সুতরাং আমি কাঁদিলেই সে কাঁদে, আমি হাসিলেই সে হাসে। তাহার আর কাহাকেও দেখিবার নাই, আর কাহারও জন্য ভাবিবার নাই। তাহার লক্ষ তারা আছে, কেবল আমার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিবার জন্য। একজন লোক যখন মরিয়া গেল, তখন আমরা ভাবি না যে একটি জগৎ নিভিয়া গেল। একটি নীলাকাশ গেল, একটি সৌরপরিবার গেল, একটি তরুলতা পশুপক্ষী শোভিত পৃথিবী গেল। [জগতের জন্ম মৃত্যু]
মাঘ ১২৮৮

সাধারণের কাছে প্রেমের অন্ধ বলিয়া একটা বদ্‌নাম আছে। কিন্তু অনুরাগ অন্ধ না বিরাগ অন্ধ? প্রেমের চক্ষে দেখার অর্থই সর্বাপেক্ষা অধিক করিয়া দেখা। * * বিজ্ঞানবিৎ কি কেবল দূরবীক্ষণ ও অণুবীক্ষণের সাহায্যেই বিজ্ঞানের সত্য আবিষ্কার করেন, তাঁহার কাছে যে অনুরাগবীক্ষণ

আছে, তাহা কি কেহ হিসাবের মধ্যে আনিবেন না? তুমি বলিবে প্রেম যদি অন্ধ না হইবে তবে কেন সে দোষ দেখিতে পায় না? দোষ দেখিতে পায় না যে তাহা নহে। দোষকে দোষ বলিয়া মনে করে না। তাহার কারণ সে এত অধিক দেখে যে দোষের চারিদিক দেখিতে পায়, দোষের ইতিহাস পড়িতে পারে। একটা দোষবিশেষকে মনুষ্য-প্রকৃতি হইতে পৃথক করিয়া লইয়া দেখিলে তাহাকে যতটা কালো দেখায়, তাহার স্বস্থানে রাখিয়া তাহার আদ্যন্তমধ্য দেখিলে তাহাকে ততটা কালো দেখায় না। আমরা যাহাকে ভালবাসি না তাহার দোষটুকুই দেখি, আর কিছু দেখি না। দেখি না যে মনুষ্য-প্রকৃতিতে সে দোষ সম্ভব, অবস্থা বিশেষে সে দোষ অবশ্যম্ভাবী ও সে দোষ সত্ত্বেও তাহার অন্যান্য এমন গুণ আছে, যাহাতে তাহাকে ভালবাসা যায়।
[বেশী দেখা ও কম দেখা]

ফাল্গুন, ১২৮৮

সংসারের কাজ-চালানে মন্ত্রবদ্ধ, ঘরকন্নার ভালবাসা যেমনই হউক, আমি প্রকৃত আদর্শ ভালবাসার কথা বলিতেছি। যে-হউক একজনের সহিত ঘেঁষাঘেঁষি করিয়া থাকা, এক ব্যক্তির অতিরিক্ত একটি অঙ্গের ন্যায় হইয়া থাকা, তাহার পাঁচটা অঙ্গুলির মধ্যে ষষ্ঠ অঙ্গুলির ন্যায় লগ্ন হইয়া থাকাকেই ভালবাসা বলে না। দুইটি আঠাবিশিষ্ট পদার্থকে একত্র রাখিলে যে জুড়িয়া যায়, সেই জুড়িয়া যাওয়াকেই ভালবাসা বলে না। * * প্রকৃত ভালবাসা দাস নহে, সে ভক্ত; সে ভিক্ষুক নহে, সে ক্রেতা। আদর্শ প্রণয়ী প্রকৃত সৌন্দর্যকে ভালবাসেন, মহত্ত্বকে ভালবাসেন; তাঁহার হৃদয়ের মধ্যে যে আদর্শ ভাব জাগিতেছে, তাহারই প্রতিমাকে ভালবাসেন। * * ভালবাসিবার জন্যই ভালবাসা নহে, ভাল ভালবাসিবার জন্যই ভালবাসা। [আদর্শ প্রেম]

বন্ধুত্ব ও ভালবাসায় অনেক তফাৎ আছে, কিন্তু ঝট করিয়া সে তফাৎ ধরা যায় না। * *

বন্ধুত্ব বলিতে তিনটি পদার্থ বুঝায়। দুই জন ব্যক্তি ও একটি জগৎ। অর্থাৎ দুইজনে সহযোগী হইয়া জগতের কাজ সম্পন্ন করা। আর প্রেম বলিলে দুই জন ব্যক্তি মাত্র বুঝায়, আর জগৎ নাই। দুই জনেই দুই জনের জগৎ। অতএব বন্ধুত্ব অর্থে দুই এবং তিন, প্রেম অর্থে এক এবং দুই।

অনেকে বলিয়া থাকেন বন্ধুত্ব ক্রমশঃ পরিবর্তিত হইয়া ভালবাসায় উপনীত

হইতে পারে, কিন্তু ভালবাসা নামিয়া অবশেষে বন্ধুত্বে আসিয়া ঠেকিতে পারে না। একবার যাহাকে ভালবাসিয়াছি, হয় তাহাকে ভালবাসিব, নয় ভালবাসিব না। * * যখন সে [ভালবাসা] থাকে তখন সে সমস্ত স্থান জুড়িয়া থাকে, নয় সে থাকে না। যখন সে দেখে তাহার অধিকার হ্রাস হইয়া আসিতেছে, তখন সে বন্ধুত্বের ক্ষুদ্র স্থানটুকু অধিকার করিয়া থাকিতে চায় না। যে রাজা ছিল, সে ফকির হইতে রাজি আছে, কিন্তু করদ জায়গীরদার হইয়া থাকিবে কিরূপে? হয় রাজত্ব, নয় ফকিরী, ইহার মধ্যে তাহার দাঁড়াইবার স্থান নাই। ইহা ছাড়া আরেকটা কথা আছে। প্রেম মন্দির ও বন্ধুত্ব বাসস্থান। মন্দির হইতে যখন দেবতা চলিয়া যায়, তখন সে আর বাসস্থানের কাজে লাগিতে পারে না, কিন্তু বাসস্থানে দেবতা প্রতিষ্ঠা করা যায়। [বন্ধুত্ব ও ভালবাসা]

দুঃখের সুর একঘেয়ে কেন? বলা বাহুল্য, মন যেখানে বৈচিত্র্য দেখে না, সেখানে সে নিজের অন্তঃপুরের মধ্যে নিজে বসিয়া থাকে, কৌতূহল উদ্রেক না হইলে সে বাহির হইবার কোন আবশ্যক দেখে না। যাহা কিছু একঘেয়ে, তাহাই আমাদিগকে আমাদের নিজের কাছে প্রেরণ করে। এই জন্যই একঘেয়ে সুরের মধ্যে একটি করুণ ভাব আছে।

যখন আমরা আমাদের নিজের কাছে থাকি, তখনি আমাদের দুঃখ। আমরা নিজের কাছ হইতে পলাইয়া থাকিতে পারিলেই সুখে থাকি। * * আমাদের মনের অর্থ—ভিক্ষার অঞ্জলি, জগতের অর্থ—ভিক্ষামুষ্টি। * * আমাদের মন গোটাকতক ক্ষুধার সমষ্টিমাত্র। জ্ঞানের ক্ষুধা, আসঙ্গের ক্ষুধা, সৌন্দর্যের ক্ষুধা। আমাদের দিকে অনন্ত জ্ঞানের পিপাসা, আর জগতের দিকে অনন্ত রহস্য। আমরা প্রাণের সহচর চাই, কিন্তু "লাখে না মিলল একে।" আমরা সৌন্দর্য উপভোগ করিতে চাই, অথচ সৌন্দর্যকে দুই হাতে স্পর্শ করিলেই সে মলিন হইয়া যায়। আমরা কৃষ্ণবর্ণ; সূর্যরশ্মির সমস্ত বর্ণধারা পান করিয়া থাকি তথাপি আমরা কালো। সূর্যরশ্মি পান করিবার আমাদের অনন্ত পিপাসা। এইরূপে অনন্ত জ্ঞানের ক্ষুধা লইয়া যে রহস্য দন্তস্ফুট করিতে পারিব না তাহাকেই অনবরত আক্রমণ করা, অনন্ত আসঙ্গের ক্ষুধা লইয়া যে সহচর মিলিবে না তাহাকেই অবিরত অন্বেষণ করা, অনন্ত সৌন্দর্যের ক্ষুধা লইয়া যে সৌন্দর্য ধরিয়া রাখিতে পারিব না তাহাকেই চির উপভোগ করিতে চেষ্টা করা, এক কথায়, অনন্ত মন অর্থাৎ সমষ্টিবদ্ধ কতকগুলি অনন্ত ক্ষুধা লইয়া জগতের পশ্চাতে অনন্ত ধাবমান

হওয়াই মনুষ্য-জীবন। এই নিমিত্তই মন নিজের কাছে থাকিতে চায় না, জগতের কাছে যাইতে চায়; ক্ষুধা নিজের কাছে থাকিতে চায় না, খাদ্যের কাছে থাকিতে চায়। [আত্ম-সংসর্গ]

চৈত্র ১২৮৮

জগৎ একটি প্রকাণ্ড পীড়া। অস্বাস্থ্যকে পরাভূত করিবার জন্য স্বাস্থ্যের প্রাণপণ চেষ্টাকে বলে পীড়া। জগৎও তাহাই। জগৎ ও অস্বাস্থ্যকে অতিক্রম করিয়া উঠিবার জন্য স্বাস্থ্যের উদ্যম। অভাবকে দূর করিবার জন্য পূর্ণতাকাঙ্ক্ষার উদ্যোগ। সুখ পাইবার জন্য অসুখের যোঝাযুঝি। জীবন পাইবার জন্য মৃত্যুর প্রযত্ন। * * আমরা যে পীড়ার বেদনা অনুভব করি, তাহা আসলে খারাপ নহে, তাহার অর্থই এই যে, এখনো আমাদের স্বাস্থ্য আছে, এখনো সে নিরুদ্যম হইয়া পড়ে নাই। সেইরূপ সমস্ত জগতের যে একটি বেদনা বোধ হইতেছে, তাহার প্রত্যেক পরমাণুতে যে অভাব অনুভূত হইতেছে, তাহার অর্থই এই যে, অভিব্যক্ত হইবার ক্ষমতা তাহার সর্বশরীরে কাজ করিতেছে। সুস্থ হইবার শক্তি জয়ী হইবার চেষ্টা করিতেছে। * * এই নিমিত্ত সমস্ত জগতের মধ্যে এবং জগতের ক্ষুদ্রতম পরমাণুর মধ্যে অসন্তোষ বিরাজ করিতেছে, সমস্ত জগৎ নিজের অবস্থায় সন্তুষ্ট নয়, এবং জগতের একটি পরমাণুও নিজের অবস্থায় সন্তুষ্ট নয়। এই অসন্তোষই বিশাল জগতের প্রাণ। [জগৎ-পীড়া]

বৈশাখ ১২৮৯

পূর্বকালে মহারাজ জনকের রাজ্যে এক ব্রাহ্মণ কোন গুরুতর অপরাধ করাতে জনকরাজ তাঁহাকে শাসন করিবার নিমিত্ত কহিয়াছিলেন, "হে ব্রাহ্মণ, আপনি আমার অধিকার মধ্যে বাস করিতে পারিবেন না।" মহাত্মা জনক এইরূপ আজ্ঞা করিলে, ব্রাহ্মণ তাঁহাকে সম্বোধনপূর্বক কহিলেন, "মহারাজ, কোন্ কোন্ স্থানে আপনার অধিকার আছে, আপনি তাহা নির্দেশ করুন; আমি অবিলম্বেই আপনার বাক্যানুসারে সেই সমুদয় স্থান পরিত্যাগ করিয়া অন্য রাজার রাজ্যে গমন করিব।" ব্রাহ্মণ এই কথা কহিলে, মহারাজ জনক তাহা শ্রবণ করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক মৌনভাবে চিন্তা করিতে করিতে অকস্মাৎ রাহুগ্রস্ত দিবাকরের ন্যায় মহামোহে সমাক্রান্ত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তাঁহার মোহ অপনীত হইলে, ব্রাহ্মণকে সম্বোধনপূর্বক কহিলেন,

"ভগবন্! যদিও এই পুরুষ-পরম্পরাগত রাজ্য আমার বশীভূত রহিয়াছে, তথাপি আমি বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলাম, পৃথিবীস্থ কোন পদার্থেই আমার সম্পূর্ণ অধিকার নাই। * * *"

জনক রাজার উক্তির তাৎপর্য এই যে, যাহা কিছুকে আমরা আমার বলি, তাহার কিছুই আমার নয়। আমার সহিত তাহাদের ন্যূনাধিক সম্বন্ধ আছে এই পর্যন্ত, কিন্তু তাহাদের প্রতি আমার কিছুমাত্র অধিকার নাই। আমরা ষষ্ঠীকে যে সম্বন্ধ কারক বলি, তাহা অতি যথার্থ, কিন্তু ইংরেজেরা যে তাহাকে Possessive case বলে তাহা অতি ভুল। মানুষের ব্যাকরণে সম্বন্ধ কারক আছে, কিন্তু Possessive case নাই। * * [অনধিকার]

জনক রাজা কহিলেন, "এক্ষণে আমার মোহ নির্মুক্ত হওয়াতে আমি নিশ্চয় বুঝিতে পারিয়াছি যে, কোন পদার্থেই আমার অধিকার নাই, অথবা আমি সমুদয় পদার্থেরই অধিকারী। আমার আত্মাও আমার নহে; অথবা সমুদয় পৃথিবীই আমার। ফলতঃ ইহলোকে সকল বস্তুতেই সকলের সমান অধিকার বিদ্যমান রহিয়াছে।" * * *

পৃথিবীতে এমন কি পদার্থ আছে, যাহাকে আমরা সর্বতোভাবে উপভোগ করিতে পারি? কোনটার ঘ্রাণ, কোনটার শব্দ, কোনটার স্বাদ, কোনটার দৃশ্য, কোনটার স্পর্শ আমরা ভোগ করি, অথবা একাধারে ইহাদের দুই-তিনটাও ভোগ করিতে পারি। কিংবা হয়তো ইহাদের সকলগুলিকেই এক পদার্থের মধ্যে পাইলাম, কিন্তু তবু তাহাকে সর্বতোভাবে উপভোগ করিতে পারি কই? * *

* * প্রচলিত ভাষার স্বত্ব থাকা ও উপভোগ করা উভয়ের এক অর্থ নহে। * * তুমি অরসিক, তোমার বাগানের গাছ হইতে একটি গোলাব ফুল তুলিয়াছ, তোমার হাতে সেটি রহিয়াছে, আমি দূর হইতে দেখিতেছি। তুমি ইচ্ছা করিলে সে গোলাবটি ছিঁড়িয়া কুটিকুটি করিতে পার, সে ক্ষমতা তোমার আছে, কিন্তু সে গোলাবটির সৌন্দর্য উপভোগ করিবার ক্ষমতা তোমার নাই। ইচ্ছা করিলে আর সব করিতে পার, কিন্তু মাথা খুঁড়িয়া মরিলেও তাহাকে উপভোগ করিতে পার না; আর, আমি তাহাকে ছিঁড়িতে পারি না বটে, কিন্তু দূর হইতে দেখিয়া তাহার সৌন্দর্য উপভোগ করিতে পারি। তাহার গোলাব ছিঁড়িবার ক্ষমতা আছে, আমার গোলাব উপভোগ করিবার ক্ষমতা

আছে, কোন্ ক্ষমতাটি গুরুতর? তবে কেন সে তাহাকে "আমার গোলাপ" বলে, আর আমি পারি না? গোলাব সম্বন্ধে যেটি সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ক্ষমতা, আমার তাহা আছে, তবু সে গোলাবের অধিকারী আমি নহি। * *

যে কোন পদার্থ আমরা দেখি, শুনি, ইন্দ্রিয় বা হৃদয় দিয়া উপলব্ধি করি, তাহাই আমাদের। তুমি যে ফুলকে "আমার" বল, তুমি তাহাকে দেখিতে পার, স্পর্শ করিতে পার, ঘ্রাণ করিতে পাও, আমি আর কিছু পাই না, কিন্তু যদি তাহাকে দেখিতে পাই, তবে সে মুহূর্তেই তাহার সহিত আমার সম্বন্ধ বাধিয়া গেল, সে সম্বন্ধ হইতে কেহ আমাকে বঞ্চিত করিতে পারিবে না তুমিও তাহার সব পাও নি, আমিও তাহার সব পাই নি, কারণ মানুষের পক্ষে তাহা অসম্ভব; তুমিও তাহার কিছু পাইলে, আমিও তাহার কিছু পাইলাম, অতএব তোমারও সে, আমারও সে। এইজন্যই জনক কহিয়াছিলেন, "কোন পদার্থেই আমার অধিকার নাই, অথবা সমুদয় পদার্থেরই অধিকারী আমি। ফলতঃ ইহলোকে সকল বস্তুতেই সকলের সমান অধিকার রহিয়াছে। [অধিকার]

১২৮৯ বঙ্গাব্দের বৈশাখেই 'বিবিধ প্রসঙ্গে'র শেষ কিস্তি 'ভারতী'তে প্রকাশিত হয়েছে। এই শেষ কিস্তিতে তিনটি প্রবন্ধ ছিল, "অনধিকার", "অধিকার" ও "উপভোগ"। গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় "উপভোগ"কে পরিত্যাগ করা হয়েছে। কিন্তু এই প্রবন্ধে কবি-চেতনার এমন একটি দিক পরিস্ফুট হয়েছে যা অন্যত্র দুর্লভ। কবি এখানে মানুষের এমন একটি ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের কথা বলেছেন যার দ্বারা সৌন্দর্য শুধু দৃষ্টিগোচরই হয় না, স্পর্শগোচরও হয়। 'বিবিধ প্রসঙ্গে'র অন্যান্য প্রবন্ধের মত এর ভাবানুষঙ্গও কবির পরবর্তী চিন্তা ও কাব্যরচনায় অনুবর্তিত হয়েছে। তা ছাড়া দেহের রূপসীমায় কবির প্রেমচেতনা ও সৌন্দর্যচেতনার দ্বন্দ্বও ওর মধ্যে রূপায়িত হয়ে উঠেছে। তাই প্রবন্ধটি সমগ্রভাবেই উদ্ধার যোগ্য, এবং 'বিবিধ প্রসঙ্গে'র আলোচনায় তার পুনর্বিন্যাস অপরিহার্য। "উপভোগে" কবি বলছেন:

মনুষ্যের যতদূর উপভোগ করিবার, অধিকার করিবার ক্ষমতা আছে, স্পর্শেই তাহার চূড়ান্ত। যাহাকে সে স্পর্শ করিতে পারে তাহাকেই সে সর্বাপেক্ষা আয়ত্ত মনে করে। এই নিমিত্ত ঋষিরা আয়ত্ত পদার্থকে 'করতলন্যস্ত আমলকবৎ' বলিতেন। এই জন্য মানুষেরা ভোগ্যপদার্থকে প্রাণপণে স্পর্শ

করিতে চায়। স্পর্শ করিতে পারাই তাহাদের অভিলাষের উপসংহার। আমাদের হৃদয়ে স্পর্শের ক্ষুধা চির জাগ্রত, এই জন্য যাহা আমরা স্পর্শ করিতে পারি তাহার ক্ষুধা আমাদের শীঘ্র মিটিয়া যায়, যাহা স্পর্শ করিতে পারি না, তাহার ক্ষুধা আর শীঘ্র মেটে না। কমলাকান্ত চক্রবর্তী তাঁহার দ্বাদশ সংখ্যক দপ্তরে একটি গীতের ব্যাখ্যা করিয়াছেন ; সেই গীতের একস্থলে আছে—

"মণি নও মাণিক নও যে হার করো্য গলে পরি,
ফুল নও যে কেশের করি বেশ।"

ইহা মনুষ্য-হৃদয়ের কাতর ক্রন্দন, তোমার ঐ রূপ, যাহা দেখিতে পাইতেছি, তোমার ঐ হৃদয়, যাহা অনুভব করিতে পারিতেছি, উহা যদি মণির মত মাণিকের মত হইত, উহা যদি হার করিয়া গলায় পরিতে পারিতাম, বুকের কাছে উহার স্পর্শ অনুভব করিতে পারিতাম, আহা, তাহা হইলে কি হইত! উহার অর্থ এমন নহে যে "বিধাতা জগৎ জড়ময় করিয়াছেন কেন? রূপ জড় পদার্থ কেন?" আমরা যখন বন্ধুকে স্পর্শ করি, তখন তাহার দেহ স্পর্শ করি মাত্র। তাহার দেহের কোমলতা, শীতোষ্ণতা অনুভব করিতে পারি মাত্র কিন্তু তাহার রূপ স্পর্শ করিতে পারি না ত, তাহার রূপ অনুভব করিতে পারি না ত। রূপ দৃশ্য হইল কেন, রূপ মণি মাণিকের মত স্পৃশ্য হইল না কেন? তাহা হইলে আমি রূপের হার করিতাম, রূপ দিয়া কেশের বেশ করিতাম। যখন কবিরা অশরীরী পদার্থকে শরীরবদ্ধ করেন, তখন আমরা এত আনন্দ লাভ করি কেন? কবির কল্পনা-বলে মুহূর্তে আমাদের মনে হয় যেন তাহার শরীর আছে, যেন তাহাকে আমরা স্পর্শ করিতেছি। আমাদের বহুদিনের আকুল তৃষ্ণা আজ যেন মিটিল। যখন রাধিকা শ্যামের মুখ বর্ণনা করিয়া বলিল, "হাসিখানি তাহে ভায়" তখন হাসিকে "হাসিখানি" কহিল কেন? যেন হাসি একটি স্বতন্ত্র পদার্থ, যেন হাসিকে ছুঁইতে পারি, যেন হাসিখানিকে লইয়া গলার হার করিয়া রাখিতে পারি! তাহার প্রাণের বাসনা তাহাই! যদি হাসি "হাসিখানি" হইত, শ্যাম যখন চলিয়া যাইত, তখন হাসিখানিকে লইয়া বসিয়া থাকিতাম! আমাদের অপেক্ষা কবিদের একটি সুখ অধিক আছে। আমরা যাহাকে স্পর্শ করিতে পারি না, কল্পনায় তাঁহারা তাহাকে স্পর্শ করিতে পারেন। উষাকে তাঁহারা বালিকা মনে করেন, সঙ্গীতকে তাঁহারা নির্ঝর মনে করেন, নবমালিকা ফুলকে তাঁহারা যেরূপ স্পর্শ করিতে পারেন,

জ্যোৎস্নাকে তাঁহারা সেইরূপ স্পর্শ করিতে পারেন, এই নিমিত্তই তাঁহারা সাহস করিয়া নবমালিকা লতার "বনজ্যোৎস্না" নামকরণ করিয়াছেন. পৃথিবীতে আমরা যাহাকে স্পর্শ করিতে পাইয়াছি, তাহাকে আর স্পর্শ করিতে চাই না, যাহাকে স্পর্শ করিতে পাই না, তাহাকে স্পর্শ করিতে চাই। এ কি বিড়ম্বনা![১০]

৫

গ্রন্থাকারে 'বিবিধ প্রসঙ্গ' প্রকাশিত হয় ১২৯০ বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাসে। অর্থাৎ 'ভারতী'তে ধারাবাহিকভাবে বেরোবার প্রায় দেড় বৎসর পরে। গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় কবির বক্তব্য সংযোজিত হয় শেষ প্রবন্ধ "সমাপনে"। "সমাপন" শুধু কবির বক্তব্যই নয়, ওর সর্বশেষ অনুচ্ছেদটি গ্রন্থের উৎসর্গপত্রও বটে। কবি লিখছেন:

'আর, আমার পাঠকদিগের মধ্যে একজন লোককে বিশেষ করিয়া আমার এই ভাবগুলি উৎসর্গ করিতেছি। এ ভাবগুলির সহিত তোমাকে আরও কিছু দিলাম, সে তুমিই দেখিতে পাইবে! সেই গঙ্গার ধার মনে পড়ে? সেই নিস্তব্ধ নিশীথ? সেই জ্যোৎস্নালোক? সেই দুইজনে মিলিয়া কল্পনার রাজ্যে বিচরণ? সেই মৃদু গম্ভীর স্বরে গভীর আলোচনা? সেই দুইজনে স্তব্ধ হইয়া নীরবে বসিয়া থাকা? সেই প্রভাতের বাতাস, সেই সন্ধ্যার ছায়া! একদিন সেই ঘনঘোর বর্ষার মেঘ, শ্রাবণের বর্ষণ, বিদ্যাপতির গান? তাহারা সব চলিয়া গিয়াছে! কিন্তু আমাদের এই ভাবগুলির মধ্যে তাহাদের ইতিহাস লেখা রহিল। এই লেখাগুলির মধ্যে কিছুদিনের গোটাকতক সুখ দুঃখ লুকাইয়া রাখিলাম, এক একদিন খুলিয়া তুমি তাহাদের স্নেহের চক্ষে দেখিও, তুমি ছাড়া আর কেহ তাহাদিগকে দেখিতে পাইবে না! আমার এই লেখার মধ্যে লেখা রহিল, এক লেখা তুমি আমি পড়িব, আরেক লেখা আর সকলে পড়িবে।'

বলাই বাহুল্য, এই উৎসর্গলিপি কাদম্বরী দেবীর উদ্দেশ্যেই নিবেদিত। চন্দননগরের দিনগুলির কথা স্মরণ করে কবি লিখেছেন, 'এ ভাবগুলির সহিত তোমাকে আরও কিছু দিলাম, সে তুমিই দেখিতে পাইবে!' 'আমাদের এই

ভাবগুলির মধ্যে তাহাদের ইতিহাস লেখা রহিল।' 'এই লেখার মধ্যে লেখা রহিল, এক লেখা তুমি আমি পড়িব, আরেক লেখা আর সকলে পড়িবে।' এই আবেগগর্ভ উৎসর্গলিপির আলোকে 'বিবিধ প্রসঙ্গে'র উদ্ধৃত রচনাবলী যে বাচ্যাতিরিক্ত অর্থান্তরের অভিব্যঞ্জনা বহন করে আনে তার মধ্যেই নিহিত রয়েছে 'বিবিধ প্রসঙ্গে'র মুখ্য তাৎপর্য।

চন্দননগরের দিনগুলি কবিজীবনের গোধূলিলগ্ন পর্যন্ত তাঁর চিত্তে যে উজ্জ্বলরাগে চিত্রিত ছিল তার প্রমাণ পরে পাওয়া যাবে। 'আকাশ প্রদীপে' "কাঁচা আম" কবিতায় নতুন বৌঠানের প্রসঙ্গে নিজের বাল্যলীলার উপসংহারে কবি বলেছেন :

বয়স বেড়ে গেল।
একদিন সোনার আংটি পেয়েছিলুম ওর কাছ থেকে ;
তাতে স্মরণীয় কিছু লেখাও ছিল।
স্নান করতে সেটা পড়ে গেল গঙ্গার জলে—
খুঁজে পাই নি।

স্মরণীয়-কিছু-লেখা সেই স্বর্ণাঙ্গুরীয়ের অভিজ্ঞান গঙ্গার জলে হারিয়ে গেছে বটে, কিন্তু 'বিবিধ প্রসঙ্গে'র উৎসর্গপত্রের অভিজ্ঞানটি মহাকালের কবল থেকে দৈবক্রমে রক্ষা পেয়েছে। "মাছ ধরা" প্রবন্ধে কবি লিখেছেন, 'আমার এক সহচর আছেন, তাঁহার পুষ্করিণী আছে, কিন্তু ছিপ নাই। অবসর মত আমি তাঁহার মন হইতে মাছ ধরিয়া থাকি, খ্যাতিটা আমার। নানাপ্রকার কথোপকথনের চার ফেলিয়া তাঁহার মাছগুলাকে আকর্ষণ করিয়া আনি ; ও খেলাইয়া খেলাইয়া জমিতে তুলি।' সেইজন্যেই উৎসর্গপত্রে কবি 'বিবিধ প্রসঙ্গে'র ভাবগুলিকে একলা তাঁরই ভাব বলেন নি, বলেছেন, "আমাদের এই ভাবগুলি"। এই ভাবগুলির মধ্যে "আরও কিছু" আছে যা শুধু দুজনের। মোরান সাহেবের বাগান-বাড়ির বৈঠকখানার শার্সির কাঁচে যে দুটি ছবি কবির চিত্তকে বিশেষ ভাবে আকর্ষণ করেছিল তার একটি হচ্ছে নিবিড় পল্লবে বেষ্টিত বৃক্ষশাখায় বিলম্বিত দোলায় একটি প্রেমিকযুগলের মিলনরহস্য। এই ছবিটি 'ছবি ও গানে'র "দোলা" কবিতার উৎস। এই রূপকল্পটিই 'সোনার তরী'র বিখ্যাত "ঝুলন" কবিতায় ব্যবহৃত হয়েছে। 'জীবনস্মৃতি'তে কবি লিখেছেন, 'কোথাকার একটি চিরনিভৃত ছায়ায় যুগলদোলনের রসমাধুর্য নদীতীরের বন-

শ্রেণীর মধ্যে একটি অপরিস্ফুট গল্পের বেদনা সঞ্চার করিয়া দিত।' 'বিবিধ প্রসঙ্গে'র ভাবগুলিও জ্যোৎস্নালোকিত নিস্তব্ধ-নিশীথে কল্পনার কুসুমিত রাজ্যে স্বপ্নকামনার নিভৃত-নিকুঞ্জে 'যুগল-দোলনের রসমাধুর্য' দিয়ে গড়া। 'গঙ্গার জলে উৎসর্গ-করা পূর্ণ-বিকশিত পদ্মফুলের মত' সেই দিনগুলি কবিজীবনে আর ফিরে আসে নি, কিন্তু 'বিবিধ প্রসঙ্গে'র ভাবগুলির মধ্যে তাদের ইতিহাস চিরদিনের মতোই লিপিবদ্ধ হয়ে রয়েছে।

॥ উল্লেখ-পঞ্জী ॥

১ কবিতা-সাধনা, 'ভারতী' পৌষ ১২৮৮; গান আরম্ভ, সন্ধ্যাসংগীত।

২ জীবনস্মৃতি, পৃ° ১৩১।

৩ প্রবাসী, আশ্বিন ১৩৪৮।

৪ 'মোরান সাহেবের বিখ্যাত হর্ম্যে আমাকে কিছু দীর্ঘকাল যাপন করতে হয়েছিল।'—সম্মান, বঙ্গবাণী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪ বঙ্গাব্দ।

৫ রবীন্দ্রজীবনী-১, পৃ° ১০০।

৬ জীবনস্মৃতি, পৃ° ১৪৩।

৭ ভারতী, জ্যৈষ্ঠ ১২৮৮, পৃ° ৭৮-৮৫।

৮ সমাপন, বিবিধ-প্রসঙ্গ, দ্র° রবীন্দ্ররচনাবলী, অচলিত সংগ্রহ, ১ম খণ্ড, পৃ° ৩৯০-৩৯২।

৯ তদেব, পৃ° ৩৯২।

১০ ভারতী, বৈশাখ ১২৮৯, পৃ° ২৭-২৮।

নবম অধ্যায়

অভিমানিনী নির্ঝরিণী

১

চন্দননগরে মোরান সাহেবের বাগান-বাড়িতে কবি যে অনুক্ষণ বিচিত্র সৃষ্টির প্রেরণায় সমাবিষ্ট ছিলেন সেই দিনগুলিতে তাঁর রচনার অজস্রতা থেকেই তার প্রমাণ পাওয়া যাবে। কবিতা ও গানে, উপন্যাস ও বিবিধ গদ্যরচনায় সেদিন তাঁর লেখনী অজস্রবর্ষী। তবু চন্দননগরের বিশেষ ফসল হল 'বিবিধ প্রসঙ্গ', 'সন্ধ্যাসংগীত' এবং কবির প্রথম সম্পূর্ণ উপন্যাস 'বৌঠাকুরাণীর হাট'। কবি 'বিবিধ প্রসঙ্গ'কে 'সন্ধ্যাসংগীতে'র দোসর বলেছেন, কিন্তু একটু অভিনিবেশ নিয়ে তলিয়ে দেখলেই বুঝতে পারা যাবে, যে-হৃদয়াবেগ এই দুখানি গ্রন্থে মন্ময় গদ্য ও পদ্যে ভাষা পেয়েছে সেই হৃদয়াবেগই মুক্তি পেয়েছে 'বৌঠাকুরাণীর হাটে'র নায়ক-নায়িকাদের জীবনে। গ্রন্থাকারে 'সন্ধ্যাসংগীত' প্রকাশিত হয় '৮৮ বঙ্গাব্দের শেষ দিকে। শেষ কবিতাটি গ্রন্থের 'উপহার'। উপহারে কবি লিখেছেন :

ভুলে গেছি কবে তুমি ছেলেবেলা একদিন
মরমের কাছে এসেছিলে ;
স্নেহময়, ছায়াময়, সন্ধ্যাময় আঁখি মেলি
একবার বুঝি হেসেছিলে।
বুঝি গো সন্ধ্যার কাছে, শিখেছে সন্ধ্যার মায়া
ওই আঁখি দুটি,
চাহিলে হৃদয়পানে মরমেতে পড়ে ছায়া
তারা উঠে ফুটি।
আগে কে জানিত বলো কত কি লুকানো ছিল
হৃদয় নিভৃতে ;
তোমার নয়ন দিয়া আমার নিজের হিয়া
পাইনু দেখিতে।

কবি যাঁকে লক্ষ্য করে এই 'উপহার'-কবিতা রচনা করেছেন তাঁর নাম তিনি

স্পষ্টাক্ষরে উচ্চারণ করেন নি বটে, কিন্তু আমাদের মনে কোনোই সন্দেহ নেই যে কবিতাটি নতুন বৌঠানকে নিয়েই লেখা। কবির নিজের কাছে এই কবিতাটির যে কী সুগভীর তাৎপর্য ছিল তার পরিচয় পাওয়া যাবে 'সঞ্চয়িতা'য়। 'সন্ধ্যাসংগীতে'র যে কয়েকটি মাত্র চরণ তিনি তাঁর শ্রেষ্ঠ কাব্যসঞ্চয়নের জন্যে সংকলন করেছেন সেই চরণাষ্টক এই 'উপহার' থেকেই সংগৃহীত। কবিহৃদয়ের নিভৃতে যে অমৃত লুকান ছিল নতুন বৌঠানের 'সন্ধ্যাময়' দুটি আঁখির দৃষ্টিতেই তা প্রথম ধরা পড়ল। তাই কবি বলেছেন, 'তোমার নয়ন দিয়া আমার নিজের হিয়া পাইনু দেখিতে।' ওই দুটি চোখ এবং চোখের দৃষ্টি শুধু যে কবির হৃদয়াকাশে তারা হয়ে ফুটে উঠেছিল তাই নয়, পরিণত বয়সে কবি সানুরাগে স্বীকার করেছেন, ওই দুটি চোখের দৃষ্টি দিয়েই তিনি জীবন এবং জগৎকে নতুন করে পেয়েছেন। 'বলাকা'র "ছবি" কবিতায় কবি বলেছেন:

নয়নসম্মুখে তুমি নাই,
নয়নের মাঝখানে নিয়েছে যে ঠাঁই।
আজি তাই
শ্যামলে শ্যামল তুমি, নীলিমায় নীল।
আমার নিখিল
তোমাতে পেয়েছে তার অন্তরের মিল।

কিন্তু 'সন্ধ্যাসংগীতে'র যুগে 'কবির নিখিল' আর 'কবির হৃদয়ে'র মধ্যে এই 'অন্তরের মিল' গড়ে ওঠে নি। তাই সেদিন কবির মর্মলোক আর তাঁর বিশ্বলোকের মধ্যে শুধু দুস্তর ব্যবধানই ছিল না, প্রচণ্ড বিরোধও বর্তমান ছিল। কবি যখন তাঁর অন্তরের মধ্যে ডুব দিয়েছেন তখন তাঁর মনে হয়েছে তিনি হারিয়ে ফেলেছেন তাঁর বিশ্বকে। তরুণ কবির সেই অন্তর্মুখী ও বহির্মুখী চেতনার দ্বন্দ্ব পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে তাঁর 'সন্ধ্যাসংগীত' ও 'প্রভাতসংগীতে'র সুর-বৈপরীত্যের মধ্যে। '৮৯ বঙ্গাব্দের বৈশাখে 'ভারতী'তে 'আমিহারা' কবিতায় কবি বলছেন:

হৃদয়ের অন্ধকার অরণ্য মাঝারে
আমি মোর হারালো কোথায়?
ভ্রমিতেছি পথে পথে খুঁজিতেছি তারে
ডাকিতেছি, আয়, আয়, আয়;

আর কি সে আসিবে না হায়!
আর কি রে পাব না কো তায়?
হৃদয়ের অন্ধকার গভীর অরণ্যতলে
আমি মোর হারালো কোথায়?

দিবস শুধায় মোরে—রজনী শুধায়,
নিতি তারা অশ্রুবারি ফেলে,
শুধায় আকুল হয়ে চন্দ্র সূর্য তারা
"কোথা তুমি কোথা তুমি গেলে?"
আঁধার হৃদয় হতে উঠিছে উত্তর,
"মোরে কোথা ফেলেছি হারায়ে।"
হৃদয়ের হায় হায় হাহাকার ধ্বনি
ভ্রমিতেছে নিশীথের বায়ে!

এই হাহাকার-ধ্বনি, অর্থাৎ হৃদয়ের অন্ধকার অরণ্য-মাঝারে কবির 'আমি'-কে হারিয়ে-ফেলার চেতনা বিশদীভূত হয়েছে 'প্রভাতসংগীতে'র 'পুনর্মিলন' কবিতায়। 'পুনর্মিলন' '৮৯ বঙ্গাব্দের 'ভারতী'র শেষ কবিতা—চৈত্রমাসে প্রকাশিত। সেখানে কবি বলছেন, ছেলেবেলা প্রকৃতির সঙ্গে ছিল তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগ। রজনীপ্রভাতে প্রাচীরের পরপারে নবীন রবির আলো তাঁর কিই না ভাল লাগত!

সর্বাঙ্গে সুবর্ণ-সুধা অজস্র পড়িত ঝরে,
প্রভাত ফুলের মত ফুটায়ে তুলিত মোরে।

সূর্যের আলোয় নবস্ফুট পুষ্পের মত সারাদিন তাঁর কাটত প্রকৃতির বিচিত্র লীলার জগতে! ছেলেবেলার সেই প্রকৃতি-প্রীতির কথা স্মরণ করে কবি বলছেন:

সেই—সেই ছেলেবেলা,
আনন্দে করেছি খেলা,
প্রকৃতি গো, জননী গো, কেবলি তোমারি কোলে।
তার পরে কী যে হল—কোথা যে গেলেম চলে।
হৃদয় নামেতে এক বিশাল অরণ্য আছে,

দিশে দিশে নাহিকো কিনারা,
তারি মাঝে হনু পথহারা।
সে বন আঁধারে ঢাকা,
গাছের জটিল শাখা
সহস্র স্নেহের বাহু দিয়ে।
আঁধার পালিছে বুকে নিয়ে।

প্রকৃতির আনন্দময় সান্নিধ্য থেকে বিচ্যুত হয়ে হৃদয়ের বিশাল অরণ্যে কবি পথহারা হলেন। তারই হাহাকার এ সব কবিতায় অভিব্যক্ত হয়েছে। 'সন্ধ্যাসংগীতে'র এই "হৃদয়-অরণ্য" থেকে 'প্রভাতসংগীতে' "নিক্রমণ" ঘটেছে বিশ্বপ্রকৃতির আনন্দলোকে। প্রকৃতির সঙ্গে এই "পুনর্মিলনে"র আনন্দই উৎসারিত হয়েছে 'প্রভাতসংগীতে'র কাব্যকাকলিতে। কিন্তু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, বাহ্যিক পরিবেশের সঙ্গে কবির এই উপলব্ধির কোনো ঘনিষ্ঠ যোগ নেই। চন্দননগরের গঙ্গাতীরে অনন্ত আকাশের কোলে 'টলমল মেঘের মাঝারে' কবি তাঁর কাব্যবধূর বাসরঘর রচনা করেছিলেন। সেই চন্দননগরেই 'সন্ধ্যাসংগীতে'র শেষ পর্যায়ের কবিতাগুলি লেখা। বাংলাদেশের আকাশভরা আলো আর স্নিগ্ধশ্যামল নদীতীরের কলধ্বনিময় দিনরাত্রিগুলি এমন আলস্যে আনন্দে অনির্বচনীয় হয়ে কবিজীবনে এর পূর্বে আর কখনো আসে নি, এ কথা 'জীবনস্মৃতি'তে কবি নিজেই স্বীকার করেছেন। অথচ কবি তখন একান্তভাবে হৃদয়রহস্যের আলো-আঁধারি লীলাতেই নিমগ্ন হয়ে ছিলেন। সেই হৃদয়-রহস্যেরই কাব্যরূপ 'সন্ধ্যাসংগীত'; তাই 'সন্ধ্যাসংগীত' মুখ্যত প্রেমকাব্য। কিন্তু 'প্রভাতসংগীত' একান্তভাবেই প্রকৃতিগাথা। কবিমানসে সেদিনকার প্রেমচেতনা ও প্রকৃতিচেতনার বিপরীত লীলাই 'সন্ধ্যাসংগীত' ও 'প্রভাতসংগীতে' ভাষা পেয়েছে। এই প্রসঙ্গে এ কথা অবশ্যই স্মরণযোগ্য যে, রবীন্দ্র-কাব্যলোকে সন্ধ্যা ও প্রভাত—এই শব্দ দুটি শব্দমাত্রই নয়, তারা বিশেষ অনুভূতির প্রতীক। 'বিবিধ প্রসঙ্গে' 'প্রাতঃকাল ও সন্ধ্যাকাল' প্রবন্ধে কবি বলেছিলেন, "প্রভাতে আমি হারাইয়া যাই, সন্ধ্যাকালে আমি ব্যতীত বাকি আর সমস্তই হারাইয়া যায়। * * প্রাতঃকালে জগতের আমি, সন্ধ্যাকালে আমার জগৎ। প্রাতঃকালে আমি সৃষ্ট, সন্ধ্যাকালে আমি স্রষ্টা। * * এককথায় প্রভাতে আমি জগৎ-রচনার কর্মকারক ও

সন্ধ্যাকালে আমি জগৎ-রচনার কর্তাকারক। প্রভাতে "আমি" নামক সর্বনাম শব্দটি প্রথম পুরুষ, সন্ধ্যাবেলায় সে উত্তম পুরুষ।"

এই বিশ্লেষণের আলোকে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, সন্ধ্যায় কবির 'আমিই' মুখ্য, আর প্রভাতে মুখ্য কবির 'জগৎ'। সন্ধ্যায় কবির 'আমি' তার অন্তর্লোকের প্রেমের মধ্যেই ডুবে থাকে, প্রভাতে তার কাছে আসে বহির্ভুবনের আহ্বান। কবির আমি-কে নিয়ে প্রেম ও প্রকৃতির এই প্রতিদ্বন্দ্বিতাই 'সন্ধ্যাসংগীত' ও 'প্রভাতসংগীতে' মূর্ত হয়ে উঠেছে। পরবর্তী জীবনে যেদিন বিরহের মোহনমন্ত্রে কবি তাঁর মানসলক্ষ্মীকে বিশ্বলক্ষ্মীরূপে খুঁজে পেলেন, সেদিন প্রেয়সী নারী আর রূপসী প্রকৃতির মধ্যে সব ব্যবধানই ঘুচে গেল। 'চিত্রা'য় এই প্রেয়সী-রূপসীর মিলন-তত্ত্ব কবির ভাষায় অভিব্যক্ত হয়েছে। কবি একবার বিশ্বলোকের দিকে তাকিয়ে বলছেন, 'জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে, তুমি বিচিত্ররূপিণী,' আবার তাঁর অন্তর্লোকের দিকে তাকিয়ে বলছেন, 'অন্তর মাঝে তুমি শুধু একা একাকী, তুমি অন্তরবাসিনী।'

তরুণ কবিচিত্তে প্রেম ও প্রকৃতির এই বিপরীতমুখী আকর্ষণকে সমান গুরুত্ব দিয়ে বিশ্লেষণ না করলে শুধু যে একদেশদর্শিতারই পরিচয় দেওয়া হবে এমন নয়, কবিমানসের বিচারেও বিভ্রান্তি ঘটবার সম্ভাবনা দেখা দেবে। শুধু সম্ভাবনা নয়, সত্যসত্যই এই বিভ্রান্তি ঘটেছে। এবং এর জন্যে মূলত দায়ী মোহিতচন্দ্র সেন সম্পাদিত ঐতিহাসিক-ক্রম-ভাঙা কাব্যগ্রন্থের [১৩১০] ভাগবত পুনর্বিন্যাসের প্রয়াস। মোহিতচন্দ্র 'সন্ধ্যাসংগীত' ও 'প্রভাতসংগীতে'র কবিতাকে যথাক্রমে 'হৃদয়-অরণ্য' ও 'নিষ্ক্রমণ' শিরোনামায় বিন্যস্ত করেছেন। এই বিন্যাসের সঙ্গে যে ভাষ্য অবিচ্ছেদ্য হয়ে গেছে সেটি হল এই যে, হৃদয়-অরণ্যে পথহারা বিষণ্ণ কবি প্রকৃতির আনন্দলোকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে অভিলষিত মুক্তির সন্ধান পেলেন। 'জীবনস্মৃতি'তে কবি নিজেও এই নিষ্ক্রমণ-তত্ত্বের আলোকেই তাঁর সেদিনকার মনোভাবের ব্যাখ্যা করেছেন। 'রুগ্ন হৃদয়টার আব্দারে' অন্তরের সঙ্গে বাইরের সামঞ্জস্য ভেঙে যাওয়ার ফলে বহির্ভুবনে চিরদিনের যে সহজ অধিকারটি হারিয়েছিলেন, কবি বলছেন 'সন্ধ্যাসংগীতে' তারই বেদনা প্রকাশ পেয়েছিল। অবশেষে এক শুভপ্রভাতের দিব্য আবেশে কবি তাঁর ছেলেবেলার বিশ্বপ্রকৃতিকে আনন্দ-রূপে অমৃত-রূপে

ফিরে পেলেন। কবি তখন সদর স্ট্রীটে জ্যোতিদাদার সঙ্গে বাস করেন। চন্দননগর থেকে ফিরে এসে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কিছুদিনের জন্যে চৌরঙ্গী যাদুঘরের নিকট দশ নম্বর সদর স্ট্রীটে বাস করছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁর সঙ্গী। এই সদর স্ট্রীটেই একদিন ভোরবেলা 'সৃষ্টির প্রথম রহস্য, আলোকের প্রকাশ' কবিজীবনে নূতন তাৎপর্য নিয়ে উদ্ভাসিত হল। 'জীবনস্মৃতি'তে তিনি বলেছেন, 'গাছগুলির পল্লবান্তরাল হইতে সূর্যোদয় হইতেছিল। চাহিয়া থাকিতে থাকিতে হঠাৎ এক মুহূর্তের মধ্যে আমার চোখের উপর হইতে যেন একটা পর্দা সরিয়া গেল। দেখিলাম, একটি অপরূপ মহিমায় বিশ্বসংসার সমাচ্ছন্ন ; আনন্দে এবং সৌন্দর্যে সর্বত্রই তরঙ্গিত। আমার হৃদয়ে স্তরে স্তরে যে-একটা বিষাদের আচ্ছাদন ছিল তাহা এক নিমিষেই ভেদ করিয়া আমার সমস্ত ভিতরটাতে বিশ্বের আলোক একেবারে বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িল। সেই-দিনই 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতাটি নির্ঝরের মতোই যেন উৎসারিত হইয়া বহিয়া চলিল।'[১] এই "নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ"ই 'প্রভাতসংগীতে'র মর্মকবিতা। পর্বতকন্দরের পাষাণ কারাগারে বন্দী নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ হল সূর্যের আলোয়, বিশ্বভুবনে বেরিয়ে পড়ার আহ্বান এল তার কাছে। তা মহাসমুদ্রে মিলিত হয়ে সার্থক পরিণতিলাভের আহ্বান। প্রভাত-সূর্যের আলোয় নবজাগ্রত কবি বুঝতে পারলেন, তাঁর হৃদয়ের অর্গলমুক্তি হয়েছে। 'জগৎ আসি সেথা করিছে কোলাকুলি।'

'মানুষের ধর্ম' গ্রন্থে কবি তাঁর সেদিনকার উপলব্ধিকে বলেছেন তাঁর 'জীবনের প্রথম অভিজ্ঞতা যাকে আধ্যাত্মিক নাম দেওয়া যেতে পারে।'[২] অবশ্য নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ সম্পর্কে 'জীবনস্মৃতি' আর 'মানুষের ধর্ম' গ্রন্থের ব্যাখ্যায় পার্থক্য দেখা দিয়েছে। 'মানুষের ধর্ম' গ্রন্থে কবি বলেছেন, 'মানুষের মধ্যে আছে দুই আমি, একটি তার 'অহং', আরেকটি তার 'আত্মা'। ঘরের মধ্যে যে আকাশ আর অসীম বিশ্বে যে আকাশ তার মধ্যে যে ভেদ 'অহং' আর 'আত্মা'য়ও সেই ভেদ।' কবি একদিন 'অহং'-এর খেলাঘরের মধ্যে বন্দী ছিলেন, 'প্রভাতসংগীতে' এল 'আত্মার ডাক'। 'মানুষের ধর্ম' গ্রন্থে কবি এই 'আত্মা'কেই বলেছেন মহামানব। 'প্রভাতসংগীতে' নির্ঝর যে মহা-সাগরের গান শুনতে পেয়েছিল কবির শেষ ভাষ্যে সেটি এই মহামানবেরই গান। 'এই মহাসমুদ্রকে এখন নাম দিয়েছি মহামানব। সমস্ত মানুষের

ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান নিয়ে তিনি সর্বজনের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত। তাঁর সঙ্গে গিয়ে মেলবারই এই ডাক।'[৩] বলাই বাহুল্য, এই ব্যাখ্যায় হৃদয়ারণ্য থেকে নিষ্ক্রমণের অর্থান্তর ঘটেছে। এবং এখানে কবি কাব্যের পটভূমি থেকে সরে এসে দার্শনিকের পটভূমিতে দাঁড়িয়ে কথা বলছেন। এই 'আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা' 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে'র উপরে 'আরোপিত' হয়েছে বলেই আমাদের বিশ্বাস। মর্ত্য পৃথিবীর মানুষকে মুখ্যত তার অহং-কে নিয়েই ঘরসংসার চালাতে হয়। 'প্রভাতসংগীত' সম্পর্কে কবির আত্মবিশ্লেষণ পরবর্তী কালের একখানি চিঠিতে সার্থক রূপ পেয়েছে। সেই পত্রে কবি লিখেছেন, "'জগতে কেহ নাই সবাই প্রাণে মোর', ও একটা বয়সের বিশেষ অবস্থা। যখন হৃদয়টা সর্বপ্রথম জাগ্রত হয়ে দুই বাহু বাড়িয়ে দেয় তখন মনে করে, সে যেন সমস্ত জগৎটা চায়—যেমন নবোদ্গতদন্ত শিশু মনে করেন, সমস্ত বিশ্বসংসার তিনি গালে পুরে দিতে পারেন। ক্রমে ক্রমে বুঝতে পারা যায়, মনটা যথার্থ কী চায় এবং কী চায় না। তখন সেই পরিব্যাপ্ত হৃদয়বাষ্প সংকীর্ণ সীমা অবলম্বন করে জলতে এবং জ্বালাতে আরম্ভ করে। একেবারে সমস্ত জগৎটা দাবি করে বসলে কিছুই পাওয়া যায় না, অবশেষে একটা কোনোকিছুর মধ্যে সমস্ত প্রাণমন দিয়ে নিবিষ্ট হতে পারলে তবেই অসীমের মধ্যে প্রবেশের সিংহদ্বারটি পাওয়া যায়। 'প্রভাতসংগীত' আমার অন্তর-প্রকৃতির প্রথম বহির্মুখ উচ্ছ্বাস, সেইজন্য ওটাতে আর কিছুমাত্র বাছবিচার নেই।"[৪]

এই বিশ্লেষণে কবি 'প্রভাতসংগীতে'র আনন্দোৎসবকে 'নবোদ্গতদন্ত শিশুর বিশ্বসংসার গালে পুরে দেবার' সঙ্গে তুলনা করে বলেছেন তাঁর অন্তরপ্রকৃতির প্রথম বহির্মুখ উচ্ছ্বাস বলেই ওতে "আর কিছুমাত্র বাছবিচার নেই।" তিনি আরো বলেছেন যে, 'একটা কোনোকিছুর মধ্যে সমস্ত প্রাণমন দিয়ে নিবিষ্ট হতে পারলে তবেই অসীমের মধ্যে প্রবেশের সিংহদ্বারটি পাওয়া যায়।' অন্তর্লোকে, কবি যাকে বলেছেন 'সৃষ্টির শেষ রহস্য—ভালোবাসার অমৃত' তার মধ্যে সমস্ত প্রাণমন দিয়ে নিবিষ্ট হয়েই তিনি একদিন অসীমের মধ্যে প্রকাশের সিংহদ্বারটি খুঁজে পেয়েছিলেন, সে সত্য কবিমানসের পরবর্তী বিশ্লেষণে ধরা পড়বে। কিন্তু পূর্বেই বলা হয়েছে, 'সন্ধ্যাসংগীত' ও 'প্রভাতসংগীতে'র যুগে কবি সেই সত্যের সন্ধান পান নি। তখনো তাঁর

মধ্যে প্রেমচেতনা ও প্রকৃতিচেতনার দ্বন্দ্ব বর্তমান। 'সন্ধ্যাসংগীতে' প্রেমাবিষ্ট কবি 'ভালোবাসার অমৃতকে'ই অন্তর্লোকে সন্ধান করে ফিরেছেন, আর 'প্রভাতসংগীতে' প্রকৃতিসৌন্দর্যমুগ্ধ কবি তন্ময় হয়েছেন 'আলোকের প্রকাশে'র মধ্যে।

কবিমানসের এই দ্বন্দ্ব সম্পর্কে কবি নিজেও সচেতন ছিলেন। ১৮৯০ খ্রীস্টাব্দে প্রমথ চৌধুরীকে লেখা এক পত্রে কবি লিখেছেন, 'আমি সত্যি সত্যি বুঝতে পারিনে আমার মনে সুখদুঃখ বিরহমিলনপূর্ণ ভালবাসা প্রবল, না সৌন্দর্যের নিরুদ্দেশ আকাঙ্ক্ষা প্রবল। আমার বোধ হয় সৌন্দর্যের আকাঙ্ক্ষা আধ্যাত্মিক জাতীয়, উদাসীন গৃহত্যাগী; নিরাকারের অভিমুখী। আর ভালবাসাটা লৌকিক জাতীয় সাকারে জড়িত। একটা হচ্ছে Shelleyর Skylark আরেকটা হচ্ছে Wordsworth-এর Skylark। একজন অনন্ত সুধা প্রার্থনা করচে, আরেক জন অনন্ত সুধা দান করচে। সুতরাং স্বভাবতই একজন সম্পূর্ণতার এবং আর একজন অসম্পূর্ণতার অভিমুখী। যে ভালবাসে, সে অভাবদুঃখপীড়িত অসম্পূর্ণ মানুষকে ভালবাসে, সুতরাং তার অগাধ ক্ষমা সহিষ্ণুতা প্রেমের আবশ্যক—আর যে সৌন্দর্যব্যাকুল, সে পরিপূর্ণতার প্রয়াসী, তার অনন্ত তৃষ্ণা। মানুষের মধ্যে এই দুই অংশই আছে, অপূর্ণ এবং পূর্ণ—যে যেটা অধিক অনুভব করে। আমার বোধ হয় মেয়েরা আপনার পূর্ণতা অধিক অনুভব করে (এই জন্যে তারা যাকে-তাকে ভালবেসে সন্তুষ্ট থাকতে পারে), পুরুষরা আপনার অপূর্ণতা অধিক অনুভব করে, এই জন্যে জ্ঞান বল, প্রেম বল, কিছুতেই তাদের আর অসন্তোষ ঘোচে না। কবিত্বের মধ্যে মানুষের এই উভয় অংশ পাশাপাশি সংলগ্ন হয়ে থাকলেই ভাল হয় কিন্তু তেমন সামঞ্জস্য দুর্লভ।'[৫] বলাই বাহুল্য রবীন্দ্রজীবনে সেই 'দুর্লভ সামঞ্জস্য' সম্ভব হয়েছিল বলেই রবীন্দ্রনাথ কবিসার্বভৌম। কিন্তু এই সামঞ্জস্যের মধ্যেও 'সুখদুঃখ-বিরহমিলনপূর্ণ ভালবাসা'র শক্তিই প্রবল, না 'সৌন্দর্যের নিরুদ্দেশ আকাঙ্ক্ষা'র শক্তিই প্রবল,—এই জিজ্ঞাসাই রবীন্দ্রমানস-তীর্থযাত্রীর সর্বশেষ জিজ্ঞাসা।

২

'সন্ধ্যাসংগীত' ও 'প্রভাতসংগীতে'র ব্যাখ্যা হিসাবে 'হৃদয় অরণ্য থেকে নিষ্ক্রমণে'র রূপকটিকে দুটি কারণে সন্তোষজনক বলে মনে হয় না। প্রথমত কবি যে প্রেমচেতনায় আবিষ্ট হয়েছিলেন তা থেকে তিনি প্রকৃতচেতনায় নিষ্ক্রান্ত হয়ে মুক্তির আনন্দ পেলেন, এই যুক্তি সমসাময়িক ও পরবর্তীকালের রচনাবলীর দ্বারা সমর্থিত হবে না। 'শৈশবসংগীত' 'সন্ধ্যাসংগীত' 'ছবি ও গান' এবং 'কড়ি ও কোমলে' কবির প্রেমচেতনাই মুখ্য। এই দিক থেকে 'প্রভাতসংগীত' অনেকাংশে মূল ধারা থেকে স্বতন্ত্র এবং প্রক্ষিপ্ত বলেই মনে হয়। দ্বিতীয়ত, নিষ্ক্রমণের দিব্যাবেশ কবিজীবনে যেমন আকস্মিক তেমনি তা অচিরস্থায়ী। 'জীবনস্মৃতি'তেই কবি সে কথা স্বীকার করেছেন। 'মানুষের ধর্ম' গ্রন্থে কবি বলেছেন তাঁর জীবনের সেই প্রথম 'আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা', দিব্যাবেশে সেই 'আত্মহারা আনন্দে'র অবস্থায় তিনি মাত্র চারদিন ছিলেন। কিন্তু তার পরেই তাঁর চোখ থেকে সেই দৃষ্টি হারিয়ে গেল। সদর স্ট্রীটের এই ঘটনার অব্যবহিত পরেই জ্যোতিদাদারা স্থির করলেন দার্জিলিঙ যাবেন। কবি সেখানেও তাঁদের সঙ্গী হলেন। দার্জিলিঙে তাঁরা 'রোজভিলা' নামে একটি নিভৃত বাসায় আশ্রয় নিলেন। কবি আশা করেছিলেন, সদর স্ট্রীটে শহরের ভিড়ের মধ্যে যা দেখলেন হিমালয়ের উদার শৈলশিখরে তাই আরো ভাল করে গভীর করে দেখতে পাবেন। অন্তত এই দৃষ্টিতে হিমালয় আপনাকে কেমন করে প্রকাশ করে তা জানা যাবে। কিন্তু, বিস্ময়ের সঙ্গে কবি বলছেন, 'সদর স্ট্রীটের সেই তুচ্ছ বাড়িটারই জিত হইল। হিমালয়ের উপরে চড়িয়া যখন তাকাইলাম তখন হঠাৎ দেখি, আর সেই দৃষ্টি নাই। বাহির হইতে আসল জিনিস কিছু পাইব এইটে মনে করাই বোধ করি আমার অপরাধ হইয়াছিল। নগাধিরাজ যত বড়োই অভ্রভেদী হোন-না, তিনি কিছুই হাতে তুলিয়া দিতে পারেন না, অথচ যিনি দেনেওয়ালা তিনি গলির মধ্যেই এক মুহূর্তে বিশ্বসংসারকে দেখাইয়া দিতে পারেন। আমি দেবদারুবনে ঘুরিলাম, ঝরণার ধারে বসিলাম, তাহার জলে স্নান করিলাম, কাঞ্চনশৃঙ্গার মেঘমুক্ত মহিমার দিকে তাকাইয়া রহিলাম—কিন্তু যেখানে পাওয়া সুসাধ্য মনে করিয়াছিলাম সেইখানেই কিছু খুঁজিয়া পাইলাম না। * * * প্রভাত-

সংগীতের গান থামিয়া গেল শুধু তার দূর প্রতিধ্বনিস্বরূপ 'প্রতিধ্বনি' নামে একটি কবিতা দার্জিলিঙে লিখিয়াছিলাম।'*

৩

'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে'র নির্ঝর ও সমুদ্রের রূপকল্পটি স্বভাবতই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কবি দুবার এই রূপকল্পটি ব্যবহার করেছেন। প্রথমবার 'ভগ্নহৃদয়ে'র উপহার-প্রসঙ্গে। দ্বিতীয়বার 'প্রভাতসংগীতে'। পূর্বেই বলা হয়েছে, 'ভগ্নহৃদয়' কাব্যখানি কবি তাঁর নতুন বৌঠানের নামেই উৎসর্গ করেছিলেন। গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় 'উৎসর্গ' কবিতায় তিনি বলছেন:

জীবন-সমুদ্রে তব জীবন-তটিনী মোর
মিশায়েছি একেবারে আনন্দে হইয়া ভোর,
সন্ধ্যার বাতাস লাগি ঊর্মি যত উঠে জাগি,
অথবা তরঙ্গ উঠে ঝটিকায় আকুলিয়া
জানে বা না জানে কেউ, জীবনের প্রতি ঢেউ
মিশিবে—বিরাম পাবে—তোমার চরণে গিয়া।

এখানে সমুদ্রের সঙ্গে তটিনীর যে আনন্দ-মিলনের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে, হৃদয়ানুরাগের প্রেক্ষাপটেই তার কল্পনা। পক্ষান্তরে 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে' নির্ঝরিণী দূর হতে মহাসাগরের যে ডাক শুনেছে নিসর্গানুরাগের পটভূমিতেই তার সার্থকতা। দুটির আবেদন দুই-'আমি'র কাছে। প্রকৃতিপ্রেমে যে-আমি আনন্দবিহ্বল সে-আমি থেকে 'ভগ্নহৃদয়ে'র মানবহৃদয়যুক্ত 'আমি' স্বতন্ত্র। কিন্তু দুজনের দুটি স্বতন্ত্র বাসনা একই রূপকল্পকে আশ্রয় করে প্রকাশিত হয়েছে, এও কম বিস্ময়ের বিষয় নয়! হৃদয়-অরণ্য থেকে নিষ্ক্রমণের ব্যাখ্যাটি মেনে নিলে 'ভগ্নহৃদয়ে'র উৎসর্গ কবিতাটি তাৎপর্যহীন হয়ে পড়ে। অথচ কবি-জীবনের প্রৌঢ় অধ্যায়গুলিতে প্রমাণিত হয়েছে যে, 'ভগ্নহৃদয়ে' উৎসর্গিত বাসনাই কবির মর্মলোকে অধিকতর সত্য হয়ে বিরাজমান ছিল।

নির্ঝরের রূপকল্প ব্যবহারপ্রসঙ্গে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জীবনের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার কথাও মনে পড়ে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতাকে ভাষা দিতে গিয়ে নির্ঝরের রূপকটি বেছে নিয়েছিলেন।

মহর্ষিদেবের জীবনেও নগাধিরাজের বিশাল অরণ্যে বিভ্রান্ত অবস্থায় একটি নির্ঝরই একটি অধ্যাত্ম-সংকেত রূপে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল। মহর্ষিদেবের জীবনে সেই ঘটনাটি ঘটেছিল রবীন্দ্রনাথের জন্মেরও বৎসর তিনেক পূর্বে, অর্থাৎ ১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দে। গৃহধর্মে বীতরাগ হয়ে তিনি তখন পর্বতশিখরের নির্জনতায় ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের ব্যাকুলতা নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। এমন সময় অরণ্যালোকে একটি পার্বত্য নির্ঝরিণীর কাছে তিনি পেলেন সংসারে ফিরে যাবার জন্যে তাঁর অন্তর্যামীর আদেশ। সেই অভিজ্ঞতার কথা মহর্ষিদেব তাঁর আত্মজীবনীর উপান্ত পরিচ্ছেদে বর্ণনা করেছেন। মহর্ষিদেব বলেছেন:

"আবার সেই শ্রাবণ-ভাদ্র মাসের মেঘ বিদ্যুতের আড়ম্বর প্রাদুর্ভূত হইল, এবং ঘন ঘন ধারা পর্বতকে সমাকুল করিল। * * এই সময়ে আমি কন্দরে কন্দরে নদী-প্রস্রবণের নব নব বিচিত্র শোভা দেখিয়া বেড়াইতাম। এই বর্ষাকালে এখানকার নদীর বেগে বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড প্রবাহিত হইয়া চলিয়া যায়। কেহই এ প্রমত্ত গতির বাধা দিতে পারে না। যে তাহাকে বাধা দিতে যায়, নদী তাহাকে বেগমুখে দূর করিয়া ফেলিয়া দেয়।

একদিন আশ্বিন মাসে খদে নামিয়া একটা নদীর সেতুর উপর দাঁড়াইয়া তাহার স্রোতের অপ্রতিহত গতি ও উল্লাসময়ী ভঙ্গী দেখিতে দেখিতে বিস্ময়ে মগ্ন হইয়া গেলাম। আহা! এখানে এই নদী কেমন নির্মল ও শুভ্র! ইহার জল কেমন স্বাভাবিক পবিত্র ও শীতল। এ কেন তবে আপনার এই পবিত্র ভাব পরিত্যাগ করিবার জন্য নীচে ধাবমান হইতেছে? এ নদী যতই নীচে যাইবে, ততই পৃথিবীর ক্লেদ ও আবর্জনা ইহাকে মলিন ও কলুষিত করিবে। তবে কেন এ সেই দিকেই প্রবল বেগে ছুটিতেছে? কেবল আপনার জন্য স্থির হইয়া থাকা তাহার কি ক্ষমতা? সেই সর্বনিয়ন্তার শাসনে পৃথিবীর কর্দমে মলিন হইয়াও ভূমিসকলকে উর্বরা ও শস্যশালিনী করিবার জন্য উদ্ধতভাব পরিত্যাগ করিয়া ইহাকে নিম্নগামিনী হইতেই হইবে।

এই প্রকার ভাবিতেছি, এই সময় হঠাৎ আমি আমার অন্তর্যামী পুরুষের গম্ভীর আদেশ-বাণী শুনিলাম, 'তুমি এ উদ্ধত ভাব পরিত্যাগ করিয়া এই নদীর মত নিম্নগামিনী হও। তুমি এখানে যে সত্য লাভ করিলে, যে নির্ভর ও নিষ্ঠা লাভ করিলে, যাও, পৃথিবীতে গিয়া তাহা প্রচার কর।'"[৭]

মহর্ষিদেবের আত্মজীবনী গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ হয়েছে 'প্রভাতসংগীতে'র অনেক পরে। কিন্তু তিনি তাঁর জীবনের এই পথনির্দেশকারী দিব্য অভিজ্ঞতার কথা নিশ্চয়ই তাঁর আত্মপরিজনের কাছে গল্প করে থাকবেন। তাঁর মুখে এই অরণ্য-নির্ঝরের আধ্যাত্মিক সংকেতটির কথা শুনে তরুণ কবিচিত্তে ওই রূপকল্পটি গড়ে ওঠা খুবই স্বাভাবিক। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে, এগার বৎসর বয়সে উপনয়নের পর রবীন্দ্রনাথ কিছুদিন হিমালয়ের শৈলপ্রবাসে বক্রোটার শিখরচূড়ায় ঘনিষ্ঠ পিতৃসান্নিধ্য পেয়েছিলেন।

এই প্রসঙ্গে 'বনবাণী'র "হাসির পাথেয়" কবিতাটিও স্মরণীয়। কবিতাটির ভূমিকায় কবি লিখেছেন, "তখন আমার অল্প বয়স। পিতা আমাকে সঙ্গে করে হিমালয়ে চলেছেন ড্যালহৌসি পাহাড়ে। সকালবেলায় ডাণ্ডি চড়ে বেরতুম, অপরাহ্ণে ডাকবাংলায় বিশ্রাম হত। আজো মনে আছে এক জায়গায় পথের ধারে ডাণ্ডিওয়ালারা ডাণ্ডি নামিয়েছিল। সেখানে শ্যাওলায় শ্যামল পাথরগুলোর উপর দিয়ে গুহার ভিতর থেকে ঝরণা নেমে উপত্যকায় কলশব্দে ঝরে পড়ছে। সে প্রথম দেখা ঝরণার রহস্য আমার মনকে প্রবল করে টেনেছিল।"[৮] সেদিনকার সেই উপলব্ধিই ১৩৩৪ সালের পয়লা বৈশাখ রচিত "হাসির পাথেয়" কবিতার জন্ম দিয়েছে। কবি লিখছেন :

> সেইদিন দেখেছিনু নিবিড় বিস্ময়মুগ্ধ চোখে
> চঞ্চল নির্ঝরধারা গুহা হতে বাহিরি আলোকে
> আপনাতে আপনি চকিত, যেন কবি বাল্মীকির
> উচ্ছ্বসিত অনুষ্টুভ। স্বর্গে যেন সুর-সুন্দরীর
> প্রথম যৌবনোল্লাস, নূপুরের প্রথম ঝংকার,
> আপনার পরিচয়ে নিঃসীম বিস্ময় আপনার,
> আপনারি রহস্যের পিছে পিছে উৎসুক চরণে
> অশ্রান্ত সন্ধান। সেই ছবিখানি রহিল স্মরণে
> চিরদিন মনোমাঝে।[৯]

এই কবিতা থেকেই বুঝতে পারা যাবে, কবিমানসে নির্ঝরের রূপকল্প কী নিগূঢ় সঞ্চারী অনুভূতির রূপক হয়ে আছে। নির্ঝর-রূপকল্পের সঙ্গে প্রভাতসূর্যের রূপকল্পটির সংযোজনা প্রসঙ্গে শেলির 'এপিসাইকিডিয়ন' কবিতাটির কথাও স্মরণীয়। শেলি বলছেন,

The fountains of our deepest life, shall be
Confused in passion's golden purity,
As mountain-springs under the morning sun.

এই কবিতাটি যে রবীন্দ্রনাথের অতি পরিচিত এবং অতি প্রিয় ছিল তার আভাস 'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্রে'ই পাওয়া যায়।

৪

'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে'র সঙ্গে আর একটি কবিতা অবিচ্ছেদ্য ভাবে গ্রথিত হয়ে আছে। 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' প্রকাশিত হয় '৮৯ বঙ্গাব্দের 'ভারতী'র অগ্রহায়ণ সংখ্যায়। সেই সংখ্যারই 'ভারতী'র শেষ দুটি পৃষ্ঠায় আর একটি কবিতা প্রকাশিত হয়, তার নাম "অভিমানিনী নির্ঝরিণী"। কবিতাটি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ বন্ধু কবি অক্ষয় চৌধুরীর লেখা। 'প্রভাতসংগীতে'র প্রথম সংস্করণে 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে'র সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ "অভিমানিনী নির্ঝরিণীকে"ও স্থান দিয়েছিলেন। এর কৈফিয়ত হিসাবে গ্রন্থকারের বিজ্ঞাপনে কবি বলেছিলেন, "'অভিমানিনী নির্ঝরিণী' নামক কবিতাটি আমার লিখিত নহে। 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' রচিত হইলে পর আমার কোন শ্রদ্ধেয় বন্ধু তাহারই প্রসঙ্গক্রমে 'অভিমানিনী নির্ঝরিণী' রচনা করেন। উভয় কবিতাই 'ভারতী'তে একত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। অতএব উভয়ের মধ্যে যে একটি আজন্ম-বন্ধন স্থাপিত হইয়াছে, তাহা বিচ্ছিন্ন না করিয়া দুটিকেই একত্রে রক্ষা করিলাম।" এই বিজ্ঞাপন থেকে এটুকু পাওয়া যাচ্ছে যে, 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' রচিত হবার পর 'তারই প্রসঙ্গক্রমে' 'অভিমানিনী নির্ঝরিণী' রচিত, এবং 'উভয়ের মধ্যে একটি আজন্ম-বন্ধন স্থাপিত' হয়েছে। আজন্ম-বন্ধনের কারণ হিসাবে 'ভারতীতে একত্র প্রকাশে'র কথা বলা হয়েছে। কিন্তু ওটুকু বাহ্য! 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে'র প্রসঙ্গক্রমেই 'অভিমানিনী নির্ঝরিণী'র সৃষ্টি, এ জন্যেই উভয়ের আজন্ম-বন্ধন। স্বভাবতই সহৃদয় রসিকের মনে এই প্রশ্ন জাগবে যে, এই নিগূঢ় প্রসঙ্গটি কি? এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার পূর্বে কবিতাটি পড়া দরকার। কবিতাটি তাই এখানে উদ্ধারযোগ্য :

অভিমানিনী নির্ঝরিণী

মহান জলধিজলে, প্রাণ ঢেলে দিব ব'লে
সুদূর পর্বত হোতে আসিনু বহিয়া,
পুরাতে প্রেমের সাধ, না গণিয়া পরমাদ
কত বাধা, কত বিঘ্ন—দাপটে ঠেলিয়া
এই ত সাগর জলে মিশিনু আসিয়া!—
কিন্তু—কিন্তু তবে কেন, আশাতে নিরাশা হেন,
কিছুই আশার মত হ'ল না ত হায়,—
যাহার আশ্রয় পেলে, থাকিব রে হেসে খেলে
কই রে?—সে করে না ত ভ্রূক্ষেপ আমায়!
সুগম্ভীর গরজনে, বহে সে আপন মনে
বহে সে দিগন্ত ভেদি কে জানে কোথায়,
কই রে! সে করে না ত ভ্রূক্ষেপ আমায়!
আপনে আপনা ভুলে, প্রমত্ত তরঙ্গ তুলে
বায়ু সনে কত খেলা আপনি খেলায়,
কখন প্রশান্ত মতি, কভু বা উৎসাহে অতি
আবেশে ঢলিয়া পড়ে বিবশা বেলায়;
কই রে!—সে করে না ত ভ্রূক্ষেপ আমায়!
এক ধারে পড়ে থাকি, নিজ মান নিজে রাখি
তাহারি উল্লাসে যেন আমারো উল্লাস,
সরোষ নির্ঘোষে তার, আমারো দু পারাপার
ঢেকে ফেলি, ভেঙ্গে ফেলি তুলিয়ে উচ্ছ্বাস।
রাখিতে তাহার মন, প্রতিক্ষণে সযতন,
হাসে হাসি কাঁদে কাঁদি—মন রেখে যাই,
মরমে মরম ঢাকি, তাহারি সম্মান রাখি,
নিজের নিজত্ব ভুলে তারেই ধেয়াই,
কিন্তু সে ত আমা পানে ফিরেও না চায়!
নিতান্ত যাহারি লাগি, হইলাম সর্বত্যাগী
সে ত রে আমার পানে ফিরেও না চায়,

ভীম দর্পে করে ত না ভ্রূক্ষেপ আমায় !
পর্বতে মায়ের কোলে ছিনু যবে শিশুকালে
কে জানিত ভাগ্যে ছিল হেন অভিশাপ ;
হ'ল সার অশ্রু ঢালা, নিরাশ মরম জ্বালা,
দিবানিশি কুলু কুলু আকুল বিলাপ।
যখন ঝটিকা উঠে গ্রাম পল্লী যায় লুটে
ছিন্নভিন্ন মতিচ্ছন্ন কোরে ফেলে মোরে,
বিসর্জি অযুত ধারা মত্ত পাগলিনী পারা
ঝাঁপিয়া সাগরে পড়ি আশ্রয়ের তরে,
আশ্রয় কে দিবে আর ? প্রেমোন্মত্ত পারাবার
দুরন্ত ঝটিকা সনে নিজে মেতে রয়,
নিজের গাম্ভীর্য ভুলি, সফেন তরঙ্গ তুলি
আলিঙ্গন আশে, পেতে দেয় রে হৃদয় !
চপলা কটাক্ষ-বাণে প্রতি কটাক্ষটি হানে,
ঝটিকা-উচ্ছ্বাস সনে মেশায় উচ্ছ্বাস !
আহ্লাদের গরজনে, কাঁপে দিগঙ্গনাগণে
ওঠে পড়ে ঘন ঘন মর্মভেদী শ্বাস।
আমি সে ঝঞ্ঝার তোড়ে, কোথা যে রয়েছি পোড়ে
কোথা যে প্রাণের প্রাণ মিশালো আমার,
সে দিকে কি ভ্রূক্ষেপও আছে গো তাঁহার ?

তবে কি মায়ের কোলে উজানে যাইব চ'লে
সুখ-সাধ সুখ আশা করি বিসর্জন ?
সহিতে পারি না আর প্রণয়েতে অত্যাচার
মরমে ঢাকে না আর জলন্ত যাতন।
কি হবে আমার আর নক্ষত্র-গ্রথিত হার,
চম্পক চামেলী বেলা অলকা ভূষণ।
আঃ ছিঃ ছিঃ ছিঃ লজ্জা করে তরল তরঙ্গ ভরে
নেচে নেচে বহে যেতে সাগর সঙ্গম !

সেদিন কোথায় আর, অন্ধকার অন্ধকার,
ঘেরিয়াছে চারিধার জমাট আঁধারে,
শৈশব স্বপনগুলি সব যেন গেছি ভুলি,
ঢলিয়ে পড়েছি প্রেমে প্রেম-পারাবারে ;
উজানে বহিতে তাই তিলমাত্র শক্তি নাই,
যাহাতে মিশেছি এসে মিশিব তাহায় !
সঁপিয়াছি প্রাণ মন, সঁপিয়াই প্রাণ মন
দেখিব এ দগ্ধ হৃদি নাহি কি জুড়ায় !
দেখিব বিকায়ে হিয়ে পরাণ সর্বস্ব দিয়ে
গম্ভীর সাগরপ্রেম পাওয়া কি না যায় !
দেখিব এ দগ্ধ হৃদি নাহি কি জুড়ায় !
না জুড়াক মন প্রাণ, নাহি পাই প্রতিদান,
জলন্ত যাতনে হৃদি হোক দগ্ধ প্রায়,
তবুও উজানে ফিরে যেতে সাধ হয় কিরে !
প্রাণ মন বিসর্জিয়ে রহিব হেথায়,
যাহাতে মিশেছি প্রেমে মিশিব তাহায় !

বলাই বাহুল্য, নির্ঝরিণীর রূপকে একটি বিশেষ নারীচিত্তই এ কবিতার আলম্বন। এবং অন্যাসক্ত স্বামীর প্রতি তদ্গতচিত্ত নারীর অভিমানই কবিতাটির বিষয়। কিন্তু কে এই অভিমানিনী নারী? আমরা পূর্বে বিহারীলালের 'সারদামঙ্গলে'র নবম ও দশম সর্গের 'আসনদাত্রী দেবী' ও 'পতিব্রতা' থেকে উদ্ধৃতি আহরণ করে দেখেছি যে, কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুর জন্যে বিহারীলাল জ্যোতিরিন্দ্রনাথকেই ভর্ৎসনা করেছেন। 'কে ছিঁড়েছে আশালতা? কি মানে মানিনী গো?' (১০।৭)—এই জিজ্ঞাসার পরে কবি লিখেছেন :

আজি মা কিসের তরে
হাসি নাই বিম্বাধরে,
মলিন বিষণ্ণমুখী, নেত্রে কেন অশ্রুজল ?
ভাল মানুষের ভালে
সুখ নাই কোন কালে,

কঠোর নিয়তি, আরো কতই কাঁদাবি বল ? ১০।৮

এস না ধরায়—আর এস না ধরায়।
পুরুষ কিম্ভূতমতি চেনে না তোমায়।
মন প্রাণ যৌবন—
কি দিয়া পাইবে মন।
পশুর মতন এরা নিতুই নতুন চায়।
এস না ধরায়!

এর পর সংশয় থাকে না যে, বিহারীলালের 'মানিনী পতিব্রতা' আর অক্ষয় চৌধুরীর 'অভিমানিনী নির্ঝরিণী' একটি আরেকটির প্রতিধ্বনিমাত্র। রসশাস্ত্রের আলংকারিক পরিভাষায় মান 'সহেতু'ই হোক্ আর 'নির্হেতু'ই হোক্, 'অভিমানিনী নির্ঝরিণী' কবিতার সমাসোক্তি অলংকারে 'মানময়ী' কাদম্বরী দেবীর হৃদয়বেদনাই অভিব্যঞ্জিত হয়েছে।

৫

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, সদর স্ট্রীটে 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' রচনার অব্যবহিত পরেই কবি জ্যোতিদাদাদের সঙ্গে দার্জিলিঙে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে ফেরার পর তাঁরা আর সদর স্ট্রীটের বাড়িতে ফিরে যান নি। তার বদলে চোদ্দ নম্বর সার্কুলার রোডের বাসাবাড়িতে এসে উঠলেন। সেখানে সাহিত্যচর্চার জন্যে 'সমালোচনী সভা' স্থাপিত হয়েছে। বাড়িতে পার্টি, গানের মজলিস প্রায়ই চলছে। সত্যেন্দ্রনাথও কিছুদিনের জন্যে ছুটি নিয়ে এসেছেন। মহা আনন্দে দিনগুলি কাটতে লাগল। এরই মধ্যে 'বিদ্বজ্জন সভা'র বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে 'কালমৃগয়া' অভিনীত হল। রবীন্দ্রনাথ অন্ধমুনি এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথ দশরথের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন।

পরবর্তী গ্রীষ্মে 'সদর স্ট্রীটের দল' কিছুদিনের জন্যে কারোয়ারে সমুদ্রতীরে আশ্রয় নিয়েছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ তখন সেখানকার জজ। কারোয়ার বম্বে প্রেসিডেন্সির দক্ষিণাংশে স্থিত কর্নাটের প্রধান শহর। এলালতা ও চন্দনতরুর জন্মভূমি মলয়াচলের দেশ কারোয়ার। 'জীবনস্মৃতি'তে কবি "কারোয়ার" অধ্যায়ে লিখেছেন, এই ক্ষুদ্র শৈলমালাবেষ্টিত সমুদ্রের বন্দরটি এমন

নিভৃত এমন প্রচ্ছন্ন যে, নগর সেখানে নাগরীমূর্তি প্রকাশ করতে পারে নি। অর্ধচন্দ্রাকারে বেলাভূমি অকূল নীলাম্বুরাশির অভিমুখে বাহু দুটি প্রসারিত করে দিয়েছে—সে যেন অনন্তকে আলিঙ্গন করে ধরবার একটি মূর্তিমতী ব্যাকুলতা। প্রশস্ত বালুতটের প্রান্তে বড় বড় ঝাউগাছের অরণ্য, এই অরণ্যের এক সীমায় একটি ক্ষুদ্র নদী তার দুই গিরিবন্ধুর উপলরেখার মাঝখান দিয়ে সমুদ্রে এসে মিশেছে। 'সোনার তরী'র বসুন্ধরা কবিতায় সমুদ্রের তটে ছোট ছোট নীলবর্ণ পর্বতসংকটে যে গ্রামখানির বর্ণনা আছে, মনে হয় তাতে কারোয়ারের স্মৃতি জড়িয়ে রয়েছে। শুক্লপক্ষের এক গোধূলিতে ছোট্ট একটি নৌকো করে নদীর উজানে শিবাজীর একটি গিরিদুর্গে নৈশ অভিযানের কাহিনীটিও কবি 'জীবনস্মৃতি'তে সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। একটি চাষীর কুটিরে বেড়া-দেওয়া পরিষ্কার নিকোনো আঙিনায় আসন পেতে বসে অপূর্ব তৃপ্তির সঙ্গে যে আহার করেছিলেন সে কথাও ভোলেন নি। সেদিন জ্যোৎস্নানিশীথে স্বপ্নাচ্ছন্ন প্রত্যাবর্তন, এবং বাড়ি পৌঁছে ঘুমের চেয়েও কোন্ গভীরতার মধ্যে যে তাঁর ঘুম ডুবে গিয়েছিল তার চিরকালের সাক্ষী হয়ে রয়েছে 'ছবি ও গানে'র "পূর্ণিমায়" কবিতাটি। কারোয়ারের স্মৃতি রবীন্দ্রমানসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবার কথা, কেন না নতুন বৌঠানের সঙ্গে এই তাঁর শেষ প্রবাস-ভ্রমণ। কারোয়ারের একটি বিস্ময়কর স্মারকচিহ্ন কালের কবল থেকে রক্ষা পেয়েছে। একটি কাচমণি পাথরকে হৃদয়ের আকার দিয়ে কবি তাতে কবিতার দুটি চরণ স্বহস্তে খোদাই করেছিলেন। পয়ারবন্ধে গ্রথিত সেই ষোড়শাক্ষর পদযুগ্মক হল :

পাষাণ হৃদয় কেটে
খোদিনু নিজের হাতে
আর কি মুছিবে লেখা
অশ্রুবারিধারাপাতে।

এই পাষাণ-হৃদয়টি রবীন্দ্রনাথ অক্ষয় চৌধুরীকে উপহার দেন।[১০] এ থেকে আবার প্রমাণ হবে যে, অক্ষয় চৌধুরী রবীন্দ্রনাথের হৃদয়াবেগের শুধু সংবাদই রাখতেন না, সমপ্রাণ সহৃদয়ের মত তিনি তরুণ কবির নিভৃত চেতনার অন্তরঙ্গ শরিকও ছিলেন। এই পদযুগলের অর্থ আবিষ্কার করার চেষ্টা নিষ্ফল হবে না। গুহ্য ব্যাপারে অন্তরঙ্গজনের মধ্যে আভাসে ইঙ্গিতে যে সংকেত-ভাষণ চলে,

এখানে তাই ব্যবহৃত হয়েছে। তবু 'সন্ধ্যাসংগীতে'র "পাষাণী" কবিতার সঙ্গে এর আশ্চর্য ভাবসাদৃশ্য দেখে বিস্মিত হতে হয়। অনুরক্ত কবিপ্রেমিক তাঁর আরাধ্যা দেবীকে নিষ্করুণা পাষাণী, এই অভিযোগ দিয়ে সে কবিতায় বলেছিলেন :

> যে জন দেবতা মোর কোথা সে আছে না জানি,
> তুমি তো কেবল তার পাষাণ-প্রতিমাখানি!
> তোমার হৃদয় নাই, চোখে নাই অশ্রুধার,
> কেবল রয়েছে তব পাষাণ আকার তার।

তাই কবি তাঁকে অস্বীকার করার ছল করে আক্ষেপানুরাগের ভঙ্গিতে বলছেন :

> তুমি নও, সে জন তো নও,
> তবে তুমি কোথা হতে এলে ?
> এলে যদি এস তবে কাছে,
> এ হৃদয়ে যত অশ্রু আছে,
> একবার সব দিই ঢেলে,
> তোমার সে কঠিন পরান
> যদি তাহে এক তিল গলে,
> কোমল হইয়া আসে মন
> সিক্ত হয়ে অশ্রু জলে জলে!

এই পংক্তিনিচয়ের সাক্ষ্য থেকে অনুমান করা অন্যায় হবে না যে, কবিকল্পিত পাষাণ-হৃদয়টির সঙ্গে এই 'পাষাণী'র একটি অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে।

৬

কারোয়ার থেকে তাঁরা ফিরলেন জাহাজে করে। এবার সবাই উঠলেন চৌরঙ্গির নিকটবর্তী ২৩৭ লোয়ার সার্কুলার রোডের একটি বাগান-বাড়িতে। সত্যেন্দ্রনাথ এই বাগান-বাড়িটি ভাড়া নিয়েছিলেন। 'প্রভাতসংগীতে'র পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ 'ছবি ও গান'-এর প্রথম পর্যায় কারোয়ারে লেখা, আর শেষ পর্যায় লোয়ার সার্কুলার রোডের এই বাগান-বাড়িতে। এ সময়কার কবির

মনোভাব পূর্বোদ্ধৃত প্রমথ চৌধুরীকে লেখা কবির পত্রখানিতে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। কি মাতাল হয়েই যে কবি 'ছবি ও গান' লিখেছিলেন তার বর্ণনা দিয়ে বলছেন, "আমি তখন দিনরাত পাগল হয়ে ছিলুম। আমার সমস্ত বাহ্যলক্ষণে এমন সকল মনোবিকার প্রকাশ পেত যে তখন যদি তোমরা আমাকে প্রথম দেখতে তো মনে করতে এ ব্যক্তি কবিত্বের ক্ষ্যাপামি দেখিয়ে বেড়াচ্ছে। আমার সমস্ত শরীরে মনে নবযৌবন যেন একেবারে হঠাৎ বন্যার মত এসে পড়েছিল। * * সত্যি কথা বলতে কি, সেই নবযৌবনের নেশা এখনো আমার হৃদয়ের মধ্যে লেগে রয়েছে। ছবি ও গান পড়তে পড়তে আমার মন যেমন চঞ্চল হয়ে ওঠে এমন আমার কোনো পুরোনো লেখায় হয় না। তার থেকে বুঝতে পারি সে নেশা এখনো এক জায়গায় আছে—তবে কিনা, সে নেশা

Hath been cooled a long age
In the deep delved heart."

'ছবি ও গান' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিল ১২৯০ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন মাসে। তার মাস তিনেক পূর্বে [২৪শে অগ্রহায়ণ] কবির বিবাহ হয়। 'ছবি ও গানে'র পূর্বেকার 'ভগ্নহৃদয়', 'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র', 'সন্ধ্যাসংগীত' ও 'বিবিধ প্রসঙ্গে'র মতো এই গ্রন্থখানিও কাদম্বরী দেবীকেই উৎসর্গ করা। উৎসর্গে কবি লিখেছিলেন, 'গত বৎসরকার বসন্তের ফুল লইয়া এ বৎসরকার বসন্তে মালা গাঁথিলাম। যাঁহার নয়ন-কিরণে প্রতিদিন প্রভাতে এই ফুলগুলি একটি একটি করিয়া ফুটিয়া উঠিত, তাঁহারি চরণে ইহাদিগকে উৎসর্গ করিলাম।'

কাদম্বরী দেবীর জীবদ্দশায় 'ছবি ও গান'ই কবির শেষ উপহার। উৎসর্গের ভাষা থেকে আমরা জানতে পারছি, এই গ্রন্থের কাব্যপুষ্পগুলি তাঁরই নয়ন-কিরণে প্রতিদিন প্রভাতে একটি একটি করে ফুটে উঠেছে। এই প্রসঙ্গে 'সন্ধ্যাসংগীতে'র "উপহার" কবিতাটিকে পুনরায় স্মরণ করতে হবে। মনে হয়, 'সন্ধ্যাসংগীত' গ্রন্থাকারে প্রকাশের পূর্বে কবি কিছুদিন তাঁর নতুন বৌঠানের কাছ থেকে দূরে ছিলেন, তাই বিরহকাতর কবি বলেছেন :

বলো দেখি কত দিন আস নি এ শূন্য প্রাণে,
বলো দেখি কত দিন চাও নি হৃদয়পানে,—
বলো দেখি কত দিন শোন নি এ মোর গান,
তবে সখী গান-গাওয়া হল বুঝি অবসান।

এই নিষ্ফল শূন্যতার আশু-অবসান কামনা করে "উপহারে"র শেষ স্তবকে কবির মিনতি ছিল—

সেই পুরাতন চোখে মাঝে মাঝে চেয়ো সখী
উজলিয়া স্মৃতির মন্দির,
এই পুরাতন প্রাণে মাঝে মাঝে এসো সখী
শূন্য আছে প্রাণের কুটির।
নহিলে আঁধার মেঘরাশি
হৃদয়ের আলোক নিবাবে,
একে একে ভুলে যাব সুর,
গান গাওয়া সাঙ্গ হয়ে যাবে।

'ছবি ও গান'-এর উৎসর্গ পড়ে বুঝতে পারা যায় কবির প্রার্থনা অপূর্ণ থাকে নি। তাঁরই নয়নকিরণে কবির হৃদয়কাননের কুসুমগুলি প্রতিদিন বিকশিত হয়ে উঠেছে। এই প্রসঙ্গে 'উপহারে'র দুটি বাক্যের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা যেতে পারে। প্রথম বাক্যে দেখা যাচ্ছে, কবি এক বসন্তের ফুল নিয়ে আর বসন্তে মালা গেঁথেছেন। সেই মালা 'বঁধুর গলায়' পরিয়ে দেওয়ার সহজাত বাসনা সংবৃত হয়ে দ্বিতীয় বাক্যে ফুলগুলি 'দেবতা-চরণে' নিবেদিত হল। অর্থাৎ 'বৈষ্ণব কবিতা'য় কবি যে কথা বলেছিলেন—'দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা'—এই ছিল তাঁরো ব্যক্তিজীবনের নিয়তি। বস্তুত, চেতনার স্তরভেদে কবির কাছে তাঁর নতুন বৌঠানের ছিল তিনটি সত্তা। অনুরক্ত ভক্তের কাছে তিনি ছিলেন দেবী, রসিক কবির প্রেমকল্পনায় তিনি রহঃসখী, আর তরুণ প্রেমিকের হৃদয়বাসনায় কৌতুকময়ী মানসসুন্দরী। অনুক্ষণ সান্নিধ্যের মধ্যে থেকেও তিনি ছিলেন চির-অপ্রাপণীয়া, নিত্যনবীনা। অন্তহীন বিরহের আলম্বনস্বরূপিণী এই রহস্যময়ীর কথা স্মরণ করে পরিণত বয়সেও কবিকণ্ঠে তাই চির-অতৃপ্ত বাসনার 'আক্ষেপ' ধ্বনিত হয়ে উঠেছে: 'তবু ঘুচিল না অসম্পূর্ণ চেনার বেদনা।'

৭

'ছবি ও গানে'র "উপহার" প্রসঙ্গে "বৈষ্ণব কবিতা"র ভাবানুষঙ্গ মনে পড়ার আরো একটি নিগূঢ় হেতু রয়েছে। এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের প্রথম ও শেষ কবিতা দুটি ছিল ভানুসিংহ ঠাকুরের দুটি পদ। রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল এই যে, কবি তাঁর প্রত্যেক সংকলনের প্রথমে কিংবা শেষে, কখনো কখনো উভয় ক্ষেত্রেই, এমন কবিতা নির্বাচিত করেন যার মধ্যে গ্রন্থের মর্মকথা বিধৃত থাকে। 'সন্ধ্যাসংগীত' থেকে আরম্ভ করে, দু একটি ব্যতিক্রম ছাড়া, এই রীতি সর্বত্র অনুসৃত হয়েছে। স্বভাবতই মনে প্রশ্ন জাগবে, কবি কেন 'ছবি ও গানে'র প্রথমে ও শেষে ভানুসিংহের দুটি পদ নির্বাচিত করেছিলেন। পরবর্তী সংস্করণে, 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' গ্রন্থাকারে প্রকাশের পর 'ছবি ও গান' থেকে কবিতা দুটি বর্জিত হয়েছে। এই বর্জনে 'ছবি ও গান' শুধু খণ্ডিতই হয় নি, তার মর্মকথাও অবলুপ্ত হয়েছে। ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলীর আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা পূর্বে বলেছি, রবীন্দ্রনাথ তাঁর ব্যক্তিসীমায় যে হ্লাদিনীর সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন, ভানুসিংহ ঠাকুরের ছদ্মবেশে তিনি সেই হ্লাদৈকময়ী লীলাসঙ্গিনীর মাধুর্যলীলাই আস্বাদন করেছেন বৈষ্ণবের নিত্যলীলার রূপককে আশ্রয় করে। 'ছবি ও গানে'র আদি ও অন্তে আমরা কবির সেই মানসরাধাকেই দেখতে পাচ্ছি। সুনির্বাচিত পদ দুটিতে আছে রাধার মিলন-বিরহ-লীলারই গীতালেখ্য। প্রথম কবিতাটি [আজু সখি, মুহু মুহু গাহে পিক কুহু কুহু] বসন্তের মাদক-বিহ্বলতায় মিলন-বিলাসের ছবি :

> আজু মধু চাঁদনী, প্রাণ-উনমাদনী,
> শিথিল সব বাঁধনী, শিথিল ভই লাজ।
> বচন মৃদু মরমর, কাঁপে রিঝ থরথর,
> শিহরে তনু জরজর, কুসুমবন-মাঝ ॥

শেষের কবিতাটি [মরণ রে, তুঁহু মম শ্যাম-সমান] রবীন্দ্রকাব্যানুরাগীদের নিকট সুপরিচিত। কবিও তাঁর 'সঞ্চয়িতা'র সর্বপ্রথমে কবিতাটিকে স্থান দিয়ে কবিবিধাতার প্রথম সার্থক আদিসৃষ্টির [সৃষ্টিরাদ্যেব ধাতুঃ] দুর্লভ

মর্যাদা দিয়েছেন। এখানে রাধা বিরহিণী। দুর্বিষহ বিরহে তিনি মৃত্যুকেই 'নিরদয় মাধবে'র বদলে বরণ করবেন বলে সংকল্প করে বলছেন:

মরণ রে, শ্যাম তোহারই নাম।
চিরবিসরল যব নিরদয় মাধব
তুঁহু ন ভইবি মোয় বাম॥
আকুল রাধা-রিঝ অতি জরজর
ঝরই নয়ন-দউ অনুখন ঝরঝর,
তুঁহু মম মাধব, তুঁহু মম দোসর,
তুঁহু মম তাপ ঘুচাও।
মরণ তু আও রে আও॥

এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে এই পদটি চন্দননগরে ১২৮৮ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাসে লেখা। এই পদে অভিব্যক্ত মৃত্যুবাসনা শুধু এই একটি কবিতারই বিচ্ছিন্ন উপলব্ধি নয়। এই সময়কার 'তারকার আত্মহত্যা', 'অনন্ত মরণ' প্রভৃতি আরো দু-একটি রচনায় মৃত্যুচেতনা কবিমানসকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। এই চেতনার হেতু কি ও উৎস কোথায়, কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুপ্রসঙ্গে পরে তা আলোচিত হবে। কিন্তু আমাদের আলোচ্য পদটিতে দেখা যাচ্ছে, মৃত্যু কামনা করছেন বলে ভানুসিংহ তাঁর রাধাকে ভর্ৎসনা করে বলেছেন:

ভানুসিংহ কহে "ছিয়ে ছিয়ে রাধা,
চঞ্চল হৃদয় তোহারি,
মাধব পহু মম, পিয় স মরণসে
অব তুঁহু দেখ বিচারি॥"

কবিতাটি যেন দৈব-সংকেতের মত 'ছবি ও গানে'র অন্তিম সংগীত রূপে বিন্যস্ত হয়েছিল। কেন না 'ছবি ও গান' প্রকাশের মাস দুই পরেই কাদম্বরী দেবী মৃত্যু বরণ করলেন। ভানুসিংহের কাতর প্রার্থনায় কর্ণপাত করার মত চিত্তের অবস্থা তাঁর ছিল না। চিরবিস্মরণশীল নিষ্করুণ মাধবের চেয়ে তাপবিমোচন মরণের কোলই তাঁর কাছে অমৃতের নিলয় বলে মনে হয়েছে।

॥ উল্লেখ-পঞ্জী ॥

১ জীবনস্মৃতি, পৃ° ১৩৬।

২ মানুষের ধর্ম, পৃ° ১০৫।

৩ তদেব, পৃ° ১০৬-১০৯।

৪ জীবনস্মৃতি, পৃ° ১৪১।

৫ চিঠিপত্র-৫, পৃ° ১৩৩-১৩৪

৬ জীবনস্মৃতি, পৃ° ১৩৮-১৩৯।

৭ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী [সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত], পৃ° ২৮১-২৮২।

৮ রবীন্দ্র-রচনাবলী-১৫। পৃ° ১৪৮।

৯ তদেব। পৃ° ১৪৯।

১০ দ্রষ্টব্য : Calcutta Municipal Gazette, Tagore Memorial Special Supplement, Sept. 13, 1941, p. vi.

দশম অধ্যায়

স্বর্ণমৃণালিনী

১

"অদৃষ্ট আমাদের জীবনের তাসে অনেকগুলির মিল রাখিয়াছেন, কিন্তু মাঝে মাঝে একটা একটা করিয়া গোলাম রাখিয়া দিয়াছেন, তাহার আর মিল খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। চিরজন্ম গোলামচোর খেলিয়া আসিতেছি, কত বাজি যে খেলা হইল তাহার আর সংখ্যা নাই, খেলোয়াড়দের মধ্যে কে জাঁক করিয়া বলিতে পারে যে, সে একবারো গোলামচোর হয় নাই? অদৃষ্টের হাতে নাকি তাস, আমরা দেখিয়া টানিতে পারি না, তাহা ছাড়া অদৃষ্টের তাসখেলায় নাকি গোলামের সংখ্যা একটি নহে, এমন অসংখ্য গোলাম আছে কাজেই সকলকেই প্রায় গোলামচোর হইতে হয়। আমরা সকলেই চাই,—মিলকে পাইতে ও অমিলকে তাড়াইতে। গোলাম পাইলে আমরা কোন উপায়ে গলাবাজি করিয়া চালাকী করিয়া প্রতিবেশীর হাতে চালান করিয়া দিতে চাই। * *

"আমাদের দেশের বিবাহপ্রণালীর মত গোলামচোরখেলা আর নাই। প্রজাপতি তাস বিলি করিয়া দিয়াছেন। সত্যমিথ্যা জানি না, বিবাহিত বন্ধুবান্ধবের মুখে শুনিতে পাই যে, তাসে গোলামের ভাগই অধিক। চৌধুরী হালদারের হাত হইতে তাস টানিবে; দেখিয়া-টানা পদ্ধতি নাই। চৌধুরীর হাতে যদি তুরি থাকে, আর হালদারের হাতেও তুরি থাকে তবেই শুভ, নতুবা যদি গোলাম টানিয়া বসেন, তবেই সর্বনাশ। আন্দাজ করিয়া টানিতে হয়, আগে থাকিতে জানিবার উপায় নাই। কিন্তু কি আশ্চর্য! কোথায় চৌধুরী কোথায় হালদার; হালদারের হাত হইতে চৌধুরী দৈবাৎ একটা তাস টানিল, চৌষট্টিটা [বাহান্ন] তাসের মধ্যে হয়ত সেইটাই মিলিয়া গেল। যেই মিলিল, অমনি মিল-দম্পতি বিশ্রাম পাইল। অন্যান্য অবিবাহিত তাসেরা হাতে হাতে মিল অনুসন্ধান করিয়া ফিরিতে লাগিল, তাহাদের আর বিশ্রাম নাই। এইখানে সাধারণকে বিদিত করিতেছি, আমি একটি অবিবাহিত তাস আছি, আমার মিল কাহার হাতে আছে জানিতে চাই। আমার বন্ধু-বান্ধবেরা

আমাকে বলেন, গোলাম। বলেন, আমার মিল ত্রিজগতে নাই। যে কন্যাকর্তা টানিবেন তিনি গোলামচোর হইবেন। কিন্তু, বোধ করি তাঁহারা রহস্য করিয়া থাকেন, কথাটা সত্য নহে।…”[১]

নিজেকে এবং আমাদের বিবাহপ্রথাকে নিয়ে রবীন্দ্রনাথের এই অপূর্ব রসিকতা ১২৮৮ বঙ্গাব্দের আষাঢ়-সংখ্যায় ‘ভারতী’তে প্রকাশিত ‘গোলামচোর’ প্রবন্ধের বিষয়ীভূত হয়েছিল। তখন তাঁর বয়স কুড়ি বৎসর। বন্ধুবান্ধবেরা তাঁকে গোলামচোর খেলার গোলামের পর্যায়ভুক্ত করেছিলেন। কেন না, তাঁরা বলতেন, তাঁর মিল ত্রিজগতে নেই। অতএব যে-কন্যাকর্তা তাঁকে টানবেন তিনি গোলামচোর হবেন। সেদিন কবি রসিকতার হালকা সুরেই বলেছিলেন, বন্ধুরা এ নিয়ে যাই রহস্য করুন না কেন, কথাটা সত্য নয়। কবির বিবাহ ও তাঁর বিবাহিত জীবনের আলোচনার প্রথমেই এই প্রবন্ধটির কথা মনে হল এই জন্যে যে, রবীন্দ্রনাথের মত অলোকসামান্য প্রতিভাবান পুরুষের জীবনসঙ্গিনী রূপে তাঁর মহাজাগতিক জীবনের ‘যথার্থ দোসর’ হওয়ার মত মেয়ে বাংলাদেশে কেন সারা পৃথিবীতেই দুর্লভ। কাজেই পিরালী-ব্রাহ্মণ-সমাজের সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে তার সন্ধান করা বিড়ম্বনা মাত্র। তবু ওই সমাজেরই একটি পল্লী-বালিকা তাঁর ‘কনে’ হিসাবে নির্বাচিতা হলেন। ১২৯০ বঙ্গাব্দের চব্বিশে অগ্রহায়ণ রবীন্দ্রনাথের বিবাহ হল।

বিবাহের পঞ্চান্ন বৎসর পরে মংপুতে একদিন শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবী কবির কাছে অনুরোধ জানালেন তাঁর বিয়ের গল্প বলতে। কবি বললেন, ‘আমার বিয়ের কোনো গল্প নেই। বৌঠানরা যখন বড় বেশি পীড়াপীড়ি শুরু করলেন, আমি বল্লুম, ‘তোমরা যা হয় কর, আমার কোনো মতামত নেই।’ তাঁরাই যশোরে গিয়েছিলেন, আমি যাই নি। আমি বলেছিলাম, আমি কোথাও যাব না এখানেই বিয়ে হবে। জোড়াসাঁকোতে হয়েছিল।’[২]

রবীন্দ্রনাথের বিবাহ সম্পর্কে অবনীন্দ্রনাথের ‘ঘরোয়া’ গ্রন্থেও সামান্য একটু সংবাদ আছে। গ্রন্থকার বলছেন, ‘রবিকার বিয়ে আর হয় না; সবাই বলেন বিয়ে করো বিয়ে করো এবারে, রবিকা রাজি হন না, চুপ করে ঘাড় হেঁট করে থাকেন। শেষে তাঁকে তো সবাই মিলে বুঝিয়ে রাজি করালেন।’[৩] কথাটা লক্ষ্য করবার মত। ‘রবিকার বিয়ে আর হয় না; সবাই বলেন বিয়ে করো বিয়ে করো এবারে।’—এ কথার তাৎপর্য এ যুগে হারিয়ে গেছে। সে যুগে

কুড়ি পেরিয়েও পুরুষের বিয়ে না হওয়া ছিল একটা অস্বাভাবিক ঘটনা। রবীন্দ্রনাথের যখন বিয়ে হয় তখন তাঁর বয়স বাইশ পেরিয়ে তেইশ চলছে। তাঁর দাদাদের বিয়ে সতেরো-আঠারো-উনিশের মধ্যেই শেষ হয়ে গেছে। কাজেই রবীন্দ্রনাথের বিবাহ কিঞ্চিৎ বিলম্বিত।

মংপুর প্রশ্নকর্ত্রীকে কবি বলেছিলেন তাঁর বিয়ের কোন গল্প নেই। কিন্তু অন্তত একটি গল্প যে ছিল সে কথা সেদিনই কবি বলেছিলেন মৈত্রেয়ী দেবীকে। কবি বললেন: 'জানো একবার একটি বিদেশী অর্থাৎ অন্য Province-এর মেয়ের সঙ্গে বিয়ের কথা হয়েছিল। সে এক পয়সাওয়ালা লোকের মেয়ে, জমিদার আর কি বড় গোছের। সাত লক্ষ টাকার উত্তরাধিকারিণী সে। আমরা কয়েকজন গেলুম মেয়ে দেখতে, দুটি অল্পবয়সী মেয়ে এসে বসলেন—একটি নেহাৎ সাদাসিদে, জড়ভরতের মত এক কোণে বসে রইল; আর একটি যেমন সুন্দরী, তেমনি চটপটে। চমৎকার তার স্মার্টনেস। একটু জড়তা নেই, বিশুদ্ধ ইংরেজি উচ্চারণ। পিয়ানো বাজালো ভালো—তারপর music সম্বন্ধে আলোচনা শুরু হল। আমি ভাবলুম এর আর কথা কি? এখন পেলে হয়।—এমন সময় বাড়ির কর্তা ঘরে ঢুকলেন। বয়েস হয়েছে, কিন্তু সৌখীন লোক। ঢুকেই পরিচয় করিয়ে দিলেন মেয়েদের সঙ্গে। সুন্দরী মেয়েটিকে দেখিয়ে বললেন,—'Here is my wife' এবং জড়ভরতটিকে দেখিয়ে 'Here is my daughter'।...আমরা আর করব কি, পরস্পর মুখচাওয়াচাওয়ি করে চুপ করে রইলুম; আরে তাই যদি হবে তবে ভদ্রলোকদের ডেকে এনে নাকাল করা কেন! যাক্, এখন মাঝে মাঝে অনুশোচনা হয়।...যা হোক্, হলে এমনই কি মন্দ হত। মেয়ে যেমনই হোক্ না কেন, সাত লক্ষ টাকা থাকলে বিশ্বভারতীর জন্যে ত এ হাঙ্গামা করতে হত না। তবে শুনেছি সে মেয়ে নাকি বিয়ের বছর দুই পরেই বিধবা হয়। তাই ভাবি ভালই হয়েছে, কারণ স্ত্রী বিধবা হলে আবার প্রাণ রাখা শক্ত।'[৪]

এই স্বল্পাক্ষর কাহিনীটি কবির স্বভাবসুলভ পরিহাস-রসিকতায় উপাদেয়। অন্য প্রদেশের অর্থাৎ অবাঙালী একটি মেয়ের সঙ্গে বিবাহ-প্রস্তাবের এই সরস গল্পটি বানিয়ে-বলা কি না, এ সংশয় তথ্যনিষ্ঠ পাঠকের মনে জাগ্রত হওয়া অসঙ্গত নয়। কিন্তু গল্পটি যে বানিয়ে-বলা নয়, অর্থাৎ কবিজীবনে যে অনুরূপ একটি ঘটনা সত্যি সত্যি ঘটেছিল তার কাব্য-প্রমাণ রয়েছে ১২৯০ বঙ্গাব্দের

জ্যৈষ্ঠের 'ভারতী'তে। সাত লক্ষ টাকার যৌতুকের সঙ্গে একটি জড়ভরতের বিবাহের কৌতুককর এই ঘটনাকে অবলম্বন করেই তরুণ রবির বড়দা দ্বিজেন্দ্রনাথ ওই সংখ্যার 'ভারতী'তে তাঁর "যৌতুক কি কৌতুক" নামক রঙ্গকাব্য রচনা করেন। 'স্বপ্নপ্রয়াণে'র কবি বিচিত্র ছন্দে এই রঙ্গরসাত্মক কাহিনী-কাব্যটি রচনা করেছিলেন। রাজপুত্র ও রাজকন্যার গল্প। একদিকে সত্যকার প্রেম, অন্যদিকে রাজত্বের প্রলোভন। অবশেষে একটি কুরূপা মন্দ্রজা দাসীকে রাজকন্যার বেশে সাজিয়ে ছলনা। কবিকল্পিত কাহিনীটি সত্যকার ঘটনাকে কাব্যের আচ্ছাদনে প্রচ্ছন্ন করে রেখেছে। কিন্তু কাব্যের শেষে যে ভাষায় উৎসর্গটি রচিত হয়েছে তাতে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এর সম্পর্কটি আর লুক্কায়িত থাকে নি। 'ভারতী'র পৃষ্ঠা থেকে সেই অংশটি উদ্ধার করা গেল :

"ছদ্ম-বেশ-ধারী উৎসর্গ

—এক কথায়—

উপসর্গ

শর্বরী গিয়াছে চলি! দ্বিজরাজ শূন্যে একা পড়ি
প্রতীক্ষিছে রবির পূর্ণ-উদয়।
গন্ধ-হীন দু চারি রজনীগন্ধা লয়ে তড়িঘড়ি
মালা এক গাঁথিয়া সে অসময়
সঁপিছে রবির শিরে এই আজ আশিষিয়া তারে
"অনিন্দিতা স্বর্ণমৃণালিনী হোক্
সুবর্ণ তুলির তব পুরস্কার! মন্দ্রজার কারে
যে পড়ে পড়ুক খাইয়া চোক।"

পরে যখন "যৌতুক কি কৌতুক" গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় তখন এই উৎসর্গ পত্রটির কিঞ্চিৎ অদল-বদল হয়েছিল। সেখানে 'মন্দ্রজা' 'কুরূপা' হয়েছে। 'রবীন্দ্রকথা'-কার খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, 'বিবাহের আশীর্বাণীস্বরূপ দ্বিজেন্দ্রনাথের 'যৌতুক কি কৌতুক' রচিত হয়।'[৫] কথাটা সম্পূর্ণ সত্য নয়। 'যৌতুক কি কৌতুক' পড়লেই বুঝতে পারা যাবে যে, বয়সে একুশ বছরের বড় দ্বিজেন্দ্রনাথের মত অগ্রজের পক্ষে তাঁর সন্তানতুল্য অনুজের শুভবিবাহে এ জাতীয় রসিকতা করা নিতান্তই বিসদৃশ। প্রকৃতপক্ষে কবির বিবাহের অন্তত সাত-আট মাস পূর্বে এই কাব্য-কৌতুক প্রকাশিত হয়েছিল। উপলক্ষ

বিবাহ নয়, সাত লক্ষ টাকার লোভে "মন্ত্রজার কারে" যে ছোটভাইকে পড়তে হয় নি সেজন্য আনন্দিত অগ্রজের ওটি আন্তরিক আশীর্বাদ। এই আশীর্বাদই কৌতুকের ছদ্মবেশ ধারণ করেছে। দ্বিজেন্দ্রনাথ একান্ত স্নেহের ছোট ভাইটির পূর্ণ-উদয়ের প্রত্যাশায় আশীর্বাদ করে বলেছিলেন, 'অনিন্দিতা স্বর্ণ-মৃণালিনী হোক স্বর্ণ তুলির তব পুরস্কার।' অগ্রজের এই ইঙ্গিত থেকেই বিবাহের দিনে কবিজায়ার নাম হল 'মৃণালিনী'। কাজেই মৃণালিনী-নামকরণটিও রবীন্দ্রনাথের স্বকৃত নয়, এ নাম তাঁর স্নেহময় বড়দারই আশীর্বাদের সঙ্গে বিবাহের বহু পূর্বে কাব্যচ্ছন্দে গ্রথিত হয়েছে।

'রবীন্দ্রকথা'-কার বলেছেন, কবি স্বয়ং পাত্রী দেখে কন্যা মনোনীত করেছিলেন। তাঁর এই উক্তিও রবীন্দ্রনাথের নিজের কথায় সমর্থিত হচ্ছে না। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, এই বিবাহে ঘটকালি করেছিলেন রবীন্দ্রনাথের মাতুল ব্রজেন্দ্রনাথ রায়ের পিসীমা আন্তাসুন্দরী। এ সম্পর্কে ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী লিখছেন, 'যশোর জেলা সেকালে ছিল ঠাকুরবংশের ভবিষ্যৎ গৃহিণীদের প্রধান আকর। * * * পূর্বপ্রথানুসারে রবিকাকার কনে খুঁজতেও তাঁর বউঠাকুরানীরা, তার মানে মা আর নতুনকাকিমা, জ্যোতি-কাকামশায় আর রবিকাকাকে সঙ্গে বেঁধে নিয়ে যশোর যাত্রা করলেন। বলা বাহুল্য আমরা দুই ভাইবোনেও সে-যাত্রায় বাদ পড়ি নি। যশোরে নরেন্দ্রপুর গ্রামে ছিল আমার মামার বাড়ি। সেখানেই আমরা সদলবলে আশ্রয় নিলুম। * * * যদিও এই বৌ-পরিচয়ের দলে আমরা থাকতুম না, তা হলেও শুনেছি যে তাঁরা দক্ষিণডিহি চেঙ্গুটিয়া প্রভৃতি আশেপাশের গ্রামে যেখানেই একটু বিবাহযোগ্যা মেয়ের খোঁজ পেতেন সেখানেই সন্ধান করতে যেতেন। কিন্তু বোধ হয় তখন যশোরে সুন্দরী মেয়ের আকাল পড়েছিল, কারণ এত খোঁজ করেও বৌঠাকুরানীরা মনের মত কনে খুঁজে পেলেন না। আবার নিতান্ত বালিকা হলেও তো চলবে না। তাই অবশেষে তাঁরা জোড়াসাঁকোর কাছারির একজন কর্মচারী বেণী রায় মশায়ের অপেক্ষাকৃত বয়স্থা কন্যাকেই মনোনীত করলেন।'*

রবীন্দ্রনাথের শ্বশুরের নাম বেণীমাধব রায়চৌধুরী। বেণীমাধব খুলনা জেলার দক্ষিণডিহি গ্রামের শুকদেব রায়চৌধুরীর বংশধর। দক্ষিণডিহিরই নিকটবর্তী ফুলতলি [ফুলতলা] গ্রামের অধিবাসী ছিলেন বেণীমাধব। গোপাল

গঙ্গোপাধ্যায়ের কন্যা দাক্ষায়ণীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। তাঁদের দুই সন্তান; পুত্র নগেন্দ্রনাথ ও কন্যা ভবতারিণী। বেণীমাধবেরা পিরালী ব্রাহ্মণ। তাঁদের বংশের সঙ্গেই জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-বাড়ির বেশির ভাগ বৈবাহিক সম্পর্ক হত। সুতরাং বেণীমাধব-দাক্ষায়ণী-দুহিতা ভবতারিণীর সঙ্গে পিরালী-কুশারী রবীন্দ্রনাথের বিবাহ কৌলিক ঐতিহ্য অনুসারেই হয়েছে। অবশ্য বিত্ত ও বিদ্যাবত্তার দিক দিয়ে বেণীমাধবকে মহর্ষি-পরিবারের সমকক্ষ কিছুতেই বলা যাবে না। পারিবারিক মর্যাদার দিক দিয়ে বরকন্যার অনেক ব্যবধান। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে শ্যামলাল গাঙুলির মেয়ে কাদম্বরী দেবীর সঙ্গে যখন জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বিবাহ স্থির হয়েছিল তখন সংস্কারপন্থী সত্যেন্দ্রনাথ তাতে আপত্তি জানিয়ে লিখেছিলেন, 'জ্যোতি এই বিবাহে কেমন করিয়া সম্মত হইল, এই আমার আশ্চর্য মনে হইতেছে।' সত্যেন্দ্রনাথ এবং জ্ঞানদানন্দিনী দেবী চেষ্টাও করেছিলেন যাতে প্রগতিশীল কোন তরুণীর সঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বিবাহ হয়। সে সময় মহর্ষিদেব বলেছিলেন, জ্যোতির বিবাহের জন্য একটি কন্যা পাওয়া গেছে এই-ই ভাগ্য। একে তো পিরালী বলে ভিন্ন শ্রেণীর লোকেরা জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-বাড়ির সঙ্গে বিবাহে যোগ দিতে চায় না, তাতে আবার মহর্ষি-প্রবর্তিত ব্রাহ্মধর্মের অনুষ্ঠানের জন্যে পিরালীরাও তাদের ভয় করে চলেন। কাজেই সমৃদ্ধি ও বিদ্যাবত্তায় রায়চৌধুরী বংশ মহর্ষি-পরিবারের সমকক্ষ না হলেও মহর্ষিদেব এই প্রস্তাবে সানন্দে সম্মতি দিয়েছিলেন। কিন্তু প্রচলিত প্রথা অনুসারে কন্যার পিতা তাঁর বাড়িতে 'বরাহ্বান' করে বিবাহের প্রস্তাব করলে মহর্ষিদেব জানালেন যে, বিবাহ হবে জোড়াসাঁকোতে এবং আদি ব্রাহ্মসমাজের নিয়ম অনুসারে ব্রাহ্ম মতে। বেণীমাধব এতে সম্মত হলে বিবাহের প্রাথমিক অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন হল। "আশীর্বাদ" বা "পাকা দেখা"র অনুরূপ ব্যবস্থা করলেন মহর্ষিদেব। কর্মচারী সদানন্দ মজুমদারকে দিয়ে ফুলতলিতে নানা রকম খেলনা ও বসনভূষণাদি প্রেরিত হল। সেখানে মিষ্টান্নাদিও প্রস্তুত করে কন্যার পিতা ও তাঁর জ্ঞাতিপরিজনের গৃহে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এদিকে কলকাতায় ব্যবস্থা হল গায়ে-হলুদ, আইবুড়ো-ভাতের। অবনীন্দ্রনাথ তাঁর 'ঘরোয়া'তে বলছেন: 'গায়ে-হলুদ হয়ে গেল। আইবুড়োভাত হবে। তখনকার দিনে ও-বাড়ির কোনো ছেলের গায়ে-হলুদ হয়ে গেলেই এ-বাড়িতে

তাকে নেমন্তন্ন করে প্রথম আইবুড়োভাত খাওয়ানো হত। তারপর এ-বাড়ি ও-বাড়ি চলত কয়দিন ধরে আইবুড়োভাতের নেমন্তন্ন। মা গায়ে-হলুদের পরে রবিকাকাকে আইবুড়োভাতের নেমন্তন্ন করলেন। মা খুব খুশি, একে যশোরের মেয়ে তায় রথীর মা মার সম্পর্কে বোন। খুব ধুমধামে খাওয়ার ব্যবস্থা হল। রবিকাকা খেতে বসেছেন উপরে আমার বড়োপিসীমা কাদম্বিনী দেবীর ঘরে, সামনে আইবুড়োভাত সাজানো হয়েছে—বিরাট আয়োজন। পিসীমারা রবিকাকাকে ঘিরে বসেছেন, এ আমাদের নিজের চোখে দেখা। রবিকাকা দোড়দার শাল গায়ে, লাল কী সবুজ রঙের মনে নেই, তবে খুব জমকালো রঙচঙের। বুঝে দেখো, একে রবিকাকা তায় ওই সাজ, দেখাচ্ছে যেন দিল্লীর বাদশা। তখনই ওঁর কবি বলে খ্যাতি, পিসীমারা জিজ্ঞেস করছেন, কী রে বৌকে দেখেছিস, পছন্দ হয়েছে। কেমন হবে বৌ ইত্যাদি সব। রবিকাকা ঘাড় হেঁট করে বসে একটু করে খাবার মুখে দিচ্ছেন আর লজ্জায় মুখে কথাটি নেই। সে মূর্তি তোমরা আর দেখতে পাবে না, বুঝতেও পারবে না বললে—ওই আমরাই যা দেখে নিয়েছি।''

অবনীন্দ্রনাথ যে সময়কার কথা বলছেন তখন তাঁর বয়স বারো পেরিয়ে তেরো। কিন্তু শিল্পদৃষ্টির সহজাত প্রতিভা নিয়েই তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। বালক-শিল্পীর সেই কৌতূহলী দৃষ্টিতে তরুণ-কবির যে লজ্জাবিনম্র স্নিগ্ধ-সুন্দর আইবুড়ো-মূর্তিটি ধরা পড়েছিল সত্য সত্যই সে মূর্তি আর কেউ দেখতে পায় নি। সে মূর্তি আর কোথাও দেখতে পাওয়া যাবে না।

২

বিবাহকালে ভবতারিণীর বয়স ছিল এগারো বৎসর। হরিচরণ বলেছেন তাঁর জন্মবর্ষ ১২৮০ সাল। সে সময়কার তুলনায় কন্যার বয়সের দিক দিয়ে এগারো বৎসর একটু বেশিই বলতে হবে। ঠাকুরবাড়িতে এর পূর্বে আট-ন' বছরের বালিকাবধূরাই এসেছেন। তবে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর স্ত্রীর বয়সের বারো বৎসর ব্যবধান যুগানুযায়ীই হয়েছে। বালিকা ভবতারিণী পিতৃগৃহে লেখাপড়ার দিক দিয়ে বেশি দূর অগ্রসর হন নি। ফুলতলির আশেপাশে

একটি মাত্র নিম্ন-প্রাথমিক পাঠশালা ছিল। ওই পাঠশালাতেই তাঁর বিদ্যা-শিক্ষার সূত্রপাত, কিন্তু সমাজনিন্দার ভয়ে সুদূর পরীক্ষাকেন্দ্রে উপস্থিত হয়ে পরীক্ষা দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি। কাজেই কুমারী-জীবনে ভবতারিণীর দিনগুলি পুতুলখেলাতেই সানন্দে অতিবাহিত হয়েছে। হরিচরণ লিখেছেন, 'এই বালিকাসুলভ খেলায় সঙ্গিনীদের সহিত মিলিয়া মিশিয়া বালিকা মৃণালিনী পিতৃগৃহে খেলাঘর পাতিয়া খেলা করিতেন। আঙিনা মেরামত করিবার জন্য তাঁহার পিতা পাশে একটি খাদ কাটিয়া মাটি লইয়াছিলেন। এই খাদেই খেলাঘর পাতিয়া কন্যা খেলা করিতেন। খাদের পাশদেয়ালে ছোট ছোট কুলঙ্গি শেলফ কাটিয়া খেলাঘরের আসবাব খোলামালা পরিপাটি করিয়া তিনি সাজাইয়া রাখিতেন। * * খেলাঘরে ঘরকন্নার সময় মৃণালিনীর স্বভাবের একটি বিশেষত্ব সকলেই লক্ষ্য করিতেন, ইহা সঙ্গিনীদের উপর তাঁহার কর্তৃত্বের সখী-সুলভ ব্যবহার; ইহাতে কর্তৃত্বের সহজাত তাপ-চাপ ছিল না, সখীসুলভ প্রণয়-প্রবণতায় ইহা সুস্নিগ্ধ কোমল সহনীয়; সঙ্গিনীরা তাই সখীর নির্দেশ মানিত, খেলাও চলিত সখীভাবে অবিরোধে। খেলাঘরের রান্না মৃণালিনীর হাতেই থাকিত, রাঁধিয়া বাড়িয়া খাওয়ান তাঁহার বড় প্রিয় ছিল।'[৮]

পল্লীর এই খেলাঘর আর খেলার সঙ্গিনীদের ছেড়ে ভবতারিণী এলেন চতুর্দোলায় চড়ে জোড়াসাঁকোর প্রাসাদমালায়। শিশু রবির সাত বৎসর বয়সে এমনই করেই চতুর্দোলায় চড়ে এসেছিলেন তাঁর নতুন বৌঠান। 'গলায় মোতির মালা সোনার চরণচক্র পায়ে।' সেদিন নববধূকে মনে হয়েছিল 'চেনাশোনার বাহির সীমানা থেকে মায়াবী দেশের মানুষ।' বারোয়াঁ সুরে বেজেছিল সানাই। তেইশ বৎসরের তরুণ কবি ছেলেবেলার সেই রূপকথার রাজ্য ছেড়ে মানুষের সংসারের কঠিন কংকরময় পথে অনেক দূর এগিয়ে এসেছেন। আজ আর রাজকন্যা নয়, বাংলার ছায়াসুনিবিড় পল্লীর নীড় থেকে এল শ্যামকান্তিময়ী একটি ভীরু পল্লীবালিকা। বারোয়াঁ সুরে সানাই বাজল কবির জীবনে। সানন্দে নববধূকে বরণ করে নেবার জন্যে প্রস্তুত হলেন কবি। তাঁর অন্তরঙ্গ সারস্বত-বান্ধবেরা তাঁর কাছ থেকে পেলেন এক অভিনব নিমন্ত্রণপত্র। কবি প্রিয়নাথ সেনকে প্রেরিত পত্রখানি তার নমুনা হিসাবে উদ্ধারযোগ্য :

প্রিয়বাবু,

আগামী রবিবার ২৪শে অগ্রহায়ণ তারিখে শুভদিনে শুভলগ্নে আমার পরমাত্মীয় শ্রীমান রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শুভবিবাহ হইবেক। আপনি তদুপলক্ষে বৈকালে উক্ত দিবসে ৬নং যোড়াসাঁকোস্থ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভবনে উপস্থিত থাকিয়া বিবাহাদি সন্দর্শন করিয়া আমাকে এবং আত্মীয়বর্গকে বাধিত করিবেন। ইতি।

অনুগত
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

চিঠির ভাব ও ভাষাটি লক্ষ্য করবার মত। রবীন্দ্রনাথ নিজের বিবাহের নিমন্ত্রণ নিজেই করে লিখছেন, "আমার পরমাত্মীয় শ্রীমান রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শুভবিবাহ।" কবি যেন নিজেকে দ্বিধাবিভক্ত করে দুই-'আমি'তে রূপান্তরিত হয়েছেন। নিমন্ত্রণকর্তা ও বিবাহকর্তা,—একই পুরুষের যেন দুই যুগ্মসত্তা, একজন দ্রষ্টা আর একজন ভোক্তা। এই চিঠিখানিতে আর-একটি লক্ষ্য করবার বিষয় ছিল। চিঠিখানি বাজারচলতি চিঠির কাগজে লেখা। কাগজের উর্ধ্বদিকের বাম কোণে ছিল একটি ব্লক, তাতে লেখা ছিল "আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু হায়"। কবি প্রিয়বাবুকে লেখা চিঠিতে ওই ব্লকের পাশে লিখে দিয়েছিলেন 'আমার motto নহে'। সমস্তটাই উচ্চাঙ্গের রসিকতা হতে পারে, অথবা হয়তো সবটাই রহস্যাবৃত প্রহেলিকা। এই কবিত্বসুলভ আত্মপ্রকাশের অভিনবত্ব সেদিন সবারই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।

রবীন্দ্রনাথের বিবাহ-বাসরে মহর্ষিদেব উপস্থিত ছিলেন না। তখন তিনি নদীপথে ভ্রমণ করতে করতে বাঁকিপুরে গিয়েছিলেন। সেখানে একই সঙ্গে তাঁর কাছে পরিবারের দুটি সংবাদ পৌঁছল। যেদিন কলকাতায় রবীন্দ্রনাথের বিবাহ সম্পন্ন হল সেই দিনই শিলাইদহে মহর্ষির জ্যেষ্ঠ-জামাতা সারদাপ্রসাদ লোকান্তরিত হলেন। জোড়াসাঁকোয় এই মৃত্যুসংবাদ এল বিবাহের পরদিন। স্বভাবতই সেই মর্মান্তিক শোকসংবাদে উৎসবপ্রাঙ্গণের আলোকমালা মরণের কালো ছায়ায় ঢাকা পড়ল। এই ছিল কবির নিয়তি। তাঁর জীবনে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত লগ্নে মৃত্যুর আবির্ভাব ঘটেছে বার বার। বার বার মৃত্যুর হাত থেকেই তাঁকে গ্রহণ করতে হয়েছে অমৃতের পানপাত্র।

৩

ফুলতলির দাক্ষায়ণীসুতা ভবতারিণী হলেন জোড়াসাঁকোর কবিপ্রিয়া মৃণালিনী। মহর্ষি-পরিবারে মৃণালিনী দেবীর শিক্ষা ও অনুশীলনের চিত্রটি কৌতূহলোদ্দীপক। বিবাহের পর নববধূকে বিদ্যাশিক্ষা ও গার্হস্থ্য শিক্ষাদানের মুখ্য দায়িত্ব পড়ে হেমেন্দ্রনাথের স্ত্রী নীপময়ী দেবীর উপর। মহর্ষিদেবের অনুমতি ও নির্দেশ অনুসারে হেমেন্দ্রনাথের কন্যাদের সঙ্গে নববধূকেও লোরেটো গার্ল স্কুলের ছাত্রী করে দেওয়া হল। সেখানে ইংরেজি ভাষা শেখা, পিয়ানো বাজানো এবং সংগীত প্রভৃতির চর্চা চলতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে বাড়িতে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অনুশীলন এবং কলকাতার অভিজাত পরিবারের উপযুক্ত আদবকায়দা ও সুচারু গৃহস্থালী শিক্ষা শুরু হল। শিক্ষার প্রাথমিক পর্যায়ে যশোরের বাঙাল-উচ্চারণ সংশোধন একটা বড় স্থান অধিকার করে থাকত। কিন্তু মৃণালিনী দেবী সেই পর্যায়েই বসে থাকেন নি। ইংরেজি বাংলা ও সংস্কৃতে অনুপ্রবেশের মোটামুটি যোগ্যতা তিনি অর্জন করেছিলেন। তাঁর সংস্কৃত শিক্ষার গৃহশিক্ষক ছিলেন আদি-ব্রাহ্ম-সমাজের আচার্য পণ্ডিত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন। কবির প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্র বলেন্দ্রনাথও সংস্কৃতে বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। তিনিও সংস্কৃত কাব্য-নাটকাদির শ্লোক ব্যাখ্যা করে সরল বাংলায় অনুবাদ করে কাকীমার সংস্কৃত-চর্চায় সাহায্য করতেন। পরবর্তী জীবনে স্বামীর নির্দেশে মৃণালিনী দেবী সংস্কৃত রামায়ণের মূল আখ্যায়িকা সহজ গদ্যে বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন। দুর্ভাগ্যের বিষয় তাঁর কৃত সেই অনুবাদের পাণ্ডুলিপি হারিয়ে গেছে। কবি তার অনেক সন্ধান করেও খুঁজে পান নি। রথীন্দ্রনাথ তাঁর জননীর স্বহস্তলিখিত একখানি ছিন্নপত্র রবীন্দ্রভবনে উপহার দিয়েছেন। তাতে মহাভারত মনুসংহিতা ও উপনিষদের কয়েকটি অনুবাদ আছে।

পূর্বেই বলা হয়েছে, রবীন্দ্রনাথের কৈশোরে ঠাকুর-পরিবারের পারিবারিক নাট্যাভিনয়ে পরিবারের কন্যা ও বধূরা অংশ গ্রহণ করতেন। রবীন্দ্রনাথের 'রাজা ও রাণী' নাটক ১২৯৬ বঙ্গাব্দের গ্রীষ্মকালে সোলাপুরে রচিত। পরবর্তী পূজাবকাশে সত্যেন্দ্রনাথ ছুটিতে কলকাতায় এলে তাঁর পার্ক স্ট্রীটের বাড়িতে 'রাজা ও রাণী'র প্রথম অভিনয় হয়। এই অভিনয়ে রবীন্দ্রনাথ সেজেছিলেন

রাজা বিক্রমদেব আর মেজো বৌঠান রাণী সুমিত্রা। দেবদত্ত সেজেছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ, ত্রিবেদী অক্ষয় মজুমদার, কুমার প্রমথ চৌধুরী, ইলা প্রিয়ংবদা। মৃণালিনী দেবীও এই অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেন। তিনি সেজেছিলেন নারায়ণী। রথীন্দ্রনাথ বলছেন এই অভিনয়ই তাঁর প্রথম ও শেষ অভিনয়। সম্ভবত স্বামীর অনুরোধেই তিনি সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে 'নারায়ণী' অভিনয়ে সম্মত হয়েছিলেন, নইলে শুদ্ধান্তঃপুর ছেড়ে পাদপ্রদীপের সম্মুখে নিজেকে প্রকাশ করা ছিল তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ। আসলে মৃণালিনী দেবীর গৃহলক্ষ্মী-মূর্তিতেই তাঁর স্বরূপ সম্যক্ প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছে। অন্তঃপুরে অনলংকৃত জীবন যাপনেই তিনি অধিকতর স্বস্তি অনুভব করতেন। হরিচরণ বলেছেন, সাজপোশাকের দিকে যেমন তাঁর দৃষ্টি ছিল না তেমনি গায়ে গয়নাও তিনি অল্পই পরতেন। একদিন কবিপত্নী কানে দুটি ফুলঝুলানো বীরবৌলি পরেছিলেন। সে সময় হঠাৎ অপ্রত্যাশিত ভাবে কবির আবির্ভাব হল। লজ্জিত হয়ে মৃণালিনী দেবী দু হাত দিয়ে কানের বীরবৌলি কবির দৃষ্টি থেকে ঢেকে রাখবার জন্যে প্রাণপণ প্রয়াস করতে লাগলেন। কবি নিজেও সাদাসিদে জীবন যাপনেরই পক্ষপাতী ছিলেন। একবার কবির জন্মদিনে মৃণালিনী দেবী একসেট সোনার বোতাম গড়িয়ে দিয়েছিলেন। বোতাম দেখে কবি বলে উঠলেন, 'ছি ছি, পুরুষ মানুষে আবার সোনা পরে, লজ্জার কথা, তোমাদের চমৎকার রুচি!'

কবিজায়ার সম্পর্কে উর্মিলা দেবীর বর্ণনাটি সুন্দর। যেদিন তিনি প্রথম ঠাকুরবাড়িতে মৃণালিনী দেবীকে দেখলেন সেদিন "তিনি নিতান্তই সাদাসিধে একখানা শাড়ি পরে বসেছিলেন।" উর্মিলা দেবী বলছেন, 'গায়ে গয়নাও তেমন দেখলুম না। সাহস করে মুখের দিকে চাইলাম—এই কবিপ্রিয়া! রবীন্দ্রনাথের স্ত্রী, সে রকম তো ভাল দেখতে নন। আবার ভাল করে চেয়ে দেখলাম। তখন দেখি এক অপরূপ লাবণ্যে সমস্ত মুখখানা যেন ঢলঢল করছে, আর একটা মাতৃত্বের আভায় যেন মুখখানা উজ্জ্বল। একবার দেখলে আবার দেখতে ইচ্ছে হয়। * * ক্রমেই বুঝতে লাগলাম তিনি খুবই অসাধারণ নারী। যে মাতৃত্বের আভা দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম তাই দিয়ে যেন শুধু নিজের ছেলেমেয়ে নয়—আত্মীয়স্বজন দাসী-চাকর সকলকেই আপন করে রেখেছিলেন। সাজগোজ বেশি কখনো করতেন না। কবিবর মহর্ষিদেবের

কনিষ্ঠতম সন্তান—ভাইপো ভাইঝিরা কেউ সমবয়সী, কেউ বা অল্পই ছোট; কিন্তু কবিপ্রিয়া এই সম্বন্ধের গুরুত্বটা যেন বেশ বুঝতেন। তিনি 'কাকিমা', 'মামিমা', বড় বড় ছেলেমেয়ে-বৌদের সামনে আবার সাজগোজ করবেন কি—এমনি যেন ভাবটা। রান্না করে মানুষ খাইয়ে বড় তৃপ্তি পেতেন। আমার দাদা [দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ] যখনই যেতেন, সিঁড়ি থেকেই বলতে বলতে উঠতেন "কাকিমা, আজ কিন্তু এটা খাব," "আজ কিন্তু ওটা খাব"; তক্ষুনি রান্নাঘরে গিয়ে সেটা তৈরি করতে বসতেন।'[১]

মৃণালিনী দেবীর শৈশবলীলায় আমরা দেখেছি খেলাঘরের পুতুল খেলায়ও রেঁধেবেড়ে সবাইকে খাওয়ানোর দায়িত্ব তিনি সর্বদা সানন্দে স্বহস্তে রাখতেন। শ্বশুর-গৃহে এসে তাঁর এই সহজাত প্রবণতা এবং অশিক্ষিত-পটুত্ব সুচারু অনুশীলনের ফলে দুর্লভ নৈপুণ্য অর্জন করেছিল। ঠাকুরবাড়িতে গৃহকর্মের একটা প্রধান অঙ্গ ছিল বিচিত্র ধরনের রান্না ও আহার্যসামগ্রী প্রস্তুত করা। 'রবীন্দ্রকথা'র লেখক বলেছেন, তখনকার দিনে মহর্ষি পরিবারে বিভিন্ন প্রকার আমিষ ও নিরামিষ রান্না ও নানা ধরনের মিষ্টান্ন পাক কন্যা ও বধূদের অবশ্যশিক্ষণীয় বিষয় ছিল। বস্তুত আহারে বাঙালীর রুচি আন্তর্জাতিক। এই প্রসঙ্গে খগেন্দ্রনাথ বলেছেন, 'বৈদিক যুগের আনন্দ নাড়ু, তিলের নাড়ু, বড়া পূপ; খাঁটি বাংলার বাহান্ন ব্যঞ্জন; মাড়োয়ারীর পূরী-কচোরী-পাঁপড়-বালুসাই মিঠাই-লাউকি-লাচ্ছা; বসাকশেঠদের আচার ও রকমারি মোহনভোগ (হালুয়া), রাধাবল্লভি; জৈন জহুরীর নানাপ্রকার বরফি ও পেঁড়া; খাস বাংলার ছানার মিষ্টি; মোগলের কাবাব-কোর্মা-কালিয়া; ইংরেজের চপ-কাটলেট-কেক-বৃঞ্জাল-আইসক্রীম; ফরাসী সালাদ, আইরিশ স্ট প্রভৃতির সম্মিলন' বাংলার ধনিগৃহের আহার্যতালিকায় স্থানলাভ করেছে। মহর্ষি-পরিবারের অন্যান্য কন্যা ও বধূদের মত মৃণালিনী দেবীও উপরের তালিকার অনেকগুলি আয়ত্ত করেছিলেন। খগেন্দ্রনাথ আরো বলেছেন, নারিকেলের নানাপ্রকার মিষ্টান্নে তাঁর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ছিল। তখনকার দিনে ঠাকুরপরিবারে ও তাঁদের আত্মীয়দের মধ্যে আমসত্ত্ব, আচার, বড়ি, আমকাসুন্দি প্রভৃতি কেউ বাজার থেকে কিনে আনতেন না। এসব বাড়িতে মেয়েরাই তৈরি করতেন। যশোরের বৈবাহিক-গৃহ থেকেও এসব ঘরে-তৈরি জিনিস, নলেন গুড়ের পাটালি, কুলের বড়ি, ঘৃতকলম্বা লেবু,

চইলতার মূল এবং দীর্ঘাকৃতি মানকচুর সঙ্গে সজ্জিত হয়ে তত্ত্ব করা হত। ঘি ও চিনি মিশিয়ে মানকচুর মুড়কি ও মালপো প্রস্তুত হয়ে জলখাবারের মিষ্টান্ন-থালার বৈচিত্র্য সৃষ্টি করত। মানকচু দিয়ে মুড়কি ও মালপো রচনায় মৃণালিনী দেবীর ছিল বিশেষ দক্ষতা। হরিচরণ বলেছেন, তাঁর হাতের চিঁড়ের পুলী, দইএর মালপো এবং পাকা আমের মেঠাই যিনি একবার খেয়েছেন তার স্বাদ তিনি জীবনে কখনো ভুলতে পারেন নি।

ভাবতে বিস্ময় বোধ হয় যে, এই রন্ধনকর্মে কবিও ছিলেন তাঁর গৃহলক্ষ্মীর নিত্য-উৎসাহী সহায়ক। নতুন নতুন ছন্দ আবিষ্কারের মতই নতুন নতুন খাদ্য আবিষ্কারের শখ ছিল তাঁর গার্হস্থ্য-জীবনের একটা প্রধান অঙ্গ। মনে হয় পত্নীর রন্ধনকুশলতাই তাঁকে এদিকে আকৃষ্ট করেছিল। তিনি রন্ধনরত পত্নীর পাশে মোড়ায় বসে নিত্যনূতন রকমের রান্নার ফরমাশ করতেন, মাল-মসলা দিয়ে নূতন প্রণালীতে পত্নীকে রান্না শিখিয়ে শখ মেটাতেন এবং এজন্যে দস্তুরমত গৌরব করে বলতেন, 'দেখলে, তোমাদেরই কাজ, তোমাদের কেমন এই একটা শিখিয়ে দিলুম।' কবিপত্নী ওষ্ঠাধরে মৃদু হাসি টেনে হারমানার ভঙ্গিতে বলতেন, 'তোমাদের সঙ্গে পারবে কে! জিতেই আছ সকল বিষয়ে।'[১০]

বস্তুত, কবি নিজেও তাঁর গৃহিণীর এই রন্ধননৈপুণ্য সম্পর্কে মনে মনে গৌরবান্বিত হতেন এবং বন্ধুবান্ধবদের ডেকে তাঁর ঘরের আহার্য সামগ্রী পরিবেশন করে বিশেষ তৃপ্তি বোধ করতেন। খাওয়া-দাওয়া সম্পর্কে কবি নিজে অত্যন্ত খেয়ালী ছিলেন, কিন্তু অন্যকে খাইয়ে আনন্দ পাওয়াতে তিনি ছিলেন তাঁর পত্নীর যথার্থ দোসর। এ সম্পর্কে অবনীন্দ্রনাথ তাঁর 'জোড়াসাঁকোর ধারে' গ্রন্থে শান্তিনিকেতনের এক প্রাতরাশের বর্ণনায় বলছেন, 'তাড়াতাড়ি এসে বসলুম টেবিলে। রবিকা বললেন, 'কোথায় গিয়েছিলে তুমি। এদিকে আমি চা নিয়ে বসে আছি তোমার জন্যে। নাও, খাও।' বলে এটা এগিয়ে দেন, ওটা এগিয়ে দেন। রবিকার সামনে বসে খাওয়া, সে কি ব্যাপার জানোই তো। তার পর চায়ের সঙ্গে আমার একটু রুটি চলে শুধু। রবিকা বললেন, 'একটু গুড় খাও দেখিনি। গুড়টা ভালো জিনিস।' সকালবেলা গুড়! মহামুস্কিল; এদিক ওদিক তাকাই; রবিকা আবার মস্ত একটি কেক এগিয়ে দিলেন 'খাও ভালো করে।' * * যাক্,

সকালের ফাঁড়া তো কাটল। প্রতিমাকে বললুম, 'প্রতিমা, যে কদিন আছি ভোরের চা-টা তোর কাছেই খাইয়ে দিস। কেন আর বারে বারে আমায় সিংহের মুখে ফেলা।'[১১] সিংহই বটে, এবং এ বিষয়ে তিনি সিংহিনীরই যোগ্য ভর্তা!

৪

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন জীবনশিল্পী। চারুচর্যা ছিল তাঁর প্রতিমুহূর্তের নিত্যব্রত। তাই এই মহাশিল্পীর অন্তঃপুরও হয়ে উঠেছিল একটি অপূর্বসুন্দর শিল্পশালা। তেইশ বৎসর বয়সে তাঁর বিবাহ হয়, আর তাঁর বিয়াল্লিশ বৎসর বয়সে তাঁর জীবনসঙ্গিনীর ইহলীলার অবসান ঘটে। এই অপূর্ণ-কুড়ি বৎসরব্যাপী কবির দাম্পত্যজীবনের পূর্ণ চিত্র পাওয়ার উপায় আর নেই। চিঠিপত্র প্রথম খণ্ডে যে সাড়ে পঁয়ত্রিশখানি চিঠি মুদ্রিত হয়েছে সেগুলি তাঁর বিবাহিত জীবনের দ্বিতীয়ার্ধে ১৮৯০ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারি থেকে ১৯০১ সনের মধ্যে লেখা। 'স্নেহমুগ্ধ জীবনে'র ওই দু-চারিটি 'চিহ্নমাত্রে' পাঠকের মন মোটেই তৃপ্ত হয় না। রবীন্দ্রনাথের পত্ররচনাও ছিল একটা বিশেষ শিল্প। শেষ দিন পর্যন্ত কবিজায়ার কাছ থেকে চিঠি পাওয়ার জন্যে কবি উন্মুখ হয়েই থাকতেন। স্বভাবতই প্রিয়াকে লেখা তাঁর তরুণ দাম্পত্যজীবনের প্রথমার্ধের প্রেমপত্রগুলি কেমন ছিল তা জানবার কৌতূহল চিরদিনই পাঠকের চিত্তে অতৃপ্ত থাকবে। দ্বিতীয়ার্ধের যে পত্রগুচ্ছ আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে সেগুলি বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ভার্যার কাছে ভর্তার লেখা বৈষয়িক পত্র। কবিচিত্তের পরিচয় তাতে প্রায় নেই। আদরসূচক আবেগগর্ভ উক্তিগুলিও সম্পাদকের স্থূলহস্তাবলেপে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। কেবল সম্বোধনের ক্ষেত্রে 'ভাই ছোট বউ' শেষ পর্যন্ত "ভাই ছুটি"তে পরিণত হয়ে কবিকণ্ঠের সম্বোধন-সংগীতকে যেন ছুটি অক্ষরের ধ্বনিমন্ত্রে অবিনশ্বর করে রেখে গেছে। উর্মিলা দেবী তাঁর 'কবিপ্রিয়া' প্রবন্ধে কবিদম্পতির প্রৌঢ়লীলার একটি সংক্ষিপ্ত ছবি এঁকে রেখেছেন। 'মৃণালিনী দেবী' তখন 'রথীর মা'। অর্থাৎ সেটি কবিজায়ার যশোদামূর্তি। ওই প্রবন্ধের একস্থানে উর্মিলা দেবী লিখছেন, 'কবির একটা অভ্যাস ছিল, সিঁড়ি থেকে সু-উচ্চ কণ্ঠে "ছোটবউ—ছোটবউ"

করে ডাকতে ডাকতে উঠতেন। আমার ভারি মজা লাগত শুনে, তাই বোধ হয় আজো মনে আছে।' কিন্তু "ছোটবউ"ও তো কবিজায়ার পারিবারিক জীবনেরই পরিচয় বহন করছে। নিভৃত আলাপনে কবি তাঁর কিশোরী প্রিয়াকে কী নামে ডাকতেন সে কথা কোথাও আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। "শাজাহান" কবিতায় কবি বলেছিলেন :

জ্যোৎস্নারাতে নিভৃত মন্দিরে
প্রেয়সীরে
যে নামে ডাকিতে ধীরে ধীরে
সেই কানে-কানে ডাকা রেখে গেলে এইখানে
অনন্তের কানে।

কবির নিজের নিভৃত মন্দিরের সেই কানে-কানে-ডাকা নামটি মহাশূন্যেই হারিয়ে গেছে।

শুধু রসিকচিত্তের এই কৌতূহলের দিক থেকেই নয়, কবির দাম্পত্য-জীবনের বহু উপকরণই লুপ্ত হয়ে গেছে, সেজন্যে এদিক থেকে রবীন্দ্র-জীবনী চিরদিনের মতোই অসম্পূর্ণতা বহন করে চলবে। ভাবরূপে কবি দাম্পত্য-লীলাকে 'স্মরণে'র একটি কবিতায় ধ্যান করেছেন। কবির দাম্পত্য-স্বপ্নকে চেনার জন্যে 'স্মরণে'র সেই কবিতাটি এখানে উদ্ধার করা যেতে পারে :

যে-ভাবে রমণীরূপে আপন মাধুরী
আপনি বিশ্বের নাথ করিছেন চুরি ;
যে-ভাবে সুন্দর তিনি সর্বচরাচরে,
যে-ভাবে আনন্দ তাঁর প্রেমে খেলা করে,
যে-ভাবে লতায় ফুল, নদীতে লহরী,
যে-ভাবে বিরাজে লক্ষ্মী বিশ্বের ঈশ্বরী,
যে-ভাবে নবীন মেঘ বৃষ্টি করে দান,
তটিনী ধরারে স্তন্য করাইছে পান,
যে-ভাবে পরম-এক আনন্দে উৎসুক
আপনারে দুই করি লভিছেন সুখ,
দুয়ের মিলনঘাতে বিচিত্র বেদনা
নিত্য বর্ণ-গন্ধ-গীত করিছে রচনা,

হে রমণী, ক্ষণকাল আসি মোর পাশে
চিত্ত ভরি দিলে সেই রহস্য-আভাসে।

যে ভাবে পরম-এক আপনাকে দুই করে মিলন-বিরহের আনন্দ-বেদনার মধ্য দিয়ে নিজেরই মাধুরী আস্বাদন করছেন সেই লীলারহস্যের আভাসই রয়েছে এই কবিতায়। কবিজীবনের এই পর্বে তাঁর বিচিত্র সৃষ্টির মধ্য দিয়েই সেই রহস্যের সন্ধান করতে হবে। বিবাহের পরে কবির প্রথম পর্বাধ্যায়ের প্রেমের কবিতাগুলি সংকলিত হয়েছে 'কড়ি ও কোমলে'র সনেটগুচ্ছে। আমি 'সনেটের আলোকে মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে বলেছি, 'কড়ি ও কোমলে'র সনেটগুলিতে কবিচেতনা দ্বিধাবিভক্ত। কিন্তু ওর মধ্যেই কতকগুলি কবিতা আছে যেগুলির আলম্বন তরুণ-কবির পঞ্চদশী কিশোরীবধূ।

ওই তনুখানি তব আমি ভালবাসি।
এ প্রাণ তোমার দেহে হয়েছে উদাসী।
* * *
ওই দেহখানি বুকে তুলে নেব বালা,
পঞ্চদশ বসন্তের একগাছি মালা।

তরুণ কবিপ্রেমিক এখানে প্রেয়সী-বধূর তনুলাবণ্যে দাম্পত্য-লীলার স্বপ্নস্বর্গ রচনা করেছেন। 'স্তন', 'চুম্বন', 'বিবসনা', 'বাহু', 'চরণ' প্রভৃতি কবিতা সেই একই রতিরসের বিচিত্র আলম্বন ও উদ্দীপন রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। দাম্পত্য-মিলনকুঞ্জে সম্ভোগপ্রেমের এমন অপূর্ব-সুন্দর চিত্র, দেহের পাত্রে মর্ত্যজীবনের পরম পিপাসার এমন মধুর আস্বাদন বৈষ্ণবপদাবলীর পরে আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। দেহরতি পুষ্পসুকুমার সৌন্দর্যস্বপ্নে রূপান্তরিত হয়ে কী অসামান্য কাব্যলাবণ্য লাভ করতে পারে, এ কবিতাগুলি যেন তারই চূড়ান্ত নিদর্শন।

'কড়ি ও কোমলে'র পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ 'মানসী'। 'মানসী'র যুগে কবি কখনো কলিকাতা, কখনো শিলাইদহ, কখনো বোলপুরে কাটিয়েছেন। কিন্তু এর তৃতীয় পর্যায়ের কবিতাগুলি লেখা হয়েছে গাজিপুরে। বিবাহের চার বৎসর পরে [কবিজায়া তখন যোড়শী] ১২৯৪ বঙ্গাব্দের শেষ দিকে কবি সপরিবারে গাজিপুরে গিয়ে বেশ কিছুদিন কাটান। বাংলা থেকে দূরে, পশ্চিমের গঙ্গাতীরে গাজিপুরের গোলাপবাগান তরুণ কবির স্বপ্নকে আকর্ষণ

করেছিল। কবির তখন প্রথম সন্তানের জন্ম হয়েছে। সকন্যা কবিজায়াকে নিয়ে তিনি গাজিপুরের নিভৃত কবিকুঞ্জে জীবনের মাধুর্যলীলার পূর্ণ আস্বাদনের সুযোগ পান। কবির দাম্পত্যজীবনে এই গাজিপুর পর্বটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এত দিন কলিকাতায় বৃহৎ পরিবারের দশজনের মধ্যে তাঁদের দাম্পত্যজীবন অতিবাহিত হয়েছে। গাজিপুরেই তাঁরা প্রথম প্রকৃতির পরম নির্জনতায় উভয়ের অন্তরঙ্গতম সান্নিধ্য ও সঙ্গ লাভের সুযোগ পেলেন। স্বভাবতই গাজিপুরের একাধিক কবিতায় নিবিড়তম দাম্পত্যমিলনের আলেখ্য বিরচিত হয়েছে। এই শ্রেণীর একটি কবিতা 'অপেক্ষা'। প্রিয়ার মিলনপ্রত্যাশী কবি রজনীর সুস্নিগ্ধ অন্ধকারের অপেক্ষায় উদ্‌গ্রীব হয়ে রয়েছেন, তাই নিদাঘের বিলম্বিত অপরাহ্ণ তাঁর কাছে দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। তাঁর মনে হয়েছে 'সকল বেলা কাটিয়া গেল বিকাল নাহি যায়।' গোধূলিলগ্নে বধূরা নেমেছে দীঘির ঘাটে। কবির মনে প্রশ্ন জেগেছে।

সেও কি এতক্ষণে
নীলাম্বরে অঙ্গ ঘিরে
নেমেছে সেই নিভৃত নীরে,
প্রাচীরে ঘেরা ছায়াতে ঢাকা
বিজন ফুলবনে।

কবি কল্পনাদৃষ্টি দিয়ে দেখছেন :

স্নিগ্ধজল মুগ্ধভাবে
ধরেছে তনুখানি।
মধুর দুটি বাহুর ঘায়
অগাধ জল টুটিয়া যায়,
গ্রীবার কাছে নাচিয়া উঠি
করিছে কানাকানি।

* * *

বুঝি বা তীরে উঠিয়াছে সে
জলের কোল ছেড়ে।
ত্বরিত পদে চলেছে গেহে,
সিক্ত বাস লিপ্ত দেহে,

যৌবন-লাবণ্য যেন
লইতে চাহে কেড়ে।

তারপর অবগাহন-স্নানে শীতল হয়ে গোধূলিপ্রসাধন শেষ করে :

বনের পথে নদীর তীরে
অন্ধকারে বেড়াবে ধীরে,
গন্ধটুকু সন্ধ্যাবায়ে
রেখার মতো রাখি।

এতক্ষণ পরে কবির মিলন-প্রতীক্ষা সার্থক হবে :

বাজিবে তার চরণধ্বনি
বুকের শিরে শিরে।
কখন, কাছে না আসিতে সে
পরশ যেন লাগিবে এসে,
যেমন করে দখিন বায়ু
জাগায় ধরণীরে

যেমনি কাছে দাঁড়াব গিয়ে
আর কি হবে কথা?
ক্ষণেক শুধু অবশ কায়
থমকি রবে ছবির প্রায়,
মুখের পানে চাহিয়া শুধু
সুখের ব্যাকুলতা।
দোঁহার মাঝে ঘুচিয়া যাবে
আলোর ব্যবধান।
আঁধার তলে গুপ্ত হয়ে
বিশ্ব যাবে লুপ্ত হয়ে,
আসিবে মুদে লক্ষকোটি
জাগ্রত নয়ান।

* * *

আঁধারে যেন দু-জনে আর
দু-জন নাহি থাকে।
হৃদয় মাঝে যতটা চাই
ততটা যেন পুরিয়া পাই,
প্রলয়ে যেন সকল যায়,
হৃদয় বাকি রাখে।

*   *   *

দু-দিক হতে দু-জনে যেন
বহিয়া খরধারে
আসিতেছিল দোঁহার পানে
ব্যাকুলগতি ব্যগ্রপ্রাণে
সহসা এসে মিশিয়া গেল
নিশীথ পারাবারে।

থামিয়া গেল অধীর স্রোত
থামিল কলতান,
মৌন এক মিলন রাশি
তিমিরে সব ফেলিল গ্রাসি,
প্রলয়তলে দোঁহার মাঝে
দোঁহার অবসান।[১২]

সমৃদ্ধিমান সম্ভোগের এমন ঋজুশুভ্র চারু-চিক্কণতা রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে দ্বিতীয় বার দেখা যায় নি বলেই এই কবিতাটির মূল্য অপরিসীম।

৫

'মানসী'র পর থেকে কবির দাম্পত্যচেতনা এক অপরূপ কল্যাণশ্রীতে মণ্ডিত হয়ে উঠেছে। দাম্পত্যপ্রণয়াস্বাদে রবীন্দ্রনাথ কালিদাস-পন্থ প্রেমেরই উত্তরসাধক। 'কুমারসম্ভবে'র মহাকবি বিবাহসজ্জায় সজ্জিতা গৌরীর বর্ণনায় বলেছেন :

সা মঙ্গলস্নানবিশুদ্ধগাত্রী
গৃহীতপত্যুদ্‌গমনীয়বস্ত্রা।
নিবৃত্তপর্জন্যজলাভিষেকা
প্রফুল্লকাশা বসুধেব রেজে॥

'গৌরী যখন মঙ্গলস্নানে নির্মলগাত্রী হয়ে পতিমিলনের উপযুক্ত বসন পরিধান করলেন, তখন তিনি বর্ষার জলাভিষেকের অবসানে কাশকুসুমে প্রফুল্ল বসুধার মত বিরাজ করতে লাগলেন।' রবীন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গে বলেছেন : 'পতিব্রতার মুখচ্ছবিতে বিবাহিতা রমণীর যে গৌরবশ্রী অঙ্কিত আছে, তাহা নিয়ত-আচরিত কল্যাণকর্মের স্থির সৌন্দর্য,—শম্ভুর কল্পনানেত্রে সেই সৌন্দর্য যখন অরুন্ধতীর সৌম্যমূর্তি হইতে প্রতিফলিত হইয়া নববধূবেশিনী গৌরীর ললাট স্পর্শ করিল, তখন শৈলসুতা যে লাবণ্যলাভ করিলেন, অকালবসন্তের সমস্ত পুষ্পসম্ভার তাঁহাকে সে সৌন্দর্য দান করিতে পারে নাই।'

মঙ্গলস্নানে নির্মলগাত্রী দাক্ষায়ণীসুতার মধ্যেও কবি শারদলক্ষ্মীর মূর্তিকেই প্রত্যক্ষ করেছেন। তাই কবি তাঁর নিজের দাম্পত্যজীবনের দিনগুলিকে শরৎ ঋতুর সঙ্গে তুলনা করেছেন। 'জীবনস্মৃতি' "বর্ষা ও শরৎ" অধ্যায়ে কবি লিখছেন : 'আমি যে সময়কার কথা বলিতেছি সে-সময়ের দিকে তাকাইলে দেখিতে পাই তখন শরৎঋতু সিংহাসন অধিকার করিয়া বসিয়াছে। তখনকার জীবনটা আশ্বিনের একটা বিস্তীর্ণ স্বচ্ছ অবকাশের মাঝখানে দেখা যায়—সেই শিশিরে ঝলমল-করা সরস সবুজের উপর সোনা-গলানো রৌদ্রের মধ্যে মনে পড়িতেছে, দক্ষিণের বারান্দায় গান বাঁধিয়া তাহাতে যোগিয়া সুর লাগাইয়া গুন গুন করিয়া গাহিয়া বেড়াইতেছি—সেই শরতের সকালবেলায়।—

আজি শরৎতপনে প্রভাতস্বপনে
কী জানি পরাণ কী যে চায়!

* * জানি না কেন, আমার তখনকার জীবনের দিনগুলিকে যে-আকাশ যে-আলোকের মধ্যে দেখিতে পাইতেছি তাহা এই শরতের আকাশ, শরতের আলোক। সে যেমন চাষিদের ধান-পাকানো শরৎ তেমনি সে আমার গান-পাকানো শরৎ—সে আমার সমস্ত দিনের আলোকময় অবকাশের গোলা

বোঝাই-করা শরৎ—আমার বন্ধনহীন মনের মধ্যে অকারণ পুলকে ছবি-আঁকানো গল্প-বানানো শরৎ।'

শরৎ-ই যে কল্যাণময় দাম্পত্যমিলনের উত্তম লগ্ন এই অনুভূতি কবি তাঁর পরিণত বয়সের প্রেমকাব্য 'মহুয়া'র "লগ্ন" কবিতায়ও প্রকাশ করেছেন। 'প্রথম মিলনদিন' নিবিড় আষাঢ়েও নয়, উন্মত্ত বসন্তেও নয়। 'যেদিন আশ্বিনে, শুভক্ষণে আকাশের সমারোহ ধরণীতে পূর্ণ হয় ধনে' সেদিনই আসে মিলনের লগ্ন। সেদিন

বনলক্ষ্মী শুভব্রতা
শুভ্রের ধেয়ানে তার মেলিয়াছে অম্লান শুভ্রতা
আকাশে আকাশে
শেফালি মালতী কুন্দে কাশে।
অপ্রগল্‌ভা ধরিত্রী-সে প্রণামে লুণ্ঠিত,
পূজারিণী নিরবগুণ্ঠিত,
আলোকের আশীর্বাদে শিশিরের স্নানে
দাহহীন শান্তি তার প্রাণে।
দিগন্তের পথ বাহি
শূন্যে চাহি
রিক্তবিত্ত শুভ্র মেঘ সন্ন্যাসী উদাসী
গৌরীশঙ্করের তীর্থে চলিয়াছে ভাসি।
সেই স্নিগ্ধক্ষণে, সেই স্বচ্ছ সূর্যকরে,
পূর্ণতায় গম্ভীর অম্বরে
মুক্তির শান্তির মাঝখানে
তাহারে দেখিব যারে চিত্ত চাহে, চক্ষু নাহি জানে।

দাম্পত্যজীবনের সাধনায় রবীন্দ্রনাথও 'পূর্ণতায় গম্ভীর অম্বরে মুক্তির শান্তির মাঝখানে' কবিজায়াকে একদিন প্রত্যক্ষ করেছিলেন। সেদিন তাঁর জীবনাকাশে তাঁর গৃহলক্ষ্মীও শারদলক্ষ্মীর মঙ্গলসৌন্দর্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিলেন। কবির সংসারজীবনের সেই 'শেষ মাধুরী' শারদলক্ষ্মীর কৌমুদীরাগরঞ্জিত তাঁর চিত্তলোকে স্বকীয়া-প্রেমের সেই আলো-আঁধারি লীলার মাধুর্যও কম আস্বাদনীয় নয়।

৬

বস্তুত মহাশিল্পী রবীন্দ্রনাথের অচিরস্থায়ী দাম্পত্যজীবন ছিল রসমাধুর্যের দিক দিয়ে 'নব রে নব নিতুই নব।' সংসার-জীবনে এই নিত্য-নবীনতার স্বাদবৈচিত্র্য রচনার মধ্যেই কবির শিল্পিসত্তার চরম পরিচয় পাওয়া যাবে। 'শেষের কবিতা'র অমিত বলেছিল, 'লোকে ভুলে যায় দাম্পত্যটা একটা আর্ট, প্রতিদিন ওকে নতুন ক'রে সৃষ্টি করা চাই। * * অধিকাংশ বর্বর বিয়েটাকেই মনে করে মিলন, সেই জন্যে তার পর থেকে মিলনটাকে এত অবহেলা।' বলাই বাহুল্য, এই বর্বরোচিত অবহেলা রবীন্দ্র-জীবনে আশঙ্কনীয় নয়। কেন না তিনি জানতেন দাম্পত্যজীবনের ললিত-কলাবিধিকে কি করে প্রতিদিন নতুন করে সৃষ্টি করতে হয়। শুধু জানতেনই না, এ সম্বন্ধে তিনি সর্বদা সচেতন এবং সক্রিয় ছিলেন।

অথচ দাম্পত্যপ্রেমৈকসর্বস্ব চেতনাসম্পন্ন মানুষ রবীন্দ্রনাথ ছিলেন না। সংসার পাতবার জন্যেই যারা তৈরি হয় তাদের দলভুক্ত করে তাঁর বিধাতা তাঁকে গড়েন নি। এদিক দিয়ে অমিত রায়ের সঙ্গেই যেন ছিল তাঁর জীবনের মিল। এ কথা মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয় যে, কবি তাঁর নিজের জীবনের আদলেই অমিত রায়ের জীবন রচনা করেছিলেন। অমিতের জীবনে এসেছিল মুখ্যত দুটি নারী—লাবণ্য আর কেতকী। একজন তার ওড়ার আকাশ, আর-একজন তার বিশ্রামের নীড়। অমিত বলছে, 'একদিন আমার সমস্ত ডানা মেলে পেয়েছিলুম আমার ওড়ার আকাশ,—আজ আমি পেয়েছি আমার ছোট্ট বাসা, ডানা গুটিয়ে বসেছি। কিন্তু আমার আকাশও রইল।' এই তত্ত্বকেই আর-একটি রূপকের সাহায্যে বিশদতর করে অমিত বলছে, 'কেতকীর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ ভালবাসারই, কিন্তু সে যেন ঘড়ায় তোলা জল, প্রতিদিন তুলবে, প্রতিদিন ব্যবহার করবে। আর লাবণ্যের সঙ্গে আমার যে-ভালবাসা সে রইল দিঘি, সে ঘরে আনবার নয়, আমার মন তাতে সাঁতার দেবে।' যতিশংকর প্রশ্ন করেছিল, এই আকাশ ও নীড়, এই ঘড়ায় তোলা জল ও দিঘির জল কি একত্রেই মিলতে পারে না? এর উত্তরে অমিতের বক্তব্যটি কম তাৎপর্যবান নয়! সে বলেছিল, 'জীবনে অনেক সুযোগ ঘটতে পারে কিন্তু ঘটে না। যে-মানুষ অর্ধেক রাজত্ব আর রাজকন্যা এক সঙ্গেই মিলিয়ে

পায় তার ভাগ্য ভাল,—যে তা না পায় দৈবক্রমে তার যদি ডান দিক থেকে মেলে রাজত্ব আর বাঁ দিক থেকে মেলে রাজকন্যা, সেও বড় কম সৌভাগ্য নয়।' ভাগ্যের সঙ্গে অমিতের এই বোঝাপড়া রসিকজনোচিত দৃষ্টিভঙ্গিরই পরিচায়ক। রবীন্দ্রনাথ যেন আপন মনের কথাই অমিতকে দিয়ে বলিয়েছেন। এ অনুমান যে মিথ্যে নয় তার প্রমাণ পাওয়া যাবে 'পত্রপুটে'র পনেরো-সংখ্যক কবিতায়। সেখানে কবির আত্মকথা অমিতের আত্মবিশ্লেষণের সহোদর। আপনার মানসলোককে নিঃশেষে নির্বারিত করে কবি বলছেন :

একদিন বসন্তে নারী এল সঙ্গীহারা আমার বনে
প্রিয়ার মধুর রূপে।
এল সুর দিতে আমার গানে,
নাচ দিতে আমার ছন্দে,
সুধা দিতে আমার স্বপ্নে।

* * *

ভালোবেসেছি তাকে।
সেই ভালবাসার একটা ধারা
ঘিরেছে তাকে স্নিগ্ধ বেষ্টনে
গ্রামের চিরপরিচিত অগভীর নদীটুকুর মতো।
অল্পবেগের সেই প্রবাহ
বহে চলেছে প্রিয়ার সামান্য প্রতিদিনের
অনুচ্চ তটচ্ছায়ায়।
অনাবৃষ্টির কার্পণ্যে কখনো সে হয়েছে ক্ষীণ
আষাঢ়ের দাক্ষিণ্যে কখনো সে হয়েছে প্রগল্‌ভ।
তুচ্ছতার আবরণে অনুজ্জ্বল
অতি-সাধারণ স্ত্রী-স্বরূপকে
কখনো করেছে লালন, কখনো করেছে পরিহাস,
আঘাত করেছে কখনো বা।

আমার ভালোবাসার আর-একটা ধারা
মহাসমুদ্রের বিরাট ইঙ্গিতবাহিনী।

মহীয়সী নারী স্নান করে উঠেছে
তারি অতল থেকে।
সে এসেছে অপরিসীম ধ্যানরূপে
আমার সর্বদেহে-মনে,
পূর্ণতর করেছে আমাকে, আমার বাণীকে।
জ্বেলে রেখেছে আমার চেতনার নিভৃত গভীরে
চিরবিরহের প্রদীপশিখা।

রবীন্দ্রমানসে ভালবাসার এই দু ধারার কথা সর্বদা স্মরণ রেখেই তাঁর হৃদয়াবেগের বিশ্লেষণ করতে হবে। এ কবিতায় শুধু অনিবার্য নিয়তির সঙ্গে বোঝাপড়াই নয়, নিজের মানসপ্রকৃতির কথাও কবি অকপটে বলেছেন। নারী যখন তাঁর চেতনার নিভৃত গভীরে চিরবিরহের প্রদীপশিখা জ্বেলে রেখেছে তখনই সে এসেছে অপরিসীম ধ্যানরূপে কবির সর্বদেহেমনে। অর্থাৎ রবীন্দ্র-জীবনে প্রেমের বীণায় যখন বিরহ-বিপ্রলম্ভের সুর বেজেছে তখনই ফুটে উঠেছে তার মধুরতম গভীরতম রূপ।

তা ছাড়া রোমান্টিক কবিমানসে শুদ্ধমাত্র সৌন্দর্যের আকর্ষণও কম প্রবল নয়। সুখ-দুঃখ-বিরহ-মিলনপূর্ণ ভালবাসা এবং সৌন্দর্যের নিরুদ্দেশ আকাঙ্ক্ষা সেখানে আপন স্বাতন্ত্র্য নিয়েই পাশাপাশি বাস করে, অথচ তাদের মধ্যে কোন বিরোধও নেই। এ বিষয়ে কবিমানসকে বোঝবার পক্ষে তাঁর 'য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি'র উল্লেখ করা যেতে পারে। এই ডায়ারিটি লেখা হয় রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় বিলাত-যাত্রার সময়। 'বিবাহের আট বৎসর পরে, ১৮৯০ সনের আগস্ট মাসে মেজদার সঙ্গে কবি আড়াই মাসের জন্যে দ্বিতীয়বার বিলাত ভ্রমণে গিয়েছিলেন। কেন গিয়েছিলেন এ প্রশ্নের উত্তর পাবার মতো কোনো উপাদান রবীন্দ্র-জীবনে রক্ষিত হয় নি। লণ্ডনে পৌঁছেই কবি সেখানে তাঁর 'সর্বাপেক্ষা পরিচিত বাড়ির দ্বারে' গিয়ে আঘাত করেছিলেন সর্বপ্রথমে। বলাই বাহুল্য, সতেরো বৎসর বয়সে তাঁর প্রথম বিলাত-প্রবাসে যে-কিশোরী তাঁর প্রবাস-জীবনের দিনগুলিকে মধুময় করে রেখেছিলেন সেই স্কটদুহিতা মিস কে-র সন্ধানেই তিনি ছুটে গিয়েছিলেন সেই গৃহদ্বারে। কিন্তু জীবনে তিনি আর তার সাক্ষাৎ পান নি। ডায়ারিতে এই ঘটনার কথাও যেমন কবি কুণ্ঠাহীন ভাষায় লিপিবদ্ধ করেছেন তেমনি আর-এক দিনের কড়চায় বলছেন,

'এখানে রাস্তায় বেরিয়ে সুখ আছে। সুন্দর মুখ চোখে পড়বেই। শ্রীযুক্ত দেশানুরাগ যদি পারেন তো আমাকে ক্ষমা করবেন। নবনীর মত সুকোমল শুভ্র রঙের উপরে একখানি পাতলা টুকটুকে ঠোঁট, সুগঠিত নাসিকা এবং দীর্ঘপল্লববিশিষ্ট নির্মল নীলনেত্র দেখে প্রবাস-দুঃখ দূর হয়ে যায়। শুভানুধ্যায়ীরা শঙ্কিত এবং চিন্তিত হবেন, প্রিয় বয়স্যেরা পরিহাস করবেন কিন্তু এ কথা আমাকে স্বীকার করতেই হবে সুন্দর মুখ আমার সুন্দর লাগে। সুন্দর হওয়া এবং মিষ্ট করে হাসা মানুষের যেন একটি পরমাশ্চর্য ক্ষমতা।'[১৩] এরই দিন আস্টেক পরে কবি লাইসীয়ম নাট্যশালায় স্কটের উপন্যাস 'দি ব্রাইড অব লামারমুর'-এর নাট্যরূপের অভিনয় দেখতে গিয়েছিলেন। তাঁদের সম্মুখবর্তী একটি বক্সে দুটি মেয়ে বসে ছিল। তাদের একটি ছিল নিখুঁত সুন্দর; রঙ্গভূমির সমস্ত দর্শকের চিত্ত এবং দূরবীন সে আকৃষ্ট করেছিল। কবি সেদিনকার ডায়ারিতে লিখছেন, 'অভিনয়ের সময় যখন সমস্ত আলো নিবিয়ে দিয়ে কেবল স্টেজের আলো জ্বলছিল, এবং সেই আলো স্টেজের অনতি-দূরবর্তী তার আধখানি মুখের উপর এসে পড়েছিল—তখন তার আলোকিত সুকুমার মুখের রেখা এবং সুভঙ্গিম গ্রীবা অন্ধকারের উপর চমৎকার চিত্র রচনা করেছিল। হিতৈষীরা আমাকে পুনশ্চ মার্জনা করবেন—অভিনয়কালে সেদিকে আমার দৃষ্টি বদ্ধ হয়েছিল।'[১৪] কবির এই অকপট ও অসংকোচ বিবৃতির মধ্যেই এর শুচিতার নিঃসংশয় প্রমাণ রয়েছে। অপাপবিদ্ধ সৌন্দর্যচেতনা শুচিশীলিত কবিমানসের নিত্যসঙ্গী। এর সঙ্গে প্রেমচেতনার কোনো দ্বন্দ্ব নেই। প্রত্যক্ষ কোনো সম্পর্কও নেই। প্রেমচেতনার ক্ষেত্রেও যে দু-ধারার কথা কবি নিজে পূর্বোদ্ধৃত কবিতায় বলেছেন সে দু-ধারার মধ্যেও তিনি একটি আশ্চর্য সঙ্গতি নিজের জীবনে গড়ে তুলতে পেরেছিলেন—এখানেই তাঁর জীবনসাধনার অনন্যসাধারণত্ব। চেতনার নিভৃত গভীরে চিরবিরহের প্রদীপশিখা অনুক্ষণ জ্বালিয়ে রেখে তার আলোকেই তিনি তাঁর গৃহপ্রাঙ্গণের পবিত্র তুলসীমঞ্চে মিলনের সন্ধ্যাদীপটিকে নিত্যপ্রোজ্জ্বল করে রেখেছিলেন। তরতম-ভেদ অবশ্যই আছে। প্রতিদিনের তুচ্ছতার আবরণে অনুজ্জ্বল দাম্পত্যপ্রেমের ধারা মহাসমুদ্রের বিরাট ইঙ্গিত-বাহিনী না হতে পারে; কিন্তু রসিকচিত্তের কাছে গ্রামের চিরপরিচিত নদীটুকুর স্নিগ্ধ বেষ্টনে যে মায়া যে মমতা, তার মাধুর্যও কম আকর্ষণীয় নয়।

রবীন্দ্র-জীবনে সীমা ও অসীম, নীড় ও আকাশ চিরদিনের রাখীবন্ধনে বাঁধা পড়েছে। তাঁর মহাজাগতিক চেতনা একদিকে সিন্ধু ও পর্বতমালায় যেমন জীবনের বিরাট স্বরূপকে প্রত্যক্ষ করে অভিভূত হয়েছে, অন্যদিকে তেমনি 'একটি ধানের শীষের উপরে একটি শিশিরবিন্দু'র সৌন্দর্যও তাঁকে কম আনন্দ দেয় নি। সেই আনন্দই উচ্ছলিত হয়েছে তাঁর দাম্পত্যজীবনের সুখ-দুঃখ-বিরহ-মিলনের মধ্যে।

আমরা 'য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি'র কথা বলেছি। উদ্ধৃত অংশে তাঁর মনের একটা দিক ফুটে উঠেছে। আর-একটা দিকের কথা পাওয়া যাবে সে সময়কার লেখা তাঁর একখানি চিঠিতে। যাবার পথে এডেনের কাছে পৌঁছে রবীন্দ্রনাথ কবিজায়াকে লিখছেন: 'এবারে সমুদ্রে আমার যে অসুখটা করেছিল সে আর কি বলব—তিন দিন ধরে যা-একটু কিছু মুখে দিয়েছি অমনই তখনি বমি করে ফেলেছি—মাথা ঘুরে গা ঘুরে অস্থির—বিছানা ছেড়ে উঠিনি—কি করে বেঁচেছিলুম তাই ভাবি। রবিবার দিন রাত্রে আমার ঠিক মনে হল আমার আত্মাটা শরীর ছেড়ে বেরিয়ে জোড়াসাঁকোয় গেছে। একটা বড় খাটে একধারে তুমি শুয়ে রয়েছ আর তোমার পাশে বেলি খোকা শুয়ে। আমি তোমাকে একটু একটু আদর করলুম আর বললুম ছোটবৌ মনে রেখো আজ রবিবার রাত্তিরে শরীর ছেড়ে বেরিয়ে তোমার সঙ্গে দেখা করে গেলুম—বিলেত থেকে ফিরে গিয়ে জিজ্ঞাসা করব তুমি আমাকে দেখতে পেয়েছিলে কিনা। তারপর বেলি খোকাকে হাম দিয়ে ফিরে চলে এলুম। যখন ব্যামো নিয়ে পড়েছিলুম তোমরা আমাকে মনে করতে কি? তোমাদের কাছে ফেরবার জন্যে ভারি মন ছটফট করত। আজকাল কেবল মনে হয় বাড়ির মত এমন জায়গা আর নেই—এবারে বাড়ি ফিরে গিয়ে আর কোথাও নড়ব না।'[১৫]

শুধু এই চিঠিতেই নয়, কবির একাধিক চিঠিতে দেখা যাচ্ছে সংসার থেকে দূরে গেলেই তিনি পত্নী ও সন্তানদের স্বপ্নে দেখছেন; তাদের কাছে পাবার জন্যে এবং ঘরের বুকে ফিরে আসার জন্যে আকুল হয়েছেন। 'কাল রাত্তিরে বেলিটাকে স্বপ্নে দেখেছিলুম—সে যেন স্টিমারে এসেচে—তাকে এমনি চমৎকার ভাল দেখাচ্চে সে আর কি বলব—' 'কাল রাত্তিরে আমি খোকাকে স্বপ্ন দেখেছি—তাকে যেন আমি কোলে নিয়ে চট্‌কাচ্চি, বেশ লাগচে।'—বলা

নিষ্প্রয়োজন, এ সব স্বপ্ন কবির গৃহপ্রত্যাবর্তনকামী মনেরই পরিচায়ক। শুধু বিদেশে গিয়েই নয়, জমিদারিতে গিয়েও কবি ঘরে ফেরার ডাক মনের মধ্যে শুনতে পেতেন। ১৮৯১ সনে সাজাদপুর থেকে কবিজায়াকে লিখছেন, 'আজ আমার প্রবাস ঠিক এক মাস হল। আমি দেখেছি যদি কাজের ভীড় থাকে তাহলে আমি কোন মতে একমাস কাল বিদেশে কাটিয়ে দিতে পারি। তার পর থেকে বাড়ির দিকে মন টানতে থাকে।'[১৬] দীর্ঘপ্রবাস যেমন কবির কাছে চিরদিনই দুর্বিষহ মনে হত তেমনি পত্নীর কাছ থেকে দূরে থাকলে দাম্পত্যজীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি স্ত্রীর চিঠি পাবার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকতেন। 'মানসী' কাব্যে "পত্রের প্রত্যাশা" কবিতায় কবি লিখেছিলেন :

দিবা যেন আলোহীনা এই দুটি কথা বিনা
"তুমি ভালো আছ কি না" "আমি ভালো আছি!"
স্নেহ যেন নাম ডেকে কাছে এসে যায় দেখে,
দুটি কথা দূর থেকে করে কাছাকাছি।

'য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি'তে একটি বিশেষ পরিবেশে এই "পত্রের প্রত্যাশা" কবির মনকে ভারি সুন্দর করে ফুটিয়ে তুলেছে। য়ুরোপ থেকে ফেরবার পথে ব্রিন্দিসিতে নেমে একটি গোরস্থানের এক জায়গায় সিঁড়ি দিয়ে একটা মাটির নীচেকার ঘরে নেমে দেখলেন, সেখানে সহস্র সহস্র মড়ার মাথা স্তূপাকারে সাজানো রয়েছে। তা দেখে কবির মনে হল, পৃথিবীর কত যুগের কত দুশ্চিন্তা, দুরাশা, অনিদ্রা ও শিরঃপীড়া ওই মাথার খুলিগুলোর, ওই গোলাকার অস্থি-বুদ্‌বুদ্‌গুলোর মধ্যে থেকে অব্যাহতি পেয়েছে। এই বৈরাগ্য-সৃজনকারী মহামৃত্যুর পটভূমিতে দাঁড়িয়ে কবির মনে গৃহাসক্তির চিন্তাই প্রবল হয়ে উঠল। কবি সেদিন ডায়ারিতে লিখছেন: 'যাই হ'ক আপাতত আমার নিজের কপালফলকটার ভিতরে বাড়ির চিঠির প্রত্যাশা সঞ্চরণ করছে। যদি পাওয়া যায় তাহলে এই খুলিটার মধ্যে খানিকটা খুশির উদয় হবে, আর যদি না পাই তাহলে এই অস্থিকোটরের মধ্যে দুঃখ নামক একটা ব্যাপারের উদ্ভব হবে, ঠিক মনে হবে আমি কষ্ট পাচ্ছি।'[১৭]

'বাড়ির চিঠি' পাওয়ার জন্যে কবিমানসের এই প্রত্যাশা কোনদিনই শিথিল হয় নি। বিবাহের এগারো বৎসর পরে শিলাইদহ থেকে কবি স্ত্রীকে

লিখছেন: 'তোমাদের মত এমন অকৃতজ্ঞ আমি দেখিনি। পাছে তোমাদের চিঠি পেতে একদিন দেরি হয় বলে কোথাও যাত্রা করবার সময় আমি একদিনে উপরি উপরি তিনটি চিঠি লিখেছি। * * তুমি যদি হপ্তায় নিয়মিত দুখানা করে চিঠিও লিখতে তাহলেও আমি যথেষ্ট পুরস্কার জ্ঞান করতুম। এখন আমার ক্রমশ বিশ্বাস হয়ে আসচে তোমার কাছে আমার চিঠির কোন মূল্য নেই এবং তুমি আমাকে দু-ছত্র চিঠি লিখতে কিছুমাত্র কেয়ার কর না। আমি মূর্খ কেন যে মনে করি তোমাকে রোজ চিঠি লিখলে তুমি হয়তো একটুখানি খুসি হবে, এবং না লিখলে হয়তো চিন্তিত হতে পার, তা ভগবান জানেন।' বিশ বৎসরব্যাপী দাম্পত্যজীবনের উপান্ত-বর্ষেও কবি একই সুরে লিখছেন, 'ভাই ছুটি, বড় হোক্ ছোট হোক্ ভাল হোক্ মন্দ হোক্ একটা করে চিঠি আমাকে রোজ লেখ না কেন? ডাকের সময় চিঠি না পেলে ভারি খালি ঠেকে।' এই পত্রখানি কবির দাম্পত্যজীবনের একটি সার্থক সংকেত রূপেই গ্রহণযোগ্য। বিবাহের কুড়ি বৎসর পরেও যে-স্বামী তাঁর স্ত্রীর কাছ থেকে 'রোজ একটা করে চিঠি' পাবার জন্যে আকুল হয়ে থাকেন, স্ত্রীর প্রতি তাঁর অনুরাগ ও আকর্ষণ সম্পর্কে অন্য কোনো প্রমাণপঞ্জী খুঁজে দেখা নিতান্তই অনাবশ্যক। শুধু চিঠির প্রত্যাশাই নয়, চিঠি পেলে কবি যে কত খুশি হতেন তার পরিচয়ও পাওয়া যাবে আর-একখানি চিঠিতে। কবি লিখছেন, 'ভাই ছুটি, আজ একদিনে তোমার দুখানা চিঠি পেয়ে খুব খুশি হলুম। কিন্তু তার উপযুক্ত প্রতিদান দেবার অবসর নেই...।' এই ফুটকি-চিহ্নিত অংশ 'চিঠি-পত্রে'র সম্পাদকের নীতিবোধের তাড়নায় অবলুপ্ত হয়েছে। নিশ্চয়ই এখানে পরিতৃপ্ত কবিচিত্তের ভাবাবেগ বল্গাহীন আদরের ভাষায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল। দাম্পত্যজীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এই উচ্ছ্বাস কবিমানসের সৌকুমার্য ও অনিঃশেষ আসক্তিরই প্রতীক।

সার্থক দাম্পত্যজীবনের স্বাভাবিক পরিণতি হল সন্তানবৎসলতায়। বাৎসল্য পুরুষের জীবনে সুস্থ পত্নীপ্রেমের মুখ্য সঞ্চারীভাব। সন্তানস্নেহের মধ্য দিয়ে তাই পুরুষের দাম্পত্যজীবনের নতুন পরিচয় পাওয়া যায়। তরুণ কবির জীবনে প্রথম সন্তানস্নেহের সঞ্চার কি ভাবে হয়েছিল তার কথা বলতে গিয়ে কবি তাঁর জ্যেষ্ঠাকন্যা বেলার [তাঁর আদরের বেলিবুড়ি, বেলুরাণু] বিবাহের পর মৃণালিনী দেবীকে লেখা এক চিঠিতে লিখছেন, 'কাল সমস্তক্ষণ

বেলার শৈশবস্মৃতি আমার মনে পড়ছিল। তাকে কত যত্নে আমি নিজের হাতে মানুষ করেছিলুম। তখন সে তাকিয়াগুলোর মধ্যে আবদ্ধ হয়ে কি রকম দৌরাত্ম্য করত—সমবয়সী ছোট ছেলে পেলেই কি রকম হুঙ্কার দিয়ে তার উপর গিয়ে পড়ত—কি রকম লোভী অথচ ভালমানুষ ছিল, আমি ওকে নিজে পার্কস্ট্রীটের বাড়িতে স্নান করিয়ে দিতুম—দার্জিলিঙে রাত্রে উঠিয়ে উঠিয়ে দুধ গরম করে খাওয়াতুম—যে সময় ওর প্রতি সেই প্রথম স্নেহের সঞ্চার হয়েছিল সেই সব কথা বারবার মনে উদিত হয়।'[১৮] 'ছিন্নপত্রের' একখানি চিঠিতেও শিশুর আদরলোভী কবিপিতার সুকুমার হৃদয়াবেগ অতুলনীয় ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। কবি শিলাইদহ থেকে ভ্রাতুষ্পুত্রীকে লিখছেন: 'এবারকার পত্রে অবগত হওয়া গেল যে, আমার ঘরের ক্ষুদ্রতমাটি ক্ষুদ্র ঠোঁট ফুলিয়ে অভিমান করতে শিখেছে। আমি সে চিত্র বেশ দেখতে পাচ্ছি। তার সেই নরম-নরম মুঠোর আঁচড়ের জন্যে আমার মুখটা নাকটা তৃষার্ত হয়ে আছে। সে যেখানে-সেখানে আমাকে মুঠো করে ধরে টল্‌মলে মাথাটা নিয়ে হাম করে খেতে আসত এবং খুদে খুদে আঙুলগুলোর মধ্যে আমার চশমার হারটা জড়িয়ে নিতান্ত নির্বোধ নিশ্চিন্ত গম্ভীর ভাবে গাল ফুলিয়ে চেয়ে থাকত, সেই কথাটা মনে পড়ছে।'[১৯]

শিশুকন্যার নরম নরম মুঠোর আঁচড়ের জন্যে কবি-পিতার মুখটা নাকটা তৃষার্ত হয়ে আছে—রবীন্দ্রনাথের সংসারজীবনের এই অন্তরঙ্গ ছবিটির দিকে তাকালে বুঝতে পারা যায় কি স্নিগ্ধ লাবণ্যে তাঁর ঘরোয়া জীবন ভরে উঠেছিল। গৃহস্থালী-রচনায় সংসারের খুঁটিনাটি প্রয়োজন এবং গৃহিণীর স্বাস্থ্য ও স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতিও কোনদিনই কবির স্নেহদৃষ্টির অভাব হয় নি। নিজেদের ব্যবহারের জন্যে কবি একটি ঘোড়ার গাড়ি কিনেছিলেন। ওতে চড়ে কবিজায়া বিকেলে বিকেলে বায়ুসেবনে বেরোবেন তা ছিল কবির মনোগত অভিপ্রায়। ১৮৯০ সনে য়ুরোপপ্রবাস থেকে কবি লিখছেন, 'আমি ফিরে গিয়ে তোমাকে যেন বেশ মোটাসোটা সুস্থ দেখতে পাই ছোটবউ। গাড়িটা তো এখন তোমারি হাতে পড়ে রয়েছে, রোজ নিয়মিত বেড়াতে যেয়ো, কেবলই পরকে ধার দিয়ো না।' কাজের তাড়ায়, বিশেষত জমিদারি পরিদর্শনে বাংলার পল্লীতে পল্লীতে যখন ঘুরে বেড়াচ্ছেন তখনো কিন্তু সর্বদা তাঁর সতর্ক দৃষ্টি রয়েছে কলিকাতায় পত্নীর স্বাস্থ্যের প্রতি। সাজাদপুর থেকে ১৮৯১ সনে লিখছেন, 'আজকাল

তুমি দুবেলা খানিকটা করে ছাতে পায়চারি করে বেড়াচ্ছ কি না আমাকে বল দেখি। এবং অন্যান্য সমস্ত নিয়ম পালন হচ্চে কি না, তাও জানাবে। আমার খুব সন্দেহ হচ্চে তুমি সেই কেদারাটার উপর পা ছড়িয়ে বসে একটু একটু করে পা দোলাতে দোলাতে দিব্যি আরামে নভেল পড়চ।' পতির অনুশাসন বটে, কিন্তু বলাই বাহুল্য হৃদয়ের সবটুকু মাধুর্য দিয়েই গড়া। কখনো কখনো এই মাধুর্যের সঙ্গে মিশেছে কৌতুকের লাবণ্যচ্ছটা। সাজাদপুর থেকে আর একখানি চিঠিতে কবি লিখছেন, 'আচ্ছা, আমি যে তোমাকে এই সাহাজাদপুরের সমস্ত গোয়ালার ঘর মন্থন করে উৎকৃষ্ট মাখনমারা ঘের্ত, সেবার জন্যে পাঠিয়ে দিলুম তৎসম্বন্ধে কোনরকম উল্লেখমাত্র যে করলে না তার কারণ কি বল দেখি? আমি দেখছি অজস্র উপহার পেয়ে পেয়ে তোমার কৃতজ্ঞতা-বৃত্তিটা ক্রমেই অসাড় হয়ে আসচে। প্রতিমাসে নিয়মিত পনেরো সের করে ঘি পাওয়া তোমার এমনি স্বাভাবিক মনে হয়ে গেছে যেন বিয়ের পূর্ব থেকে তোমার সঙ্গে আমার এই রকম কথা নির্দিষ্ট ছিল।' রসিকতাটি উপাদেয় সন্দেহ নেই; কিন্তু সমস্ত গোয়ালার ঘর মন্থন করে উৎকৃষ্ট মাখনমারা ঘের্ত পত্নীর 'সেবার জন্যে' কবি নিয়মিত পাঠাচ্ছেন—এ দৃশ্যটি যেমন হৃদ্য তেমনি উপভোগ্য।

গৃহিণীর মনোরঞ্জনের জন্যে এইসব অকৃত্রিম প্রয়াসের মূলে তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত প্রণয়াবেগ সম্পর্কে কবি যেমন সচেতন ছিলেন তেমনি নিজের কবিস্বভাবের জন্যে তিনি যে কবিজায়ার নানাবিধ দুঃখ ও কষ্টের কারণ হতেন সে কথাও কবি কখনো ভোলেন নি। একখানি চিঠিতে তিনি লিখছেন, 'একটু সুযোগ পেলেই পরের ত্রুটি নিয়ে খিটিমিটি করা আমার স্বভাব এবং তোমার অদৃষ্টক্রমে তোমাকে চিরজীবন এটা সহ্য করতে হবে। ভৎর্সনাটা প্রায় চেঁচিয়ে করি আর অনুতাপটা মনে মনে করি, কেউ শুনতে পায় না।' এর ছ বছর পরে আর-একখানি চিঠিতে আছে, 'আমি জানি তুমি আমার জন্যে অনেক দুঃখ পেয়েছ, এও নিশ্চয় জানি যে আমারই জন্যে দুঃখ পেয়েছ বলে হয়তো একদিন তার থেকে তুমি একটি উদার আনন্দ পাবে। ভালবাসায় মার্জনা এবং দুঃখস্বীকারে যে সুখ, ইচ্ছাপূরণ ও আত্মতৃপ্তিতে সে সুখ নেই।'

কিন্তু এ সব ক্ষেত্রে কবি ইচ্ছে করে গৃহিণীর দুঃখ সৃষ্টি করেছেন এমন

কথা চিন্তা করলে কবির প্রতি সুবিচার করা হবে না। শত চেষ্টা সত্ত্বেও কবির সংসার সবদিক দিয়ে সুখের হতে পারে না, কোন-না-কোন দিক দিয়ে তা অভিশপ্ত হবেই, এই যেন কবিজীবনের অনিবার্য নিয়তি। স্ত্রীকে লেখা একখানি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, 'এমনি এই সংসার! সমুদ্রতীর এবং সমুদ্র-তরঙ্গের উপর যখন কবিতা লিখচি তখন আর কাঠা বিঘের জ্ঞান থাকে না, তখন অনন্ত সমুদ্র অনন্ত তীর চোদ্দ অক্ষরের মধ্যে। আর সেই সমুদ্রের ধারে একটি ছোট্ট 'বাঙ্গলা' বানাতে যাও, তখন এঞ্জিনিয়ার কণ্ট্রাক্টর এষ্টিমেট চিন্তা পরামর্শ ধার এবং টোয়েলভ পার্সেণ্ট সুদ—তার উপরে আবার কবির স্ত্রীর পছন্দ হয় না, লোকসান বোধ হয়—স্বামীর মস্তিষ্কের অবস্থার উপর সন্দেহ উপস্থিত হয়। কবিত্ব এবং সংসার এই দুটোর মধ্যে বনিবনাও আর কিছুতেই হয়ে উঠল না দেখচি। কবিত্বে এক পয়সা খরচ নেই (যদি না বই ছাপাতে যাই) আর সংসারটাতে পদে পদে ব্যয়বাহুল্য এবং তর্কবিতর্ক।' এই হল কবিজীবনের সাধারণ নিয়তি। স্বামীর মস্তিষ্কের অবস্থার উপর কবির স্ত্রীর সন্দেহ উপস্থিত হওয়া এবং তজ্জনিত তর্কবিতর্ক ও ভুলবোঝাবুঝি সংসার-জীবনে শিল্পগোত্র মানুষমাত্রেরই চিরদিনের পাওনা। তা ছাড়া হৃদয়ের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুভূতি নিয়ে যার কারবার তার সব কথা সংসারী মানুষকে বুঝিয়ে বলাও সম্ভব নয়। জগতের বিচিত্র তরঙ্গ-আঘাত তার নিভৃত চিত্তমাঝে প্রতি নিমেষে বেজে চলেছে। একের মধ্যে তদ্গতচিত্ত হয়ে বিশ্বকে ভুলে যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। বিশ্বভুবন থেকে অনুক্ষণ কত গান-দৃশ্য তার চিত্তলোকে প্রবেশ করছে, কবি-শিল্পী 'আশা দিয়ে ভাষা দিয়ে তাহে ভালোবাসা দিয়ে' গড়ে তুলছে তার মানসী প্রতিমা। বিচিত্রের দূত সে, বিচিত্রের উপাসক। তার চিত্তের অন্তহীন রহস্য তার নিজের কাছেই অপরিজ্ঞেয়। তাই অন্তরঙ্গ প্রিয়জন তার সবটুকু বুঝতে না পেরে তাকে চিরদিনই ভুল বুঝবে। রবীন্দ্রনাথও এ কথা মর্মে মর্মে জানতেন, কিন্তু এই ভাগ্যকে তিনি শুধু শান্ত চিত্তে গ্রহণই করেন নি, প্রিয়ার কাছে নিজেকে যতটুকু সম্ভব অনাবৃত করতেও সর্বদা চেষ্টা করেছেন। পুরীর বাঙ্গলা বানাতে গিয়ে যখন মৃণালিনী দেবীর সঙ্গে তাঁর মতভেদ হচ্ছে এবং কবি রসিকতা করে লিখছেন স্বামীর মস্তিষ্কের অবস্থার উপর তাঁর সন্দেহ উপস্থিত হয়েছে, তখনকার একটি কবিতায় কবিচিত্তের ব্যাকুলতা ভাষা

পেয়েছে। 'সোনার তরী'তে সংকলিত সেই "দুর্বোধ" কবিতায় কবিপ্রিয়াকে সম্বোধন করে কবি লিখছেন :

তুমি মোরে পার না বুঝিতে ?
প্রশান্ত বিষাদভরে
দুটি আঁখি প্রশ্ন ক'রে
অর্থ মোর চাহিছে খুঁজিতে,
চন্দ্রমা যেমন ভাবে স্থির নতমুখে
চেয়ে দেখে সমুদ্রের বুকে।

কিছু আমি করিনি গোপন।
যাহা আছে, সব আছে
তোমার আঁখির কাছে
প্রসারিত অবারিত মন।
দিয়েছি সমস্ত মোর করিতে ধারণা,
তাই মোরে বুঝিতে পার না ?

এ যদি হইত শুধু মণি,
শত খণ্ড করি তারে
সযত্নে বিবিধাকারে
একটি একটি করি গণি
একখানি সূত্রে গাঁথি একখানি হার
পরাতেম গলায় তোমার।

এ যদি হইত শুধু ফুল,
সুগোল সুন্দর ছোটো,
উষালোকে ফোটো ফোটো,
বসন্তের পবনে দোদুল,
বৃন্ত হতে সযতনে আনিতাম তুলে,
পরায়ে দিতেম কালো চুলে।

এ যে সখী সমস্ত হৃদয়।
কোথা জল, কোথা কূল,
দিক্ হয়ে যায় ভুল,
অন্তহীন রহস্য-নিলয়।
এ রাজ্যের আদি অন্ত নাহি জান রানী,
এ তবু তোমার রাজধানী।

কবিচিত্ত অন্তহীন রহস্যনিলয় সন্দেহ নেই, কিন্তু এ রাজ্যের আদি-অন্ত কবিজায়ার জানা থাক্ আর নাই থাক্, কবি বলেছেন, 'এ তবু তোমার রাজধানী।' কবিকণ্ঠের এই আবেগগর্ভ স্বীকৃতির মধ্যে কবিচিত্তে কবিজায়ার আধিপত্য ও অধিকারের জয়বার্তাই বিঘোষিত হয়েছে।

৭

কবিচিত্তের রাজধানীতে কবিজায়া যে একদিন 'রানীর মতন রতন-আসনে' অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন এর জন্যে মৃণালিনী দেবীর ভাগ্যকেই শুধু সাধুবাদ দিলে চলবে না, কবিগৃহিণী হিসাবে তাঁর গুণগরিমার কথাও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতে হবে। ফুলতলি গ্রামের ফুলি [ওই ছিল তাঁর ছেলেবেলার ডাক-নাম] ঠাকুরপরিবারে এসে মৃণালিনীরূপে রবির আলোয় বিকশিত হয়ে উঠেছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর পিতৃদত্ত ভবতারিণী নামের মধ্যেই যেন তাঁর স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয়েছে। ভবতারিণীর অন্নপূর্ণা-মূর্তিই তাঁর সত্যকার রূপ। পাতিব্রত্যে তিনি ছিলেন পার্বতী, ভোলানাথের মতই আত্মভোলা কবিস্বামীর সংসার তিনি আগ্‌লে রেখেছিলেন অন্নপূর্ণার মত। গঙ্গাজলের মত নির্মল ছিল তাঁর মন, যেমন সরল তেমনি উদার। সুখে-দুঃখে সম্পদে-বিপদে আত্মীয়-পরিজন সবাইকে আপনার করাই ছিল তাঁর স্বভাবধর্ম, সবাইকে নিয়ে আমোদ-আহ্লাদ করে প্রসন্ন ও প্রশান্ত জীবনযাত্রার দিকেই ছিল তাঁর চিত্তের প্রবণতা। ভাসুরপুত্র বলেন্দ্রনাথ ও নীতীন্দ্রনাথকে তিনি পুত্রাধিক স্নেহেই লালন করেছেন। শ্বশুরকে তিনি দেবতার মত ভক্তি করতেন। মহর্ষিদেবের প্রতি তাঁর অপরিসীম ভক্তি ও বিশ্বাস এত গভীর ছিল যে, শ্বশুরের দোহাই দিয়ে তিনি স্বামীর কাজকর্মে বাধা দিতেও কুণ্ঠিত হতেন

না। উর্মিলা দেবী বলেছেন, কতবার যে তাঁর মুখে শুনেছি, 'বাবামশায়ের মত এটা নয়, আমি এ কাজ কখনো করব না।' ছোটবৌয়ের প্রতি মহর্ষিদেবেরও স্নেহের অন্ত ছিল না।

স্নেহপ্রবণ মধুর স্বভাবের জন্যে 'ছোটমা' ছিলেন পরিবার ও ভৃত্যবর্গেরও পরম স্নেহময়ী জননী। তাঁর মাতৃহৃদয়ের একটি সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন 'সেকালের রবীন্দ্র-তীর্থে'র লেখক শ্রীশচীন্দ্রনাথ অধিকারী। 'দেবী মৃণালিনী' তখন থাকতেন শিলাইদহ কুঠিবাড়িতে। সেখানকার দারোয়ান ও বরকন্দাজদের মধ্যে দুজন ছিল পাঞ্জাবী শিখ। তাদেরই এক আত্মীয় দারুণ অভাবের জ্বালায় দেশ ছেড়ে শিলাইদহে গিয়ে হাজির হয়। তার নাম ছিল মুলা সিং, দেখতে ভীমের মত, আহারেও সে ছিল বৃকোদরের সহোদর। তার দুর্দশার করুণ কাহিনী 'ছোট মাইজী'র কাছে যথাকালে নিবেদিত হল। কবি তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। মৃণালিনী দেবী সেদিন তাকে দারোয়ানের কাজে বহাল করে দিলেন। মাইনে ধার্য হল পনেরো টাকা। মাইজী বললেন, বাবু এলে মাইনের বিষয় পুনর্বিবেচনা হবে। মুলা সিং অকূলে কূল পেয়ে মনের আনন্দেই কাজকর্ম করতে লাগল, কিন্তু মাসের শেষে তার মুখখানা বড়ই মলিন হয়ে গেল। তার বিমর্ষ ভাব মাইজীর দৃষ্টি এড়াল না। তিনি জানতে পারলেন মুলা সিংয়ের জঠরজ্বালা নেভাতে রোজ চার সের করে আটা লাগে দু বেলায়। মাইনে যা পায় তা খেয়েই সব শেষ করে দেয়। বাড়িতে টাকা পাঠাতে পারে না। তখন মুলা সিংয়ের দু মাসও চাকরি হয় নি। মাইনে বাড়াবার মালিক তিনি নন। তাই মৃণালিনী দেবী নিজের সংসার থেকে রোজ চার সের আটা মুলা সিংয়ের জন্যে বরাদ্দ করে দিলেন। মাস তিন-চার পরে মাইজীর চেষ্টাতেই মুলা সিংয়ের মাইনে বেড়ে কুড়ি টাকা হল। কিন্তু তার জন্যে মাইজী তার বরাদ্দ চার সের আটা বন্ধ করে দিলেন না। মাতৃস্নেহ দিয়েই এই ভীম-সন্তানের খোরাক বরাবর যুগিয়ে যেতে লাগলেন।

শুধু মুলা সিং নয়, করুণাময়ী 'ছোটমা'র মাতৃস্নেহ সবার প্রতিই সমভাবে বর্ষিত হত। শচীন্দ্রনাথ তাঁর গ্রন্থে 'দেবী মৃণালিনী'র শিলাইদহ-বাস প্রসঙ্গে বলেছেন, কুঠিবাড়িতে কবিজায়া একটি সুন্দর শাকশব্জীর বাগান করেছিলেন। তিনি নিজে ওই বাগানের কাজকর্ম দেখতেন। বাগানের

শবজী ও তরকারি তিনি নিজে উদ্যোগ করে কর্মচারীদের বাড়ি বাড়ি পাঠিয়ে দিতেন। সে সময়ে যে সব আমলা সপরিবারে বাস করবার সুবিধা পেতেন না, তাদের জন্যে একটা মেস খুলবার প্রস্তাব হয়; মৃণালিনী দেবীই এই মেসের জন্যে এস্টেট থেকে একজন পাচকের ব্যবস্থা করে দিলেন। একজন চাকরও বহাল হল। শুধু তাই নয়, কুঠিবাড়ির বাগানের তরিতরকারি সপ্তাহে দুদিন করে মেসে পাঠাবার ব্যবস্থাও তিনি করে দিলেন। বিদেশী আমলাদের প্রায়ই কুঠিবাড়িতে নিমন্ত্রণ থাকত। 'ছোটমা' নিজে আয়োজন করে নানারকমের পিঠে-পরমান্ন তৈরি করে নিজের হাতে সবাইকে পরিবেশন করতেন। স্বভাবতই মৃণালিনী দেবী যখন শিলাইদহ ছেড়ে আসেন তখন চাকর ও আমলারা মাতৃহারা সন্তানের মতই অশ্রুপাত করেছে।[২০]

স্বামী সম্পর্কে কবিজায়ার মনোভাব আমাদের সনাতন পাতিব্রত্যের আদর্শকেই অনুসরণ করেছে। অন্য দেশের কথা জানি নে; আমাদের দেশে পতিসোহাগিনী নারীর দৃষ্টিতে তাঁর স্বামী আত্মভোলা সদাশিব। আমাদের দাম্পত্যজীবনের আদর্শ পার্বতীপরমেশ্বরের যে রূপান্তর আমাদের লোক-সাহিত্যে শিব-উমার কাহিনীতে ঘটেছে তা থেকেই এ দেশের মনোভাবটি ধরতে পারা যায়। পাগলা ভোলানাথ সবদিকেই বেসামাল, মাতা অন্নপূর্ণা এই বেসামাল মানুষের সংসারটিকেও দশ হাতে সামলাবার চেষ্টা করছেন, স্বামীটিকেও আগলাবার দায়িত্ব তাঁর। জানি না হয়তো সাংখ্যের প্রকৃতি-পুরুষ-তত্ত্বের প্রভাবেও এমনটি ঘটে থাকতে পারে। কিন্তু কিছুটা অগোছালো এবং আত্মভোলা হওয়াটাই যেন পুরুষের পৌরুষের লক্ষণ। তা ছাড়া কবিরা শুধু ভোলানাথই নন, তাঁরা নীলকণ্ঠ। জীবনসিন্ধু মন্থন করে যে হলাহল ওঠে তাই নিজের কণ্ঠে ধারণ করে বিশ্বজনকে অমৃত বিতরণের ভার কবিদের উপর বিধাতা ন্যস্ত করেছেন।

মৃণালিনী দেবী তাঁর নীলকণ্ঠ কবিস্বামীকে যে বুঝতেন না তা নয় কিন্তু পতিগতপ্রাণা নারীর অভিমান তাঁর মধ্যে অবশ্যই ছিল, এবং এ কথাও সত্য যে, অভিমান অনুরাগেরই দোসর। আর অভিমানেরই প্রাকৃত রূপ হল ভুল-বোঝাবুঝি। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এই ভুল-বোঝাবুঝির আভাস পাওয়া যাবে ১৯০০ সনের ডিসেম্বরে লেখা কবির একখানি চিঠি থেকে। কবিজায়া তখন শিলাইদহে, কলিকাতা থেকে কবি লিখছেন, 'তোমার সন্ধ্যাবেলাকার

মনের ভাবে আমার কি কোন অধিকার নেই? আমি কি কেবল দিনের বেলাকার? সূর্য অস্ত গেলেই তোমার মনের থেকে আমার দৃষ্টিও অস্ত যাবে? তোমার যা মনে এসেছিল আমাকে কেন লিখে পাঠালে না? তোমার শেষের দু-চার দিনের চিঠিতে আমার যেন কেমন একটা খটকা রয়ে গেছে। সেটা কি ঠিক analyze করতে পারি নে কিন্তু একটা কিসের আচ্ছাদন আছে।'

কিন্তু এ ধরনের অভিমান বা ভুল-বোঝাবুঝির চেয়ে এই অদ্ভুত ও অসামান্য মানুষটি সম্পর্কে কবিজায়ার মনে বিস্ময় ও মমতাবোধই বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ক্রিয়াশীল হত। দু-একটি ছোটখাটো ঘটনার উল্লেখ করলেই তাঁর মনোভাবটি স্পষ্ট হবে। রবীন্দ্রনাথের গান-রচনার একটি বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, সৃষ্টির অজস্রতার লগ্নে তিনি একই দিনে তিন-চারিখানি গান রচনা করতেন। কথা ও সুরসৃষ্টি চলত একই সঙ্গে। সে সুর কেউ শিখে না নিলে তিনি একটু পরেই তা ভুলে যেতেন। তাই আশেপাশে সুরের ভাণ্ডারী যাঁরা থাকতেন তাঁদের বলতেন, 'শিগ্‌গীর এসে শিখে নাও, এক্ষুণি ভুলে যাব কিন্তু।' রবীন্দ্রনাথের এই অদ্ভুত স্বভাবটি কবিপ্রিয়াকে বিস্মিত করত। একসময় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের ভগিনী অমলা দেবী এই গানের সূত্রেই কবির পরিবারভুক্ত হয়ে ছিলেন। তাঁর কণ্ঠটি ছিল অসামান্য; কবির সে সময়কার বহু গান তিনিই প্রথম কণ্ঠে তুলে রেখেছিলেন। কবিপ্রিয়া হেসে বলতেন 'এমন মানুষ আর কখনো দেখেছ, অমলা, নিজের দেওয়া সুর নিজে ভুলে যায়?' কবিও পরিহাসের ভঙ্গিতে বলতেন, 'অসাধারণ মানুষের সবই অসাধারণ হয়, ছোটবউ, চিনলে না তো!'

বোলপুরের আশ্রম-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পূর্বে শান্তিনিকেতনের অতিথিশালায় কবি মাঝে মাঝে সপরিবারে গিয়ে থাকতেন। দ্বিজেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র, কবির চেয়ে বয়সে এক বছরের ছোট, দ্বিপেন্দ্রনাথও কখনো সখনো সস্ত্রীক তাঁদের সঙ্গে থাকতেন। সংসারের ভার ছিল কবিপত্নীর উপর, গৃহকর্মে তাঁর সাহায্য করতেন বৌমা হেমলতা দেবী, আর দ্বিপেন্দ্রনাথ সংসারের প্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহ করতেন। সংসার চলত সুশৃঙ্খল ভাবে, খাওয়া-দাওয়া হত চমৎকার। কবি তাঁর কাব্যরচনাতেই ডুবে থাকতেন। তারই ফাঁকে সংসার সম্পর্কে হঠাৎ সচেতন হয়ে কবিজায়াকে ডেকে বলতেন, 'লিখতে

লিখতে রোজ শুনি, চাই ঘি, চাই চিনি, চাই সুজি চিঁড়ে ময়দা, মিষ্টি তৈরি হবে; যত চাচ্ছ তত পাচ্ছ, মজা হয়েছে খুব! দ্বিপু তো কখনো না বলবে না; যত চাইবে ততই দেবে, তার মত কর্তা আর তোমার মত গিন্নী হলে হয়েছে আর কি, দুদিনেই ফতুর।' কবিপত্নী পাকা গিন্নীর গাম্ভীর্য কণ্ঠে ফুটিয়ে বলতেন, 'দ্বিপু সংসার বোঝে, তার সঙ্গে কাজ করেও সুখ, তোমার এতে নজর দেওয়া কেন?'[২১]

এক স্থানে একসঙ্গে দীর্ঘদিন বাস করা ছিল কবির স্বভাববিরুদ্ধ। কিন্তু যেখানেই বাসবদল হোক না কেন, সংসার তো পাততে হবে! অথচ গৃহস্থালীর নিত্যপ্রয়োজনীয় কড়া-খুন্তি হাতা-বেড়ি ঘটি-বাটির বোঝা বয়ে বেড়ানোতে কবির বড় বিরক্তি ছিল চিরকাল। কিন্তু এ সব উপকরণ ছাড়া গৃহস্থের সংসার একেবারেই চলে না, এ কথা গৃহিণীমাত্রেই মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেন। তাই মৃণালিনী দেবী আক্ষেপের সুরে বলতেন, 'দেখ তো বাপু, এমন লোক নিয়ে কি ঘর করা যায়! ফেলে তো যাব সব, এদিকে গিয়েই কিন্তু অতিথি-সমাগমের ধূম পড়ে যাবে।' বন্ধুবান্ধবদের আমন্ত্রণ করে ভূরিভোজের সঙ্গে আপ্যায়ন করা ছিল কবির গৃহবিলাসের একটি বড় দিক। মাঝে মাঝে তাতে বিভ্রাটও ঘটত। একদিন কবি তাঁর প্রিয়সুহৃৎ কবি প্রিয়নাথ সেনকে মধ্যাহ্ন-ভোজনের নিমন্ত্রণ করে এসেছেন। অথচ বাড়িতে এসে পত্নীকে সে কথা বলতে গেছেন ভুলে। এমন কি নিজে যখন খাওয়া-দাওয়া করেছেন তখনো তাঁর সে কথা মনে হয় নি। যথাকালে পরিবারের সবার খাওয়া-দাওয়ার পর্ব শেষ হয়েছে, এমন সময় প্রিয়নাথ এসে উপস্থিত। বিড়ম্বনার একশেষ! কিন্তু অন্নপূর্ণার সংসারে কোনদিনই কোন কিছুর ত্রুটি হবার যো ছিল না! তাঁর গৃহিণীপনার নৈপুণ্যে অল্পক্ষণের মধ্যেই ভোজনপাত্র সুস্বাদু খাবার ও সরস মিষ্টান্নে পূর্ণ হয়ে উঠল।

আহার্য নিয়ে কবির উদ্ভট পরীক্ষা-নিরীক্ষারও অন্ত ছিল না। কখনো কখনো তিনি নিজে এত অল্প আহার করতেন যে তা কবিজায়ার উদ্বেগের কারণ হয়ে উঠত। অথচ তিনি ভাল করেই জানতেন যত উদ্বেগ আর দুশ্চিন্তাই হোক না, কবি তাঁর নিজের খেয়ালের বশেই চলবেন, বরং বারণ করলে তাঁর জেদ আরো বেড়ে যাবে। একটি ঘটনার কথা পাওয়া যাবে রথীন্দ্রনাথের স্মৃতিকথায়। 'ভারতী' পত্রিকার সম্পাদিকা সরলা দেবী কবিকে

না জানিয়েই একবার কাগজে ঘোষণা করে দেন যে, পরের মাস থেকে রবীন্দ্রনাথের একটি হাসির নাটক 'ভারতী'তে প্রকাশিত হবে। কবি তখন শিলাইদহে। প্রথমে তো এর জন্যে ভাগিনেয়ীর উপর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। কিন্তু পরদিনই কবিজায়াকে বললেন, তাঁকে যেন খাওয়া-দাওয়ার জন্যে বিরক্ত করা না হয়, কেন না তিনি লেখায় ব্যস্ত থাকবেন। কেবল মধ্যে মধ্যে এক গেলাস সরবৎ পাঠালেই চলবে। এই বলে কবি তাঁর রুদ্ধদ্বার গৃহে তিন দিন প্রায় অনশনের মধ্যেই কাটালেন। তৃতীয় দিনের শেষে 'চিরকুমার সভা' লেখা শেষ করে ডাকঘরের ভরসায় না থেকে নাটক নিয়ে ছুটলেন কলিকাতায়। নতুন লেখা শেষ করে সঙ্গে সঙ্গে অন্তরঙ্গ পরিজনদের পড়ে না শোনালে কিছুতেই কবির তৃপ্তি হত না। কিন্তু তিন দিন প্রায় কিছু না খেয়েই এই অমানুষিক পরিশ্রম করার ফলে কবি এত দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন যে, জোড়াসাঁকোর সিঁড়ি দিয়ে উঠতে গিয়ে তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান। কবিজায়া এই সুযোগ ছাড়লেন না, কবিকে নিয়মিত পুষ্টিকর খাদ্যগ্রহণে বাধ্য করলেন।[২২]

কবির খামখেয়ালী স্বভাবের বোধ করি চূড়ান্ত নিদর্শন পাওয়া যাবে তাঁর দ্বিতীয় কন্যার বিবাহে। বড় মেয়ে বেলার বিয়ের অল্পদিন পরেই একদিন কবি এসে বললেন, 'ছোটবৌ, রানীর বিয়ে ঠিক করে এলুম, মাঝে মাত্র তিনটি দিন আছে, তার পরদিনই বিয়ে।' এ সম্পর্কে কবি তাঁর বন্ধু জগদীশচন্দ্রকেও সমসাময়িক এক পত্রে লিখেছেন, 'হঠাৎ আমার মধ্যম কন্যা রেণুকার বিবাহ হইয়া গেছে। একটি ডাক্তার বলিল, বিবাহ করিব—আমি বলিলাম কর। যেদিন কথা তার তিন দিন পরেই বিবাহ সমাধা হইয়া গেল।' রানীর বয়স তখন সবে এগারো। এই তাড়াহুড়োয় যে-কোন মানুষই অবাক হবে। কবিপ্রিয়া বললেন, 'তুমি বল কি গো? এরি মধ্যে মেয়ের বিয়ে দেবে? তা ছাড়া মাত্র তিন দিনের মধ্যে সব যোগাড়ই বা হবে কি করে?' কবি খানিকটা অপ্রস্তুত হয়ে সুর নামিয়ে অসহায়ের ভঙ্গিতেই বললেন, 'হবে হবে, সব হবে, শুধু তুমি একটু প্রসন্ন মনে কাজে লেগে যাও তো ছোটবৌ, সব ঠিক হয়ে যাবে।' বলাই বাহুল্য, এর পর আর কোন অনুযোগ করার উপায় থাকে না।

৮

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কবিস্বভাবের এই অদ্ভুত দিকগুলি তাঁর মিতাচার ও সুচারু জীবনচর্যার ফলে কোনোদিনই মাত্রাতিরেকী হয়ে উঠতে পারে নি। সাধনাধন্য তাঁর জীবনে প্রেয়োবোধের সঙ্গে চিরদিনই শ্রেয়োবোধের সুন্দর সম্মিলন ঘটেছে। কালিদাসের শকুন্তলা নাটকের বিচারপ্রসঙ্গে দাম্পত্যপ্রেমের যে পূর্বমিলন ও উত্তরমিলনের কথা রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন তাঁর জীবনেও সেই পূর্বমিলন ও উত্তরমিলনের আদর্শ বাস্তবে রূপায়িত হয়ে উঠেছিল। গাজিপুর-প্রবাসকালেই কবিমানসে শ্রেয়োবোধে প্রবুদ্ধ জীবনসাধনার স্বপ্ন কাব্যে রূপ গ্রহণ করতে দেখা যায়। তখন থেকেই দেশের জন্যে আত্মোৎসর্জনের আদর্শ তাঁর চিন্তাকে আবিষ্ট করে রেখেছে। "গুরুগোবিন্দ" কবিতাটি (২৬ জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৫) তারই ইঙ্গিত। শিখজাতির জীবনে যখন সংকট-লগ্ন চলছে তখন গুরুগোবিন্দ নির্জন অরণ্যবাসে নিজেকে প্রস্তুত করে তুলছিলেন। অনুচরবৃন্দ যখন তাঁকে নেতৃত্বের দায়িত্ব গ্রহণের আহ্বান জানাল তখনো তিনি বলছেন—

চারিদিক হতে অমর জীবন
বিন্দু বিন্দু করি আহরণ
আপনার মাঝে আপনারে আমি
পূর্ণ দেখিব কবে॥

কবে প্রাণ খুলে বলিতে পারিব—
'পেয়েছি আমার শেষ।
তোমরা সকলে এস মোর পিছে,
গুরু তোমাদের সবারে ডাকিছে,
আমার জীবনে লভিয়া জীবন
জাগো রে সকল দেশ।'

এই কবিতা লেখার পাঁচ বৎসর পরে ১৩০০ সালে লেখা 'ইংরাজ ও ভারতবাসী' প্রবন্ধেও কবি বলেছেন, গুরুগোবিন্দের মত 'আমাদের যিনি গুরু হইবেন তাঁহাকেও খ্যাতিহীন নিভৃত আশ্রমে অজ্ঞাতবাস যাপন করিতে হইবে।' দেশের ডাকে কবি নিজেকেও এই আদর্শেই গড়ে তোলার সাধনা করছিলেন।

১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দের জুন মাসে শিলাইদহ থেকে স্ত্রীকে লিখছেন, 'স্ত্রী-পুরুষের অল্প বয়সের প্রণয়মোহে একটা উচ্ছ্বসিত মত্ততা আছে, কিন্তু এ বোধ হয় তুমি তোমার নিজের জীবনের থেকেও অনুভব করতে পারচ—বেশি বয়সেই বিচিত্র বৃহৎ সংসারের তরঙ্গদোলার মধ্যেই স্ত্রীপুরুষের যথার্থ স্থায়ী গভীর সংযত নিঃশব্দ প্রীতির লীলা আরম্ভ হয়।' এই চিঠিতেই তিনি তাঁর দাম্পত্য জীবনাদর্শকেই ভাষা দিয়ে বলছেন, 'আজকাল আমার মনের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা এই, আমাদের জীবন সহজ ও সরল হোক্, আমাদের চতুর্দিক প্রশান্ত ও প্রসন্ন হোক্, আমাদের সংসারযাত্রা আড়ম্বরশূন্য ও কল্যাণপূর্ণ হোক্, আমাদের অভাব অল্প উদ্দেশ্য উচ্চ চেষ্টা নিঃস্বার্থ এবং দেশের কার্য আপনাদের কাজের চেয়ে প্রধান হোক্—,এবং যদি বা ছেলেমেয়েরাও আমাদের এই আদর্শ থেকে ভ্রষ্ট হয়ে ক্রমশ দূরে চলে যায় আমরা দুজনে শেষ পর্যন্ত পরস্পরের মনুষ্যত্বের সহায় এবং সংসারক্লান্ত হৃদয়ের একান্ত নির্ভরস্থল হয়ে জীবনকে সুন্দরভাবে অবসান করতে পারি।'

'আমাদের সংসারযাত্রা আড়ম্বরশূন্য ও কল্যাণপূর্ণ হোক,···দেশের কার্য আপনাদের কাজের চেয়ে প্রধান হোক্'—এই আদর্শে প্রবুদ্ধ স্বামী-স্ত্রীর মিলনকেই আমি উত্তরমিলন বলেছি। রবীন্দ্রনাথ শুধু অলস ভাববিলাসী কবিমাত্রই ছিলেন না, আদর্শকে বাস্তবীভূত করে তোলার সাধনায় তাঁর উদ্যম ছিল ক্লান্তিহীন। তিনি বুঝেছিলেন কলিকাতার নাগরিক জীবনের উন্মত্ততায় তাঁর সাধনাকে রূপ দেওয়া সম্ভব হবে না। নিভৃত আশ্রমে অজ্ঞাতবাসের পক্ষে পল্লীর নির্জনতাই তাঁর কাছে চিরদিন শ্রেয় বলে মনে হয়েছে। স্ত্রীকে লিখছেন, 'কলকাতার ভিড়ে আমার জীবনটা নিষ্ফল হয়ে থাকে, * * * কোনকালেই আমি কলকাতায় নিজের সমস্ত শক্তিকে গোর দিয়ে থাকতে পারব না।' সংসার-রচনার ক্ষেত্রেও দেখা গেছে কবি সর্বদা শহর থেকে দূরেই বাসস্থান নির্বাচন করেছেন। কবির অন্তরঙ্গ সুহৃৎ জগদীশচন্দ্র বসু কবিকে এক পত্রে লিখছেন, 'বন্ধুজায়ার অমায়িক ব্যবহারে অতিশয় সুখী হইয়াছি, এবং আপনাদের স্নিগ্ধ পারিবারিক জীবন, সহরের কোলাহল হইতে দূরে থাকিয়া পুত্রকন্যা পরিবেষ্টিত হইয়া, নীরবে অথচ কর্মঠভাবে যেরূপ কাটাইতেছেন, তাহা আমার বড় ভাল লাগিয়াছে।''[২৩] বস্তুত, গাজিপুর শিলাইদহ ও শান্তিনিকেতন কবিজীবনে আকস্মিকভাবে

আসে নি। পর্যায়ক্রমে এই তিনটি স্থান কবিমানসের বিবর্তনের তিনটি প্রতীক বলেই গৃহীত হতে পারে।

গাজিপুর থেকে ফিরে আসার পর রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্ত্রী ও সন্তানদের মেজদা ও মেজবৌঠানের কাছেই বেশির ভাগ সময় রাখা পছন্দ করতেন। কবি-জীবনের এই পর্বেও সত্যেন্দ্রনাথ ও জ্ঞানদানন্দিনীর প্রভাব ফলপ্রসূ হয়েছে। সত্যেন্দ্রনাথ তখন সোলাপুরে চাকরি করছেন। মৃণালিনী দেবী তাঁর শিশুদের নিয়ে প্রায়ই সেখানে থাকতেন। ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে [বাংলা ১৩০৪ সাল] সত্যেন্দ্রনাথ সিভিল সার্বিস থেকে অবসর গ্রহণ করেন। এদিকে ১৩০৩ সালে ঠাকুরবাড়ির জমিদারি পার্টিশন নিয়ে নানা সাংসারিক অশান্তি শুরু হয়। মহর্ষিদেব মৃত্যুর পূর্বে ভ্রাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্রদের যথোচিত প্রাপ্য ন্যায্য ভাবে বণ্টন করে দেবার জন্যে উদগ্রীব হওয়ায় এজমালি জমিদারির ভাগ-বাঁটোয়ারা এই সময় সম্পন্ন হয়। সে সময় কবি ঘরে বাইরে নানা দায়িত্ব ও কর্তব্য নিয়ে ব্যস্ত ও বিব্রত। কবিজায়া সংসারের নানা উপদ্রবে অশান্তি ও দুশ্চিন্তার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। কবি তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে লিখলেন, 'আমি কলকাতার স্বার্থদেবতার পাষাণমন্দির থেকে তোমাদের দূরে নিভৃত পল্লীগ্রামের মধ্যে নিয়ে আসতে এত উৎসুক হয়েছি।' ১৩০৫ সাল থেকে কবি তাঁর স্ত্রী ও পুত্রকন্যাদের নিয়ে শিলাইদহের কুঠিবাড়িতে বসবাস শুরু করলেন। এর পূর্বেও কবিজায়া একাধিকবার এখানে এসেছেন, কিন্তু এখন থেকে বৎসর তিনেকের জন্যে শিলাইদহেই গড়ে উঠল তাঁদের স্থায়ী সংসার। সন্তানের শিক্ষার কথাও কবিকে বিশেষ ভাবে ভাবতে হয়েছে। তিনি বুঝেছিলেন, কলকাতায় 'রথীদের উপযুক্ত শিক্ষা কিছুতেই হয় না—সকলেই কি রকম উড়ুউড়ু করতে থাকে।' তাই শিলাইদহে গৃহবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করে কবি সন্তানদের জন্যে গৃহশিক্ষকের ব্যবস্থা করলেন।

শিলাইদহ কিন্তু কবিজায়ার ভাল লাগে নি। সে কথা জেনে কবি বোলপুরে আশ্রম প্রতিষ্ঠার মাস কয় আগেও তাঁকে লিখছেন, 'ছেলেমেয়েদের শিক্ষার কথা চিন্তা করে তোমাদের এই নির্বাসন দণ্ড গ্রহণ করতেই হবে। এর পরে যখন সামর্থ্য হবে তখন এর চেয়ে ভাল জায়গা বেছে নিতে হয়ত পারব।' শিলাইদহ-পর্ব অজস্র সৃষ্টির দিক দিয়ে কবিজীবনে অবিস্মরণীয়। কিন্তু ব্যক্তিজীবনে তার সঙ্গে সুখ এবং দুঃখ দুয়েরই স্মৃতি জড়িত। কবির

দৃষ্টিতে তুলনায় দুঃখের চেয়ে সুখটাই বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। কিন্তু কবিজায়ার পক্ষে শিলাইদহ ছিল সত্যসত্যই 'নির্বাসন'। কবিও সেকথা অনুভব করে একখানি চিঠিতে লিখছেন, 'কাল বসে বসে মনে পড়ছিল এই ছাদের উপর তোমার অনেক মর্মান্তিক দুঃখের সন্ধ্যা ও রাত্রি কেটেছে—আমারও অনেক বেদনার স্মৃতি এই ছাদের সঙ্গে জড়িত হয়ে আছে।'

এই 'মর্মান্তিক দুঃখে'র 'নির্বাসন দণ্ড' থেকে কবি তাঁর স্ত্রীকে উদ্ধার করবার ব্যবস্থা করলেন ১৩০৮ বঙ্গাব্দের ৭ই পৌষ। শিলাইদহ ছেড়ে আসার পরে কবি স্ত্রীকে এক চিঠিতে লিখছেন, 'শিলাইদহ এখন তেমন ভাল অবস্থায় নেই। শিশিরে সমস্ত ভিজে রয়েছে; বেলা আটটা পর্যন্ত কুয়াশা, সন্ধ্যার পরে হিম—কুয়ো এবং পুকুর দুয়েরই জল যাচ্ছে-তাই—চারদিকেই ম্যালেরিয়ার ধুম—আমরা ঠিক [সময়েই] শিলাইদহ ত্যাগ করেছি—নইলে ছেলেদের নিয়ে ব্যামো হয়ে বিপদে পড়তুম। বোলপুর এর চেয়ে ঢের বেশি নির্মল ও স্বাস্থ্যকর। কিন্তু গোলাপ যে কত ফুটেছে তার সংখ্যা নেই। খুব বড় বড় ভাল ভাল গোলাপ। বাবলা ফুলের গন্ধে চারিদিক আমোদিত। পুরাতন বন্ধু শিলাইদহ এই চিঠির সঙ্গে তোমাকে তার কয়েকটা বাবলা পাঠাচ্ছে।'

বোলপুরে আশ্রম-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে [১৩০৮ ৭ই পৌষ] কবিজীবনে মহত্তম কর্মযজ্ঞের শুরু হল। আমরা অন্যত্র একে 'বিশ্বজিৎ যজ্ঞে'র সঙ্গে তুলনা করেছি। বিশ্বজিৎ যজ্ঞের দক্ষিণা যজমানের সর্বস্ব। রবীন্দ্রনাথকেও শান্তিনিকেতনে আয়োজিত বিশ্বজিৎ যজ্ঞের দক্ষিণাস্বরূপ তাঁর সর্বস্বই দান করতে হল। বিশ্বজীবনে উত্তরণের এই যজ্ঞহোমানলে কবির প্রথম আহুতি হল তাঁর সংসার-জীবন। আশ্রম-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ঠিক এগারো মাস পরে ১৩০৯ সালের ৭ই অগ্রহায়ণ মৃণালিনী দেবীর মৃত্যু হল।

স্বামীর এই মহত্তম জীবনযজ্ঞে সুদক্ষিণা ধর্মপত্নীর ব্রত গ্রহণ করলেন মৃণালিনী দেবী আশ্রম-বিদ্যালয়ের আশ্রম-জননীরূপে। প্রথমেই তিনি যথাসর্বস্ব তুলে দিলেন স্বামীর হাতে—তাঁর সমস্ত স্বর্ণালংকার। কবির বহু সাধের সমুদ্র-নিবাস 'পুরীর বাঙলা'র বিক্রয়লব্ধ অর্থের সঙ্গে গৃহলক্ষ্মীর অলংকার-বিক্রয়-করা অর্থও যুক্ত হয়ে সৃষ্টি হল ব্রহ্মচর্যাশ্রমের প্রারম্ভিক

তহবিল। আশ্রমের বিদ্যার্থি-সঙ্ঘের পুরোভাগে পাঠাতে হল জ্যেষ্ঠপুত্রকে। রথীন্দ্রনাথ সাজলেন নগ্নপদ গৈরিকধারী বালব্রহ্মচারী। আশ্রমপিতা নির্দেশ দিলেন পুত্রকেও গিয়ে থাকতে হবে আশ্রমের অন্যান্য বিদ্যার্থীর সঙ্গে। কৃচ্ছ্রসাধনায় একজোড়া কম্বল মাত্রই সম্বল করে পুত্র মাতৃক্রোড় ছেড়ে উঠলেন গিয়ে আশ্রমকুটীরে। মৃণালিনী দেবীর মাতৃহৃদয় সেদিন নিশ্চয়ই ডুকরে কেঁদে উঠেছিল। কিন্তু আশ্রমজননী-রূপে অপত্য-নির্বিশেষে সব ছেলের মা হবার মহৎ সাধনায় চোখের জলের মধ্য দিয়েই তাঁর দীক্ষা পূর্ণ হল। তিনি যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন তাঁর মাতৃস্নেহ দিয়ে তিনি বোলপুরের রুক্ষ পরিবেশকে সুধাশ্যামল করে রেখেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর কবি এদিক দিয়েও তাঁর অভাব মর্মে মর্মে উপলব্ধি করে বলতেন 'আমি ছেলেদের সব দিতে পারি, মাতৃস্নেহ তো দিতে পারি না। রথীর মা সে-বিষয়ে আমাকে অসহায় করে রেখে গেছেন।'

আশ্রমপ্রতিষ্ঠার প্রথম বর্ষাতেই মৃণালিনী দেবী অসুস্থ হয়ে পড়েন। কবি প্রথম প্রথম নিজেই হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করতে লাগলেন। কিন্তু যখন তাঁর অবস্থা ক্রমশই মন্দের দিকে যেতে লাগল তখন তাঁকে কলিকাতায় স্থানান্তরিত করা হল। সেখানে কবিপ্রিয়া প্রায় দু মাস শেষশয্যায় ছিলেন। কবি তাঁর দাম্পত্যজীবনকে শরৎ ঋতুর সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। তাঁর সংসার-জীবনের শেষ শরৎ কাটল শারদলক্ষ্মীর অন্তিম সেবায়। এ সম্পর্কে হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পবিত্রসুন্দর বর্ণনাটি অনবদ্য। তিনি লিখছেন, 'রোগশয্যার পার্শ্বে বসিয়া কবি এই দীর্ঘকাল পীড়িত পত্নীর যেরূপে সেবা-শুশ্রূষা করিয়াছিলেন, তাহা কদাচিৎ কোন সৌভাগ্যবতী আয়ুষ্মতীর ভাগ্যে সম্ভব হয়। অর্থ-বিনিময় সেবাকারিণীর অসদ্‌ভাব তখন না হইলেও তাদৃশ অবস্থায় পাছে কোন ত্রুটিতে রোগিণীর রোগযন্ত্রণা বৃদ্ধি পায় এই সন্দেহেই জীবনান্ত পর্যন্ত কবি পত্নীর সেবাশুশ্রূষা স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছিলেন। বৈদ্যুতিক পাখা তখন ছিল না, হাতপাখার বাতাসে দিনের পর দিন কবি রোগিণীর রোগজ্বালা প্রশমিত করিয়াছিলেন। পতি পত্নীর প্রণয়বন্ধনের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত জীবনান্ত পর্যন্ত কবির এই অক্লান্ত সেবা।'[২৪]

পরমশান্ত মহাযোগীর মতই কবি তাঁর জীবনসঙ্গিনীর শেষকৃত্য করলেন। রথীন্দ্রনাথ লিখছেন, শেষবার যখন মায়ের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয় তখন তিনি

[মা] কথা বলতে পারছিলেন না, শুধু তাঁর দু চোখ বেয়ে চোখের জলের ধারা নেমেছিল।

৯

রবীন্দ্র-জীবনে মৃণালিনী দেবীর যথাযোগ্য মূল্যনিরূপণ সহজসাধ্য নয়। ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে কবির উচ্ছ্বাসহীনতার ফলে এ বিষয়ে ভুলভ্রান্তি হওয়াও অসম্ভব নয়। কিন্তু কবিমানসের একটি সংকটলগ্নে তাঁর জীবনে এসেছিলেন এই কল্যাণী নারীলক্ষ্মী। বিবাহের মাস চার পরেই কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুতে কবিজীবনের ভারসাম্য কিভাবে বিচলিত হয়ে পড়েছিল সেকথা 'জীবনস্মৃতি'র পাঠক কবিকণ্ঠেই শুনেছেন। মৃত্যুর অন্ধকার-রাজ্যে ঐকান্তিক আবেগবিহ্বলতায় সেদিন কবির পক্ষে উৎকেন্দ্রিক হওয়া অস্বাভাবিক ছিল না। সেই মহাসংকটে মৃণালিনী দেবী জায়ারূপে তাঁর নারীচিত্তের লাবণ্য ও সঙ্গসুধা দিয়ে কবিজীবনের ভারসাম্যকে অবিচলিত ও অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। তাঁর সর্বংসহা ক্ষমা ও তিতিক্ষা, তাঁর একনিষ্ঠ প্রেম ও সেবা দিয়ে তিনি কবির চিত্তকে জয় করেছিলেন। কবিমানসের রাজধানীতে রানীর আসন পেয়েছিলেন তিনি। 'চারিত্রপূজা' গ্রন্থে কবি লিখেছেন, 'মহাপুরুষের ইতিহাস বাহিরের নানা কার্যে এবং জীবন-বৃত্তান্তে স্থায়ী হয়, আর, মহৎ-নারীর ইতিহাস...তাঁহার স্বামীর কার্যে রচিত হইয়া থাকে, এবং সে-লেখায় তাঁহার নামোল্লেখ থাকে না।' কবির এই উক্তির আলোকেই তাঁর জীবনে মৃণালিনী দেবীর স্থান নির্ণয় করা সমীচীন। কবিজায়া শুধু মিলনের সুধা দিয়েই তাঁর জীবনের পাত্র পূর্ণ করে যান নি; তিনিই হাত ধরে তাঁকে সংসার-জীবনের সংকীর্ণ সীমানা থেকে বিশ্বজীবনের উন্মুক্ত মহাকাশের অসীমতায় পৌঁছে দিয়ে গেছেন।

পত্নীর মৃত্যুর পরে কবি তাঁর অনুচ্ছ্বসিত ভাষায় এখানে-সেখানে যে দু-একটি কথা বলেছেন তাতে জীবনসঙ্গিনী সম্পর্কে তাঁর প্রেমপূর্ণ অন্তরের স্নিগ্ধ লাবণ্যই বিচ্ছুরিত হয়েছে। 'শিশু' কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলি শেষ করে কবি বলেছেন, 'এখন আমার শিশুটির কাছ থেকে বিদায়। শিশুকে উপলক্ষ্য করে ছলনাপূর্বক শিশুর মার সঙ্গ পেয়েছিলেম।' মোহিতচন্দ্র সেনকে লেখা আর

একখানি চিঠিতে কবি লিখেছেন, [শিশু-কাব্যে বর্ণিত] 'খোকা এবং খোকার মার মধ্যে যে ঘনিষ্ঠমধুর সম্বন্ধ সেইটে আমার গৃহস্মৃতির শেষ মাধুরী—তখন খুকী ছিল না—মাতৃশয্যার সিংহাসনে খোকাই তখন চক্রবর্তী সম্রাট ছিল। সেইজন্যে লিখতে গেলেই খোকা এবং খোকার মার ভাবটুকুই সূর্যাস্তের পরবর্তী মেঘের মত নানা রঙে রাঙিয়ে ওঠে—সেই অস্তমিত মাধুরীর সমস্ত কিরণ ও বর্ণ আকর্ষণ করে আমার অশ্রুবাষ্প এই রকম খেলা খেলবে—তাকে নিবারণ করতে পারি নে।'

গৃহস্মৃতির অস্তমিত মাধুরীর কিরণ ও বর্ণ আকর্ষণ করে কবির অশ্রুবাষ্প মুক্তোর মতো দানা বেঁধে উঠেছে 'স্মরণে'র কবিতায়। কিন্তু মৃণালিনী দেবীর মৃত্যুর অব্যবহিত পরে কবি "মুক্ত পাখির প্রতি" শীর্ষক যে কবিতাটি লিখেছিলেন সেটিই প্রিয়ার দেহপিঞ্জরমুক্ত আত্মার উদ্দেশে তাঁর স্মরণীয় কাব্যতর্পণ। ১৩০৯ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যার 'বঙ্গদর্শনে' কবিতাটি প্রকাশিত হয়। কাব্যাংশে কবিতাটি অনবদ্য। কবিতা যদি কবিচিত্তের দর্পণ হয় তা হলে এই কবিতাটি পত্নীবিয়োগব্যথাতুর কবিচিত্তের মর্মান্তিক বেদনার প্রত্যক্ষ সাক্ষীরূপে চিরন্তন হয়ে থাকবে :

আজিকে গহন কালিমা লেগেছে গগনে, ওগো,
দিক্-দিগন্ত ঢাকি।—
আজিকে আমরা কাঁদিয়া শুধাই সঘনে ওগো,
আমরা খাঁচার পাখি,—
হৃদয়বন্ধু, শুন গো বন্ধু মোর,
আজি কি আসিল প্রলয় রাত্রি ঘোর ?
চিরদিবসের আলোক গেল কি মুছিয়া ?
চিরদিবসের আশ্বাস গেল ঘুচিয়া ?
দেবতার কৃপা আকাশের তলে
কোথা কিছু নাহি বাকি ?—
তোমা পানে চাই, কাঁদিয়া শুধাই
আমরা খাঁচার পাখি।

ফাল্গুন এলে সহসা দখিন পবন হতে
মাঝে মাঝে রহি রহি
আসিত সুবাস সুদূর কুঞ্জভবন হতে
অপূর্ব আশা বহি।
হৃদয়বন্ধু, শুন গো বন্ধু মোর,
মাঝে মাঝে যবে রজনী হইত ভোর,
কী মায়ামন্ত্রে বন্ধনদুখ নাশিয়া
খাঁচার কোণেতে প্রভাত পশিত হাসিয়া
ঘনমসি-আঁকা লোহার শলাকা
সোনার সুধায় মাখি।
নিখিল বিশ্ব পাইতাম প্রাণে
আমরা খাঁচার পাখি।

আজি দেখো ওই পূর্ব-অচলে চাহিয়া, হোথা
কিছুই না যায় দেখা,—
আজি কোনো দিকে তিমির প্রান্ত দাহিয়া, হোথা
পড়েনি সোনার রেখা।
হৃদয়বন্ধু, শুন গো বন্ধু মোর,
আজি শৃঙ্খল বাজে অতি সুকঠোর।
আজি পিঞ্জর ভুলাবারে কিছু নাহি রে
কার সন্ধান করি অন্তরে-বাহিরে।
মরীচিকা লয়ে জুড়াব নয়ন
আপনারে দিব ফাঁকি
সে আলোটুকুও হারায়েছি আজি
আমরা খাঁচার পাখি।

ওগো আমাদের এই ভয়াতুর বেদনা যেন
তোমারে না দেয় ব্যথা।
পিঞ্জরদ্বারে বসিয়া তুমিও কেঁদো না যেন
লয়ে বৃথা আকুলতা।

হৃদয়বন্ধু, শুন গো বন্ধু মোর,
তোমার চরণে নাহি তো লোহডোর।
সকল মেঘের ঊর্ধ্বে যাও গো উড়িয়া,
সেথা ঢালো তান বিমল শূন্য জুড়িয়া,—
"নেবেনি, নেবেনি প্রভাতের রবি"
কহ আমাদের ডাকি,
মুদিয়া নয়ান শুনি সেই গান
আমরা খাঁচার পাখি।[২৩]

১০

জীবনের অপরাহ্ণ-লগ্নে কবিমানসে কবিজায়ার বিরহ কী রূপ পরিগ্রহ করেছিল তা জানবার কৌতূহল রবীন্দ্র-কাব্যরসিকের চিত্তে জাগ্রত হওয়া স্বাভাবিক। এই প্রসঙ্গে 'পূরবী' কাব্যগ্রন্থের "কৃতজ্ঞ" কবিতাটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। কবিতাটি ১৯২৪ সনের ২রা নভেম্বর তারিখে দক্ষিণ-আমেরিকার সমুদ্রপথে আণ্ডেস জাহাজে রচিত। বাইশ বৎসর পূর্বে এই নভেম্বর মাসেরই এক বিষণ্ণ সন্ধ্যায় কবি হারিয়েছিলেন কবিজায়াকে। একটু তলিয়ে দেখলেই দেখতে পাওয়া যাবে, 'স্মরণে'র সদ্যোবিয়োগব্যথাতুর কবিহৃদয়ের শোকোচ্ছ্বাস ওতে কী অপূর্ব-সুন্দর বাণীসংহতি লাভ করেছে। একটি অন্তরঙ্গ অশ্রুসজল আবেদনের স্মৃতি নিয়ে কবিতাটির আরম্ভ :

বলেছিনু "ভুলিব না", যবে তব ছল-ছল আঁখি
নীরবে চাহিল মুখে। ক্ষমা করো যদি ভুলে থাকি।

ভুলে-থাকার জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করে কৈফিয়তের ভঙ্গিতে কবি বলছেন :

সে যে বহুদিন হল। সেদিনের চুম্বনের 'পরে
কত নববসন্তের মাধবীমঞ্জরী থরে থরে
শুকায়ে পড়িয়া গেছে ; মধ্যাহ্নের কপোতকাকলি
তারি 'পরে ক্লান্ত ঘুম চাপা দিয়ে এল গেল চলি
কতদিন ফিরে ফিরে।

'মধ্যাহ্নের কপোতকাকলি'র রূপকল্পটি ঘরোয়া দাম্পত্যজীবনেরই ভাবানুষঙ্গ

বহন করে এনেছে। সেদিনের চুম্বনের উপর 'ক্লান্ত ঘুম চাপা দিয়ে' কতো দিন ফিরে ফিরে এসেছে, চলে গিয়েছে। কিন্তু তবু এ বিস্মরণ ক্ষমার যোগ্য যে নয় সে কথা অনুভব করেই কবি বলছেন :

সেদিনের ফাল্গুনের বাণী যদি আজি এ ফাল্গুনে
ভুলে থাকি, বেদনার দীপ হতে কখন নীরবে
অগ্নিশিখা নিবে গিয়ে থাকে যদি, ক্ষমা করো তবে।

কবিতাটির প্রথমার্ধের এই আন্তরিক ক্ষমা প্রার্থনার পরে দ্বিতীয়ার্ধে আছে কবিজীবনে কবিজায়ার দান সম্পর্কে কবির অকুণ্ঠ স্বীকৃতি। বাইশ বৎসর পূর্বে সদ্যোবিয়োগবেদনার মুহূর্তে যে ভাষায় তা উচ্চারিত হয়েছে, সুদীর্ঘ কালের ব্যবধান সত্ত্বেও, সেই একই ভাষা কবিকণ্ঠে শুনতে পাওয়া যাবে। 'পূরবী'র "কৃতজ্ঞ" এবং 'স্মরণে'র কয়েকটি কবিতা একসঙ্গে স্মরণ করলেই আমাদের বক্তব্য স্পষ্ট হবে।

কৃতজ্ঞ' কবিতায় কবি বলছেন,

একদিন তুমি দেখা দিয়েছিলে বলে
গানের ফসল মোর এ জীবনে উঠেছিল ফলে,
আজো নাই শেষ।

স্মরণে র নবম কবিতায় বলেছিলেন,

হে লক্ষ্মী, তোমার আজি নাই অন্তঃপুর।
সরস্বতী-রূপ আজি ধরেছ মধুর,
দাঁড়ায়েছ সংগীতের শতদল-দলে।
মানস-সরসী আজি তব পদতলে
নিখিলের প্রতিবিম্বে রচিছে তোমায়।

'কৃতজ্ঞ' কবিতায় :

রবির আলোক হতে একদিন
ধ্বনিয়া তুলেছে তার মর্মবাণী, বাজায়েছে বীন
তোমার আঁখির আলো।

'স্মরণে'র অষ্টম কবিতায় :

তোমারি নয়নে আজ হেরিতেছি সব,
তোমারি বেদনা বিশ্বে করি অনুভব।

পুনশ্চ, 'স্মরণে'র সপ্তদশ কবিতায় :

আমার নয়নে তুমি পেতেছ আলোক—

'কৃতজ্ঞ' কবিতায় :

তোমার পরশ নাহি আর,
কিন্তু কী পরশমণি রেখে গেছ অন্তরে আমার,—
বিশ্বের অমৃতছবি আজিও তো দেখা দেয় মোরে
ক্ষণে ক্ষণে,—অকারণ আনন্দের সুধাপাত্র ভরে
আমারে করায় পান।

'স্মরণে'র দ্বাদশ কবিতায় :

আপনার মাঝে আমি করি অনুভব
পূর্ণতর আজি আমি। তোমার গৌরব
মুহূর্তে মিশায়ে তুমি দিয়েছ আমাতে।
ছোঁয়ায়ে দিয়েছ তুমি আপনার হাতে
মৃত্যুর পরশমণি আমার জীবনে।

উদ্ধৃত উদাহরণগুলি থেকে এই সত্যই স্বচ্ছ হয়ে উঠেছে যে, 'স্মরণে'র বিবিধ কবিতার ভাবানুষঙ্গগুলি 'পূরবী'র ওই একটি কবিতার মধ্যেই সংহতিবদ্ধ হয়েছে। কবিতাটি যে কবিজায়াকেই স্মরণ করে লেখা তার নিঃসংশয় প্রমাণ রয়েছে শেষ চারটি চরণে। কবি লিখছেন :

আজ তুমি আর নাই, দূর হতে গেছ তুমি দূরে,
বিধুর হয়েছে সন্ধ্যা মুছে-যাওয়া তোমার সিন্দূরে,
সঙ্গীহীন এ জীবন শূন্যঘরে হয়েছে শ্রীহীন,
সব মানি,—সব চেয়ে মানি তুমি ছিলে একদিন।

"বিধুর হয়েছে সন্ধ্যা মুছে-যাওয়া তোমার সিন্দূরে" এবং "সঙ্গীহীন এ জীবন শূন্য ঘরে হয়েছে শ্রীহীন" এই দুটি বাক্য প্রেরণার উৎস সম্পর্কে অভ্রান্ত প্রমাণ। স্বীয় সীমন্তিনী ছাড়া অন্য কোন নারীর বিরহের প্রতীক হিসাবে মুছে-যাওয়া সিন্দূরে সন্ধ্যার বিধুরতার কল্পনা ভারতীয় হিন্দু-কবির চেতনায় আসতেই পারে না। 'স্মরণে'র ষষ্ঠ কবিতায় কবি বলেছিলেন :

আজি বিশ্বদেবতার চরণ-আশ্রয়ে
গৃহলক্ষ্মী দেখা দাও বিশ্বলক্ষ্মী হয়ে।

নিখিল নক্ষত্র হতে কিরণের রেখা
সীমন্তে আঁকিয়া দিক্ সিন্দুরের লেখা।

সঙ্গীহীন জীবনে শূন্য ঘরের শ্রীহীনতা গৃহিণীহীন গৃহেরই [গৃহিণী গৃহমুচ্যতে] শব্দালেখ্য। 'স্মরণে'র চতুর্থ কবিতায় কবি বলেছিলেন:

তোমার সংসার-মাঝে, হায়, তোমা-হীন
এখনো আসিবে কত সুদিন-দুর্দিন,—
তখন এ শূন্যঘরে চিরাভ্যাস-টানে
তোমারে খুঁজিতে এসে চাব কার পানে ?

এই কবিতায় 'তোমা-হীন' 'শূন্যঘর'ই 'কৃতজ্ঞে'র 'সঙ্গীহীন' 'শূন্যঘর' হয়েছে। 'স্মরণে'র সঙ্গে "কৃতজ্ঞ" কবিতার এই সব ভাবসাদৃশ্য দেখে এ কথাই মনে হয় যে, পত্নীবিয়োগে কবির ভাবনা-বেদনা যে ভাবে 'সূর্যাস্তের পরবর্তী মেঘের মত নানা রঙে রাঙিয়ে' উঠেছিল, তেমনি 'সেই অস্তমিত মাধুরীর সমস্ত কিরণ ও বর্ণ আকর্ষণ করে' কবির 'অশ্রুবাষ্প' ঘনীভূত হয়ে "কৃতজ্ঞ" কবিতায় মুক্তারাশির আকারে ঝরে পড়েছে।

॥ উল্লেখ-পঞ্জী ॥

১ 'গোলাম-চোর', ভারতী, আষাঢ় ১২৮৮, পৃ° ১১২-১১৫।
২ মংপুতে রবীন্দ্রনাথ, পৃ° ২১।
৩ ঘরোয়া, পৃ° ৬৩।
৪ মংপুতে রবীন্দ্রনাথ, পৃ° ২১।
৫ রবীন্দ্রকথা, পৃ° ২৫৪।
৬ 'রবীন্দ্রস্মৃতি', শ্রীইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী, পৃ° ৫৮।
৭ ঘরোয়া, পৃ° ৬৩।
৮ 'কবির কথা' গ্রন্থে 'মৃণালিনী দেবী' অধ্যায়, পৃ° ১০-১১।
৯ বিশ্বভারতী, তৃতীয় বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, পৃ° ২৪৫।
১০ দ্রষ্টব্য, কবির কথা, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ° ১৬।
১১ জোড়াসাঁকোর ধারে, পৃ° ৭৭।
১২ মানসী, রবীন্দ্র-রচনাবলী-২, পৃ° ১৯২-১৯৭।

১৩ রবীন্দ্র-রচনাবলী-১, পৃ° ৬০৪।

১৪ তদেব, পৃ° ৬০৬।

১৫ চিঠিপত্র-১, পৃ° ৪-৫।

১৬ তদেব, পৃ° ১৯।

১৭ রবীন্দ্র-রচনাবলী-১, পৃ° ৬১৮।

১৮ চিঠিপত্র-১, পৃ° ৯১।

১৯ ছিন্নপত্র, পৃ° ২১২।

২০ দ্রষ্টব্য, সেকালের রবীন্দ্রতীর্থ, শ্রীশচীন্দ্রনাথ অধিকারী, পৃ° ২৭-২৮।

২১ দ্রষ্টব্য, কবির কথা, শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ° ১৫-১৬।

২২ দ্রষ্টব্য, On the Edges of Time, পৃ° ৩২।

২৩ জগদীশচন্দ্র বসুর পত্রাবলী, প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৩, পৃ° ২৬১।

২৪ কবির কথা, পৃ° ২২-২৩।

২৫ মোহিতচন্দ্র সেন সম্পাদিত কাব্যগ্রন্থাবলীতে এই কবিতাটি 'রূপক' পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় এর প্রেরণার উৎস সম্পর্কে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। মোহিতলাল তাঁর কাব্যমঞ্জুষায় এর উৎসমূলে পরাধীনতার বন্ধনজ্বালার কল্পনা করেছেন। কিন্তু রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অভিমতই এ সম্পর্কে গ্রহণযোগ্য। দ্রষ্টব্য রবীন্দ্রজীবনী-২, পৃ° ৪৪-৪৫।

একাদশ অধ্যায়

আত্মবিসর্জন

১

আমরা বলেছি রবীন্দ্র-জীবনে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত লগ্নে মৃত্যুর আবির্ভাব ঘটেছে বার বার। বার বার মৃত্যুর হাত থেকেই তাঁকে গ্রহণ করতে হয়েছে অমৃতের পাত্র। 'চৈতালি' কাব্যগ্রন্থে প্রেম ও সৌন্দর্যের কবি কালিদাসের প্রতি রবীন্দ্রনাথের জিজ্ঞাসা ছিল: 'নিদ্রাহীন রাত্তি কখনো কি কাটে নাই বক্ষে শেল গাঁথি?' কবির নিজের জীবনের দিক দিয়ে এই জিজ্ঞাসার একটি গূঢ় তাৎপর্য রয়েছে। তাঁর দাম্পত্যজীবন শুরু থেকেই মৃত্যুর আবির্ভাবে অভিশপ্ত। সেদিন মহাকাল-নিক্ষিপ্ত সেই মৃত্যুশেল কবির মর্মস্থলে আমূল বিদ্ধ হয়েছিল। শেলবিদ্ধ বক্ষের রক্তক্ষরা বেদনা নিয়ে এসেছে কবিজীবনে নিদ্রাহীন রাত। সত্যোবিবাহিত তরুণ কবি জীবনের কাছে চেয়েছিলেন অমৃতের অধিকার, কিন্তু মৃত্যু তাঁর হাতে তুলে দিলে বিষের পাত্র। নীলকণ্ঠ কবি সেই বিষই শোধন করে অমৃতে রূপান্তরিত করলেন।[১]

রবীন্দ্রনাথের যেদিন বিবাহ সেদিনই মৃত্যু হল তাঁর বড়-ভগ্নীপতি সারদাপ্রসাদের। আর পাঁচ মাস পূর্ণ না হতেই মাস দেড়েকের ব্যবধানে লোকান্তরিত হলেন প্রথমে কাদম্বরী দেবী, তারপর কবির সেজদা হেমেন্দ্রনাথ। সারদাপ্রসাদ মহর্ষি-পরিবারেই থাকতেন, পুত্র সত্যপ্রসাদের প্রায় সমবয়স্ক রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর স্নেহ ছিল সুগভীর, তাঁরই উৎসাহে রবীন্দ্রনাথের 'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিল। মহর্ষি-পরিবারে হেমেন্দ্রনাথের উপর ছিল শিশুদের পড়াশুনা দেখার ভার। যখন চারদিকে ইংরেজি পড়াবার ধুম পড়ে গিয়েছে তখন হেমেন্দ্রনাথই সাহসের সঙ্গে বাংলা শেখাবার দিকে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। সেকথা রবীন্দ্রনাথ 'জীবন-স্মৃতি'তে কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করেছেন। স্বভাবতই তাঁদের দুজনের বিয়োগবেদনা কবির অন্তরকে স্পর্শ করেছিল। কিন্তু নতুন বৌঠানের মৃত্যুই তাঁর চেতনার মর্মমূলে প্রচণ্ড আঘাত করে তাঁর সমগ্র সত্তাকে আলোড়িত ও

বিক্ষুব্ধ করে তুলল। 'জীবনস্মৃতি'তে কবি "মৃত্যুশোক" অধ্যায়ে সেই অভিঘাতের কথা বলেছেন ; এবং সেই ঘটনার তেত্রিশ বছর পরে একখানি চিঠিতে তিনি লিখেছেন, 'তাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে আমার পায়ের নিচে থেকে যেন পৃথিবী সরে গেল, আমার আকাশ থেকে আলো নিভে গেল। আমার জগৎ শূন্য হল, আমার জীবনের সাধ চলে গেল। সেই শূন্যতার কুহক কোনোদিন ঘুচবে, এমন কথা আমি মনে করতে পারি নি।'[২]

কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুদিন ১২৯১ বঙ্গাব্দের ৮ই বৈশাখ। তিনি আত্মহত্যা করেছিলেন। যে চিঠির কথা উল্লেখ করলাম সেই চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, 'এক সময়ে যখন আমার বয়স তোমারই মতো ছিল তখন আমি যে নিদারুণ শোক পেয়েছিলুম সে ঠিক তোমারই মতো। আমার যে-পরমাত্মীয় আত্মহত্যা করে মরেন শিশুকাল থেকে আমার জীবনের পূর্ণ নির্ভর ছিলেন তিনি।' এখানে আত্মহত্যার উল্লেখ আছে, কিন্তু নাম নেই ; তবে কে সেই পরমাত্মীয় তা কবির জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে সহজেই অনুমান করে নিতে পারা যায়। 'জীবনস্মৃতি'র "মৃত্যুশোক" অধ্যায়ে কবি লিখেছেন, 'জীবনের মধ্যে কোথাও যে কিছুমাত্র ফাঁক আছে তাহা তখন জানিতাম না ; সমস্তই হাসিকান্নায় একেবারে নিরেট করিয়া বোনা। * * * এমন সময় কোথা হইতে মৃত্যু আসিয়া এই অত্যন্ত প্রত্যক্ষ জীবনটার একটা প্রান্ত যখন এক মুহূর্তের মধ্যে ফাঁক করিয়া দিল, তখন মনটার মধ্যে সে কী ধাঁধাই লাগিয়া গেল। * * * এমন কি, দেহ প্রাণ হৃদয় মনের সহস্রবিধ স্পর্শের দ্বারা যাহাকে তাহাদের সকলের চেয়েই বেশি সত্য করিয়াই অনুভব করিতাম সেই নিকটের মানুষ যখন এত সহজে এক নিমেষে স্বপ্নের মতো মিলাইয়া গেল তখন সমস্ত জগতের দিকে চাহিয়া মনে হইতে লাগিল, এ কী অদ্ভুত আত্মখণ্ডন।'[৩] বলাই বাহুল্য, 'আত্মখণ্ডন' কথাটি আত্মহত্যার অনাবৃত রূঢ়তাকে যেমন ঢেকে রেখেছে তেমনি আলোচ্য প্রসঙ্গে তা অনেক বেশি তাৎপর্যমণ্ডিত হয়ে উঠেছে।

এই আত্মখণ্ডন সম্পর্কে শ্রীমতী সুনয়নী দেবীর কণ্ঠে নতুন সংবাদ শোনা গেল। তিনি বলছেন, 'আর একদিনের কথা মনে আছে। যেদিন জ্যোতি-কাকার স্ত্রী কাদম্বিনী [কাদম্বরী] দেবী মারা যান। আপনারা জানেন তিনি আত্মহত্যা করেছিলেন। কারণটা আমরা ঠিক জানি নে। তবে

শুনেছি জ্যোতিকাকার সঙ্গে তাঁর কি নিয়ে মনোমালিন্য হয়েছিল। সেই সময়ে আমাদের বাড়িতে এক কাপড়উলী প্রায়ই কাপড় বেচতে আসত। তার নাম ছিল বোধ হয় বিশু। তাকে টাকা দিয়ে তিনি লুকিয়ে আফিম আনান—তাই খেয়ে আত্মহত্যা করেন। আমরা এ বাড়ির জানলা থেকে দেখছি। ঘরে তাঁর মৃতদেহ পড়ে আছে। সারা বাড়িতে শোকের ছায়া। পরে পুলিশ এসে সেই মৃতদেহ নিয়ে যায় এবং ময়নাতদন্তে পাকস্থলীতে আফিম পাওয়া যায়।'[৪]

কাদম্বরী দেবী কেন আত্মহত্যা করলেন, এ জিজ্ঞাসা রবীন্দ্র-জীবন-জিজ্ঞাসায় অনিবার্যভাবেই আসে। বিশেষত রবীন্দ্রনাথের বিবাহের মাস চার পরেই কাদম্বরী দেবী আত্মহত্যা করেছিলেন, কাজেই সাধারণ মানুষের মনে এ চিন্তা জাগ্রত হওয়া স্বাভাবিক যে, রবীন্দ্রনাথের বিবাহই কাদম্বরী দেবীর আত্মহত্যার কারণ। যেখানে প্রণয়াসক্তি জৈব-এরসের প্রেরণায় উজ্জীবিত সেখানে সামান্য নারীর পক্ষে অনুরূপ ক্ষেত্রে আত্মহত্যা করা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু রবীন্দ্রজীবনে কাদম্বরী দেবীর প্রেরণা প্লেটোবর্ণিত দিব্য-এরসের মহত্তর ভিত্তিভূমিতে প্রতিষ্ঠিত। পরিণত জীবনে কবি সেই প্রেরণার কথা স্মরণ করে লিখেছেন :

কোন্ জ্যোতির্ময়ী হোথা অমরাবতীর বাতায়নে
রচিতেছে গান
আলোকের বর্ণে বর্ণে ; নির্নিমেষ উদ্দীপ্ত নয়নে
করিছে আহ্বান।
তাই তো চাঞ্চল্য জাগে মাটির গভীর অন্ধকারে ;
রোমাঞ্চিত তৃণে
ধরণী ক্রন্দিয়া উঠে, প্রাণস্পন্দ ছুটে চারিধারে
বিপিনে বিপিনে॥

* * *

তুমি সে আকাশভ্রষ্ট প্রবাসী আলোক, হে কল্যাণী,
দেবতার দূতী।
মর্ত্যের গৃহের প্রান্তে বহিয়া এনেছে তব বাণী
স্বর্গের আকূতি।

ভঙ্গুর মাটির ভাণ্ডে গুপ্ত আছে যে অমৃতবারি
মৃত্যুর আড়ালে,
দেবতার হয়ে হেথা তাহারি সন্ধানে তুমি, নারী,
দু-বাহু বাড়ালে ॥*

রবীন্দ্রজীবনে কাদম্বরী দেবী অমরাবতীর বাতায়নবর্তিনী জ্যোতির্ময়ী মূর্তিরই আকাশভ্রষ্ট প্রবাসী আলোক। মর্ত্যের গৃহের প্রান্তে তিনি স্বর্গের আকৃতি বহন করে এনেছিলেন। তাঁরই দিব্য প্রেরণায় কবিকিশোর 'নামহীন দীপ্তিহীন তৃপ্তিহীন আত্মবিস্মৃতি'র তমসা থেকে অলৌকিক প্রতিভার জ্যোতির্ময়তায় সমুদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিলেন। এই দিব্য-প্রেরণাকে জৈবস্তরে অবনমিত করে আনুষঙ্গিক পরিণতির কথা চিন্তা করার মত বিভ্রান্তি আর কিছু হতে পারে না। কাজেই রবীন্দ্রনাথের বিবাহকে কাদম্বরী-দেবীর আত্মহত্যার মূলীভূত হেতুরূপে চিন্তা করা দূরে থাক্, নিমিত্ত-হেতু রূপে অনুমান করারও কোন সঙ্গত কারণ নেই। আমরা পূর্বেই দেখেছি, অক্ষয় চৌধুরী "অভিমানিনী নির্ঝরিণী" কবিতায় এবং বিহারীলাল তাঁর 'সাধের আসনে'র "আসনদাত্রী দেবী" ও "পতিব্রতা" শীর্ষক নবম ও দশম সর্গে কাদম্বরী দেবীর অভিমান ও তজ্জনিত আত্মবিসর্জনের জন্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথকেই দায়ী করেছেন। 'সাধের আসন' কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুর চার বৎসর পরে লেখা। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অনাদর ও অবহেলার জন্যেই কাদম্বরী দেবী মৃত্যু বরণ করেছেন এই প্রত্যয়ে বিহারীলাল এত ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন যে, কাব্যের আবেশে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর ভর্ৎসনা সংযমের সীমানা লঙ্ঘন করেছে। যে জগতে 'কিম্ভূতমতি পুরুষ' 'পশুর মতন নিতুই নূতন চায়' সেখানে পতিব্রতার স্থান নয়, এই খেদোক্তি করে কবি বলছেন :

সরল হৃদয় লুটি
এ ফুলে ও ফুলে ছুটি
ভ্রমর কলঙ্ককালো উড়িয়া বেড়ায়,
গুন্ গুন্ রবে ওর
বিষাক্ত মদের ঘোর,
ও নহে কাহারো পতি ;
কেন গো দাঁড়ায়ে সতি !

যাও মা অমরাবতী, এস না ধরায় !—
আর এস না ধরায় ! ১০।১১ ॥

আত্মভোলা বিহারীলালের এই মাত্রাতিরেকী ভর্ৎসনা-বাণী শোকবিহ্বল কবিকণ্ঠেরও অযোগ্য। কিন্তু কাদম্বরী দেবীর মৃত্যু তাঁকে কতটা বিচলিত করেছিল এ থেকে তারই প্রমাণ পাওয়া যায়। তা ছাড়া পত্নীর মৃত্যু সম্পর্কে তিনি জ্যোতিরিন্দ্রনাথকেই যে দায়ী করেছেন সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

কিন্তু কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুর হেতু-নির্দেশে রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক রচনাবলীর সাক্ষ্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ১২৯১ সালের বৈশাখে কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুর এক বৎসরের মধ্যে সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের রচনাবলীর একটি তালিকা নিয়ে প্রদত্ত হল। ১২৯১ সালে 'ভারতী' ছাড়া 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা', 'নবজীবন' ও 'প্রচারে' রবীন্দ্রনাথের লেখা মুদ্রিত হয়েছে। জ্যৈষ্ঠে কোথাও কোন লেখা নেই। আষাঢ়ে সৌন্দর্য ও প্রেম (প্রবন্ধ—'ভারতী'), শ্রাবণে 'ভারতী'তে কথাবার্তা (সংলাপ নিবন্ধ) সরোজিনী প্রয়াণ (শ্রাবণ ভাদ্র ও অগ্রহায়ণ তিন কিস্তিতে), বিদেশী ফুলের গুচ্ছ (অনুবাদ কবিতা), এবং 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় আত্মা (প্রবন্ধ); ভাদ্রের 'ভারতী'তে হায়! (গান), আশ্বিনে হাতে কলমে (প্রবন্ধ); কার্তিকে ঘাটের কথা (গল্প), যোগিয়া (কবিতা), এবং 'নবজীবনে বৈষ্ণব কবির গান (প্রবন্ধ); অগ্রহায়ণে 'একটি পুরাতন কথা' (প্রবন্ধ—'ভারতী'), রাজপথের কথা (গল্প—'নবজীবন'), পৌষে কৈফিয়ৎ (একটি পুরাতন কথার পরিশিষ্ট—'ভারতী'), কোথায় (কবিতা—'ভারতী'); মাঘে রামমোহন রায় (প্রবন্ধ—'ভারতী'), ফাল্গুনে উপকথা (কবিতা), সমস্যা (প্রবন্ধ); চৈত্রে বিদায় (কবিতা); ১২৯২ সালের বৈশাখে পুষ্পাঞ্জলি (প্রবন্ধ)। এই রচনাবলীর মধ্যে কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুর প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়েছে বিদেশী ফুলের গুচ্ছ, আত্মা, হায়!, যোগিয়া, কোথায়,, বিদায় এবং পুষ্পাঞ্জলি—এই সাতটি রচনায়। এই রচনা-সপ্তকের আদিতে আছে বিদেশী ফুলের গুচ্ছ আর অন্তে পুষ্পাঞ্জলি। নতুন বৌঠানের মৃত্যুর পর তাঁর উদ্দেশে তরুণ কবি যে পুষ্পার্ঘ্য প্রদান করেন, বিশেষ লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, তার প্রথম অর্ঘ্য তিনি আহরণ করেছেন বিদেশী কবিদের

কাব্যমালঞ্চ থেকে। শেলি, ব্রাউনিং-জায়া, আর্নেস্ট মায়ার্স, ওব্রে ডি ভিয়র, অগস্টা ওয়েব্‌স্টার, মার্সস্টন, ও ভিক্টর হ্যুগোর মোট আটটি বিষাদসংগীত 'সিন্ধুতীরে বিষণ্ণ হৃদয়ের গান' এই শিরোনামায় শ্রাবণের 'ভারতী'তে প্রকাশিত হয়েছিল। সেদিন কবির হৃদ্‌গত শোকোচ্ছ্বাস তাঁর প্রিয় কবিদের রচনা থেকেই প্রতিধ্বনি আহরণ করেছে। প্রথম কবিতাটি শেলির 'Stanzas written in Dejection near Naples'—এই কবিতার প্রথম চার স্তবকের অনুবাদ। তারই অনুসরণে কবি এই কাব্যগুচ্ছকে 'সিন্ধুতীরে বিষণ্ণ হৃদয়ের গান' বলে গ্রথিত করেছিলেন। 'কড়ি ও কোমলে' এই কবিতাগুলির সঙ্গে ম্যুর, ব্রাউনিং-জায়া, ক্রিস্টিনা রসেটি, সুইন্‌বর্ণ্, হুড ও একটি জাপানী কবিতার অনুবাদ যুক্ত হয়ে এই পুষ্পগুচ্ছ সম্পূর্ণ হয়েছে। কবিতাগুলি প্রিয়বিয়োগ-বেদনায় শোকবিহ্বল কবিচিত্তের অনবদ্য বিষাদসংগীত। সেদিন কবির মানসসিন্ধুতে শোকের ঊর্মিমালা কিভাবে তরঙ্গায়িত হয়ে উঠেছিল এই কবিতাগুলির নির্বাচন থেকেই তার আভাস পাওয়া যাবে।

কিন্তু কবির নিজের কণ্ঠে সেই আবেগ প্রথম ভাষা পেল ভাদ্রের 'ভারতী'তে প্রকাশিত একটি গানে। গানটি এখানে সম্পূর্ণ উদ্ধারযোগ্য :

হায়!

রাগিণী ললিত।

তোরা বসে গাঁথিস মালা,
তারা গলায় পরে।
কখন যে শুকায়ে যায়
ফেলে দেয় রে অনাদরে!
তোরা সুধা করিস্ দান,
তারা শুধু করে পান,
সুধায় অরুচি হলে
ফিরেও যে নাহি চায়;
হৃদয়ের পাত্রখানি
ভেঙে দিয়ে চলে যায়।

তোরা শুধু হাসি দিবি,
　　তারা কেবল বসে আছে,
চোখের জল দেখিলে তারা
　　আর ত রবে না কাছে !
প্রাণের ব্যথা প্রাণে রেখে,
প্রাণের আগুন প্রাণে ঢেকে
পরাণ ভেঙে মধু দিবি,
　　অশ্রু-ছাঁকা হাসি হেসে,
বুক ফেটে কথা না কয়ে
　　শুকায়ে পড়িবি শেষে।"

রবীন্দ্রনাথ সারাজীবন যে অনিঃশেষ বিরহের গান গেয়েছেন এই গানটি তারই 'আদিসৃষ্টি' বলে এর মূল্য অপরিসীম। কিন্তু এর ভাববস্তু বিশ্লেষণ করলেই দেখা যাবে যে রবীন্দ্রনাথেরও অভিযোগ জ্যোতিরিন্দ্রনাথেরই বিরুদ্ধে। 'তোরা' এবং 'তারা'র বহুবচনের দ্বারা সাধারণীকৃতির চেষ্টা সত্ত্বেও তরুণ কবির ক্ষোভ "কেন" ও "কোথায়" তা খুঁজে পাওয়া দুষ্কর নয়।

এই গানে কবিমানসের যে হাহাকার ফুটে উঠেছে তার সুর আরো ঋজু আরো স্পষ্টোচ্চারিত ভাবে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে অগ্রহায়ণের 'ভারতী'তে প্রকাশিত "কোথায়" কবিতায়। গানের শিরোনামা ছিল "হায়!", কবিতাটির প্রথম পংক্তি হল 'হায়, কোথা যাবে!'—

হায়, কোথা যাবে!
অনন্ত অজানা দেশ, নিতান্ত যে একা তুমি,
পথ কোথা পাবে!
হায়, কোথা যাবে!

কঠিন বিপুল এ জগৎ,
খুঁজে নেয় যে যাহার পথ।
স্নেহের পুতলি তুমি সহসা অসীমে গিয়ে
কার মুখে চাবে।
হায়, কোথা যাবে!

মোরা কেহ সাথে রহিব না,
মোরা কেহ কথা কহিব না।
নিমেষ যেমনি যাবে, আমাদের ভালোবাসা
আর নাহি পাবে।
হায়, কোথা যাবে!

মোরা বসে কাঁদিব হেথায়,
শূন্যে চেয়ে ডাকিব তোমায়;
মহা সে বিজন মাঝে হয়ত বিলাপধ্বনি
মাঝে মাঝে শুনিবারে পাবে,
হায়, কোথা যাবে!

* * *

হায়, কোথা যাবে!
যাবে যদি, যাও যাও, অশ্রু তবে মুছে যাও,
এইখানে দুঃখ রেখে যাও।
যে বিশ্রাম চেয়েছিলে, তাই যেন সেথা মিলে,
আরামে ঘুমাও।
যাবে যদি, যাও।'

বিলাপচারী এই কবিতায় উচ্চারিত স্বচ্ছন্দ আবেগের মর্মকথাটি লক্ষণীয়। নতুন বৌঠানের মৃত্যুর জন্যে কবি যদি নিজেকে সামান্যতম দায়ী মনে করতেন তা হলে এ ভাবে নিজেকে প্রকাশ করতে পারতেন না।

শুধু তাই নয়, পাঠকগণ দেখে বিস্মিত হবেন যে, রবীন্দ্রনাথ নতুন বৌঠানের আত্মহত্যাকে নৈতিক দিক দিয়ে সমর্থনই করেছেন। আত্মহনন সাধারণত নিন্দনীয় সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু কার্য-কারণ-প্রসঙ্গ-নির্বিশেষে সব আত্মহত্যাকে একই মাপকাঠিতে মাপা কিছুতেই চলে না। অন্যায়ের প্রতিবাদে সত্যাগ্রহী যখন অনশনব্রত অবলম্বন করে তিলে তিলে মৃত্যুবরণ করেন তখন তাঁর কর্মও কি আত্মহত্যা নয়? নারীত্বের মর্যাদা রক্ষার জন্যে আগুনে ঝাঁপ দিয়ে রাজপুত বীরাঙ্গনারা যে জহরব্রত করতেন তাকেও আত্মহত্যা ছাড়া আর কী বলা যাবে? আসলে প্রেয়োবোধের

প্ররোচনা এবং শ্রেয়োবোধের প্রেরণাভেদে আত্মহত্যার স্বরূপও ভিন্ন হতে বাধ্য। আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছায় প্রবৃত্তির তাড়নাবশে বাসনার জটিল গ্রন্থিজালে নিজেকে জড়িয়ে যখন দশদিক অন্ধকার বলে মনে হয়, যখন মুক্তির কোথাও কোন পথ মানুষ খুঁজে পায় না, তখন নিজেরই কোনো কৃতকর্মের অনুশোচনায় চরম আত্মধিক্কারবশে সে আত্মহত্যা করে। আত্মবিশ্বাসহীন দুর্বলের সেই নিষ্করুণ নিয়তি অনুশোচনীয় বটে, কিন্তু কিছুতেই সমর্থনীয় নয়। পক্ষান্তরে অন্যায়ের প্রতিবাদ প্রতিরোধ কিংবা প্রতিবিধানের চরম অস্ত্র হিসাবে আত্মহননকে আত্মবিসর্জন হিসাবেই গণনা করা উচিত। সে আত্মহনন শ্রেয়োবোধের দ্বারাই অনুপ্রাণিত। আকস্মিক কোনো অপ্রত্যাশিত আঘাতের আত্যন্তিক বিমূঢ়তায়ও মানুষ আত্মহত্যা করে, কিন্তু যেখানে শ্রেয়োবোধের প্রেরণা ক্রিয়াশীল সেখানে আকস্মিক বিমূঢ়তা নয়, একটি অবিচলিত সংকল্পই অমোঘ নিষ্ঠুর বলে চরম মুহূর্তকে অনিবার্য করে তোলে। এই প্রসঙ্গে প্লেটোর 'ফিডো' [Phædo] ডায়ালগটির বক্তব্যও বিশেষ ভাবে স্মরণীয়। সক্রেটিসের বিষপানে আত্মহত্যার পূর্বমুহূর্তে মৃত্যুতত্ত্ব, মৃত্যু ও অমরতা এবং দেহ ও আত্মার সম্পর্ক নিয়ে দার্শনিক তত্ত্বালোচনা করেছেন প্লেটো সক্রেটিসের কণ্ঠে। সক্রেটিস স্পষ্টই বলেছেন কোনো কোনো মানুষের জীবনে এমন মুহূর্ত আসে যখন বেঁচে থাকার চেয়ে মৃত্যুবরণ করাই শ্রেয়স্কর। 'At some times and to some persons only it is better to die than to live.'[৮]

রবীন্দ্রনাথ এ জাতীয় আত্মহননকে বলেছেন আত্মবিসর্জন। নতুন বৌঠানের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে তিনি 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় ১৮০৬ শকের (অর্থাৎ ১২৯১ বঙ্গাব্দের) শ্রাবণ সংখ্যায় "আত্মা" নামে একটি প্রবন্ধ রচনা করেন। প্রবন্ধটি পরে তাঁর 'আলোচনা' গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র উপযুক্ত তাত্ত্বিক ও নৈর্ব্যক্তিক প্রকাশভঙ্গি সত্ত্বেও এ সম্পর্কে কোনো সংশয় থাকে না যে, প্রবন্ধটি নতুন বৌঠানের আত্মহত্যাকে উপলক্ষ্য করেই রচিত। এই প্রবন্ধে এক স্থানে কবি বলছেন, 'আমরা মুহূর্তে মুহূর্তে এক-একটা কাজ দেখিয়া সেই কার্য-কারকের মুহূর্তে মুহূর্তে এক-একটা নাম দিই। সেই নামের প্রভাবে তাহার ব্যক্তিবিশেষত্ব ঘুচিয়া যায়, সে একটা সাধারণ শ্রেণীভুক্ত হইয়া পড়ে, সুতরাং ভিড়ের মধ্যে তাহাকে হারাইয়া ফেলি।

আমরা রামকে যখন খুনী বলি, তখন সে পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ খুনীর সহিত এক হইয়া যায়। কিন্তু রাম-খুনী ও শ্যাম-খুনীর মধ্যে এই খুন সম্বন্ধেই এমন আকাশ পাতাল প্রভেদ, যে, উভয়কে এক নাম দিলে বুঝিবার সুবিধা হওয়া দূরে থাকুক, বুঝিবার ভ্রম হয়। আমরা প্রত্যহ আমাদের কাছের লোকদিগকে এইরূপে ভুল বুঝি। তাড়াতাড়ি তাহাদের এক-একটা নামকরণ করিয়া ফেলি ও সেই নামের কৃত্রিম খোলসটার মধ্যেই সে ব্যক্তি ঢাকা পড়িয়া যায়।'*

এখানে 'খুনী' শব্দের বদলে 'আত্মহত্যাকারী' বসালেই আমাদের প্রাসঙ্গিক যুক্তি ও বক্তব্যের যাথার্থ্য স্পষ্ট হয়ে উঠবে। 'আত্মবিসর্জন' প্রসঙ্গে কবি লিখছেন, 'আত্মার উপরে শ্রেষ্ঠ অধিকার কাহার জন্মিয়াছে? যে-আত্মবিসর্জন করিতে পারে। * * আত্মবিসর্জনের মধ্যেই আত্মার অমরতার লক্ষণ দেখা যায়। যে আত্মায় তাহা দেখা যায় না, সে আত্মার যতই বর্ণ থাকুক ও যতই গন্ধ থাকুক তাহা বন্ধ্যা। একজন মানুষ কেনই বা আত্মবিসর্জন করিবে! পরের জন্য নিজেকে কেনই বা কষ্ট দিবে! ইহার কি যুক্তি আছে? যাহার সহিত নিতান্তই আমার সুখের যোগ, তাহাই আমার অবলম্ব্য আর কিছুর জন্যই আমার মাথাব্যথা নাই, এইত ইহসংসারের শাস্ত্র। জগতের প্রত্যেক পরমাণুই আর সমস্ত উপেক্ষা করিয়া নিজে টিকিয়া থাকিবার জন্য প্রাণপণে যুঝিতেছে, সুতরাং স্বার্থপরতার একটা যুক্তি-সঙ্গত অর্থ দেখা যাইতেছে। কিন্তু এই স্বার্থপরতার উপরে মরণের অভিশাপ দেখা যায়, কারণ ইহা সীমাবদ্ধ। * * আমরা আপনার সুখ চাই না, আমরা আনন্দের সহিত আত্মবিসর্জন করিতে পারি, আমরা পরের সুখের জন্য নিজেকে দুঃখ দিতে কাতর হই না। কোথাও ইহার "কেন" খুঁজিয়া পাই না। কেবল হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করিতে পারি যে, নিজের ক্ষুধায় কাতর, সংগ্রাম-পরায়ণ এই জগৎ অতিক্রম করিয়া আর এক জগৎ আছে, ইহা সেইখানকার নিয়ম। সুতরাং এইখানেই পরিণাম দেখিতেছি না। চারিদিকে এই যে বস্তু-জগতের ঘোর কারাগার-ভিত্তি উঠিয়াছে, ইহাই আমাদের অনন্ত কবর-ভূমি নহে। অতএব যখনই আমরা আত্মবিসর্জন করিতে শিখিলাম, তখনই আমাদের গুরুভার ঐহিক দেহের উপরে দুটি পাখা উঠিল। পৃথিবীর মাটিতে চলিবার সময় সে পাখা দুটির কোন অর্থ বুঝা গেল না। কিন্তু ইহা বুঝা গেল যে ঐ পাখা দুটি কেবলমাত্র তাহার শোভা নহে, উহার কার্য আছে।'

প্রবন্ধের শেষ অনুচ্ছেদে কবি লিখছেন, 'যে গেছে, সে তাহার জীবনের সার পদার্থ লইয়া গেছে, তাহার যা যথার্থ জীবন তাহাই লইয়া গেছে, আর তাহার দু-দিনের সুখ দুঃখ, দু-দিনের কাজকর্ম আমাদের কাছে রাখিয়া গেছে। তাহার জীবনে অনেক সময়ে আজিকার মতের সহিত কালিকার মতের অনৈক্য দেখিয়াছি, এমন কি, তাহার মত একরূপ শুনা গিয়াছে, তাহার কাজ আর একরূপ দেখা গিয়াছে—এই সকল বিরোধ অনৈক্য চঞ্চলতা তাহার আত্মার জড় আবরণের মত এইখানেই পড়িয়া রহিল, ইহাকে অতিক্রম করিয়া যে ঐক্য যে অমরতা অধিষ্ঠিত ছিল, তাহাই ফেলিয়া চলিয়া গেল। যখন তাহার দেহ দগ্ধ করিয়া ফেলিলাম, তখন এগুলিও দগ্ধ করিয়া শ্মশানে ফেলিয়া আসা যাক্। তাহার সেই মৃত অনিত্যগুলিকে লইয়া অনর্থক সমালোচনা করিয়া কেন তাহার প্রতি অসম্মান করি? তাহার মধ্যে যে সত্য, যে দেবতা ছিল, যে থাকিবে, সেই আমাদের হৃদয়ের মধ্যে অধিষ্ঠান করুক।'

এই প্রবন্ধটির সঙ্গে 'চিত্রা' কাব্যের "মৃত্যুর পরে" [আজিকে হয়েছে শান্তি জীবনের ভুলভ্রান্তি সব গেছে চুকে] কবিতাটির ভাবসাদৃশ্য লক্ষণীয়। "মৃত্যুর পরে" কবিতাটি বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর দিন দশেক পরে লেখা, কাজেই বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুই [২৬শে চৈত্র ১৩০০ সাল] কবিতাটি রচনার সাক্ষাৎ উপলক্ষ্য বলে কেউ কেউ মনে করেছিলেন। কিন্তু এ অনুমান ভ্রান্ত। 'জীবনস্মৃতি'তে কবি লিখছেন, 'আমার চব্বিশ বছর বয়সের সময় মৃত্যুর সঙ্গে যে পরিচয় হইল তাহা স্থায়ী পরিচয়। তাহা তাহার পরবর্তী প্রত্যেক বিচ্ছেদ-শোকের সঙ্গে মিলিয়া অশ্রুর মালা দীর্ঘ করিয়া গাঁথিয়া চলিয়াছে।' দেখা যাচ্ছে কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুর পর আট-দশ বৎসর কবি বৈশাখের এই দিনগুলিতে বার বার তাঁকে স্মরণ করে তাঁর উদ্দেশ্যে কাব্যপুষ্পাঞ্জলি নিবেদন করেছেন। ৮ই বৈশাখ নতুন বৌঠানের মৃত্যুদিবস। ১৩০১ সালে ৫ই বৈশাখ কবি দুটি কবিতা লেখেন, "দুঃসময়" [বিলম্বে এসেছ, রুদ্ধ এবে দ্বার], এবং "মৃত্যুর পরে"। দুটি কবিতারই প্রত্যক্ষ আলম্বন কাদম্বরী দেবী। বিশেষ লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, "আত্মা" প্রবন্ধে গ্রথিত রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যের সঙ্গে "মৃত্যুর পরে" কবিতার ভাবানুষঙ্গ অভিন্ন। "আত্মা" প্রবন্ধে কবি মানুষের বিচারে সামগ্রিক দৃষ্টির দাবি জানিয়ে বলেছেন, 'আমরা তাহার কতকগুলা কাজের টুকরা এখান-ওখান হইতে কুড়াইয়া জোড়া

দিয়া একটি জীবনচরিত খাড়া করিয়া তুলি, কিন্তু তাহার সমগ্রটি ত দেখিতে পাই না।' "মৃত্যুর পরে"ও কবির অনুনয় :

ব্যাপিয়া সমস্ত বিশ্বে দেখো তারে সর্বদৃশ্যে
বৃহৎ করিয়া ;
জীবনের ধূলি ধুয়ে দেখো তারে দূরে থুয়ে
সম্মুখে ধরিয়া !
পলে পলে দণ্ডে দণ্ডে ভাগ করি খণ্ডে খণ্ডে
মাপিয়ো না তারে।
থাক্ তব ক্ষুদ্র মাপ ক্ষুদ্র পুণ্য, ক্ষুদ্র পাপ—
সংসারের পারে।

কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুর পরে আত্মীয়-পরিজন-সমাজেও তাঁর কম নির্মম বিরুদ্ধ সমালোচনা হয় নি ! "আত্মা" প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের দাবি ছিল, 'তাহার সেই মৃত অনিত্যগুলিকে লইয়া অনর্থক সমালোচনা করিয়া কেন তাহার প্রতি অসম্মান করি ?' "মৃত্যুর পরে" কবিতায় তাঁর একই অনুনয়, একই প্রার্থনা :

আজ বাদে কাল যারে ভুলে যাবে একেবারে
পরের মতন
তারে লয়ে আজি কেন বিচার বিরোধ হেন—
এত আলাপন।

* *

সব তর্ক হোক্ শেষ— সব রাগ, সব দ্বেষ,
সকল বালাই।
বলো শান্তি, বলো শান্তি, দেহ-সাথে সব ক্লান্তি—
পুড়ে হোক্ ছাই।

কিন্তু দেহ ভস্মীভূত হবার সঙ্গে সঙ্গে যারা নিঃশেষে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, কাদম্বরী দেবী তাদের দলভুক্ত ছিলেন না। বরং মৃত্যুর মধ্য দিয়েই তিনি অমরত্ব লাভ করেছেন। এবং ফল দেখে যদি কর্মের বিচার করতে হয় তা হলে কাদম্বরী দেবীর আত্মবিসর্জন চরম সার্থকতায় মণ্ডিত হয়েছে। আমরা পূর্বে বলেছি, মানুষের সংসারে মূর্তিমতী প্রেরণাস্বরূপিনী এই শ্রীময়ী প্রাণময়ী ও কল্যাণময়ী নারী তাঁর প্রাণের অনিঃশেষ ঐশ্বর্য ছড়িয়ে তাঁর পরিমণ্ডলকে মধুময় করে

রেখেছিলেন। কিন্তু তাঁর হৃদয়-মন্দাকিনীধারা মর্ত্যলীলায় মুখ্যত মুক্ত-ত্রিবেণীতেই নিত্যপ্রবাহিত হত। কাদম্বরী দেবীর সেই প্রাণ-প্রবাহিনী গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতী ধারায় বিহারীলাল, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের অভিমুখে ভক্তি প্রেম ও প্রীতির অমৃত-নির্ঝরিণীরূপে উৎসারিত হয়েছিল। 'প্রীতি' শব্দটি আমরা 'অসম্প্রযোগবিষয়ারতি'র ঘনীভূত নির্যাস অর্থেই ব্যবহার করেছি। বিহারীলাল তাঁর অনুরাগময়ী ভক্ত-পাঠিকার মৃত্যুর পর শুধু 'সাধের আসন' কাব্যই লিখলেন না, তাঁর কবিকল্পনায় এই নারীলক্ষ্মী "ব্রহ্মার মানস-সরে প্রফুল্ল-নলিনী" রূপেই উদ্ভাসিত হয়ে উঠলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সম্পর্কে কোন তীব্র মন্তব্য করা সমীচীন হবে না। তাঁর দাম্পত্য-জীবনের প্রারম্ভে আমরা দেখেছি তাঁর মত শিল্পীর পরিমার্জনের ফলেই কাদম্বরী দেবীর অসামান্য ধাতুপ্রকৃতি দিব্যকান্তি লাভ করেছিল। 'নন্দনকাননে' তিনি যে দাম্পত্যস্বর্গ রচনা করেছিলেন, শিল্পগোত্র মানুষের সাময়িক বিভ্রান্তির ফলে তিনি সেই স্বর্গ থেকে যে ভ্রষ্ট হয়েছিলেন সে বিচারে প্রবৃত্ত না হয়েও বলা যায়, হয়তো তাঁকে ভুল বুঝে তাঁর উপর অভিমান করে চরম ব্যবস্থা গ্রহণের প্ররোচনা তিনি স্ত্রীকে দিয়েছিলেন। কিন্তু সাময়িক মোহ ও বিভ্রান্তি থেকে মুক্ত হয়ে তিনি যে শেষজীবনে মোরাবাদী পাহাড়ের চূড়ায় মহত্তর আত্মোপলব্ধির আনন্দে নিমগ্ন হয়েছিলেন, তার মূলে কাদম্বরী দেবীর আত্ম-বিসর্জন কম প্রভাব বিস্তার করে নি। তাঁর চক্ষুরুন্মীলনে মানময়ী প্রাণবধূর মর্মান্তিক চরম আঘাত অত্যাবশ্যক ছিল বলেই মনে হয়। রবীন্দ্রমানসে মৃত্যুর মধ্য দিয়েই তিনি দেবীর আসনে চিরপ্রতিষ্ঠিত হয়ে রইলেন। বেঁচে থাকলে যে সব জটিলতা অনিবার্য হয়ে উঠতে পারত, মৃত্যুবরণ করে সে সব জটিলতা থেকে কবিমানসকে চিরদিনের জন্যে মুক্তি দিয়ে গেলেন তিনি। কাজেই ফলাফলের বিচারে এমন সার্থক মৃত্যু আর কী হতে পারে! 'শেষের কবিতা'য় একদিন লাবণ্য অমিতকে জিজ্ঞাসা করেছিল, "আচ্ছা মিতা, তুমি কি মনে কর না, যেদিন তাজমহল তৈরি শেষ হল, সেদিন মমতাজের মৃত্যুর জন্যে শাজাহান খুশি হয়েছিলেন? তাঁর স্বপ্নকে অমর করবার জন্যে এই মৃত্যুর দরকার ছিল। এই মৃত্যুই মমতাজের সবচেয়ে বড়ো প্রেমের দান।"

লাবণ্যর এই চিন্তা রবীন্দ্রমানসেই অধিবাসিত হয়েছে। মমতাজের প্রেমের সবচেয়ে বড় দান তাঁর মৃত্যু। তবু তিনি স্বেচ্ছায় সে মৃত্যু বরণ

করেন নি। কিন্তু কাদম্বরী দেবীর মৃত্যু তাঁর স্বেচ্ছাবৃত বলে তার লজ্জা ও গৌরব, দায়িত্ব ও কৃতিত্ব—সবটুকুই তাঁর একার পাওনা।

২

কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুর পাঁচ সপ্তাহের মধ্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনে এমন একটি ঘটনা ঘটল যা এই প্রসঙ্গে সতর্ক উল্লেখের অপেক্ষা রাখে। জ্যোতিরিন্দ্র-জীবননাট্যের মুখ্য-বিমর্ষসন্ধিতে দাঁড়িয়ে চরম সংকটলগ্নের এই দৃশ্যটি আপাতদৃষ্টিতে বিভ্রান্তিকর বলেই মনে হয়। চরম সর্বনাশের মুখে দাঁড়িয়ে ট্রাজেডি-নাট্যের নায়ক হয় 'আমার সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল' বলে ভেউ ভেউ কান্নায় ভেঙে পড়ে, নয় 'It is a tale told by an idiot, full of sound and fury signifying nothing' বলে আকাশ-ফাটা অট্টহাসির তলায় নিজের বুকভরা কান্নাকে চাপা দেবার জন্যে সচেষ্ট হয়। "সরোজিনী প্রয়াণ" জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনে অমনই এক নভোবিদারণকারী অট্টহাসি।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'জীবনস্মৃতি'তে "বঙ্কিমচন্দ্র" অধ্যায়ের পরেই "জাহাজের খোল" ও "মৃত্যুশোক" এই দুটি অধ্যায়কে পর পর বিন্যস্ত করেছেন। "জাহাজের খোল" প্রসঙ্গে জানা যাচ্ছে 'এক্‌সচেঞ্জ গেজেটে' বিজ্ঞাপন দেখে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ একদিন সাত হাজার টাকা দিয়ে একটা জাহাজের খোল কিনলেন। তার উপরে এঞ্জিন জুড়ে কামরা তৈরি করে একটা পুরো জাহাজ নির্মাণ করে স্বদেশী চেষ্টায় জাহাজ চালাবেন এই ছিল তাঁর সংকল্প। তাঁর এই সংকল্পের প্রথম সৃষ্টি হল 'সরোজিনী'। পরে 'ভারত', 'লর্ড রিপন', 'বঙ্গলক্ষ্মী' ও 'স্বদেশী' নামে পর পর কয়েকটি জাহাজ খুলনা-বরিশাল পথে তিনি চালিয়েছিলেন। স্বাদেশিকতার উদ্দীপনায় বিলাতি কোম্পানির সঙ্গে এই ভাবে বাণিজ্য-নৌযুদ্ধে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ একদিন সর্বস্বান্ত হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, শূন্য খোল একদা ভরতি হয়ে উঠল, শুধু কেবল এঞ্জিনে এবং কামরায় নয়—'ঋণে এবং সর্বনাশে'।

শেষ তিনটি পদে রবীন্দ্রনাথের ভাষাপ্রয়োগ লক্ষণীয়। সংযোজক অব্যয়টি 'ঋণ' ও 'সর্বনাশে'র মাঝখানে বসে সর্বনাশকে ঋণ থেকে শুধু আলাদাই করে নি, সর্বনাশের তুলনায় ঋণকে অনেক লঘুও করে দিয়েছে।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-পরিচালিত নৌবিভাগের প্রথম যাত্রীবাহী স্টীমারের নাম হল 'সরোজিনী'। ৮ই বৈশাখ কাদম্বরী দেবীর মৃত্যু হল, ১১ই জ্যৈষ্ঠ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ 'সরোজিনী'তে চড়ে বরিশাল যাত্রা করলেন। রবীন্দ্রনাথ এই যাত্রায় জ্যোতিদাদার সঙ্গী ছিলেন। 'ভারতী'তে ১২৯১ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ ভাদ্র ও অগ্রহায়ণ সংখ্যায় "সরোজিনী প্রয়াণ" শিরোনামায় কবি পরিহাসলঘু ভঙ্গিতে এই নদীভ্রমণের কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন। এই যাত্রায় জ্ঞানদানন্দিনী দেবীও জ্যোতিরিন্দ্রনাথদের সঙ্গ নিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'কথা ছিল আমরা তিনজনে যাইব—তিনটি বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষমানুষ। সকালে উঠিয়া জিনিসপত্র বাঁধিয়া প্রস্তুত হইয়া আছি, পরম পরিহসনীয়া শ্রীমতী ভ্রাতৃজায়া ঠাকুরাণীর নিকট ম্লানমুখে বিদায় লইবার জন্য সমস্ত উদ্‌যোগ করিতেছি এমন সময় শুনা গেল তিনি তাঁহার দুইটি পুণ্যফল তাঁহার শ্রীমতী যথা ও শ্রীমান্ সর্বস্বটিকে লইয়া আমাদের অনুবর্তিনী হইবেন।'[১০]

জ্ঞানদানন্দিনী দেবী তখন পুত্রকন্যা ইন্দিরা ও সুরেন্দ্রনাথকে নিয়ে সার্কুলার রোডের ভাড়াটে বাড়িতে থাকতেন। সত্যেন্দ্রনাথ সে সময় সোলাপুরে জজিয়তি করছেন, কিন্তু ছেলেমেয়ের লেখাপড়ার জন্যে জ্ঞানদানন্দিনী থাকতেন কলকাতায়। জাহাজে করে নদীপথে বরিশাল ভ্রমণে একলা নারীর পক্ষে 'তিনটি বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষমানুষে'র অনুবর্তিনী হওয়া—বিশেষত পরিবারের সেই শোকাবহ দুর্বিপাকের পটভূমিতে একটু দৃষ্টিকটু মনে হওয়া অসঙ্গত নয়। কিন্তু জ্ঞানদানন্দিনী দেবী ছিলেন অসামান্যা রমণী। সত্যেন্দ্রনাথ তাঁকে নিয়ে একাধিকবার যে দুঃসাহসিক পরীক্ষা করেছেন তার কথা আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি। প্রথম ভারতীয় আই. সি. এস.-এর সহধর্মিণী হিসাবে তাঁকে যে-সমাজে মিশতে হত সে-সমাজের অভিজাত আদবকায়দা ও চলনধরনে অভ্যস্ত হয়ে তাঁর জীবনচর্যা যে অনন্যসাধারণ স্বাতন্ত্র্য পেয়েছিল তা বলাই বাহুল্য। চিন্তায় ও আচরণে তিনি ছিলেন বাংলার নারীপ্রগতির অগ্রদূতী। তা ছাড়া দেবর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁর সমবয়স্ক। শৈশবে শ্বশুরগৃহে এসে খেলাধুলোয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথকেই তিনি প্রিয়সঙ্গী হিসাবে পেয়েছিলেন। 'স্মৃতিকথা'য় তিনি লিখেছেন কিশোরী-বয়সেও কিশোর দেবরের সঙ্গে দৌড়-ঝাঁপ করে তিনি 'নাইন পিন্‌স্' খেলা খেলতেন। কাজেই জ্ঞানদানন্দিনী ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ শুধু দেবর-ভ্রাতৃবধূই ছিলেন না, তাঁরা ছিলেন একে অন্যের

অন্তরঙ্গ বন্ধু। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সেই মানসিক অবস্থায় তাঁকে সঙ্গদান করা জ্ঞানদানন্দিনী দেবী নিশ্চয়ই তাঁর কর্তব্য বলে বিবেচনা করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর "সরোজিনী প্রয়াণে" সেই নদীভ্রমণের যে হাস্যোচ্ছল বর্ণনা দিয়েছেন তাতে এই জলযাত্রার চিত্রটি নানাদিক দিয়েই উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। হাস্যপরিহাসে রবীন্দ্রনাথের নিজের ভাষাও তাঁর সে-সময়কার হৃদয়ানুভূতির পক্ষে বিষম ও বিসদৃশ। বিশেষত সংক্ষিপ্ত আকারে সংকলিত হয়ে "সরোজিনী প্রয়াণ" 'বিচিত্র প্রবন্ধে' যে ভাবে গ্রথিত হয়েছে তাতে তাঁর এই আপাত-লঘুচিত্ততা তাঁর মানসবিচারের দিক দিয়ে বিভ্রান্তি-সৃষ্টির সহায়ক হতে পারে। সাধারণ পাঠকের কথা দূরে থাক্, এমন কি রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার পর্যন্ত "সরোজিনী প্রয়াণে"র লেখককে মারাত্মকভাবে ভুল বুঝেছেন। তিনি লিখেছেন, 'কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুর এক মাস পরে 'সরোজিনী প্রয়াণ' রচিত, এই রচনার মধ্যে যে লঘুভাব, যে সৌন্দর্যপ্রিয়তা, যে হাস্যোজ্জ্বল আনন্দ উচ্ছ্বাস প্রকাশ পাইয়াছে তাহার সহিত সেই যুগের 'কোথায়', 'পুরাতন', 'নূতন' প্রভৃতি কবিতার সুর বা জীবনস্মৃতিতে বর্ণিত মনোভাবের বা পুষ্পাঞ্জলির উচ্ছ্বাসের সম্বন্ধ আবিষ্কার করা কঠিন।' এবং এই 'সম্বন্ধ আবিষ্কারে' অসমর্থ হয়ে প্রভাতকুমার রবীন্দ্রমানসের বিচারে সত্যের সম্পূর্ণ বিপরীত একটি ভ্রান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে বলছেন, 'আসল কথা, তাঁহার শোক বা সুখ কোনোটিই মনে স্থায়ী রেখাপাত করিত না—তাঁহার ভাবাবেগের পূর্ণ প্রকাশের জন্য—তাহা শোকই হউক বা সুখই হউক, তাহাকে উদ্‌বোধিত করিবার জন্য যতটুকু আঘাত (stimuli) প্রয়োজন হইত, ততটুকুমাত্র তিনি সহ্য করিতেন—তদতিরিক্তকে আমল দিতেন না। এই নিরাসক্তি তাঁহার চরিত্রে যে নৈর্ব্যক্তিকতা দান করিয়াছিল, তাহার জন্য তিনি অন্যকে দুঃখ দিয়াছেন। তাঁহার দুঃখ intellectualised emotion-এর একটি রূপ মাত্র, তাঁহার কাব্যসৃষ্টির পক্ষে যেটুকু প্রয়োজন সেইটুকুমাত্র; তারপর সৃষ্টিসুখ সম্ভোগ হইয়া গেলে বিস্মৃতির চিরপাথারে স্মৃতি ডুবিয়া যাইত।'[১১]

প্রভাতকুমারের মত জীবনীকারের পক্ষে এই বিভ্রান্তি বিস্ময়কর। যে বিরহের বহ্নিশিখাকে রবীন্দ্রনাথ অগ্নিহোত্রীর মত অন্তরের নিভৃত কক্ষে সারাজীবন প্রোজ্জ্বল করে রেখেছেন সে সম্পর্কে এই মন্তব্য শুধু অশ্রদ্ধেয়ই নয়, পরম বেদনাদায়কও বটে। অথচ যে "সরোজিনী প্রয়াণে"র উপর নির্ভর করে

প্রভাতকুমার এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন 'ভারতী'র পৃষ্ঠায় সেই প্রবন্ধটি ভাল করে পড়লে তিনি তাঁর এই ভ্রান্ত ধারণা থেকে অনায়াসেই মুক্ত হতে পারতেন। আমরা পূর্বেই বলেছি 'বিচিত্র প্রবন্ধে' রচনাটি সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশিত হয়েছে। 'ভারতী'তে পরিত্যক্ত অংশগুলিতেই রবীন্দ্রনাথের সে সময়কার মনোভাব গুপ্ত হয়ে আছে। প্রথম কিস্তিতেই তিনি লিখেছেন, 'হাসি-তামাসা অনেক সময়ে পর্দার কাজ করে, হৃদয়ের বে-আব্রুতা দূর করে। অত্যন্ত অন্তরঙ্গ বন্ধুদের কাছে সকলই শোভা পায়, কিন্তু নগ্ন প্রাণ লইয়া কিছু বাহিরে বেরোন যায় না—সে সময়ে প্রাণের উপর আবরণ দিবার জন্ত গোটাকতক হাল্কা কথা গাঁথিয়া ঢিলেঢালা একপ্রকার সাদা আলখাল্লা বানাইতে হয়, সেটার রঙ কতকটা হাসির মত দেখায় বটে। কিন্তু সকল সময়ে এ রকম কাপড়ও জোটে না। সে অবস্থায় অসভ্যদের মত গায়ে রঙ করিয়া, উল্কি পরিয়া, এক ছটাক শুষ্ক দন্তচ্ছটা আধ সের জলে গুলিয়া সর্বাঙ্গে তাহারি ছাপ মারিয়া সমাজে বাহির হইতে হয়—কিন্তু সে হইলে কেমন সংয়ের মত দেখিতে হয়, এবং দেখিতে দেখিতে রংচং শুকাইয়া উঠে ও শরীর চচ্চড় করিতে থাকে। লেখাই লোকে দেখে, লেখকের কথা কি আর কেউ ভাবে।'[১২]

আর-একটু এগিয়ে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ পুনশ্চ লিখছেন, 'মরণের বাড়া আর ত তামাসা নাই।...কাঁদিলেই ত আমাদের হার হইল, এত বড় একটা ঠাট্টা যখন ধরা পড়িল, তখন ত আমাদেরই জিত। জীবনের সিংহাসনের উপর জরীজড়ানো মছলন্দ পাতিয়া আমাদিগকে পুতুলটির মত সমস্ত দিন কে বসাইয়া রাখিয়াছে, অবশেষে সন্ধ্যাবেলাটিতে মছলন্দখানি তুলিয়া দেয়, দেখা যায় খানকতক চিতার কাষ্ঠ—এই ত পরিহাস; এইজন্যই ত এত বিরাট অট্টহাস্য! আমরাও হাসিতেছি—হাঃ হাঃ হাঃ!'[১৩]

ভাদ্রের 'ভারতী'তে "সরোজিনী প্রয়াণে"র দ্বিতীয় কিস্তির শুরুতেই আবার কবি লিখছেন, 'আবার কেমন হৃদয়ের মধ্যে মেঘ করিয়া আসে—লেখার উপরে গম্ভীর ছায়া পড়ে,—মনের কথাগুলি শ্রাবণের বারিধারার মত অশ্রুর আকারে ঝর্‌ঝর্‌ করিয়া ঝরিয়া পড়িতে চায়। কিন্তু এ লেখার বাদ্‌লা কাহারো ত ভাল লাগিবে না। আমার মনের মধ্যে যাহাই হউক, আমি নিজের মেঘে পাঠকের সূর্যকিরণ রোধ করিয়া রাখিতে চাই না—সুতরাং

নিশ্বাস ফেলিয়া আমি সরিয়া পড়িলাম, আর সমস্ত প্রকাশ হউক।'

লেখক 'নিজের মেঘে পাঠকের সূর্যকিরণ রোধ' করতে চান নি, তাই প্রবন্ধ রচনার সময় স্বগতোক্তির মত অভিব্যক্ত এই অংশগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশকালে তিনি বর্জন করেছেন। 'ভারতী'র পৃষ্ঠায় "সরোজিনী প্রয়াণ"কে ভাল করে তলিয়ে পড়েন নি বলেই প্রভাতকুমার রবীন্দ্রমানসবিচারে দিগ্‌ভ্রান্ত হয়েছেন।

'ভারতী'র পৃষ্ঠাতেই বা কেন, গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময়ও এই প্রবন্ধে বর্ণিত গঙ্গাতীরের শোভাকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, অশ্রুজলের স্ফটিক দিয়ে বাঁধানো সুখের ছবি। কবি লিখছেন, 'এই যে-সব গঙ্গার ছবি আমার মনে উঠিতেছে, এ কি সমস্তই এইবারকার স্টীমার-যাত্রার ফল? তাহা নহে। এ-সব কতদিনকার কত ছবি, মনের মধ্যে আঁকা রহিয়াছে। ইহারা বড়ো সুখের ছবি, আজ ইহাদের চারিদিকে অশ্রুজলের স্ফটিক দিয়া বাঁধাইয়া রাখিয়াছি। এমনতরো শোভা আর এ-জন্মে দেখিতে পাইব না।'[১৪] অশ্রুজলের স্ফটিকে বাঁধানো ছবির রূপকল্প সৃষ্টি একমাত্র রবীন্দ্রনাথই করতে পারতেন। অশ্রু এখানে ঘনীভূত হয়ে স্ফটিকে পরিণত।

৩

রবীন্দ্র-জীবনীকার রবীন্দ্রনাথের সুখদুঃখানুভূতি সম্পর্কে যে তত্ত্বকে কবিমানসের বিচারে মূলসূত্ররূপে গ্রহণ করেছেন সে সম্পর্কে আর একটু বিচার-বিশ্লেষণ এখানে অত্যাবশ্যক। তিনি বলেছেন, রবীন্দ্রনাথের শোক বা সুখ কোনোটিই মনে স্থায়ী রেখাপাত করত না। তাঁর ভাবাবেগের প্রকাশের জন্যে, তাকে উদ্বোধিত করবার জন্যে, যতটুকু আঘাত প্রয়োজন হত ততটুকুমাত্র তিনি সহ্য করতেন, তার অতিরিক্তকে তিনি আমল দিতেন না। তাঁর দুঃখ তাঁর কাব্যসৃষ্টির পক্ষে যেটুকু প্রয়োজন সেইটুকুমাত্র; তারপর সৃষ্টিসুখ সম্ভোগ হয়ে গেলে বিস্মৃতির চিরপাথারে স্মৃতি ডুবে যেত।

কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুজনিত দুঃখকেও তিনি এই তত্ত্বের দ্বারাই ব্যাখ্যা করেছেন। তাই দেখতে পাই, তিনি রবীন্দ্র-জীবনের এই তীব্রতম, মহত্তম

দুঃখকেও ক্ষণিক ও ক্ষণস্থায়ী বলে ধরে নিয়েছেন এবং কবির তৎকালীন রচনাবলী থেকে তাঁর সিদ্ধান্তের সমর্থন সংকলনের প্রয়াসী হয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'এই মৃত্যুর আঘাত তাঁহাকে কিয়ৎকালের জন্য বিচলিত করিয়াছিল' [প্রথম খণ্ড, পৃ° ১৫১]। 'জীবনের সমস্ত সজীবতা ও সরসতাকে সাময়িকভাবে শুষ্ক ও শীর্ণ করিয়া দিয়াছিল' [পৃ° ১৫৩]। 'মৃত্যুশোক পর্বে জীবনের প্রতি যে বৈরাগ্যভাব ঐ কবিতাগুলির মধ্যে ['কড়ি ও কোমলে'র মৃত্যু-সম্পর্কিত কবিতাবলীর কথাই লেখক বলছেন] প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহা যে অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী হৃদয়ালুতাপ্রসূত, তাহা আমরা ইতঃপূর্বে আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছি' [পৃ° ১৭৫-১৭৬]।

'বালকে' "রুদ্ধগৃহ" প্রবন্ধ প্রকাশিত হবার পর অক্ষয় চৌধুরীর সঙ্গে পৌষ মাসে যে "উত্তর-প্রত্যুত্তর" চলে তার বিশ্লেষণ করেও তিনি বলছেন, রুদ্ধগৃহ প্রবন্ধের তাৎপর্য ব্যাখ্যানের মধ্যে 'রবীন্দ্রনাথের জীবনের অন্যতম মূলসূত্র'টি ধরা পড়েছে। 'সেটি হইতেছে, ভুলিয়া যাইবার অসীম ক্ষমতা, বা বিস্মৃতি। অর্থাৎ অতীতের অনাবশ্যক আবর্জনাকে ভুলিয়া গিয়া নূতন সত্য গ্রহণে, নূতন তত্ত্ব আবিষ্কারে, নূতন প্রেম অভিনন্দনের জন্য উন্মুখীনতা' [পৃ° ১৬৭]।

রবীন্দ্রনাথের উপর এই তত্ত্ব আরোপ করবার জন্যে উন্মুখ হবার ফলে প্রভাতকুমার একস্থলে রবীন্দ্রনাথ যা অস্বীকার করেছেন সেই কথাই তাঁর স্বীকৃতিরূপে ব্যবহার করে নিজের বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। তিনি লিখছেন :

'তাঁহার বিবাহের মাত্র চারিমাস পরে নবীন জীবনের প্রথমে এই শোক। রবীন্দ্রনাথ ঠিকই লিখিয়াছেন, "ভুলিবার শক্তি প্রাণশক্তির একটা প্রধান অঙ্গ ;...এইজন্য জীবনে প্রথম যে মৃত্যু কালো ছায়া ফেলিয়া প্রবেশ করিল, তাহা আপনার কালিমাকে চিরন্তন না করিয়া ছায়ার মতই একদিন নিঃশব্দপদে চলিয়া গেল।" 'যোগিয়া' ও 'ভবিষ্যতের রঙ্গভূমি'র মধ্যে এই মুক্তিপ্রয়াসের ধ্বনি জাগিয়াছে' [পৃ° ১৫৪]।

এখানে প্রভাতকুমার কবির 'নবীন জীবনের প্রথমে এই শোক' বলতে যে-শোকের কথা বলেছেন আর রবীন্দ্রনাথের উদ্ধৃতিতে 'জীবনে প্রথম যে মৃত্যু'র কথা আছে সে দুটি এক নয়। রবীন্দ্রনাথের উদ্ধৃতিতে তাঁর চোদ্দ

সর বয়সে মায়ের মৃত্যুর কথাই উল্লিখিত হয়েছে। আর প্রভাতকুমারের উদ্ধৃতিতে উদ্দিষ্ট হয়েছে কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুর প্রসঙ্গ। 'জীবনস্মৃতি'র "মৃত্যুশোক" অধ্যায় থেকে গৃহীত রবীন্দ্রনাথের সম্পূর্ণ বক্তব্যটি উদ্ধার করলেই প্রভাতকুমারের ভুলটি ধরা পড়বে। সত্যসন্ধ কবি মায়ের মৃত্যু ও কাদম্বরী দেবীর মৃত্যু তাঁর মনে যে ভিন্নতর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল তার হেতু বিশ্লেষণ করে লিখেছেন, 'যে-ক্ষতি পূরণ হইবে না, যে-বিচ্ছেদের প্রতিকার নাই, তাহাকে ভুলিবার শক্তি প্রাণশক্তির একটা প্রধান অঙ্গ ;—শিশুকালে সেই প্রাণশক্তি নবীন ও প্রবল থাকে, তখন সে কোনো আঘাতকে গভীরভাবে গ্রহণ করে না, স্থায়ী রেখায় আঁকিয়া রাখে না। এইজন্য জীবনে প্রথম যে-মৃত্যু কালো ছায়া ফেলিয়া প্রবেশ করিল, তাহা আপনার কালিমাকে চিরন্তন না করিয়া ছায়ার মতই একদিন নিঃশব্দপদে চলিয়া গেল। * * কিন্তু আমার চব্বিশ বছর বয়সের সময় মৃত্যুর সঙ্গে যে-পরিচয় হইল তাহা স্থায়ী পরিচয়। তাহা তাহার পরবর্তী প্রত্যেক বিচ্ছেদশোকের সঙ্গে মিলিয়া অশ্রুর মালা দীর্ঘ করিয়া গাঁথিয়া চলিয়াছে। শিশু বয়সের লঘু জীবন বড়ো বড়ো মৃত্যুকেও অনায়াসেই পাশ কাটাইয়া ছুটিয়া যায়—কিন্তু অধিক বয়সে মৃত্যুকে অত সহজে ফাঁকি দিয়া এড়াইয়া চলিবার পথ নাই। তাই সেদিনকার সমস্ত দুঃসহ আঘাত বুক পাতিয়া লইতে হইয়াছিল।'[১৫]

এখানে 'কিন্তু'-অব্যয় ব্যবহার করে রবীন্দ্রনাথ যে কথা স্পষ্টতই অস্বীকার করতে চাইছেন সে কথা জীবনীকার তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে উদ্ধার করে কবির প্রতি অবিচার করেছেন। কেন না এখানে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য প্রভাতকুমারের বক্তব্যের অনুকূল তো নয়ই, বরং সম্পূর্ণ বিপরীত।

আসলে জীবনীকার কবিমানসে নিরাসক্তিজনিত যে নৈর্ব্যক্তিকতার তত্ত্ব গড়ে তুলতে চেয়েছেন, আর যে-ক্ষেত্রেই হোক, কাদম্বরী দেবীর ক্ষেত্রে সে তত্ত্ব প্রযোজ্য নয়। জীবনীকার স্বয়ং তাঁর গ্রন্থে কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুর পূর্বে ও পরে, তাঁর সম্পর্কে কবির হৃদয়ানুভূতির উজ্জ্বল স্বাক্ষরযুক্ত যে সব কবিতা প্রবন্ধ ও গ্রন্থোৎসর্গের তালিকা সযত্নে পঞ্জীভূত করেছেন সেগুলি থেকেই তাঁর বক্তব্যের অসারতা প্রমাণিত হয়। এ সম্পর্কে কবির মানস-প্রবণতার একটি ইঙ্গিত পাওয়া যাবে বর্তমান গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায়ে উদ্ধৃত দান্তে পেত্রার্কা ও

গেটের প্রেম সম্পর্কে তাঁর সতেরো বছর বয়সের লেখা প্রবন্ধত্রয় থেকে। সেখানে কবিকিশোর দান্তে ও পেত্রার্কার প্রেমের সঙ্গে গেটের প্রেমের তুলনা করে লিখেছেন, 'দান্তে ও পেত্রার্কার প্রেম প্রেমের আদর্শ, আর গেটের প্রেম পার্থিব, অর্থাৎ সাধারণ। * * সে প্রেম তাঁহার ইচ্ছাধীন, প্রয়োজন অতীত হইলেই সে প্রেম দূর করিতে তাঁহার বড় একটা কষ্ট পাইতে হয় নাই। গেটে নিজেই কহেন, যদি বা প্রেম লইয়া তাঁহার হৃদয়ে কখনও আঘাত লাগিত, সে বিষয়ে একটা নাটক লিখিলেই সমস্ত চুকিয়া যাইত।' প্রভাতকুমার যখন বলেন, রবীন্দ্রনাথের দুঃখ তাঁর কাব্যসৃষ্টির পক্ষে যেটুকু প্রয়োজন সেইটুকু মাত্র, তারপর সৃষ্টি-সুখ সম্ভোগ হয়ে গেলে বিস্মৃতির চিরপাথারে স্মৃতি ডুবে যেত, তখন তিনি রবীন্দ্রনাথ-ধিকৃকৃত গেটের হৃদয়ানুভূতির সঙ্গেই রবীন্দ্রনাথের হৃদয়ানুভূতির সাধর্ম্য আবিষ্কারের জন্যে প্রয়াসী হন। কিন্তু এ বিষয়ে কিশোর বয়সে রবীন্দ্রনাথের যে মনোভাব দান্তে পেত্রার্কা ও গেটে-প্রসঙ্গে ব্যক্ত হয়েছে শুধু তা থেকেই নয়, তাঁর সারা জীবনব্যাপী অনুভূতির সাক্ষ্যবহনকারী রচনাবলী থেকেই প্রভাতকুমারের বক্তব্যের অযৌক্তিকতা প্রতিপন্ন হয়।

রবীন্দ্রনাথের দুঃখ ও দুঃখসঞ্জাত জীবনবোধ সম্পর্কে সি. এফ. এ্যান্ড্রুসের সিদ্ধান্তটি এই প্রসঙ্গে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য বলে আমরা মনে করি। তিনি লিখেছেন :

Suffering may come to him in incredible forms of pain. No one has suffered more acutely and sensitively than he has done. But as long as the ideal is set before him and a fresh adventure of faith and hope is in sight, he will go through torture, almost intolerable, to one of his supremely refined nature, in order to reach his goal....

The goal itself with him is always high, always glorious, always noble. He has the poet's deep love for the colour and music, the song and drama of life. But all the time, there is an austerity of refinement that is fastidious in its purity, lest the ideal itself should become debased and the aim low. He cannot bear for a single moment that the beauty of the end in view should be tarnished by any meanness in the process. At the same time his moral idealism is never formal

or conventional. It rests upon an unerring aesthetic instinct, which is like a strain of music played upon a perfect instrument by a master-hand. The slightest discord mars for him the whole song. It jars upon his inner spirit, creating an agony which less sensitive natures could not for a moment understand.[১৬]

'ধর্ম' গ্রন্থে "দুঃখ" প্রবন্ধে কবি নিজেও বলেছেন, 'মানুষের একটিমাত্র আপনার ধন' আছে সেটি দুঃখধন।...'অতএব দুঃখকে আমরা দুর্বলতাবশত খর্ব করিব না, অস্বীকার করিব না, দুঃখের দ্বারাই আনন্দকে আমরা বড়ো করিয়া এবং মঙ্গলকে আমরা সত্য বলিয়া জানিব।' এই প্রবন্ধে জীবনে দুঃখের প্রয়োজন ও মূল্য সম্পর্কে আলোচনা করে কবি লিখেছেন, 'মানুষের এই যে দুঃখ ইহা কেবল কোমল অশ্রুবাষ্পে আচ্ছন্ন নহে, ইহা রুদ্রতেজে উদ্দীপ্ত। বিশ্বজগতে তেজঃপদার্থ যেমন, মানুষের চিত্তে দুঃখ সেইরূপ; তাহাই আলোক, তাহাই তাপ, তাহাই গতি, তাহাই প্রাণ; তাহাই চক্রপথে ঘুরিতে ঘুরিতে মানবসমাজে নূতন নূতন কর্মলোক ও সৌন্দর্যলোক সৃষ্টি করিতেছে—এই দুঃখের তাপ কোথাও বা প্রকাশ পাইয়া কোথাও বা প্রচ্ছন্ন থাকিয়া মানবসংসারের সমস্ত বায়ুপ্রবাহগুলিকে বহমান করিয়া রাখিয়াছে।'

কবিবর্ণিত এই দুঃখতত্ত্ব তাঁর নিজের জীবনের পরম দুঃখের দিনে কি ভাবে কতটা সত্য ও বাস্তব হয়ে উঠেছে তার সন্ধান করলেই কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুজনিত দুঃখের আঘাতের স্বরূপনির্ণয় করা সম্ভব হবে।

৪

'বিশ্বজগতে তেজঃপদার্থ যেমন, মানুষের চিত্তে দুঃখ সেইরূপ; তাহাই আলোক, তাহাই তাপ, তাহাই গতি, তাহাই প্রাণ।'—দুঃখসত্য সম্পর্কে এই বাক্যটি মহাকবি-কণ্ঠোচ্চারিত দিব্যসংকেত। এই সংকেতের দ্বারাই কবিমানসে অধিবাসিত দুঃখের অনুভূতি ও তার বিচিত্র পরিণতির সূত্রসন্ধান সম্ভব। কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুর সাতাশ বৎসর পরে লেখা 'জীবনস্মৃতি'তে [রচনাকাল ১৩১৮ ভাদ্র-১৩১৯ শ্রাবণ] একান্ন বৎসর বয়সে কবি তাঁর 'চব্বিশ' বৎসর বয়সের মৃত্যুশোক সম্পর্কে যা লিখেছেন সর্বাগ্রে সে কথা স্মরণ করা প্রয়োজন।

কেন না সাতাশ বৎসরের ব্যবধানে দাঁড়িয়ে 'প্রথম-পুরুষে'র মোহমুক্ত দৃষ্টিতে 'উত্তম-পুরুষে'র মর্মলোক সেখানেই নিঃশেষে নির্বারিত হয়েছে। কবি লিখছেন, এতদিন তিনি যে এক নিরবচ্ছিন্ন স্বপ্নাবেশের মধ্যে আবিষ্ট ছিলেন মৃত্যু এসে অকস্মাৎ সেই মোহাবেশ ভেঙে দিয়ে গেল। 'জীবনের মধ্যে কোথাও যে কিছুমাত্র ফাঁক আছে, তাহা তখন জানিতাম না; সমস্তই হাসিকান্নায় একেবারে নিরেট করিয়া বোনা। তাহাকে অতিক্রম করিয়া আর-কিছুই দেখা যাইত না, তাই তাহাকে একেবারে চরম করিয়াই গ্রহণ করিয়াছিলাম। এমন সময় কোথা হইতে মৃত্যু আসিয়া এই অত্যন্ত প্রত্যক্ষ জীবনটার একটা প্রান্ত যখন এক মুহূর্তের মধ্যে ফাঁক করিয়া দিল, তখন মনটার মধ্যে সে কী ধাঁধাই লাগিয়া গেল।' মুহূর্তের মধ্যে এই ফাঁক-হয়ে-যাওয়া শূন্যতাবোধের মধ্যে কবির কেবলই মনে হতে লাগল, 'যাহা আছে এবং যাহা রহিল না, এই উভয়ের মধ্যে কোনোমতে মিল করিব কেমন করিয়া!'

এই চিন্তা, এই চেতনাই কবিমানসে অনুক্ষণ জিজ্ঞাসার আকারে জাগ্রত হয়ে রইল। 'জীবনের এই রন্ধ্রটির ভিতর দিয়া যে একটা অতলস্পর্শ অন্ধকার প্রকাশিত হইয়া পড়িল, তাহাই আমাকে দিনরাত্রি আকর্ষণ করিতে লাগিল। আমি ঘুরিয়া ফিরিয়া কেবল সেইখানে আসিয়া দাঁড়াই, সেই অন্ধকারের দিকেই তাকাই এবং খুঁজিতে থাকি—যাহা গেল তাহার পরিবর্তে কী আছে।' 'চারাগাছকে অন্ধকার বেড়ার মধ্যে ঘিরিয়া রাখিলে, তাহার সমস্ত চেষ্টা যেমন সেই অন্ধকারকে কোনোমতে ছাড়াইয়া আলোকে মাথা তুলিবার জন্য পদাঙ্গুলিতে ভর করিয়া যথাসম্ভব খাড়া হইয়া উঠিতে থাকে—তেমনি, মৃত্যু যখন মনের চারিদিকে হঠাৎ একটা 'নাই'-অন্ধকারের বেড়া গাড়িয়া দিল, তখন সমস্ত মনপ্রাণ অহোরাত্র দুঃসাধ্য চেষ্টায় তাহারই ভিতর দিয়া কেবলই 'আছে'-আলোকের মধ্যে বাহির হইতে চাহিল। কিন্তু সেই অন্ধকারকে অতিক্রম করিবার পথ অন্ধকারের মধ্যে যখন দেখা যায় না তখন তাহার মতো দুঃখ আর কী আছে।'

এই দুর্বিষহ দুঃখের দহনে দগ্ধ হতে হতেই কবি খুঁজে পেলেন অন্ধকারকে অতিক্রম করার পথ। মৃত্যুর মধ্য দিয়ে যে একমুহূর্তে 'নাই' হয়ে গেল বিশ্বজীবনের মধ্যে সে যে 'আছে'—এই প্রতীতিতে দুঃখের অন্ধকারের মধ্যে আনন্দের আলো বিকশিত হয়ে উঠতে লাগল। থাকা এবং না-থাকা, অস্তি

এবং নাস্তি—এই দুই বিপরীত কোটি যে এক মহত্তর সঙ্গতিতে—'তদুভয়ে'—মিলিত হয়ে 'জীবন-মৃত্যুর হরণপূরণে' এই বিশ্বজীবনসত্যকে নিত্য-উন্মীলিত করে তুলছে কবি পেলেন এই সত্যের সন্ধান। হাসিকান্নায় নিরেট-করে-বোনা যে জীবনকে তিনি একেবারে চরম করেই গ্রহণ করেছিলেন সেই জীবনের প্রতি 'অন্ধ আসক্তি' জীবনমৃত্যুর হরণপূরণের অখণ্ড লীলারসের উপলব্ধির মধ্যে মুক্তি পেল। ব্যক্তিগত মোহের আসক্তি থেকে বিশ্বগত সত্যের মুক্তিলোকে 'নাই'-অন্ধকারকে অতিক্রম করে 'আছে'-আলোকের মধ্যে এই নিক্রমণের অনুভূতি বর্ণনা করে কবি লিখেছেন, 'তবু এই দুঃসহ দুঃখের ভিতর দিয়া আমার মনের মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে একটা আকস্মিক আনন্দের হাওয়া বহিতে লাগিল, তাহাতে আমি নিজেই আশ্চর্য হইতাম। জীবন যে একেবারে অবিচলিত নিশ্চিত নহে, এই দুঃখের সংবাদেই মনের ভার লঘু হইয়া গেল। আমরা যে নিশ্চল সত্যের পাথরে-গাঁথা দেয়ালের মধ্যে চিরদিনের কয়েদি নহি, এই চিন্তায় আমি ভিতরে ভিতরে উল্লাস বোধ করিতে লাগিলাম। যাহাকে ধরিয়াছিলাম তাহাকে ছাড়িতেই হইল, এইটাকে ক্ষতির দিক দিয়া দেখিয়া যেমন বেদনা পাইলাম তেমনি সেই ক্ষণে ইহাকে মুক্তির দিক দিয়া দেখিয়া একটা উদার শান্তি বোধ করিলাম। সংসারের বিশ্বব্যাপী অতি বিপুল ভার জীবনমৃত্যুর হরণপূরণে আপনাকে আপনি সহজেই নিয়মিত করিয়া চারিদিকে কেবলই প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে, সে-ভার বদ্ধ হইয়া কাহাকেও কোনোখানে চাপিয়া রাখিয়া দিবে না—একেশ্বর জীবনের দৌরাত্ম্য কাহাকেও বহন করিতে হইবে না—এই কথাটা একটা আশ্চর্য নূতন সত্যের মতো আমি সেদিন যেন প্রথম উপলব্ধি করিয়াছিলাম।'

এই 'আশ্চর্য নূতন সত্যের' সন্ধান, জীবনের প্রতি নিজের অন্ধ আসক্তি থেকে মুক্ত হয়ে বিশ্বসত্যের মধ্যে এই নিক্রমণের ফলেই কবি 'মরণের বৃহৎ পটভূমিকার উপরে' জগৎকে সম্পূর্ণ করে সুন্দর করে দেখার নূতন সৌন্দর্যদৃষ্টি লাভ করলেন। বিশ্বপ্রকৃতির সৌন্দর্যরূপের সাক্ষাৎ তিনি কি ভাবে পেলেন তার বর্ণনা দিয়ে বলছেন, 'সেই বৈরাগ্যের ভিতর দিয়া প্রকৃতির সৌন্দর্য আরও গভীররূপে রমণীয় হইয়া উঠিয়াছিল। কিছুদিনের জন্য জীবনের প্রতি আমার অন্ধ আসক্তি একেবারেই চলিয়া গিয়াছিল বলিয়াই, চারিদিকে আলোকিত নীল আকাশের মধ্যে গাছপালার আন্দোলন আমার অশ্রুধৌত

চক্ষে ভারি একটি মাধুরী বর্ষণ করিত। জগৎকে সম্পূর্ণ করিয়া এবং সুন্দর করিয়া দেখিবার জন্য যে-দূরত্বের প্রয়োজন মৃত্যু সেই দূরত্ব ঘটাইয়া দিয়াছিল। আমি নির্লিপ্ত হইয়া দাঁড়াইয়া মরণের বৃহৎ পটভূমিকার উপর সংসারের ছবিটি দেখিলাম এবং জানিলাম তাহা বড় মনোহর।'

আসক্তির বন্ধন থেকে এই মুক্তিকে কবি বলেছেন তাঁর জীবনে যেন 'একটা ছুটির পালা।' 'সেই সময়ে আবার কিছুকালের জন্য আমার একটা সৃষ্টিছাড়া রকমের মনের ভাব ও বাহিরের আচরণ দেখা দিয়াছিল। সংসারের লোকলৌকিকতাকে নিরতিশয় সত্য পদার্থের মতো মনে করিয়া তাহাকে সদাসর্বদা মানিয়া চলিতে আমার হাসি পাইত। * * কিছুকাল ধরিয়া আমার শয়ন ছিল বৃষ্টি বাদল শীতেও তেতালায় বাহিরের বারান্দায়; সেখানে আকাশের তারার সঙ্গে আমার চোখাচোখি হইতে পারিত। এবং ভোরের আলোর সঙ্গে আমার সাক্ষাতের বিলম্ব হইত না।

'এ সমস্ত যে বৈরাগ্যের কৃচ্ছ্রসাধন তাহা একেবারেই নহে। এ যেন আমার একটা ছুটির পালা, সংসারের বেত-হাতে গুরুমহাশয়কে যখন নিতান্ত একটা ফাঁকি বলিয়া মনে হইল তখন পাঠশালার প্রত্যেক ছোটো ছোটো শাসনও এড়াইয়া মুক্তির আস্বাদনে প্রবৃত্ত হইলাম।'

কিন্তু এই মুক্তির আস্বাদন কবি সহজে পান নি। এ মুক্তি পলায়নী-মনোবৃত্তিসম্পন্ন রোমান্টিক কবিমানসের কল্পনাভিসার থেকে আসে নি, 'সংসারের বেত-হাতে গুরুমহাশয়ের' আঘাতে আঘাতে জর্জরিত হয়ে তবেই কবি এই মুক্তির সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন। 'জীবনস্মৃতি'তে "মৃত্যুশোক" অধ্যায়ের সর্বশেষ অনুচ্ছেদে 'নাই'-অন্ধকার থেকে 'আছে'-আলোকে এই মুক্তির জন্যে কবির 'সমস্ত মনপ্রাণ অহোরাত্র যে দুঃসাধ্য চেষ্টা' করত তারই একটি ইঙ্গিত দিয়ে তিনি লিখছেন, 'বাড়ির ছাদে একলা গভীর অন্ধকারে মৃত্যুরাজ্যের কোনো-একটা চূড়ার উপরকার একটা ধ্বজপতাকা, তাহার কালোপাথরের তোরণদ্বারের উপরে আঁক-পাড়া কোনো-একটা অক্ষর কিংবা একটা চিহ্ন দেখিবার জন্য আমি যেন সমস্ত রাত্রিটার উপর অন্ধের মতো দুই হাত বুলাইয়া ফিরিতাম। আবার, সকালবেলায় যখন আমার সেই বাহিরের পাতা বিছানার উপরে ভোরের আলো আসিয়া পড়িত তখন চোখ মেলিয়াই দেখিতাম, আমার মনের চারিদিকের আবরণ যেন স্বচ্ছ হইয়া

আসিয়াছে; কুয়াশা কাটিয়া গেলে পৃথিবীর নদী গিরি অরণ্য যেমন ঝলমল করিয়া ওঠে, জীবন-লোকের প্রসারিত ছবিখানি আমার চোখে তেমনি শিশিরসিক্ত নবীন ও সুন্দর করিয়া দেখা দিয়াছে।'

জীবনের নদী গিরি অরণ্যের ঝলমল রূপ দেখার আগে 'সমস্ত রাত্রিটার উপর অন্ধের মত দুই হাত বুলাইয়া ফিরিবার' এই উৎপ্রেক্ষাসৃষ্টি রবীন্দ্রনাথের মত সূক্ষ্ম অনুভূতিসম্পন্ন কবির পক্ষেই সম্ভব। কিন্তু পূর্বেই বলা হয়েছে, এ রচনা মৃত্যুশোকের সাতাশ বৎসর পরে লেখা। অর্থাৎ তখন বেদনার অগ্নিদাহ নির্বাপিত হয়ে অনুক্ষণ-জ্বালার অবসান হয়েছে, রয়েছে তার স্মৃতি। কিন্তু সেই অগ্নিদাহের স্মৃতিমাত্রের উদ্বোধনে যদি এই উৎপ্রেক্ষার সৃষ্টি হয়ে থাকে তা হলে যখন কবি সেই দাহে দগ্ধ হচ্ছেন তখন তাঁর চিত্তে দুঃখ কী মর্মান্তিক মূর্তিতে দেখা দিয়েছিল সহজেই অনুমেয়। এবং এ কথাও এই সঙ্গে স্মরণীয় যে, যখন অর্ধরাত্রে সেই দুঃখরাজের রথচক্রের বজ্রগর্জনে মেদিনী বলির পশুর হৃৎপিণ্ডের মত কেঁপে ওঠে তখনো কবি সেই প্রচণ্ড আবির্ভাবের জয়ধ্বনি করেছেন। কেন না তিনি জেনেছেন অমাবস্যার অন্ধকারে অনন্ত জ্যোতিষ্কলোককে যেমন প্রকাশ করে দেয় তেমনি দুঃখের নিবিড়তম তমসার মধ্যে অবতীর্ণ হয়ে আত্মা আনন্দলোকের ধ্রুবজ্যোতি দেখতে পায়। তাই তাঁর দৃষ্টিতে দুঃখের তত্ত্ব আর সৃষ্টির তত্ত্ব একেবারে একসঙ্গে বাঁধা। এই জন্যেই কবিচেতনায় মৃত্যুতত্ত্ব ও দুঃখতত্ত্ব চিরদিন অসামান্য গুরুত্ব পেয়েছে। আর, বলাই বাহুল্য, কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুই কবিকে সেই দুঃখের সন্ধান দিয়েছে যে-দুঃখকে তিনি বিশ্বজগতের তেজঃপদার্থের সঙ্গে তুলনা করে বলেছেন, মানুষের চিত্তে 'তাহাই আলোক, তাহাই তাপ, তাহাই গতি, তাহাই প্রাণ।' কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুজনিত দুঃখের আগুন তাঁকে শুধু দগ্ধই করে নি, সেই তেজঃশক্তিই তাঁর সত্তায় দিয়েছে আলো, দিয়েছে তাপ, দিয়েছে গতি, দিয়েছে প্রাণ। সাত বৎসর বয়সে একদিন যাঁর সোনার কাঠির ছোঁওয়ায় শিশু-রবির ঘুম ভেঙেছিল, ষোলো-বৎসর-ব্যাপী অনুক্ষণ সঙ্গ ও সান্নিধ্যের প্রেরণা দিয়ে যিনি সেই শিশুসত্তাকে কবিসত্তায় রূপান্তরিত করেছিলেন, চব্বিশ বৎসর বয়সে তাঁরই শ্মশানবহ্নির অগ্নিশলাকায় উদ্দীপ্ত হয়ে সেই কবি খুঁজে পেলেন তাঁর জীবন ও জগতের মূল সত্যকে। তাই রবীন্দ্রনাথের জীবনে কাদম্বরী দেবীর স্বেচ্ছামৃত্যুই তাঁর সবচেয়ে বড় প্রেমের দান।

৫

কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুর সাতাশ বছর পরে 'জীবনস্মৃতি'তে অভিব্যক্ত কবির স্মৃতিচিন্তনের আলোকে মৃত্যুর স্বল্পকালের মধ্যে লেখা রচনাবলীর বিশ্লেষণ করলে সন্তঃশোকার্ত ও দুঃখাভিহত তরুণ কবিচিত্তের সম্যক্ পরিচয় পাওয়া সম্ভব হবে। আমরা মৃত্যুর এক বৎসরের মধ্যে লেখা অর্থাৎ ১২৯১ বঙ্গাব্দে সাময়িক-পত্রিকায় প্রকাশিত কবির রচনাবলীর কথা উল্লেখ করেছি। ১২৯২ বঙ্গাব্দে 'ভারতী' এবং 'বালক' পত্রিকায় প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের গন্ত ও কবিতার কথাও এই প্রসঙ্গে অবশ্য-স্মর্তব্য। ১২৯২ সালের 'ভারতী'তে বৈশাখে বেরোয় নূতন (কবিতা) [হেথাও তো পশে সূর্যকর !], পুষ্পাঞ্জলি, রসিকতার ফলাফল (প্রবন্ধ); জ্যৈষ্ঠে বিবিধ প্রসঙ্গ [১-১৩]; শ্রাবণে সাকার ও নিরাকার উপাসনা (প্রবন্ধ); ভাদ্রে বিবিধ প্রসঙ্গের [১-১৭] দ্বিতীয় কিস্তি; এবং ফাল্গুনে 'পত্র' (কবিতা) [জলে বাসা বেঁধেছিলেম, ডাঙায় বড় কিচিমিচি]। এই বৎসরই জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর সম্পাদনায় ঠাকুরবাড়ি থেকে 'বালক' পত্রিকা প্রকাশিত হল। এই বৎসরে কবির বেশির ভাগ রচনাই 'বালকে' প্রকাশিত হয়েছে। বৈশাখে 'বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর' (কবিতা), কাজের লোক কে ? [নানকের কাহিনী], মুকুট, গুটিকত গল্প [শিশুশিক্ষামূলক নিবন্ধ], ফুলের ঘা (কবিতা) [বসন্ত বালক মুখভরা হাসিটি]; জ্যৈষ্ঠে মা লক্ষ্মী (কবিতা) [কার পানে মা চেয়ে আছ মেলি দুটি করুণ আঁখি !], লাঠির উপর লাঠি [জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর প্রবন্ধের উত্তর], মুকুট, চিরঞ্জীবেষু [চিঠিপত্র], হেঁয়ালি নাট্য ; আষাঢ়ে সাত ভাই চম্পা (কবিতা), দশদিনের ছুটি [ভ্রমণ কাহিনী, বিচিত্র প্রবন্ধের 'ছোটনাগপুর'], রাজর্ষি [উপন্যাস, এর পর থেকে প্রতিমাসে ক্রমশঃ প্রকাশিত], শ্রীচরণেষু [চিঠিপত্র], হেঁয়ালি নাট্য, আকবর শাহের উদারতা [শিশুশিক্ষামূলক]; শ্রাবণে ন্যায়ধর্ম [শিশুশিক্ষামূলক], বীরগুরু [গুরু গোবিন্দের কথা], হাসিরাশি (কবিতা) [তার নাম রেখেছি বাবলারাণী একরত্তি মেয়ে], চিরঞ্জীবেষু, বর্ষার চিঠি (কবিতা), হেঁয়ালি নাট্য ; ভাদ্রে পুরানো বট (কবিতা), শ্রীচরণেষু, হেঁয়ালি নাট্য ; আশ্বিন-কার্তিকে বাঙ্গালা উচ্চারণ [শব্দতত্ত্ব], চিরঞ্জীবেষু, হেঁয়ালি নাট্য ; আকুল আহ্বান (কবিতা)

[অভিমান করে কোথায় গেলি। আয় মা ফিরে আয় মা ফিরে আয়।], রুদ্ধগৃহ (প্রবন্ধ), বরফ পড়া [শিশুপাঠ্য], গ্রিথ স্বাধীনতা [শিশুপাঠ্য] ; অগ্রহায়ণে বৈজ্ঞানিক সংবাদ [শিশুপাঠ্য], পথপ্রান্তে (প্রবন্ধ), শিউলিফুলের গাছ, হেঁয়ালি নাট্য, একটি প্রশ্ন [শব্দতত্ত্ব] ; পৌষে আহ্বানগীত (কবিতা) [পৃথিবী জুড়িয়া বেজেছে বিষাণ], উত্তর-প্রত্যুত্তর [রুদ্ধগৃহ সম্পর্কে অক্ষয় চৌধুরীর পত্র ও রবীন্দ্রনাথের উত্তর], শ্রীচরণেষু, হেঁয়ালি নাট্য ; মাঘে হেঁয়ালি নাট্য, চিরঞ্জীবেষু ; ফাল্গুনে চিঠি (কবিতা) [চিঠি লিখব কথা ছিল, দেখছি সেটা ভারি শক্ত], সংজ্ঞা বিচার [শব্দতত্ত্ব] ; এবং চৈত্রে ডেঁএে পিঁপড়ের মন্তব্য [রসরচনা], বানরের শ্রেষ্ঠত্ব [তদেব], জন্মতিথির উপহার (কবিতা) [স্নেহ উপহার এনেছিরে দিতে। লিখেও এনেছি দু তিন ছত্তর], শ্রীচরণেষু, চিরঞ্জীবেষু, সত্য [প্রবন্ধ], অবসাদ (কবিতা—বাল্যকালের লেখা) [দয়াময়ি, বাণি, বীণাপাণি], হেঁয়ালি নাট্য।

এই রচনাবলীর মধ্যে "নূতন" কবিতা এবং "পুষ্পাঞ্জলি", "বিবিধ প্রসঙ্গ", "রুদ্ধগৃহ", "পথপ্রান্তে" ও "শিউলিফুলের গাছ" এই গদ্যরচনাপঞ্চক কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুর প্রত্যক্ষ প্রভাব-সঞ্জাত সৃষ্টি। মৃত্যুশোক কবিমানসে কী বিচিত্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল এই পাঁচটি নিবন্ধের মধ্যে তার ইতিহাস লিপিবদ্ধ রয়েছে। ১২৯১ ও ৯২ এই দু বৎসরের মধ্যে কবির অন্যান্য রচনাকে মুখ্যত দুটি পর্যায়ভুক্ত করা চলে ; প্রথম পর্যায়ে শিশুপাঠ্য রচনা এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে সমাজ-ধর্ম-সংক্রান্ত তত্ত্বজিজ্ঞাসা। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ১২৯১ সালের আশ্বিন মাসে মহর্ষিদেব রবীন্দ্রনাথকে আদি-ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক-পদের দায়িত্বপূর্ণ কর্মে আহ্বান করলেন। রবীন্দ্রনাথের স্কন্ধে এই প্রথম সামাজিক কর্তব্যপালনের আনুষ্ঠানিক দায়িত্ব ন্যস্ত হল। আদি-ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক হিসাবে নবহিন্দুধর্ম-ব্যাখ্যাতা বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁর পরিকরবৃন্দের সঙ্গে এই সময় থেকেই রবীন্দ্রনাথের বাগ্‌যুদ্ধের সূত্রপাত হল। প্রতিপক্ষের সঙ্গে তর্কযুদ্ধ এবং তদ্দ্বারা সত্যপ্রতিষ্ঠায় তরুণ রবীন্দ্রনাথের নিষ্ঠা ও উদ্দীপনার ফলে "একটি পুরাতন কথা", "সাকার ও নিরাকার উপাসনা" এবং "সত্য" প্রভৃতি প্রবন্ধের আবির্ভাব ঘটেছে।

কিন্তু শিশুসাহিত্য-সৃষ্টির প্রেরণা বহিরাগত নয়, তা তাঁর প্রাণাবেগের তাগিদেই উৎসারিত। ঠাকুরবাড়ির বালকবালিকাদের রচনায় উৎসাহদান

এবং তাদের সাহিত্যামোদী করে তোলার উদ্দেশ্যেই 'বালক' পত্রিকার উদ্ভব হয়েছিল। বালকবালিকাদের মধ্যে তখন জোড়াসাঁকোর এ বাড়িতে আছেন সুধীন্দ্রনাথ, বলেন্দ্রনাথ, সুরেন্দ্রনাথ ও ইন্দিরা এবং ও-বাড়িতে গগনেন্দ্রনাথ, সমরেন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথ। এই নামাবলীর মধ্যে যে নামটি বাদ পড়েছে সেটি হল কবিজায়া মৃণালিনী দেবীর। 'বালক' প্রকাশের সময় মৃণালিনী দ্বাদশবর্ষীয়া বালিকাবধূ। মৃণালিনী দেবী আর ইন্দিরা দেবী ছিলেন সমবয়স্কা। সমবয়স্কা এই দুই বালিকার মধ্যে সখীত্ব-সম্বন্ধ গড়ে ওঠা খুবই স্বাভাবিক ছিল। রবীন্দ্রনাথের অপূর্ব-দাম্পত্যজীবনের প্রথম স্তরে এই সখীত্ব নানাদিক দিয়েই ফলপ্রসূ হয়েছিল। বালিকাবধূর প্রতি কবির পূর্বরাগ-প্রকাশের পক্ষেও তা ছিল সহায়ক। একটা উদাহরণ দিলে কথাটা স্পষ্ট হবে। ১২৯২ সালে বোম্বাই থেকে কবি "চিঠি" নামে একটি পত্রকাব্য প্রেরণ করেন। ফাল্গুনের 'বালকে' তা প্রকাশিত হয়। 'শ্রীমতী—প্রাণাধিকাসু'—এই চিঠির উদ্দিষ্টা। তাতে কবি লিখছেন, 'চিঠি লিখব কথা ছিল, দেখছি সেটা ভারি শক্ত।' এই চিঠিতে যে 'দুষ্টু মেয়েটি'র কথা আছে তার মধ্যে 'বিবি' [ইন্দিরা] ও 'ফুলি' দুটি সত্তাই যেন এক হয়ে গেছে। 'ফুলি' অর্থাৎ মৃণালিনী ঠাকুর-পরিবারে এসেও তাঁর পুতুলের খেলাঘর সাজিয়ে পরিতৃপ্ত থাকতেন। 'খেয়া' কাব্যগ্রন্থের "বালিকাবধূ" কবিতায় নিজের বালিকাবধূর বাল্যলীলারই প্রতিবিম্ব কবি রচনা করেছেন। মহর্ষি-পরিবারে মৃণালিনীর শিক্ষা-দীক্ষার যে আয়োজন হয়েছিল তার কথা পূর্বে বলা হয়েছে। 'বালক' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ যে-সব শিশুপাঠ্য কবিতা ও নিবন্ধাদি রচনা করেছেন সেগুলির মুখ্যপ্রেরণা এসেছে বালিকাবধূর শিক্ষা ও মনোরঞ্জনের বাসনা থেকে। 'হেঁয়ালি নাট্যে' মাসের পর মাস তিনি সাহিত্যক্ষেত্রে এক অভিনব খেলাঘরই সাজিয়েছিলেন।

বালিকাবধূর পুতুলের সংসার সম্পর্কে কবির সস্নেহ অনুরাগের একটি মধুর আলেখ্য পাওয়া যাবে একটি অপ্রত্যাশিত সূত্রে। 'শব্দতত্ত্ব' গ্রন্থের প্রথম প্রবন্ধ "বাংলা-উচ্চারণে" এই ছবিটি আত্মগোপন করে আছে। প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল ১২৯২ সালের 'বালকে'র আশ্বিন-কার্তিক সংখ্যায়; অর্থাৎ কবির বিবাহের ঠিক দু বছর পরে। মহর্ষি-পরিবারে যশোর-খুলনার বধূদের প্রথম সংস্কার হত তাঁদের 'বাঙাল'-উচ্চারণ সংশোধনের দ্বারা। "বাংলা-উচ্চারণ" প্রবন্ধ রচনার মূলে কবিজায়ার উচ্চারণ-সংস্কারের প্রেরণা কবিমানসে

ক্রিয়াশীল হয়েছিল অনুমান করা অন্যায় হবে না। এই প্রবন্ধে কবি লিখেছেন, ইংলণ্ডে থাকতে তাঁর একজন ইংরেজ বন্ধুকে [স্কট-দুহিতা প্রসঙ্গ স্মরণীয়] বাংলা পড়াবার সময় বাংলা উচ্চারণ সম্পর্কে তাঁর মনে যে সব প্রশ্ন জাগে সেগুলি তিনি একটি খাতায় লিখে রেখেছিলেন। বাংলা অভিধানের সাহায্যে উদাহরণ সংগ্রহ করে উচ্চারণের বিশৃঙ্খলার মধ্যে একটা নিয়ম আবিষ্কারের চেষ্টাই ছিল এই লেখার উদ্দেশ্য। কবি লিখছেন :

'এই সকল উদাহরণ এবং তাহার টীকায় রাশি রাশি কাগজ পুরিয়া গিয়াছিল। যখন দেশে আসিলাম তখন এই কাগজগুলি আমার সঙ্গে ছিল। একটি চামড়ার বাক্সে সেগুলি রাখিয়া আমি অত্যন্ত নিশ্চিন্ত ছিলাম। দুই বৎসর হইল, একদিন সকালবেলায় ধুলা ঝাড়িয়া বাক্সটি খুলিলাম, ভিতরে চাহিয়া দেখি—গোটা দশেক হলদে রং-করা মস্ত খোঁপাবিশিষ্ট মাটির পুতুল তাহাদের হস্তদ্বয়ের অসম্পূর্ণতা ও পদদ্বয়ের সম্পূর্ণ অভাব লইয়া অম্লান বদনে আমার বাক্সের মধ্যে অন্তঃপুর রচনা করিয়া বসিয়া আছে। আমার কাগজপত্র কোথায়। কোথাও নাই। একটি বালিকা আমার হিজিবিজি কাগজগুলি বিষম ঘৃণাভরে ফেলিয়া দিয়া বাক্সটির মধ্যে পরম সমাদরে তাহার পুতুলের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। তাহাদের বিছানাপত্র, তাহাদের কাপড়চোপড়, তাহাদের ঘটিবাটি, তাহাদের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের সামান্যতম উপকরণটুকু পর্যন্ত কিছুরই ত্রুটি দেখিলাম না, কেবল আমার কাগজগুলিই নাই। বুড়ার খেলা বুড়ার পুতুলের জায়গা ছেলের খেলা ছেলের পুতুল অধিকার করিয়া বসিল। প্রত্যেক বৈয়াকরণের ঘরে এমনি একটি করিয়া মেয়ে থাকে যদি, পৃথিবী হইতে সে যদি তদ্ধিত প্রত্যয় ঘুচাইয়া তাহার স্থানে এইরূপ ঘোরতর পৌত্তলিকতা প্রচার করিতে পারে, তবে শিশুদের পক্ষে পৃথিবী অনেকটা নিষ্কণ্টক হইয়া যায়।'[১৭]

এই উদ্ধৃতির অন্তিম মন্তব্যটির ব্যঞ্জনা লক্ষণীয়। কবির নিজের জীবন-ব্যাকরণের তদ্ধিত প্রত্যয়ের বিশৃঙ্খল সূত্রগুলির মধ্যে তিনি যখন একটা নিয়ম আবিষ্কারের জন্যে দুঃসাধ্য গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেছেন তখন তাঁর ঘরের বালিকাবধূটি তাঁর পুতুলখেলা নিয়েই পরিতৃপ্ত ছিলেন বলে তাঁর কাছে 'সমস্যাসংকুল এই পৃথিবী' ছিল একান্তই 'নিষ্কণ্টক'। বস্তুত, কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুকালে মৃণালিনী ছিলেন নিতান্তই বালিকা। তাঁর পুতুলের খেলাঘরে

পৃথিবীর হরণপূরণলীলার কোনোই ছায়া তখনো পড়ে নি। বিবাহের অব্যবহিত পরে রবীন্দ্রনাথ যে নাটক রচনা করেছিলেন সেই 'অকিঞ্চিৎকর' 'নলিনী'-গদ্যনাট্যে তিনি বালিকা 'ফুলি'র যে ভূমিকা কল্পনা করেছিলেন সেদিন তাঁর জীবননাট্যেও তাঁর বালিকাবধূ 'ফুলি'র ভূমিকা তার অধিক ছিল না। এই 'নলিনী' নাটক-রচনার ইতিহাসটি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। কবির বিবাহের আনন্দানুষ্ঠানকে মধুরতর করে তোলবার জন্যে একটি নাটক-অভিনয়ের প্রস্তাব হল। স্থির হল যে, এই নাটকের রচয়িতা হবেন অভিনেতারা স্বয়ং। মোটামুটি ভাবে একটি গল্পকাঠামো খাড়া করে অভিনয়ের অংশ নিজেদের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হল,—এবং স্থির হল যে, একজন নিজের অংশ লিখে দিলে অন্যজন তাঁর অংশ লিখবেন। কিন্তু বলা নিষ্প্রয়োজন, এ ভাবে নাটক রচনা সম্ভব হয় না। কাজেই শেষকালে রবীন্দ্রনাথ নিজে প্রাথমিক খসড়ার উপর ভিত্তি করে গড়ে তুললেন যে গদ্যনাট্য তার নামকরণ করা হল 'নলিনী'—রবীন্দ্রনাথের প্রিয় নাম। নাটক-রচনা শেষ হল বটে, কিন্তু তার অভিনয় আর হল না। বৈশাখে কাদম্বরী দেবী লোকান্তরিতা হলেন।[১৮]

এই গদ্য-নাট্যখানিকে কবি 'অকিঞ্চিৎকর' বলে অভিহিত করেছেন, কিন্তু 'মায়ার খেলা'র ভূমিকায় তিনি স্বীকার করেছেন যে, 'নলিনী'র সঙ্গে তার সাদৃশ্য রয়েছে। 'নলিনী' নাটকে নলিনী নীরদ নীরজা ও নবীনকে অবলম্বন করে প্রেমের যে চতুর্ভুজ-সমস্যা রচিত হয়েছে সেখানে 'বালিকা ফুলি' তার শিশুচিত্তের কৌতূহল নিয়ে কেবল দক্ষিণ সমীরণের স্নিগ্ধ স্পর্শের মত নায়ক-নায়িকার চিত্তে লগ্ন হয়ে আছে। কখনো সে তার অজ্ঞাতসারে বকুল গাছের তলায় ঝরে-পড়া সুন্দর ফুলগুলি মাড়িয়ে দিয়ে চলে যায়; কখনো অন্যের চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে তাকে ডাক দেয় ফুলের আর পাখির আর গানের আনন্দসত্রে।

সেদিন রবীন্দ্রজীবনে তাঁর বালিকাবধূ ফুলিরও ছিল ওই একই ভূমিকা। কিন্তু ওই 'নবীনা' 'বুদ্ধিবিহীনা বালিকাবধূ'র প্রতি কবির প্রথমানুরাগ সঞ্চারিত হল মৃত্যুর করুণ পটভূমিকার উপর। হাসিকান্নায় একেবারে নিরেট-করে-বোনা জীবনটার একটা প্রান্ত যখন মৃত্যু এসে একেবারে ফাঁক করে দিয়ে গেল তখন কবি প্রত্যক্ষ করলেন যে, কাছে-পাওয়া এবং ধরে-রাখাটাই জীবনের একমাত্র সত্য নয়, অকস্মাৎ অপ্রত্যাশিত ভাবে চলে-যাওয়া

এবং ছেড়ে-দেওয়াটাও সমান ভাবেই সত্য। মৃত্যুসাক্ষিক এই জীবনসত্যই 'সোনার তরী'র যুগে "যেতে নাহি দিব" কবিতায় মানবজীবনের মর্মান্তিক ট্রাজিক-চেতনায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে :

এ অনন্ত চরাচরে স্বর্গমর্ত্য ছেয়ে
সব চেয়ে পুরাতন কথা, সবচেয়ে
গভীর ক্রন্দন "যেতে নাহি দিব।" হায়,
তবু যেতে দিতে হয়, তবু চলে যায়!

'মরণপীড়িত এই চিরজীবী প্রেমে'র দৃষ্টি দিয়েই কবি তাঁর বালিকাবধূর অস্ফুট নয়নকমলের দিকে প্রথম সকরুণ দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন। অন্তরে এই উপলব্ধির প্রথম সঞ্চার সম্পর্কে তিনি বলছেন :

'প্রতিদিনের সুখ-দুঃখ, প্রতিদিনের ধূলারাশি আমাদের চারিদিকে ভিত্তি রচনা করিয়া দেয়, শোকের এক ঝটিকায় সে সমস্ত ভূমিসাৎ হইয়া যায়, আমরা অনন্তের রাজপথে বাহির হইয়া পড়ি। এতদিন আমরা প্রতিদিনের মানুষ ছিলাম, এখন অনন্ত আমরা অনন্তকালের জীব। এতদিন আমরা বাড়ি ঘর দুয়ারের জীব ছিলাম, এখন আমরা অনন্ত জগতের সীমাহীনতার মধ্যে বাস করি। যাহাদিগকে নিতান্ত আপনার মনে করিয়াছিলাম, তাহারা তত আপনার নহে, সেইজন্য তাহাদিগকে বেশী করিয়া আদর করি, মনে করি এ পান্থশালা হইতে কে কবে কোন্ পথে যাত্রা করিবে, এ দুদিনের সৌহার্দ্যে যেন বিচ্ছেদ বা অসম্পূর্ণতা না থাকে।'[১১]

মৃত্যু-প্রত্যক্ষ-করা এই 'বিশ্লেষধিয়ার্তি'—এই হারাই-হারাই ভাব থেকেই তরুণ কবির দাম্পত্যচেতনার প্রথম স্তর রচিত হয়েছে। এই অনুভূতির প্রথম প্রকাশ রয়েছে ১২৯২ সালের বৈশাখে প্রকাশিত "নূতন" কবিতায়। এই কবিতার অন্তিম স্তবকে কবি বলছেন :

একি ঢেউ-খেলা হায়, এক আসে আর যায়,
কাঁদিতে কাঁদিতে আসে হাসি,
বিলাপের শেষ তান না হইতে অবসান
কোথা হতে বেজে ওঠে বাঁশি।
আয় রে কাঁদিয়া লই, শুকাবে দু-দিন বই
এ পবিত্র অশ্রুবারিধারা।

সংসারে ফিরিব ভুলি, ছোটো ছোটো ফুলগুলি
রচি দিবে আনন্দের কারা।
না রে, করিব না শোক, এসেছে নূতন লোক,
তারে কে করিবে অবহেলা।
সেও চলে যাবে কবে, গীত গান সাঙ্গ হবে,
ফুরাইবে দু'দিনের খেলা।[১০]

'এসেছে নূতন লোক', 'সেও চলে যাবে কবে, গীত গান সাঙ্গ হবে', এবং দু'দিনের খেলা ফুরিয়ে যাবে—এই চেতনাতেই কবি তাঁর সংসারের একটি নিঃসহায় বালিকামূর্তির দিকে ফিরে তাকিয়েছেন। এই একই অনুভূতি পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে পরবর্তী বৎসরের 'ভারতী ও বালক'-এ প্রকাশিত "বিরহীর পত্র" কবিতায় [ভাদ্র, ১২৯৩, পৃ° ৩১৪-১৫]। সেখানেও একই চেতনার অভিব্যক্তি পরিলক্ষিত হবে। প্রবাসে গিয়ে প্রোষিতভর্তৃকা ত্রয়োদশী বধূর কথা চিন্তা করে কবি লিখছেন:

হয় কি না হয় দেখা, ফিরি কি না ফিরি,
দূরে গেলে এই মনে হয়,
দুজনার মাঝখানে অন্ধকারে ঘিরি
জেগে থাকে সতত সংশয়।
এত লোক, এত জন, এত পথ গলি,
এমন বিপুল এ সংসার,
ভয়ে ভয়ে হাতে হাতে বেঁধে বেঁধে চলি,
ছাড়া পেলে কে আর কাহার!
কে কোথায় হারাইব কোন্ রাত্রিবেলা
কে কোথায় হইব অতিথি।
তখন কি মনে রবে দুদিনের খেলা
দরশের পরশের স্মৃতি।

তাই মনে করে কিরে চোখে জল আসে
একটুকু চোখের আড়ালে।

প্রাণ যারে প্রাণের অধিক ভালবাসে
সেও কি রবে না এককালে।
আশা নিয়ে একি শুধু খেলাই কেবল—
সুখ দুঃখ মনের বিকার।
ভালোবাসা কাঁদে, হাসে, মোছে অশ্রুজল,
চায়, পায়, হারায় আবার।'[২১]

কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুশোক কবিকে কি ভাবে তাঁর বালিকা-বধূর প্রতি আকৃষ্ট করেছে, কি ভাবে বিচ্ছেদের অনুক্ষণ-আশঙ্কা নবমিলনকে অশ্রুমধুর করে রেখেছে এই রচনাগুলি তারই চিরন্তন সাক্ষী।

৬

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'মৃত্যু একটা প্রকাণ্ড কালো কঠিন কষ্টিপাথরের মতো। ইহারই গায়ে কষিয়া সংসারের সমস্ত খাঁটি সোনার পরীক্ষা হইয়া থাকে।'[২২] কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুর দু বৎসরের মধ্যে লেখা 'পুষ্পাঞ্জলি', 'বিবিধ প্রসঙ্গ', 'রুদ্ধগৃহ', 'পথপ্রান্তে' ও 'শিউলিফুলের গাছ' এই পাঁচটি গদ্যরচনায় মৃত্যুশোক কবিমানসে কী বিচিত্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল তারই সাক্ষ্য বহন করছে। জীবন জগৎ ও প্রেম সম্পর্কে কবির চিন্তা ও চেতনা মৃত্যুর কঠিন কষ্টিপাথরে নিকষিত হয়ে প্রথম এই রচনাগুচ্ছে প্রকাশিত হয়েছিল বলে এগুলির মূল্য অপরিসীম। বিশ্লেষণ করলেই দেখা যাবে এই রচনাগুচ্ছের মধ্যে একটি ঘনিষ্ঠ ভাবসম্বন্ধ বিরাজমান। তার মধ্যে রুদ্ধগৃহ ও পথপ্রান্তের রচনারীতি এক, অর্থাৎ এ দুটি প্রবন্ধরূপেই গ্রথিত। 'শিউলিফুলের গাছ' একটি বিশুদ্ধ রূপকাত্মক রচনা। আর পুষ্পাঞ্জলি ও বিবিধ প্রসঙ্গের রচনারীতি মোরান সাহেবের বাগানবাড়িতে লেখা কবির প্রথম মন্ময় গদ্যগ্রন্থ 'বিবিধ প্রসঙ্গে'রই অনুরূপ। অর্থাৎ এগুলি স্বয়ংসম্পূর্ণ অনুচ্ছেদে বিভক্ত। পুষ্পাঞ্জলিতে সবশুদ্ধ বারোটি অনুচ্ছেদ আছে, আর 'বিবিধ প্রসঙ্গে' 'ভারতী'র জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় তেরোটি এবং ভাদ্র সংখ্যায় সতেরোটি মোট ত্রিশটি অনুচ্ছেদ রয়েছে। 'বিবিধ প্রসঙ্গে'র কয়েকটি অনুচ্ছেদ চলতি ভাষায় রূপান্তরিত হয়ে 'বিচিত্র প্রবন্ধে'র দ্বিতীয় সংস্করণে (১৩৪২) 'নানা কথা'র

আকারে গ্রথিত হয়েছে। কাদম্বরী দেবীর প্রতি অনুরক্তির কথাই শুধু যে এই রচনাগুলির মধ্যে আছে তা নয়, জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে রবীন্দ্রমানসের মূল ভাবসূত্রগুলিরও পরিচয় এগুলির মধ্যে ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তাই এই রচনাগুচ্ছকে প্রধানত দু ভাগে বিভক্ত করে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে ;—প্রথম ভাগে মৃত্যুরচিত অপার বিচ্ছেদের একপারে দাঁড়িয়ে কবির ঐকান্তিক অনুরক্তির কথা, আর দ্বিতীয় ভাগে মৃত্যু-তীর্ণ অভিজ্ঞতায় জীবন ও জগতের সম্বন্ধে যে নূতন চিন্তাধারা উদ্ভূত হয়েছে তার কথা।

'পুষ্পাঞ্জলি'তে কবি বলছেন, 'হে জগতের বিস্মৃত, আমার চিরস্মৃত, আগে তোমাকে যেমন গান শুনাইতাম, এখন তোমাকে তেমন শুনাইতে পারি না কেন? এ সব লেখা যে আমি তোমার জন্য লিখিতেছি। পাছে তুমি আমার কণ্ঠস্বর ভুলিয়া যাও, অনন্তের পথে চলিতে চলিতে যখন দৈবাৎ তোমাতে আমাতে দেখা হইবে, তখন পাছে তুমি আমাকে চিনিতে না পার, তাই প্রতিদিন তোমাকে স্মরণ করিয়া আমার এই কথাগুলি তোমাকে বলিতেছি, তুমি কি শুনিতেছ না! এমন একদিন আসিবে যখন এই পৃথিবীতে আমার কথার একটিও কাহারো মনে থাকিবে না—কিন্তু ইহার একটি-দুটি কথা ভালবাসিয়া তুমিও কি মনে রাখিবে না! যে-সব লেখা তুমি এত ভালবাসিয়া শুনিতে, তোমার সঙ্গেই যাহাদের বিশেষ যোগ, একটু আড়াল হইয়াছ বলিয়াই তোমার সঙ্গে আর কি তাহাদের কোন সম্বন্ধ নাই! এত পরিচিত লেখার একটি অক্ষরও মনে থাকিবে না? তুমি কি আর-এক দেশে আর-এক নূতন কবির কবিতা শুনিতেছ?'

যিনি 'জগতের বিস্মৃত', কিন্তু কবির 'চিরস্মৃত', তাঁর জন্যেই কবির এসব রচনা, অথচ তাঁকে শোনাতে পারছেন না বলে কবির দুঃখের শেষ নেই। যে-সব লেখা তিনি এত ভালবেসে এতদিন শুনতেন, তাঁর সঙ্গেই যাদের বিশেষ যোগ ছিল, দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে গেছেন বলেই তাদের সঙ্গে আর তাঁর কোনো সম্বন্ধ নেই এ চিন্তা কবির পক্ষে দুর্বিষহ। কিন্তু শুধু কাব্যরচনার সঙ্গেই যে তাঁর বিশেষ যোগ ছিল তাও তো নয়, সুদীর্ঘ ষোলো বৎসর ধরে কবির সম্পূর্ণ জীবনটাই যে তাঁর সঙ্গে সুখেদুঃখে গ্রথিত হয়ে উঠেছিল। সে কথাকেই বিশেষ করে স্মরণ করে কবি লিখেছেন, 'আমাকে যাহারা চেনে সকলেই ত আমার নাম ধরিয়া ডাকে, কিন্তু সকলেই কিছু এক ব্যক্তিকে

ডাকে না, এবং সকলকেই কিছু একই ব্যক্তি সাড়া দেয় না! এক-এক জনে আমার এক-একটা অংশকে ডাকে মাত্র, আমাকে তাহারা ততটুকু বলিয়াই জানে। এই জন্য, আমরা যাহাকে ভালবাসি তাহার একটা নূতন নামকরণ করিতে চাই ; কারণ, সকলের-সে ও আমার-সে বিস্তর প্রভেদ। আমার যে গেছে সে আমাকে কতদিন হইতে জানিত ;—আমাকে কত প্রভাতে, কত দ্বিপ্রহরে, কত সন্ধ্যাবেলায় সে দেখিয়াছে! কত বসন্তে, কত বর্ষায়, কত শরতে আমি তাহার কাছে ছিলাম! সে আমাকে কত স্নেহ করিয়াছে, আমার সঙ্গে কত খেলা করিয়াছে, আমাকে কত শতসহস্র বিশেষ ঘটনার মধ্যে খুব কাছে থাকিয়া দেখিয়াছে। যে-আমাকে সে জানিত সে সেই সতের [ষোলো] বৎসরের খেলাধূলা, সতের বৎসরের সুখদুঃখ, সতের বৎসরের বসন্ত বর্ষা। সে আমাকে যখন ডাকিত তখন আমার এই ক্ষুদ্র জীবনের অধিকাংশই, আমার এই সতের বৎসর তাহার সমস্ত খেলাধূলা লইয়া তাহাকে সাড়া দিত। ইহাকে সে ছাড়া আর কেহ জানিত না, জানে না। সে চলিয়া গেছে, এখন আর ইহাকে কেহ ডাকে না, এ আর কাহারো ডাকে সাড়া দেয় না! তাঁহার সেই বিশেষ কণ্ঠস্বর, তাঁহার সেই অতি পরিচিত সুমধুর স্নেহের আহ্বান ছাড়া জগতে এ আর-কিছুই চেনে না। বহির্জগতের সহিত এই ব্যক্তির আর-কোন সম্বন্ধই রহিল না—সেখান হইতে এ একেবারেই পালাইয়া আসিল,—এ-জন্মের মত আমার হৃদয়কবরের অতি গুপ্ত অন্ধকারের মধ্যে ইহার জীবিত সমাধি হইল।' [পুষ্পাঞ্জলি]

কিন্তু পরমুহূর্তেই কবির মনে হয়েছে সতেরো বৎসরেই তো জীবন শেষ হয়ে যাবে না! 'এমন ত আরো সতের বৎসর যাইতে পারে! আবার ত কত নূতন ঘটনা ঘটিবে, কিন্তু তাহার সহিত তাঁহার ত কোন সম্পর্কই থাকিবে না! কত নূতন সুখ আসিবে কিন্তু তাহার জন্য তিনি ত হাসিবেন না—কত নূতন দুঃখ আসিবে কিন্তু তাহার জন্য তিনি ত কাঁদিবেন না। কত শত দিনরাত্রি একে একে আসিবে কিন্তু তাহারা একেবারেই তিনি-হীন হইয়া আসিবে! আমার সম্পর্কীয় যাহা-কিছু তাহার প্রতি তাঁহার বিশেষ স্নেহ আর এক মুহূর্তের জন্যও পাইব না! মনে হয়—তাঁহারও কত নূতন সুখ দুঃখ ঘটিবে, তাহার সহিত আমার কোন যোগ নাই। যদি অনেক দিন পরে সহসা দেখা হয়, তখন তাঁহার নিকটে আমার অনেকটা অজানা, আমার

নিকট তাঁহার অনেকটা অপরিচিত। অথচ আমরা উভয়ের নিতান্ত আপনার লোক!' [পুষ্পাঞ্জলি]

কিন্তু এই তো মর্ত্যনিকেতনে মানবজীবনের নিয়তি! বিচ্ছেদ-বেদনা যতই মর্মান্তিক হোক, কালের প্রলেপে তার অগ্নিজ্বালা ধীরে ধীরে প্রশমিত হয়ে আসবে, এমন কি তারপর একদিন বিস্মৃতির মুক্তিপথ দিয়ে স্মৃতির সঞ্চয়গুলি কোন্ অদৃশ্য শূন্যলোকে হারিয়েও যাবে। বিরহীচিত্ত যতই চাক্ তার অন্তরবেদনা চিরন্তন হয়ে থাকবে, জীবনসত্যের অমোঘবিধানে একদিন সে দেখতে পায়—

হায় রে হৃদয়,
তোমার সঞ্চয়
দিনান্তে নিশান্তে শুধু পথপ্রান্তে ফেলে যেতে হয়!

এই তো জগতের নিয়ম! 'পুষ্পাঞ্জলি'তে কবি বুঝেছেন, এ নিয়মের অর্থও বুঝি আছে। যতদিন কাজ করবে ততদিন প্রকৃতি তোমাকে মাথায় করে রাখবে। কিন্তু যেই তোমার দ্বারা আর কোন কাজ পাওয়া যাবে না, যেই তুমি মৃত হলে, অমনি সে তাড়াতাড়ি তোমাকে সরিয়ে ফেলবে—তোমাকে চোখের আড়াল করে দেবে—তোমাকে এই জগৎদৃশ্যের নেপথ্যে দূর করে দেবে। এমন না হলে মৃতেরাই এ জগৎ অধিকার করে থাকত, জীবিতদের এখানে স্থান থাকত না। কারণ, মৃতই অসংখ্য, জীবিত নিতান্ত অল্প। আমাদের চিরজীবনের কাজের, চিরজীবনের ভালবাসার এই পুরস্কার! এই ত চিরদিন হয়ে এসেছে, এই ত চিরদিন হবে! এই নিষ্ঠুর জীবনসত্য তরুণ বিরহীচিত্তকে পীড়িত করেছে, তাই কবি বলছেন, 'তাই যদি সত্য হয়, তবে এই অতিশয় কঠিন নিয়মের মধ্যে আমি থাকিতে চাই না! আমি সেই চিরবিস্মৃতদের মধ্যে যাইতে চাই—তাহাদের জন্য আমার প্রাণ আকুল হইয়া উঠিয়াছে! তাহারা হয়ত আমাকে ভুলে নাই, তাহারা হয়ত আমাকে চাহিতেছে। এককালে এ জগৎ তাহাদেরই আপনার রাজ্য ছিল। কিন্তু তাহাদেরই আপনার দেশ হইতে তাহাদিগকে সকলে নির্বাসিত করিয়া দিতেছে—কেহ তাহাদের চিহ্নও রাখিতে চাহিতেছে না! আমি তাহাদের জন্য স্থান করিয়া রাখিয়াছি, তাহারা আমার কাছে থাকুক! বিস্মৃতিই যদি আমাদের অনন্তকালের বাস হয় আর স্মৃতি যদি কেবলমাত্র দুদিনের হয় তবে সেই আমাদের

স্বদেশেই যাই না কেন! সেখানে আমার শৈশবের সহচর আছে; সে আমার জীবনের খেলাঘর এখান হইতে ভাঙিয়া লইয়া গেছে—যাবার সময় সে আমার কাছে কাঁদিয়া গেছে—যাবার সময় সে আমাকে তাহার শেষ ভালবাসা দিয়া গেছে। এই মৃত্যুর দেশে, এই জগতের মধ্যাহ্নকিরণে কি তাহার সেই ভালবাসার উপহার প্রতি মুহূর্তেই শুকাইয়া ফেলিব! আমার সঙ্গে তাহার যখন দেখা হইবে তখন কি তাহার আজীবনের এত ভালবাসার পরিণামস্বরূপ আর কিছুই থাকিবে না, আর কিছুই তাহার কাছে লইয়া যাইতে পারিব না, কেবল কতকগুলি নীরস স্মৃতির শুষ্ক মালা! সেগুলি দেখিয়া কি তাহার চোখে জল আসিবে না!' [পুষ্পাঞ্জলি]

এই জগতের মধ্যাহ্নকিরণে প্রতি মুহূর্তে যদি সবই শুকিয়ে যায়, তাহলে আজীবনের এত ভালবাসার এই পরিণাম—কেবল কতকগুলি নীরস স্মৃতির শুষ্কমালা বহন করে চলতে কবিচিত্ত কিছুতেই রাজি নয়; তাই কবি বলছেন, 'বিস্মৃতিই যদি আমাদের অনন্তকালের বাসা হয় আর স্মৃতি যদি কেবলমাত্র দু দিনের হয়, তবে সেই আমাদের স্বদেশেই যাই না কেন! সেখানে আমার শৈশবের সহচর আছে!' বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, 'বিস্মৃতির দেশ'কেই কবি তাঁর 'স্বদেশ' বলেছেন। বিরহীচিত্তের এই স্বপ্নের ভুবন এই বিস্মৃতির দেশ কবিমানসে যে নূতন ভাবানুষঙ্গ রচনা করেছে, তা থেকে আমরা রবীন্দ্র-কাব্যলোকে এখন থেকে বার বার আর-একটি জগতের কথা শুনতে পাব। জগতের নদীগিরি সকলের শেষে রবিহীন মণিদীপ্ত সেই প্রদোষের দেশ। ভাষার অতীত তীরে কাঙাল নয়ন যেথা দ্বার হতে আসে ফিরে ফিরে, সেখানে কবির বিরহী ভাবনা বার বার ছুটে যেতে চাইবে। মৃত্যুর পরে আমাদের প্রাণের সহচরদের সেটি প্রয়াণলোক! সেই স্বপ্নের ভুবন জ্ঞানবুদ্ধির অগোচর, তা বিরহীর হৃদয়সংবেদ্য ভাবসত্য দিয়ে গড়া।

৭

আমরা বলেছি, আলোচ্য রচনাগুচ্ছের আদিতে আছে 'পুষ্পাঞ্জলি' আর শেষে 'শিউলিফুলের গাছ'। পুষ্পাঞ্জলির একটি অনুচ্ছেদে আছে, 'তুমি যে-ঘরটিতে রোজ সকালে বসিতে তাহারই দ্বারে স্বহস্তে যে-রজনীগন্ধার গাছ

রোপণ করিয়াছিলে তাহা কি আর তোমার মনে আছে! তুমি যখন ছিলে তখন তাহাতে এত ফুল ফুটিত না, আজ সে কত ফুল ফুটাইয়া প্রতিদিন প্রভাতে তোমার সেই শূন্য ঘরের দিকে চাহিয়া থাকে। সে যেন মনে করে, বুঝি তাহারই পরে অভিমান করিয়া তুমি কোথায় চলিয়া গিয়াছ! তাই সে আজ বেশি করিয়া ফুল ফুটাইতেছে। তোমাকে বলিতেছে, তুমি এস, তোমাকে রোজ ফুল দিব! হায় হায়, যখন সে দেখিতে চায় তখন সে ভাল করিয়া দেখিতে পায় না—আর যখন সে শূন্যহৃদয়ে চলিয়া যায়, এ-জন্মের মত দেখা ফুরাইয়া যায় তখন আর তাহাকে ফিরিয়া ডাকিলে কি হইবে! সমস্ত হৃদয় তাহার সমস্ত ভালবাসার ডালাটি সাজাইয়া তাহাকে ডাকিতে থাকে। আমিও তোমার গৃহের শূন্যদ্বারে বসিয়া প্রতিদিন সকালে একটি একটি করিয়া রজনীগন্ধা ফুটাইতেছি—কে দেখিবে! ঝরিয়া পড়িবার সময় কাহার সদয় চরণের তলে ঝরিয়া পড়িবে! আর সকলেই ইচ্ছা করিলে এই ফুল ছিঁড়িয়া লইয়া মালা গাঁথিতে পারে, ফেলিয়া দিতে পারে—কেবল তোমারই স্নেহের দৃষ্টি এক মুহূর্তের জন্যও ইহাদের উপরে আর পড়িবে না!'

আমরা 'পুষ্পাঞ্জলি'র পাণ্ডুলিপি দেখি নি, রচনাবলীর সপ্তদশ খণ্ডে জীবনস্মৃতির গ্রন্থপরিচয়ে পাণ্ডুলিপির সঙ্গে মিলিয়ে ভারতী থেকে 'পুষ্পাঞ্জলি' সমগ্রভাবে সংকলিত হয়েছে। সংকলনকর্তা বলেছেন, 'পাণ্ডুলিপিতে ইহার পর একটি গান আছে—কেহ কারো মন বুঝে না'।[২৩] এখানে গীতবিতান থেকে উক্ত গানটি উদ্ধারযোগ্য :

কেহ কারো মন বুঝে না, কাছে এসে সরে যায়।
সোহাগের হাসিটি কেন চোখের জলে মরে যায়।
বাতাস যখন কেঁদে গেল প্রাণ খুলে ফুল ফুটিল না,
সাঁঝের বেলায় একাকিনী কেন রে ফুল ঝরে যায়॥
মুখের পানে চেয়ে দেখো, আঁখিতে মিলাও আঁখি,
মধুর প্রাণের কথা প্রাণেতে রেখ না ঢাকি।
এ রজনী রহিবে না, আর কথা হইবে না,
প্রভাতে রহিবে শুধু হৃদয়ের হায় হায়॥[২৪]

পুষ্পাঞ্জলির আলোচ্য অনুচ্ছেদ এবং এই গানটির সঙ্গে 'শিউলিফুলের গাছে'র ভাবানুষঙ্গ মিলিয়ে দেখলেই বুঝতে পারা যাবে যে, একই হৃদয়বাসনা

'শিউলিফুলের গাছে' সমর্পিত হয়েছে। প্রথম দুটি ক্ষেত্রে কবির নিজের ভাষায় গদ্যে ও গানে যে কথা ব্যক্ত হয়েছে 'শিউলিফুলের গাছে' তাই বিশুদ্ধ রূপকের সাহায্যে উচ্চারিত। শিউলিফুলের গাছ বলছে :

'আমি সমস্ত দিন কেবল টুপ্ টাপ্ করিয়া ফুল ফেলিতেছি ; আমার ত আর কোন কাজ নাই। আমার প্রাণ যখন পরিপূর্ণ হইয়া উঠে, আমার সাদা সাদা হাসিগুলি মধুর অশ্রুজলের মত আমি বর্ষণ করিতে থাকি।

* * *

'বাতাস আসিয়াছে। ভোরের বেলায় জাগিয়া উঠিয়াই আমাকে তাহার মনে পড়িয়াছে। রাত্রে সে স্বপ্ন দেখিয়া মাঝে মাঝে জাগিয়া আমার কোলের উপর আসিয়া আবার ঘুমাইয়া পড়ে। আমার কোমল পল্লবের স্তরের মধ্যে আসিয়া সে আরাম পায়।...

* * *

'আমি এক জায়গায় দাঁড়াইয়া থাকি—যাহার জন্য আমার ফুল ফুটিতেছে মনের সাধ মিটাইয়া তাহাকে খুঁজিয়া বেড়াইতে পারি না। এইজন্য আমি সমস্ত দিন ফুল ফেলিয়া ফেলিয়া দিই—আমি দাঁড়াইয়া থাকি কিন্তু আমার সুগন্ধ আমার প্রাণের আশা ঘুরিয়া বেড়ায়। আমার ফুলগুলি আমি বাঁধিয়া রাখি না, তাহারা উড়িয়া যায়। তাহাদের আমি জগতে পাঠাইয়া দিই, আমার আনন্দের বার্তা তাহারা দূরে গিয়া প্রচার করিয়া আসে। আমি আমার অজানা অচেনাকে ফুলের অক্ষরে চিঠি লিখিয়া পাঠাই। নিশ্চয় তাহার হাতে গিয়া পৌছায়, নহিলে আমার মনের ভার লাঘব হয় কেন? আমি নীলাকাশে চাহিয়া উদ্দেশে আমার প্রিয়তমের চরণে অনুক্ষণ অঞ্জলিপূর্ণ ফুল ঢালিয়া দিই, আমি যেখানে যাইতে পারি না, আমার ফুলেরা সেখানে চলিয়া যায়।'[২০]

এখানে দেখা যাচ্ছে, পুষ্পাঞ্জলির অনুচ্ছেদে এবং গানটির মধ্যে যে নৈরাশ্যের ভাব ফুটে উঠেছিল এখানে তা পরিবর্তিত হয়ে একটি সার্থকতার আনন্দ পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। গানে কবি বলেছিলেন :

বাতাস যখন কেঁদে গেল প্রাণ খুলে ফুল ফুটিল না,
সাঁঝের বেলায় একাকিনী কেন রে ফুল ঝরে যায়।

কিন্তু 'শিউলিফুলের গাছ' বলছে, 'জগতের প্রেম আমার মধ্যে ফুল হইয়া

ফুটিয়া জগতে ফিরিয়া যায়। আমার যত আছে তত দিই। আরো থাকিলে আরো দিতাম।

'দিয়া কি হয়? শুকাইয়া যায় ছড়াইয়া যায়—কিন্তু ফুরাইয়া যায় না, আমার কোল ত শূন্য হয় না, প্রতিদিন আবার আমার প্রাণ ভরিয়া উঠে। প্রতিদিন নূতন প্রাণের উচ্ছ্বাস হৃদয় হইতে বাহির করিয়া সূর্যালোকে ফুটাইয়া তোলা, এবং প্রতিদিন আনন্দধারা অজস্রধারে জগতের মধ্যে বিসর্জন করিয়া দেওয়া এই সুখই ত আমি কেবল জানি; তারপরে আমার ফুল কে চায় আমার ফুল কে গ্রহণ করে, আমার ফুল কে দলন করে আমি তাহার কিছুই জানি না। মনের মধ্যে এই বিশ্বাস যে, আমার এই ফুল ফোটান ফুল-বিসর্জন অবশ্য কিছু-না-কিছু কাজে লাগেই। আমার ঝরা ফুলগুলি জগৎ কুড়াইয়া লয়। অতীত আমার ঝরা ফুল লইয়া মালা গাঁথে। আমার সহস্র ফুল অবিশ্রাম ঝরিয়া ঝরিয়া সুদূর ভবিষ্যতের জন্য এক অপূর্ব নূতন শতদল রচনা করে। প্রভাতসংগীতের তালে তালে আমার ফুলের পতন। সেই সুমধুর ছন্দে আমার ফুলের পতনে জগতের নৃত্যগীত সম্পূর্ণ হইতেছে।

'আকাশের তারাগুলিও স্বর্গীয় কল্পতরুর ঝরা ফুল। তাহারা কি কোন কাজে লাগে না? মালার মত গাঁথিয়া কেহ কি তাহাদের গলায় পরে নাই? কোমল বলিয়া আমার ফুলগুলির উপরে কেহ কি পা-ও রাখিবে না? আমি জানি আমার ফুলগুলি ঝরিয়া জননী লক্ষ্মীর পদ্মাসনের তলে পুনর্জন্ম লাভ করে। সেখানে অমৃতধারায় অনন্তকাল প্রফুল্ল হইয়া থাকে। সেই অমর সৌন্দর্যের স্তরের উপর স্তরে জগদ্ব্যাপী স্তরের মধ্যে একটি ছোট পাপড়ি হইয়া আনন্দে বিকশিত হইতে থাকে।'

এই অংশে অভিব্যক্ত শিউলিফুলের গাছের আত্মকথা কবির আত্মকথারই প্রতিধ্বনি। 'কড়ি ও কোমল' কাব্যগ্রন্থে সংকলিত 'সনেটগুচ্ছে'র ভূমিকা হিসাবে কবি যে কবিতাটি বসিয়েছেন তারও নাম 'ছোটোফুল'। সেখানে কবি বলছেন:

> আমি শুধু মালা গাঁথি ছোটো ছোটো ফুলে,
> সে ফুল শুকায়ে যায় কথায় কথায়,
> তাই যদি, তাই হোক্, দুঃখ নাহি তায়,
> তুলিব কুসুম আমি অনন্তের কূলে।

* * *

ক্ষুদ্র ফুল, আপনার সৌরভের সনে
নিয়ে আসে স্বাধীনতা, গভীর আশ্বাস—
মনে আনে রবিকর নিমেষ-স্বপনে,
মনে আনে সমুদ্রের উদার বাতাস।
ক্ষুদ্র ফুল দেখে যদি কারো পড়ে মনে
বৃহৎ জগৎ, আর বৃহৎ আকাশ।

ছোটো ছোটো ফুলে মালা গেঁথে বৃহৎ জগৎ আর বৃহৎ আকাশের সঙ্গে যোগস্থাপনের মধ্যেই সেদিন কবি গভীর আশ্বাসের সন্ধান পেয়েছেন।

৮

রবীন্দ্রনাথের প্রেমচেতনা, প্রকৃতিচেতনা ও সৌন্দর্যচেতনার নানা স্তর। এই সব স্তরভেদের ফলেই কবির কাব্যলোকে নানা বৈচিত্র্য নানা ভাবানুষঙ্গের সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু মৃত্যুর কঠিন কষ্টিপাথরে নিকষিত হয়েই তাদের স্বর্ণকান্তি সবচেয়ে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। 'পুষ্পাঞ্জলি'তে কবি বলেছেন, যখন আমাদের প্রিয়বিয়োগ হয় তখন সমস্ত জগতের প্রতি আমাদের বিষম সন্দেহ উপস্থিত হয়, অথচ সন্দেহ করবার মত কোনো কারণ দেখতে পাইনে বলে হৃদয়ের মধ্যে কেমন আঘাত লাগে। যেমন নিতান্ত কোনো অভূতপূর্ব ঘটনা দেখলে আমাদের সন্দেহ হয় বুঝি আমরা স্বপ্ন দেখছি, আমাদের হাতের কাছে যে-জিনিস থাকে তাকে ভালো করে স্পর্শ করে দেখি এ-সমস্ত সত্য কিনা, তেমনি আমাদের প্রিয়জন যখন চলে যায়, তখন আমরা জগৎকে চারদিকে স্পর্শ করে দেখি এরাও সব ছায়া কিনা, মায়া কিনা, এরাও এখনি চারদিক থেকে মিলিয়ে যাবে কিনা! এই সত্যপরীক্ষার প্রথম স্তরে জগৎ ও জীবনের প্রতি জাগে গভীর অভিমান। আমাদের সবচেয়ে আপনার জন যখন একেবারেই 'নাই' হয়ে গেল তখনো চারদিকের আর সব কিছু ঠিক আগের মতই রয়েছে; প্রকৃতির এই বিধানকে অত্যন্ত নিষ্ঠুর বলে মনে হয়। কিন্তু যখন বিরহী চিত্তে বিশ্বাস ফিরে আসে, 'নাই'-অন্ধকারের মধ্যে যখন সে 'আছে'-আলোকের সন্ধান পায়, তখন সে অনুভব করতে পারে 'ত্রিভুবনমপি তন্ময়ং'—তিনভুবন জুড়েই তার স্মৃতি, তার প্রেম, তার সৌন্দর্যমূর্তি। 'বিবিধ প্রসঙ্গে'র আরম্ভেই

এই চেতনাকে ভাষা দিয়ে কবি বলছেন, 'আমি মাঝে মাঝে ভাবি, এই পৃথিবী কত লক্ষকোটি মানুষের কত মায়া কত ভালবাসা দিয়া জড়ান। কত যুগযুগান্তর হইতে কত লোক এই পৃথিবীর চারিদিকে তাহাদের ভালবাসার জাল গাঁথিয়া আসিতেছে! মানুষ যেটুকু ভূমিখণ্ডে বাস করে, সেটুকুকে কতই ভালবাসে। সেইটুকুর মধ্যে চারিদিকে গাছটি, পালাটি, ছেলেটি, গরুটি তাহার ভালবাসার কত জিনিসপত্র দেখিতে দেখিতে জাগিয়া উঠে; তাহার প্রেমের প্রভাবে সেটুকু ভূমিখণ্ড কেমন মায়ের মত মূর্তি ধারণ করে, কেমন পবিত্র হইয়া উঠে, মানুষের হৃদয়ের আবির্ভাবে বন্য প্রকৃতির কঠিন মৃত্তিকা লক্ষ্মীর পদতলস্থ শতদলের মত কেমন অপূর্ব সৌন্দর্য প্রাপ্ত হয়। ছেলেপিলেদের কোলে করিয়া মানুষ যে গাছের তলাটিতে বসে সে গাছটিকে মানুষ কত ভালবাসে। প্রণয়িনীকে পাশে লইয়া মানুষ যে আকাশের দিকে চায় সেই আকাশের প্রতি তাহার প্রেম কেমন প্রসারিত হইয়া যায়। যেখানেই মানুষ প্রেম রোপণ করে দেখিতে দেখিতে সেই স্থান প্রেমের শস্যে আচ্ছন্ন হইয়া যায়! মানুষ চলিয়া যায়, কিন্তু তাহার প্রেমের পাশে পৃথিবীকে সে বাঁধিয়া রাখিয়া যায়। অতীতকালের সংখ্যাতীত মৃত মনুষ্যের প্রেমে পৃথিবী আচ্ছন্ন; সমস্ত নগর গ্রাম কানন ক্ষেত্রে বিস্মৃত মনুষ্যের প্রেম শত সহস্র আকারে বিচরণ করিতেছে। মৃত মনুষ্যের প্রেম ছায়ার মত আমাদের সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেছে। আমাদের সঙ্গে শয়ন করিতেছে। আমাদের সঙ্গে উত্থান করিতেছে।' এই অনুভূতিরই অপূর্বসুন্দর কাব্যরূপ পাই 'সোনার তরী'র "পুরস্কার" কবিতায়—

> শ্যামলা বিপুলা এ ধরার পানে
> চেয়ে দেখি আমি মুগ্ধ নয়ানে;
> সমস্ত প্রাণে কেন-যে কে জানে
> ভরে আসে আঁখিজল,
> বহু মানবের প্রেম দিয়ে ঢাকা,
> বহু দিবসের সুখে দুখে আঁকা,
> লক্ষ যুগের সংগীতে মাখা
> সুন্দর ধরাতল।

শুধু তাই নয়, কবি বলছেন 'আমরাও সেই মৃত মনুষ্যের প্রেম, নানা ব্যক্তি-আকারে বিকশিত।'[২৩] তা ছাড়া এই অনুভূতিও কবির হয়েছে যে, মানুষের

প্রেম যেন জড় পদার্থের সঙ্গেও লিপ্ত হয়ে যেতে পারে। 'নূতন বাড়ির চেয়ে যে-বাড়িতে দুই পুরুষে বাস করিয়াছে সেই বাড়ির যেন বিশেষ একটা কি মাহাত্ম্য আছে! মানুষের প্রেম যেন তাহার ইটকাঠের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আছে এমনি বোধ হয়। বিজনে অরণ্যের বৃক্ষ নিতান্ত শূন্য, কিন্তু যে বৃক্ষের দিকে একজন মানুষ চাহিয়াছে, সে বৃক্ষে সে মানুষের চাহনি যেন জড়িত হইয়া গেছে। বহু দিন হইতে যে গাছের তলায় রৌদ্রের বেলায় মানুষ বসে সে গাছে যেমন হরিদ্বর্ণ আছে তেমনি মনুষ্যত্বের অংশ আছে।'[২]

এই মনুষ্যত্বের অংশ, মানুষের প্রেম দিয়ে জড়ানো বলেই এই জড়জগৎ—আমাদের এই মর্ত্যনিকেতন কবির কাছে প্রিয়তর হয়ে উঠেছে। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে, প্রভাতসংগীতের যুগে একদিন এক দিব্যাবেশে কবি প্রত্যক্ষ করেছিলেন, 'একটি অপরূপ মহিমায় বিশ্বসংসার সমাচ্ছন্ন, আনন্দে এবং সৌন্দর্যে সর্বত্রই তরঙ্গিত।' সেদিন কবি তাঁর অন্তরে ঔপনিষদ সত্যেরই আনন্দ-স্পন্দ অনুভব করেছিলেন। এই রূপের জগৎ বিশ্বরূপেরই খেলাঘর। যা-কিছু পরিদৃশ্যমান সমস্তের মধ্যে তাঁরই আনন্দরূপ অমৃতরূপের প্রকাশ! আজ কবি এই পৃথিবীকে এই নিসর্গলোককে আর-এক দিক থেকে দেখলেন। এই দুই দেখার মধ্যে পার্থক্য অবশ্যই রয়েছে। একটি জ্ঞানের আলোকে দেখা, আর একটি প্রেমের আলোকে দেখা। কবির কাব্যলোকে এই দুই দেখা কি ভাবে কতটা সার্থকতা পেয়েছে, অনুভবের ক্ষেত্রে সেখানে কতটুকু তর-তম ভেদ রয়েছে, কবির নিসর্গচেতনার আলোচনায় তা অবশ্যই বিচার্য।

শুধু নিসর্গ-প্রকৃতিই নয়, নিসর্গ-সৌন্দর্যকেও কবি এই একই প্রেমের আলোকে নূতন করে দেখেছেন। 'পুষ্পাঞ্জলি'তে পাই, 'আমরা যাহাদের ভালবাসি তাহারা আছে বলিয়াই যেন এই জ্যোৎস্নারাত্রির একটা অর্থ আছে—বাগানের এই ফুলগাছগুলিকে এমনিতর দেখিতে হইয়াছে—নহিলে তাহারা যেন আর-একরকম দেখিতে হইত। তাই যখন একজন প্রিয়ব্যক্তি চলিয়া যায় তখন সমস্ত পৃথিবীর উপর দিয়া যেন একটা মরুর বাতাস বহিয়া যায়—মনে আশ্চর্য বোধ হয় তবুও কেন পৃথিবীর উপরকার সমস্ত গাছপালা একেবারে শুকাইয়া গেল না! যদিও তাহারা থাকে তবু তাহাদের থাকিবার একটা যেন কারণ খুঁজিয়া পাই না! জগতের সমুদয় সৌন্দর্য যেন আমাদের প্রিয়-ব্যক্তিকে তাহাদের মাঝখানে বসাইয়া রাখিবার জন্য। তাহারা আমাদের

ভালবাসার সিংহাসন। আমাদের ভালবাসার চারিদিকে তাহারা জড়াইয়া উঠে, লতাইয়া উঠে, ফুটিয়া উঠে। এক-একদিন কি মাহেন্দ্রক্ষণে প্রিয়তমের মুখ দেখিয়া আমাদের হৃদয়ের প্রেম তরঙ্গিত হইয়া উঠে, প্রভাতে চারিদিকে চাহিয়া দেখি সৌন্দর্য-সাগরেও তাহারই এক তালে আজ তরঙ্গ উঠিয়াছে—কত বিচিত্র বর্ণ, কত বিচিত্র গন্ধ, কত বিচিত্র গান! কাল যেন জগতে এত মহোৎসব ছিল না! অনেকদিনের পরে সহসা যেন সূর্যোদয় হইল। হৃদয়ও যখন আলো দিতে লাগিল সমস্ত জগৎও তাহার সৌন্দর্যচ্ছটা উদ্ভাসিত করিয়া দিল। সমস্ত জগতের সহিত হৃদয়ের এক অপূর্ব মিলন হইল! একজনের সহিত যখন আমাদের মিলন হয়, তখন সে মিলন আমরা কেবল তাহারই মধ্যে বদ্ধ করিয়া রাখিতে পারি না, অলক্ষ্যে অদৃশ্যে সে মিলন বিস্তৃত হইয়া জগতের মধ্যে গিয়া পৌঁছায়। সূচ্যগ্র ভূমির জন্যও যখন আলো জ্বালা হয়, তখন সে আলো সমস্ত ঘরকে আলো না করিয়া থাকিতে পারে না!'

এই অংশে কবির সৌন্দর্যানুভূতি সম্পর্কে একটি নূতন কথা কবির মুখে শুনতে পাওয়া গেল। জগতের সমুদয় সৌন্দর্য যেন আমাদের ভালবাসার সিংহাসন! প্রিয়জনের মৃত্যুর পর কবি তাঁকে সেই সৌন্দর্যের সিংহাসনেই সমাসীন দেখতে পেয়েছেন। বলাকার ৭-সংখ্যক কবিতায় কবি শাজাহানের তাজমহলকে বলেছেন সম্রাট-কবির নবমেঘদূত। এই সৌন্দর্যদূত বিরহী-প্রেমিকের প্রাণের আকূতিকে বহন করে নিয়ে চলেছে সেই অলক্ষ্যের পানে যেখানে তাঁর বিরহিণী প্রিয়া মিশে আছেন—

'প্রভাতের অরুণ আভাসে
ক্লান্ত-সন্ধ্যা দিগন্তের করুণ-নিশ্বাসে,
পূর্ণিমায় দেহহীন চামেলির লাবণ্য-বিলাসে।

'কল্পনা' কাব্যগ্রন্থেও দেখা যাবে কবি ইমনকল্যাণে তাঁর 'মানসপ্রতিমা'র উদ্দেশে যে প্রেম-সংগীত রচনা করেছেন তাতেও আছে—

তুমি সন্ধ্যার মেঘ শান্ত সুদূর
আমার সাধের সাধনা,
মম শূন্য গগন-বিহারী।
আমি আপন মনের মাধুরী মিশায়ে,
তোমারে করেছি রচনা;

তুমি আমারি যে তুমি আমারি,
মম অসীম-গগন-বিহারী।

কবি যখন মৃত্যুর পর তাঁর মানসপ্রতিমাকে বিশ্বসৌন্দর্যের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত দেখলেন তখনই তাঁর শূন্য ভুবন পূর্ণ হয়ে উঠল। বিশিষ্ট রূপসীমার মধ্যে হারিয়ে তিনি তাঁকে ফিরে পেলেন বিশ্বের অপরিমেয় প্রেমের মধ্যে, অপরিসীম সৌন্দর্যের মধ্যে।

৯

'জীবনস্মৃতি'তে কবি বলেছেন, যাকে ধরেছিলেন তাকে ছাড়তেই হল, এটাকে ক্ষতির দিক দিয়ে দেখে যেমন তিনি বেদনা পেয়েছিলেন, তেমনি একে মুক্তির দিক দিয়ে দেখে একটা উদার শান্তিও বোধ করেছিলেন। অর্থাৎ মরণের বৃহৎ পটভূমিকায় কবি জীবনের প্রতি নিজের অন্ধ আসক্তি থেকে মুক্ত হয়ে বিশ্বজীবনের সঙ্গে যুক্ত হলেন। 'বিবিধ প্রসঙ্গে'র প্রথম কিস্তির অষ্টম অনুচ্ছেদের শেষে কবি বলছেন, 'শোকে আমাদের সংসারের ভার লাঘব করিয়া দেয়, আমাদের চরণের বেড়ি খুলিয়া দেয়, সংসারের অবিশ্রাম মাধ্যাকর্ষণ-রজ্জু যেন ছিন্ন করিয়া দেয়।' এই অবস্থায় কবির মনে এই জগৎ ও জীবনসত্য সম্বন্ধে যে নূতন উপলব্ধি হল তারই প্রকাশ আমাদের আলোচ্য রচনাপঞ্চকের 'রুদ্ধগৃহ' ও 'পথপ্রান্তে'র মধ্যে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। এই দুটি রচনা পরস্পরের পরিপূরক। 'রুদ্ধগৃহে' অভিব্যক্ত অনুভূতিকে কবির নবলব্ধ জীবনবোধের সঙ্গে মিলিয়ে না দেখলে তাঁকে ভুল বোঝা খুবই স্বাভাবিক। অক্ষয় চৌধুরীও তাঁকে ভুল বুঝেছিলেন। ১২৯২ সালের পৌষ মাসের 'বালকে' অনুযোগের সুরে তিনি কবিকে যে পত্র লেখেন তার প্রত্যুত্তরে কবি তাঁর নিজের বক্তব্যকে তাঁর নবলব্ধ জীবনবোধের আলোকেই বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন। কবির এই উপলব্ধি যে তাঁর শোকবিমূঢ় চিত্তের একটা সাময়িক অনুভূতিমাত্র তা নয়, এই উপলব্ধিই এখন থেকে তাঁর চেতনা ও চিন্তায় স্থায়ী আকারে দেখা দিয়েছে। বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, 'রুদ্ধগৃহ' ও 'পথপ্রান্তে' লেখার উনত্রিশ বৎসর পরে 'বলাকা' কাব্যগ্রন্থের 'ছবি' ও 'শাজাহান' কবিতায় কাব্যচ্ছন্দে এই একই উপলব্ধির

পুনঃপ্রকাশ ঘটেছে। আমরা যে-অর্থে 'রুদ্ধগৃহ' ও 'পথপ্রান্তে'কে পরস্পরের পরিপূরক বলেছি সেই অর্থে 'ছবি' ও 'শাজাহান' এই দুটি কবিতাও পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক। প্রেম ও জীবনের সম্পর্ক কি, এই জিজ্ঞাসাই ওই প্রবন্ধযুগল ও কবিতাযুগলের প্রধান উপজীব্য। আমরা এখানে ছবি ও শাজাহান কবিতার কাব্যবিচারে প্রবৃত্ত হব না, রচনা দুটির উৎস-সন্ধানও আমাদের বর্তমান উদ্দেশ্য নয়, আমরা শুধু ভাবানুষঙ্গের দিক দিয়ে রুদ্ধগৃহ ও পথপ্রান্তের সঙ্গে তাদের সাদৃশ্য সন্ধান করব।

'রুদ্ধগৃহ' প্রবন্ধে কবি বলছেন, 'বৃহৎ বাড়ির মধ্যে কেবল একটি ঘর বন্ধ। তাহার তালাতে মরিচা ধরিয়াছে—তাহার চাবি কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সন্ধ্যাবেলা সে ঘরে আলো জলে না, দিনের বেলা সে-ঘরে লোক থাকে না—এমন কতদিন হইতে কে জানে!

*　　　*　　　*

'এ-ঘর বিধবা। এক জন কে ছিল সে গেছে, সেই হইতে এ-গৃহের দ্বার রুদ্ধ। সেই অবধি এখানে আর কেহ আসেও না, এখান হইতে আর কেহ যায়ও না। সেই অবধি এখানে যেন মৃত্যুরও মৃত্যু হইয়াছে। সকলেরই এমন একজন আছে যে মরিলে পৃথিবীর আর সকলই মরিয়া যায়—পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় মৃত্যু থাকে না।

'এ-জগতে অবিশ্রাম জীবনের প্রবাহ মৃত্যুকে হু হু করিয়া ভাসাইয়া লইয়া যায়, মৃত কোথাও টিকিয়া থাকিতে পারে না। এই ভয়ে সমাধিভবন মৃত্যুকে পাথরচাপা দিয়া রাখে, মৃত্যুকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখে। কৃপণ যেমন তাহার বহুমূল্য মানিকটি লোহার সিন্ধুকের মধ্যে বন্ধ করিয়া রাখে, সমাধিভবন তেমনি মৃত্যুর কঙ্কালটিকে বহুমূল্য রত্নের মত চোরের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য পাষাণ প্রাচীরের মধ্যে লুকাইয়া রাখে, ভয় তাহার উপরে দিবারাত্রি পাহারা দিতে থাকে।* *

'পৃথিবীর এমন কোন্‌খানে আমরা পদক্ষেপ করিতে পারি যেখানে মৃত জীবের সমাধি নাই। কিন্তু পৃথিবীর দ্বার অবারিত। পৃথিবী মৃত্যুকেও কোলে করিয়া লয়, জীবনকেও কোলে করিয়া রাখে—পৃথিবীর কোলে উভয়েই ভাই বোনের মত খেলা করে।

*　　　*　　　*

'পৃথিবীতে যাহা আসে তাহাই যায়। এই প্রবাহেই জগতের স্বাস্থ্য রক্ষা হয়। কণামাত্রের যাতায়াত বন্ধ হইলে জগতের সামঞ্জস্য ভঙ্গ হয়। জীবন যেমন আসে জীবন তেমনি যায়; মৃত্যুও যেমন আসে মৃত্যুও তেমনি যায়। তাহাকে ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা কেন? * * জীবনমৃত্যুর প্রবাহ রোধ করিও না। হৃদয়ের দুই দ্বারই সমান খুলিয়া রাখো। প্রবেশের দ্বার দিয়া সকলে প্রবেশ করুক, প্রস্থানের দ্বার দিয়া সকলে প্রস্থান করিবে।'

তিয়াত্তর বৎসর বয়সে চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা এক চিঠিতে 'রুদ্ধ-গৃহে'র অর্থ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কবি লিখেছেন, 'জীবনে যখন কোনো বড়ো শোক আসে তখন মনে করতে পারিনে কালে তার ক্ষয় হতে পারে। নিজের কাছে নিজের শোকের একটা অভিমান আছে। এত তীব্র বেদনাও যে কোনো চিরসত্যকে বহন করে না সে কথাটাকে আমরা সান্ত্বনাস্বরূপে গ্রহণ করিনে, তাতে আমাদের দুঃখের অহংকারে আঘাত লাগে। * * আমাদের কাছে প্রিয়জনের মৃত্যুর একটিমাত্র দাবি, সে বলে মনে রেখো। কিন্তু প্রাণের দাবি অসংখ্য, মনকে সে অহোরাত্রি নানাদিক থেকেই আকর্ষণ করতে থাকে।— দাবির সেই উপস্থিত ভীড়ের মধ্যে মৃত্যুর একটিমাত্র আবেদন টিঁকতে পারে না। মনে যদি থাকে স্মৃতির ব্যথা যায় ক্ষীণ হয়ে। কিন্তু শোকের অভিমান জীবনকে বঞ্চিত করে ও শোককে ধরে রাখতে চায়। * * মনকে নিজকৃত কবরে জীবিত সমাধি দেবার মতো অভিশাপ কিছু হতে পারে না। দেখা যাচ্ছে পরবর্তী কালের বলাকার ভাবের সঙ্গে এই লেখার মিল আছে।'[২৮]

'বলাকা'র "শাজাহান" কবিতায় এই জীবন-সত্যই আরো সুন্দর ও সুগ্রথিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। সেখানে কবি বলছেন, জীবনের খরস্রোতে মানুষ নিত্য-ভাসমান। ভুবনের ঘাটে ঘাটে এক হাটে বোঝা নিয়ে সেই বোঝা অন্য হাটে শূন্য করে দিয়ে তাকে এই সংসার থেকে চলে যেতে হবে। অথচ প্রিয়জনকে হারিয়ে প্রেমিকের বিরহীচিত্তের একান্ত প্রার্থনা হল, তার অন্তর-বেদনা যেন চিরন্তন হয়ে থাকে। মমতাজ-বিরহী শাজাহান তাঁর মর্মনিঙড়ানো উপলব্ধি দিয়েই গড়ে তুললেন তাঁর অমর শিল্প তাজমহল। তারপর কালস্রোতের অনিবার্য বেগে তিনি ও তাঁর সাম্রাজ্য নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, কিন্তু তাঁর তাজমহল দেশকালের সীমানা উত্তীর্ণ হয়ে শিল্পরূপে তাঁর মর্মবেদনাকে

চিরন্তন করে রেখেছে। যুগ-যুগান্তর ধরে তার মধ্যে ধ্বনিত হচ্ছে চিরবিরহীর সেই মর্মবাণী 'ভুলি নাই, ভুলি নাই, ভুলি নাই প্রিয়া'। এখানেই কবিচিত্তে জিজ্ঞাসা জেগেছে, শিল্পে যেমন একটি মুহূর্তই অনন্ত হয়ে ওঠে জীবনেও কি তা সম্ভব? স্মৃতির সমাধিমন্দির রচনা করে কি প্রাণের একদিনের প্রেমকে চিরদিন বাঁচিয়ে রাখা যাবে? তারই উত্তরে কবি বলছেন—

সমাধি মন্দির
এক ঠাঁই রহে চিরস্থির;
ধরার ধুলায় থাকি
স্মরণের আবরণে মরণেরে যত্নে রাখে ঢাকি।
জীবনেরে কে রাখিতে পারে।
আকাশের প্রতি তারা ডাকিছে তাহারে।
তার নিমন্ত্রণ লোকে লোকে
নব নব পূর্বাচলে আলোকে আলোকে।

জীবন গতিচঞ্চল। কাজেই যে-প্রেম বেঁধে রাখে, যে-প্রেম এক জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সে-প্রেম জীবনধর্মের বিরোধী বলে জীবনে চলার পথে তাকে পিছনেই পড়ে থাকতে হবে। 'যে-প্রেম সম্মুখপানে চলিতে চালাতে নাহি জানে' সে-প্রেম জীবনের দোসর নয়। যে-প্রেম প্রাণের মধ্যে নিত্য প্রেরণারূপে ক্রিয়াশীল সে প্রেম আমাদের বেঁধে রাখে না। সে চলার পথে মানুষকে নিত্যই এগিয়ে দেয়। পথিক-মানুষের জীবনে প্রেমের এই সত্যকেই কবি 'পথপ্রান্তে' প্রবন্ধে ভাষা দিয়েছেন। তিনি বলছেন—

'আমার লেখার উপরে ছায়া ফেলিয়া পৃথিবীর লোক পথ দিয়া চলিয়া যাইতেছে। তাহারা সঙ্গে কিছুই লইয়া যায় না। তাহারা সুখ দুঃখ ভুলিতে ভুলিতে চলিয়া যায়। জীবন হইতে প্রতি নিমেষের ভার ফেলিতে ফেলিতে চলিয়া যায়। তাহাদের হাসি কান্না আমার লেখার উপরে পড়িয়া অঙ্কুরিত হইয়া উঠে। তাহাদের গান তাহারা ভুলিয়া যায়, তাহাদের প্রেম তাহারা রাখিয়া যায়।

'আর কিছুই থাকে না কিন্তু প্রেম তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকে। তাহারা সমস্ত পথ কেবল ভালবাসিতে বাসিতে চলে। পথের যেখানে তাহারা পা ফেলে সেইখানটুকুই তাহারা ভালবাসে। সেইখানেই তাহারা চিহ্ন রাখিয়া

যাইতে চায়—তাহাদের বিদায়ের অশ্রুজলে সে জায়গাটুকু উর্বরা হইয়া উঠে। তাহাদের পথের দুই পার্শ্বে নূতন নূতন ফুল নূতন নূতন তারা ফুটিয়া থাকে। নূতন নূতন পথিকদিগকে তাহারা ভালবাসিতে বাসিতে অগ্রসর হয়। প্রেমের টানে তাহারা চলিয়া যায়; প্রেমের প্রভাবে তাহাদের প্রতি পদক্ষেপের শ্রান্তি দূর হইয়া যায়।

* * *

'প্রেম আমাদিগকে ভিতর হইতে বাহিরে লইয়া যায়, আপন হইতে অন্যের দিকে লইয়া যায়, এক হইতে আর-একের দিকে অগ্রসর করিয়া দেয়। এই জন্যই তাহাকে পথের আলো বলি।

* * *

('পথ দেখাইবার জন্যই সকলে আসিয়াছে, পথের বাধা হইবার জন্য কেহ আসে নাই। এই জন্য কেহই ভিড় করিয়া তোমাকে ঘিরিয়া থাকে না, সকলেই সরিয়া গিয়া তোমাকে পথ করিয়া দেয়, সকলেই একে একে চলিয়া যায়। কেহই আপনাকে বা আর কাহাকেও বদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে না।'[২৯]

এই প্রবন্ধে কবি প্রেমকে বলেছেন 'পথের আলো'। পথিক মানুষের জীবনের চলার পথে প্রেম আলো দেখায়। সে আলো অনির্বাণ। এমন কি যাকে আজ ভালবেসেছি তাকে একদিন আপাতদৃষ্টিতে ভুলেও যেতে পারি। কিন্তু প্রেম যদি এগিয়ে যাবার প্রেরণা রূপে আমাদের জীবনে এসে থাকে তা হলে তার আলো কোনদিনই নিভবে না।) প্রেমের এই সত্যই 'ছবি' কবিতায় ভাষা পেয়েছে। জীবনের পথে এক সঙ্গে চলতে চলতে একদিন যে মৃত্যুর অন্ধকারে হারিয়ে গেল, আড়াল হল বলেই যে সে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল তা নয়। সে আমাদের চোখের আলো হয়েই আমাদের মধ্যে বেঁচে রইল। অর্থাৎ তার প্রেম প্রেমিকের চোখে যে আলো জেলে দিয়ে গেল সেই আলো দিয়েই বিরহী তার বিশ্বভুবনকে দেখতে পায়। 'ছবি' কবিতায় তাই কবি বলেছেন:

নয়ন-সমুখে তুমি নাই
নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাঁই;
আজি তাই

শ্যামলে শ্যামল তুমি; নীলিমায় নীল
আমার নিখিল
তোমাতে পেয়েছে তার অন্তরের মিল।
নাহি জানি, কেহ নাহি জানে
তব সুর বাজে মোর গানে ;
কবির অন্তরে তুমি কবি,
নও ছবি, নও ছবি, নও শুধু ছবি।

'পথপ্রান্তে' প্রবন্ধে কবি প্রেমকে বলেছিলেন পথের আলো, কিন্তু বিরহী কবিচিত্তে তাঁর 'ভালোবাসার ধন' যেদিন 'কবির অন্তরে কবি' হয়ে ওঠেন সেদিন আলো বাইরে থেকে জ্বলে না, কবির অন্তরেই তাঁর প্রাণের প্রদীপ হয়ে জ্বলে ওঠে। সেই আলোয় কবি তাঁর মর্মলোকে এবং বিশ্বলোকে কখনো দেখেন তাঁর মানসপ্রতিমাকে আর কখনো দেখেন তাঁরই প্রেমের মাধুর্যে ও সৌন্দর্যে অনুরঞ্জিত এই বিশ্বভুবনকে।

॥ উল্লেখ-পঞ্জী ॥

১ দ্রষ্টব্য : 'সনেটের আলোকে মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ', পৃ° ২৩২-২৩৩।

২ শ্রীযুক্ত অমিয় চক্রবর্তীকে লিখিত পত্র, ১৩২৪ সালের ৮ আষাঢ়। দ্রষ্টব্য : 'কবিতা'—১৩৪৮, কার্তিক।

৩ রবীন্দ্র-রচনাবলী-১৭। পৃ° ৪২৩।

৪ 'শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সঙ্ঘের' উদ্যোগে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত রবীন্দ্রনাথের শতবার্ষিকী উৎসবে সভানেত্রীর ভাষণ : 'রবিকার জন্মদিনে'।

৫ আহ্বান, পূরবী।

৬ দ্রষ্টব্য, 'রবিচ্ছায়া', গীতবিতান, পৃ° ৮৬২-৮৬৩।

৭ দ্রষ্টব্য, 'কড়ি ও কোমল', রবীন্দ্র-রচনাবলী-২, পৃ° ৪৬-৪৭।

৮ Five Dialogues, এভ্রিম্যান্স লাইব্রেরি, পৃ° ১৩৯।

৯ দ্রষ্টব্য, রবীন্দ্র-রচনাবলী, অচলিত সংগ্রহ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ° ৪২-৪৩।

১০ 'ভারতী', শ্রাবণ ১২৯১, পৃ° ১৫৬।

১১ রবীন্দ্রজীবনী-১, পৃ° ১৫৫।

১২ 'ভারতী', শ্রাবণ ১২৯১, পৃ° ১৫৪।

১৩ তদেব। পৃ° ১৫৬।

১৪ সরোজিনী প্রয়াণ, বিচিত্র প্রবন্ধ। দ্রষ্টব্য, রবীন্দ্র-রচনাবলী-৫, পৃ° ৪৯২।

১৫ জীবনস্মৃতি, পৃ° ১৬২-১৬৩।

১৬ 'The Poet', The Golden Book of Tagore, পৃ°২৫-২৬।

১৭ বালক, আশ্বিন-কার্তিক ১২৯২। দ্রষ্টব্য, রবীন্দ্র-রচনাবলী-১২, পৃ° ৩৩৯-৪০।

১৮ দ্রষ্টব্য, রবীন্দ্রজীবনী-১, পৃ° ১৫০-৫১।

১৯ বিবিধ প্রসঙ্গ, ভারতী, জ্যৈষ্ঠ ১২৯২।

২০ দ্রষ্টব্য, রবীন্দ্র-রচনাবলী-২, পৃ° ৩৫।

২১ দ্রষ্টব্য, তদেব, পৃ° ৫৩-৫৪।

২২ মা ভৈঃ, বিচিত্র প্রবন্ধ, রবীন্দ্র-রচনাবলী-৫, পৃ°৪৪১।

২৩ রবীন্দ্র-রচনাবলী-১৭, পৃ° ৪৯৪।

২৪ গীতবিতান, প্রেম-পর্যায়ের ৩৬৫ সংখ্যক গান, পৃ° ৪২২।

২৫ বালক, ১২৯২, পৃ° ৩৮৫ ৮৭।

২৬ বিবিধ প্রসঙ্গ (অনুচ্ছেদ-২), ভারতী, জ্যৈষ্ঠ, ১২৯২।

২৭ তদেব (অনুচ্ছেদ-৩)

২৮ দ্রষ্টব্য, বিশ্বভারতী পত্রিকা, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৬০, পৃ° ১৭৭।

২৯ দ্রষ্টব্য, রবীন্দ্র-রচনাবলী-৫, পৃ° ৩৭৯-৩৮২।

দ্বাদশ অধ্যায়

'কবির অন্তরে তুমি কবি'

১

যাঁকে অবলম্বন করে তরুণ কবির সুকুমার চিত্তবৃত্তি আশৈশব বিকশিত হয়ে উঠেছিল তাঁরই মৃত্যু কবির অন্তর্জীবনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। মৃত্যুর কষ্টিপাথরে নিকষিত হয়েই কবির গভীরতম হৃদয়ানুরাগের চূড়ান্ত পরীক্ষা হল। মৃত্যুশোক তাঁর চিত্তাকাশকে শুধু অশ্রুবাষ্পেই আচ্ছন্ন করে রাখল না, রুদ্রতেজে উদ্দীপ্ত হয়ে সেই পরম বেদনা তাঁর সমস্ত সত্তায় আলো হয়ে তাপ হয়ে গতি হয়ে প্রাণ হয়ে নব নব শক্তিতে বিচ্ছুরিত হতে লাগল। তার ফলে শুধু যে কবির প্রেমচেতনা ও সৌন্দর্যচেতনাই নব নব রূপে রূপায়িত হয়ে উঠল এমন নয়, কবির গভীরতম জীবনবোধও তারই আলোকে নির্ণীত ও নিয়ন্ত্রিত হতে লাগল।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'ইতিহাসের অপ্রকাশিত লিখন যদি বের করা যেত তাহলে দেখতে পেতেম নারীর প্রেমের প্রেরণা মানুষের সমাজে কী কাজ করেছে। শক্তির যে-ক্রিয়া উদ্যত চেষ্টারূপে চঞ্চল আমরা তাকেই শক্তির প্রকাশরূপে দেখি, কিন্তু যে-ক্রিয়া গূঢ় উদ্দীপনারূপে পরিব্যাপ্ত তার কথা মনেই আনি নে।'[১] কবিজীবনে কাদম্বরী দেবীর ষোলো বৎসরব্যাপী অনুক্ষণ প্রেরণার অপরূপ রূপটি আমরা দেখেছি, কিন্তু মৃত্যুর পরে সেই অলোকসামান্যা নারীলক্ষ্মীর প্রভাব কবির সমগ্র সত্তায় "গূঢ় উদ্দীপনারূপে" কি ভাবে পরিব্যাপ্ত ছিল সে রহস্য দুর্জ্ঞেয় এবং দুর্নিরীক্ষ্য। রবীন্দ্রজীবনে কবিমানসীর সেই নিগূঢ় সঞ্চরণলীলা এর পর থেকে দ্বিধা-বিভক্ত করেই দেখতে হবে। কবির ব্যক্তিজীবনে স্মৃতি-বিস্মৃতির আলো-আঁধারি লীলায় তিনি কি ভাবে সেই বিদেহিনীর অস্তিত্ব ও প্রেরণাকে আজীবন অন্তর্লোকে অনুভব করেছেন; আর তাঁর কবিমানসে প্রেম ও সৌন্দর্যচেতনার নব নব স্তরে সেই মানসলক্ষ্মীর লীলারঙ্গ কি ভাবে কাব্যের হিরণ্ময় পাত্রে বার বার উচ্ছলিত হয়ে উঠেছে। একটি ব্যক্তিসীমার জগতে দাঁড়িয়ে প্রাকৃত জীবনে আস্বাদ্য চিরপুরাতন

বিরহমিলন-লীলা, আর একটি ব্যক্তি-পরিচ্ছেদ-বিগলিত অসীমের দিকে তাকিয়ে কবিপ্রজাপতির নব নব সৃষ্টিরহস্যের সূত্রসন্ধান। একটি কবিপ্রেমিকের মর্ত্যলীলার প্রাকৃত জগৎ; আর একটি কবিশিল্পীর অমর্ত্যলীলার অপ্রাকৃত স্বপ্নের ভুবন। শিল্পীর সেই স্বপ্নের ভুবনে কবির মানসপ্রতিমাগুলি নব নব রসের তুলিতে যে সৌন্দর্যমূর্তি লাভ করেছে স্বভাবতই তার রসভাষ্যের রূপ ও রীতি স্বতন্ত্র হবে। 'জীবনস্মৃতি'র উপান্ত বাক্যে কবি সত্যই বলেছেন, 'মূর্তিকে বিশ্লেষণ করিতে গেলে কেবল মাটিকেই পাওয়া যায়, শিল্পীর আনন্দকে পাওয়া যায় না।' কবিমানসে বিলসিত শিল্পীর আনন্দ দিয়ে গড়া সেই সৌন্দর্যমূর্তিগুলির বিচার-বিশ্লেষণকে তাই স্বতন্ত্র আলোচনার জন্যে তুলে রেখে আমরা আপাতত কবির ব্যক্তিসীমার জগতে দাঁড়িয়ে তাঁর মানসলোকের গোপনচারিণীর সঞ্চরণলীলাকে অনুসরণ করবার চেষ্টা করব।

২

কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুর অব্যবহিত পরবর্তী দুখানি কাব্যগ্রন্থ হল 'কড়ি ও কোমল' এবং 'মানসী'। স্বভাবতই এ দুখানি কাব্যে করুণ-বিপ্রলম্ভের সুর ব্যক্তিসীমার জগতেই নিখাদে ঝংকৃত হয়েছে। 'কড়ি ও কোমলে'র প্রেমচেতনা সনেট-কলাকৃতিকে অবলম্বন করেই আত্মপ্রকাশ করেছে। আমরা 'সনেটের আলোকে মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ে তার আলোচনা করেছি। 'মানসী' কাব্যগ্রন্থের প্রেমের কবিতাগুলি মুখ্যত কবি-মানসীরই স্তবগান। তন্মধ্যে 'ভুলে', 'ভুলভাঙা', 'বিরহানন্দ', 'ক্ষণিক মিলন', 'আত্মসমর্পণ', 'সংশয়ের আবেগ', 'বিচ্ছেদের শান্তি', 'তবু', 'নিভৃত আশ্রম', 'বিদায়', 'সন্ধ্যায়', 'শেষ উপহার', 'মৌন ভাষা' প্রভৃতি কবিতা বিশেষ ভাবে স্মরণীয়। এই সব কবিতার মধ্যে কবির বিরহী চিত্ত সীমার কোটিতে দাঁড়িয়েই বিরহ-বিপ্রলম্ভের সকরুণ বেণুতে সুরসাধনা করেছে। কিন্তু 'সোনার তরী' থেকেই কবির প্রেমচেতনা ও সৌন্দর্যচেতনা ব্যক্তি থেকে বিশ্বে, বিশেষ থেকে নির্বিশেষে এবং সীমা থেকে অসীমের অভিমুখে ক্রমপ্রসারিত। 'চিত্রা'র যুগে জীবনপাত্রে উচ্ছলিত মাধুর্যলীলা জীবনদেবতাতত্ত্বের আলোকে এক অভিনব রসমূর্তি লাভ করেছে। কিন্তু 'চিত্রা'তেও ব্যক্তিসীমার জগৎ একেবারে

অবলুপ্ত হয়ে যায় নি। কাদম্বরী দেবী লোকান্তরিত হয়েছিলেন ১২৯১ সালের ৮ই বৈশাখ। এর পর থেকে বৈশাখের এই দিনগুলি প্রতি বৎসর কবিচিত্তের হাহাকারে ভরে উঠত। অতীতের নানা স্মৃতি উদ্দীপনবিভাব-রূপে কবিচিত্তে ক্রিয়াশীল হত। তাই কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুর দশ বৎসর পরেও 'চিত্রা' কাব্যে "স্নেহস্মৃতি" (বর্ষশেষ, ১৩০০), "নববর্ষে" (নববর্ষ, ১৩০১), "দুঃসময়" (৫ই বৈশাখ, ১৩০১) এবং "মৃত্যুর পরে" (৫ই বৈশাখ, ১৩০১)—এই কটি কবিতা কবির বিরহীচিত্তের করুণ সংগীতে ভরে উঠেছে। "স্নেহস্মৃতি" কবিতায় কবি বলেছেন :

সেই চাঁপা, সেই বেলফুল,
কে তোরা আজি এ প্রাতে এনে দিলি মোর হাতে
জল আসে আঁখিপাতে, হৃদয় আকুল।
সেই চাঁপা, সেই বেলফুল!

* * *

বড়ো বেসেছিনু ভালো এই শোভা, এই আলো,
এ আকাশ, এ বাতাস, এই ধরাতল ;
কতোদিন বসি তীরে শুনেছি নদীর নীরে
নিশীথের সমীরণে সংগীত তরল ;
কতোদিন পরিয়াছি সন্ধ্যাবেলা মালাগাছি
স্নেহের হস্তের গাঁথা বকুল-মুকুল ;
বড়ো ভালো লেগেছিল যেদিন এ হাতে দিল
সেই চাঁপা, সেই বেলফুল!

নতুন-বৌঠানের প্রয়াণতিথির কাছাকাছি দিনগুলিতে জোড়াসাঁকোর সেই অসংখ্য স্মৃতিবিজড়িত পরিবেশে তাঁরই পুনরাবির্ভাব কল্পনা করে কবি "দুঃসময়" কবিতায় আক্ষেপভরে বলছেন :

বিলম্বে এসেছ, রুদ্ধ এবে দ্বার,
জনশূন্য পথ, রাত্রি অন্ধকার,
গৃহহারা বায়ু করি হাহাকার
ফিরিয়া মরে।

তোমারে আজিকে ভুলিয়াছে সবে,
শুধাইলে কেহ কথা নাহি কবে,
এ হেন নিশীথে আসিয়াছ তবে
কি মনে করে।

"মৃত্যুর পরে" কবিতায় এই আক্ষেপ শোক ও সান্ত্বনা, হতাশা ও প্রত্যাশার মিশ্র সুরে ধ্বনিত হয়ে উঠেছে। কখনো হতাশায় ভেঙে পড়ে কবি বলছেন :

হায়·রে নির্বোধ নর, কোথা তোর আছে ঘর,
কোথা তোর স্থান।
শুধু তোর ওইটুক অতিশয় ক্ষুদ্র বুক
ভয়ে কম্পমান।
ঊর্ধ্বে ওই দেখো চেয়ে সমস্ত আকাশ ছেয়ে
অনন্তের দেশ,
সে যখন একধারে লুকায়ে রাখিবে তারে
পাবি কি উদ্দেশ?

যে অনন্তের মধ্যে মিশে গেছে তার উদ্দেশ হয়তো আর কিছুতেই পাওয়া যাবে না; কিন্তু বিরহী-চিত্তে পুনর্মিলনের আকাঙ্ক্ষা যে চিরদিনই জেগে থাকে। তাই কবির জিজ্ঞাসা :

ওই হেরো সীমাহারা গগনেতে গ্রহতারা
অসংখ্য জগৎ,
ওরি মাঝে পরিভ্রান্ত হয়তো সে একা পান্থ
খুঁজিতেছে পথ।
ওই দূর-দূরান্তরে অজ্ঞাত ভুবন 'পরে
কভু কোনোখানে
আর কি গো দেখা হবে, আর কি সে কথা কবে,
কেহ নাহি জানে।

এসব কবিতা ব্যক্তিসীমার প্রাকৃত জগতে থেকে কবির নিঃসঙ্গ মুহূর্তের স্বগতোক্তির মতই উচ্চারিত। এসব কবিতার পাশেই রয়েছে অসীমের কোটিতে উন্নীত হয়ে মানসসুন্দরী-অন্তর্যামী-জীবনদেবতার স্তবগান। রবীন্দ্র-জীবনে তাঁর কবি-সত্তা ও ব্যক্তি-সত্তার এই দু ধারার লীলাও কম বিস্ময়কর নয়।

৩

'চিত্রা'র যুগ পেরিয়ে 'চৈতালি'র যুগে কবিমানসী আবার ব্যক্তিসীমায় ধরা দিয়েছেন। 'চৈতালি'র "উৎসর্গ" কবিতাটি তাঁরই উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত। একই দিনে [১৩ চৈত্র, ১৩০২] লিখলেন "গীতহীন" কবিতাটি। এবং তার পর দিন "স্বপ্ন"। "স্বপ্ন" কবিতার মধ্যেও কবিমানসে গোপনচারিণীর অলক্ষ্য পদধ্বনি শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু 'চৈতালি' গ্রন্থের ১৩০৩ সালের ৭ শ্রাবণ লেখা চারটি সনেটকল্প কবিতা নতুন বৌঠানের স্মৃতিসুধায় ভরপুর। এই চারটি কবিতার নাম "নদীযাত্রা", "মৃত্যুমাধুরী", "স্মৃতি" ও "বিলয়"। নদীযাত্রায় চলতে চলতে কবিমানসে চন্দননগর-প্রবাসকালীন নতুন বৌঠানের সঙ্গে নদীযাত্রার স্মৃতি ভেসে উঠেছে। "স্মৃতি" কবিতায় তিনি লিখছেন :

সে ছিল আরেক দিন এই তরী'পরে,
কণ্ঠ তার পূর্ণ ছিল সুধাগীতিস্বরে।
ছিল তার আঁখি দুটি ঘনপক্ষ্মচ্ছায়,
সজল মেঘের মতো ভরা করুণায়।
কোমল হৃদয়খানি উদ্বেলিত সুখে,
উচ্ছ্বসি উঠিত হাসি সরল কৌতুকে।
পাশে বসি বলে যেত কলকণ্ঠকথা,
কত কী কাহিনী তার কত আকুলতা।
প্রত্যুষে আনন্দ-ভরে হাসিয়া হাসিয়া
প্রভাত-পাখির মতো জাগাত আসিয়া।
স্নেহের দৌরাত্ম্য তার নির্ঝরের প্রায়
আমারে ফেলিত ঘেরি বিচিত্র লীলায়।
আজি সে অনন্ত বিশ্বে আছে কোন্‌খানে
তাই ভাবিতেছি বসি সজল নয়ানে।

লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে কবির স্মৃতিপটে নতুন বৌঠানের চোখ দুটিই সবচেয়ে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। "ছিল তার আঁখি দুটি ঘনপক্ষ্মচ্ছায়, সজল মেঘের মতো ভরা করুণায়।" নতুন বৌঠানের আঁখি দুটি রবীন্দ্র-মানস-পটে

চিরদিনের মতোই অম্লান হয়ে পরিস্ফুট ছিল। সেই "স্নেহময়, ছায়াময়, সন্ধ্যাময়" আঁখি দুটিই আকাশের তারা হয়ে ফুটে উঠেছে, সেই আঁখি-তারকাই কবিজীবনের ধ্রুবতারকা। জীবনের অপরাহ্ণ-লগ্নে যখন কবির আত্মপ্রকাশের অন্যতম বাহন হল ছবি, তখন কবির আঁকা বহু নারীমূর্তিতে ফুটে উঠেছে একই চোখের গড়ন, একই চোখের ভঙ্গি। এর কারণ কি, সে সম্বন্ধে শিল্পাচার্য নন্দলাল রবীন্দ্রনাথকে প্রশ্ন করেছিলেন। তার উত্তরে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'নতুন বৌঠানের চোখ দুটো এমনভাবে আমার মনের মধ্যে গাঁথা আছে যে মানুষের ছবি আঁকতে বসলে অনেক সময়েই তাঁর চোখ দুটো আমার চোখের সামনে জলজল করতে থাকে—কিছুতেই ভুলতে পারিনে। তাই ছবিতেও বোধ হয় তাঁর চোখেরই আদল এসে যায়।'[২] এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে প্রতীচ্য দৃষ্টিতে চোখই আত্মার বাতায়ন ; আত্মিক প্রেমের বাহন।

১৩০৩ সালের ৭ শ্রাবণ লেখা সনেট-চতুষ্টয়ের শেষ সনেট "বিলয়" কবিতায়ও কবি নতুন বৌঠানের আঁখি দুটি অসীম আকাশে ফুটে উঠতে দেখেছেন। কবি বলছেন :

যেন তার আঁখি দুটি নবনীল ভাসে
ফুটিয়া উঠিছে আসি অসীম আকাশে।
বৃষ্টিধৌত প্রভাতের আলোক-হিল্লোলে
অশ্রুমাখা হাসি তার বিকাশিয়া তোলে।
তার সেই স্নেহলীলা সহস্র আকারে
সমস্ত জগৎ হতে ঘিরিছে আমারে।
বরষার নদী'পরে ছল ছল আলো,
দূরতীরে কাননের ছায়া কালো কালো,
দিগন্তের শ্যামপ্রান্তে শান্ত মেঘরাজি
তারি মুখখানি যেন শতরূপ সাজি।
আঁখি তার কহে যেন মোর মুখে চাহি
"আজ প্রাতে সব পাখি উঠিয়াছে গাহি—
শুধু মোর কণ্ঠস্বর এ প্রভাতবায়ে
অনন্ত জগৎমাঝে গিয়েছে হারায়ে।"

নতুন বৌঠানের কণ্ঠস্বরটি অনন্ত জগৎমাঝে হারিয়ে গিয়েছে বটে, কিন্তু তাঁর

সেই স্নেহলীলাই কবিকে সমস্ত জগৎ হতে সহস্র আকারে ঘিরে রয়েছে। তাঁর রূপ নিয়েই ত্রিভুবন তন্ময় হয়ে উঠেছে—'ত্রিভুবনমপি তন্ময়ং বিরহে'।

৪

'চৈতালি'র পরে 'ক্ষণিকা' [প্রকাশ ১৩০৭ শ্রাবণ] কাব্যগ্রন্থের শেষ দুটি কবিতা "অন্তরতম" এবং "সমাপ্তি"তে কবিমানসে আবার নতুন বৌঠানের আবির্ভাব লক্ষ্য করা যায়। 'ক্ষণিকা' রবীন্দ্রকাব্যপ্রবাহে এক আশ্চর্য সংযোজন। নানা দিক দিয়েই একক এবং অদ্বিতীয়। "শুধু অকারণ পুলকে" এর উদ্বোধন। সহজ সুরে চল্‌তি চটুল ছন্দে সহজিয়া জীবনসাধনার অনুভূতিই এ কাব্যগ্রন্থে ভাষা পেয়েছে। শিরীষ ফুলের অলকে শিশিরবিন্দুর মতো শিথিল-বাঁধন প্রাণের স্বপ্নকামনার কথা এ গ্রন্থের উপজীব্য। "উদাসীন" কবিতায় কবি অকপটেই বলছেন :

মন-দেয়া-নেয়া অনেক করেছি
মরেছি হাজার মরণে,
নূপুরের মতো বেজেছি চরণে
চরণে।

এই মন-দেয়া-নেয়ার পালা, শেষ করে কবি তাঁর "অন্তরতম" মানস-প্রতিমার সঙ্গে অন্তরঙ্গ আলাপন শুরু করেছেন—

আমি যে তোমায় জানি, সে তো কেউ
জানে না।
তুমি মোর পানে চাও, সে তো কেউ
মানে না।
মোর মুখে পেলে তোমার আভাস
কত জনে কত করে পরিহাস,
পাছে সে না পারি সহিতে
নানা ছলে তাই ডাকি যে তোমায়,
কেহ কিছু নারে কহিতে।

এই কবিতার অন্তিম স্তবকে কবি বলছেন :

বলি নে তো কারে, সকালে বিকালে
তোমার পথের মাঝেতে,
বাঁশি বুকে লয়ে বিনা কাজে আসি
বেড়াই ছদ্ম-সাজেতে।
যাহা মুখে আসে গাই সেই গান,
নানা রাগিণীতে দিয়ে নানা তান,
এক গান রাখি গোপনে।
নানা মুখপানে আঁখি মেলি চাই,
তোমা পানে চাই স্বপনে।

এই অন্তরতম স্বপনচারিণীর উদ্দেশেই 'ক্ষণিকা'র "সমাপ্তি" কবিতাটি উৎসর্গীকৃত। কবি তাঁর ক্ষণিক দিনের আলোকে ক্ষণিকের গান শেষ করে পথপ্রান্তে পৌঁছে বলছেন :

পথে যতদিন ছিনু, ততদিন
অনেকের সনে দেখা।
সব শেষ হল যেখানে সেথায়
তুমি আর আমি একা।

জীবনের অন্য-সব চেতনার যখন অবসান হল তখন কবি দেখা পেলেন তাঁর মানসলক্ষ্মীর। সেখানে আর-কেউ নেই, শুধু 'তুমি আর আমি একা।'

'ক্ষণিকা'র পরে এগারো-বারো বৎসর কবির ব্যক্তিজীবনে আর কবি-মানসীর দেখা নেই। এই যুগটিকেই কবি তাঁর 'পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি'তে [৫ই অক্টোবর ১৯২৪] বলেছেন 'জীবনের খাসমহল'। 'সে সময়ে অনেক বড় বড় সংকল্প, অনেক কঠিন সাধনা, অনেক মস্ত লাভ, অনেক মস্ত লোকসান এসে জমেছিল।' সব জড়িয়ে কবি ভেবেছেন, 'এবার আসা গেল পাকা পরিচয়ের কিনারাটাতে।' সেদিন জীবনের তৃণবিছানো বীথিকা পৌঁছল এসে পাথরে-বাঁধানো রাজপথে। তাঁর ডাক পড়ল বন্ধুর পথ দিয়ে তরঙ্গমন্দ্রিত জনসমুদ্রতীরে। সেদিন তমালতরুতলের বংশীবাদক হয়ে উঠলেন মহাকুরুক্ষেত্রের পাঞ্চজন্যনাদী পার্থসারথি। মথুরার ঐশ্বর্যলীলার নব নব বিভূতিতে ঢাকা পড়ল বৃন্দাবনের কিশোর-কিশোরী-লীলার মধুস্মৃতি।

পঞ্চাশ বৎসর বয়স উত্তীর্ণ হয়ে 'জীবনস্মৃতি' লিখতে বসে ['প্রবাসী', ১৩১৮ সালের ভাদ্র থেকে ১৩১৯ সালের শ্রাবণ] স্মৃতির পটে জীবনের ছবির দিকে তাকিয়ে কবির চিত্তে আবার ফিরে এল তাঁর শৈশব-কৈশোর-যৌবনের দিনগুলি। কবি লিখছেন, 'আমাদের ভিতরের এই চিত্রপটের দিকে ভালো করিয়া তাকাইবার আমাদের অবসর থাকে না। ক্ষণে ক্ষণে ইহার এক-একটা অংশের দিকে আমরা দৃষ্টিপাত করি। কিন্তু ইহার অধিকাংশই অন্ধকারে অগোচরে পড়িয়া থাকে।'[৩]

অন্ধকারে অগোচরে পড়ে-থাকা এই স্মৃতি-বিস্মৃতির আলো-আঁধারি লীলার দিকে তাকাতে গিয়ে কবি তাঁর চেতনার মধ্যে আবার ফিরে পেলেন তাঁর নতুন বৌঠানকে। মনে পড়ল ষোলো বৎসর ব্যাপী তাঁর সঙ্গ সান্নিধ্য ও প্রেরণার কথা। বিস্মৃতির অতল সমুদ্র থেকে ভেসে উঠল তাঁর মূর্তিখানি। চব্বিশ বৎসর বয়সের "মৃত্যুশোক" পুনরুজ্জীবিত হল কবিমানসে। তার বৎসর তিনেক পরে, ১৩২১ সালের ৩রা কার্তিক এলাহাবাদে বসে কবি তাঁর নতুন বৌঠানের নববন্দনা রচনা করলেন "ছবি" কবিতায়। কবির হৃৎশতদলে তাঁর মানসলক্ষ্মীর কমলাসন নূতন করে রচিত হল। অন্তরে সেই মানসপ্রতিমাকে পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত করে কবিজীবনের বাকি দিনগুলি এক অপূর্ব জাগর-স্বপ্নে অতিবাহিত হয়েছে।

'বলাকা'র "ছবি" কবিতার আলম্বনস্বরূপিণী এই নারী-মূর্তিটি কার, এ সম্পর্কে মতভেদ থাকা অস্বাভাবিক নয়। 'রবিরশ্মি'-প্রণেতা চারু বন্দ্যোপাধ্যায় এবং 'বলাকা-কাব্য-পরিক্রমা'-কার আচার্য ক্ষিতিমোহন সেনের মতে কবিজায়া মৃণালিনী দেবীর ছবি দেখেই কবি এই কবিতাটি রচনা করেছিলেন। কিন্তু এ সম্পর্কে শ্রীপ্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ লিখছেন :

'১৩২১ সালে কার্তিক মাসে কবি কিছুদিন এলাহাবাদে তাঁর ভাগিনেয় সত্যপ্রসাদ গাঙ্গুলীর বাড়িতে বাস করেছিলেন। কবির কাছে শুনেছি এই বাড়িতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পত্নী, কবির নতুন-বৌঠানের একখানা পুরানো ফটো তাঁর চোখে পড়ে, আর এই ছবি দেখেই বলাকার 'ছবি'-নামে কবিতাটি লেখেন।'[৪]

মহলানবিশ মহাশয় দীর্ঘদিন বিশ্বভারতীর প্রকাশ-বিভাগের সম্পাদকরূপে কবির ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন। কবির কাছে তাঁর শোনা এই

কাহিনী সম্পর্কে সংশয় প্রকাশের অবকাশ নেই। তা ছাড়া কবিতাটির ছন্দ সম্পর্কে একটি অভ্রান্ত আভ্যন্তরীণ প্রমাণ মহলানবিশ মহাশয়ের বক্তব্যকেই সমর্থন করছে। আমরা যাকে 'বলাকার ছন্দ' বলি সেই তানপ্রধান মুক্তবন্ধ বা মুক্তক-ছন্দের প্রথম প্রকাশ ঘটেছে "ছবি" কবিতায়। 'বলাকা'র এই ছন্দে লেখা অন্যান্য কবিতাগুলি "ছবি"র পরে লেখা হয়েছে। 'বলাকা'-পরবর্তী সমগ্র রবীন্দ্রজীবনে এই তানপ্রধান মুক্তবন্ধ ছন্দই কবির অনায়াস বাণীপ্রকাশের স্বতঃস্ফূর্ত বাহন হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু 'বলাকা'র পূর্বে একবার মাত্র এই মুক্তবন্ধ ছন্দটি কবির লেখনীতে ধরা দিয়েছিল। "ছবি" কবিতা রচনার চৌত্রিশ বৎসর পূর্বে 'মানসী' কাব্যগ্রন্থে ১৮৮৭ খ্রীস্টাব্দের ১৩ অগ্রহায়ণ কবি এই ছন্দে লেখেন "নিষ্ফল কামনা" কবিতাটি। ৭৯ পংক্তির অমিল-মুক্তবন্ধ তানপ্রধান ছন্দে কবিতাটি রচিত। "নিষ্ফল কামনা" প্রেমের কবিতা। নতুন বৌঠানের মৃত্যুর পরে প্রেম সম্পর্কে একটি দার্শনিক মনোভাব এই কবিতায় অভিব্যক্ত হয়েছে। রবীন্দ্রমানসে প্রেমচেতনার স্বরূপ নির্ণয়ে এই কবিতাটির গুরুত্ব অপরিসীম। "নিষ্ফল কামনা" রচনার চৌত্রিশ বৎসর পরে নতুন বৌঠানের ছবি দেখে কবির পুনরুজ্জীবিত হৃদয়ানুরাগ ওই ভুলে-যাওয়া অনাদৃত ছন্দরূপটিকে আশ্রয় করেই বাণীমূর্তি লাভ করেছে। "নিষ্ফল কামনা"র অমিল মুক্তক-রূপটি "ছবি"তে সমিল-মুক্তকরূপ পরিগ্রহ করে পুনর্মিলনের প্রত্যাশাকেই বহুগুণিত করে তুলেছে। এ দিক দিয়ে "ছবি" কবিতা কাকে নিয়ে লেখা তার একটি শিল্পসৃষ্টিগত উত্তর খুঁজে পাওয়া যাবে, এবং আমরা এই আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্যকে সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য বলে মনে করি। "ছবি" কবিতায় কবি বলছেন :

এ জীবনে
আমার ভুবনে
কত সত্য ছিলে।
মোর চক্ষে এ নিখিলে
দিকে দিকে তুমিই লিখিলে
রূপের তুলিকা ধরি রসের মুরতি।
সে-প্রভাতে তুমিই তো ছিলে
এ-বিশ্বের বাণী মূর্তিমতী।

তারপর জীবনের চলার পথে একসঙ্গে যেতে যেতে রজনীর আড়ালেতে তোমার চলা স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আমাকে তো পথের প্রেমে যেতে দূর হতে দূরে অনুক্ষণ চলতে হয়েছে! তাই তোমাকে ভুলে গিয়েছিলাম। কিন্তু কেন সেই ভুল? তারই উত্তরে কবি বলছেন:

তুমি যে নিয়েছ বাসা জীবনের মূলে
তাই ভুল।

* * *

ভুলে-থাকা নয় সে তো ভোলা;
বিস্মৃতির মর্মে বসি রক্তে মোর দিয়েছ যে দোলা।

* * *

নাহি জানি, কেহ নাহি জানে
তব সুর বাজে মোর গানে,
কবির অন্তরে তুমি কবি,
নও ছবি, নও ছবি, নও শুধু ছবি।
তোমারে পেয়েছি কোন্ প্রাতে,
তার পরে হারায়েছি রাতে।
তারপরে অন্ধকারে অগোচরে তোমারেই লভি।
নও ছবি, নও তুমি ছবি।

উদ্ধৃত অংশের 'সে-প্রভাতে তুমিই তো ছিলে এ-বিশ্বের বাণী মূর্তিমতী'—এই বাক্যের 'সে-প্রভাতে' কথাটি আমাদের সিদ্ধান্তেরই অনুকূলে আরেকটি আভ্যন্তরীণ প্রমাণ। কবিজীবনের প্রভাতলগ্ন উত্তীর্ণ হবার পরই তাঁর জীবনে এসেছিলেন কবিজায়া মৃণালিনী দেবী। কাজেই কবিজীবনের 'সে-প্রভাতে' এ বিশ্বের মূর্তিমতী বাণীরূপে কাদম্বরী দেবীরই কল্পনা অনিবার্য হয়ে ওঠে।

'ছবি' যে নতুন বৌঠানের ছবি দেখেই লেখা সে সম্পর্কে কবির পরমাত্মীয় শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ কৃপালনি কানাই সামন্ত মহাশয়কে এক পত্রে জানিয়েছেন—

I had once asked Gurudev directly as to whether the poem "Chhabi" in *Balaka* was inspired by Mrinalini Devi's

portrait. He replied, "No. The poem was addressed to Natun Bouthan's photograph."[৫]

উদ্ধৃত অংশের 'কবির অন্তরে তুমি কবি'—এই পরিচয় জীবনদেবতারই ভাবানুষঙ্গ বহন করে আনে। জীবনদেবতাকেও রবীন্দ্রনাথ কবি-রূপে বিশেষিত করে লিখেছেন, 'এই যে কবি, যিনি আমার সমস্ত ভালোমন্দ, আমার সমস্ত অনুকূল ও প্রতিকূল উপকরণ লইয়া আমার জীবনকে রচনা করিয়া চলিয়াছেন, তাঁহাকেই আমার কাব্যে আমি "জীবনদেবতা" নাম দিয়াছি'।[৬] কিন্তু এ প্রসঙ্গ বর্তমান আলোচনার 'কাব্য-ভাষ্য' খণ্ডে বিস্তৃত বিচারের অপেক্ষা রাখে।

৫

'ছবি' রচনার পাঁচ বৎসর পরে ১৩২৬ সালের আষাঢ় থেকে অগ্রহায়ণের মধ্যে 'সবুজপত্র', 'প্রবাসী', 'ভারতী', 'মানসী ও মর্মবাণী' প্রভৃতি মাসিক পত্রিকায় "কথিকা" ও অন্যান্য স্বতন্ত্র নামে রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি ছোট ছোট গীতিগন্ধ বা কাব্যসুরভিত গদ্যরচনা প্রকাশিত হয়েছিল। শিল্পরূপের দিক দিয়ে এই রচনাগুলিকে কবির গদ্যকবিতা রচনার পূর্বাভাস বলা যেতে পারে। এই রচনাগুলি বৎসর তিনেক পরে 'লিপিকা' গ্রন্থে সংকলিত হয়। কাকে লক্ষ্য করে এই ছোট-ছোট গদ্যকাব্য কবি রচনা করেছিলেন তার আভাস 'লিপিকা' নামকরণের মধ্যেই নিহিত রয়েছে। 'লিপিকা'র প্রথম খণ্ডের "পায়ে চলার পথ", "মেঘলা দিনে", "বাণী", "মেঘদূত", "বাঁশি", "সন্ধ্যা ও প্রভাত", "পুরানো বাড়ি", "গলি", "একটি চাউনি", "একটি দিন", "কৃতঘ্ন শোক", "সতেরো বছর", "প্রথম শোক", "প্রশ্ন"—এই চোদ্দটি রচনা কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুর পরে লেখা 'পুষ্পাঞ্জলি'-'বিবিধ প্রসঙ্গ'-'রুদ্ধগৃহ'-'পথপ্রান্তে'-'শিউলিফুলের গাছ'—এই রচনাপঞ্চকেরই নবীভূত রূপ। "বাঁশি", "সন্ধ্যা ও প্রভাত" এবং "সতেরো বছর"কে 'পুষ্পাঞ্জলি'র তিনটি অনুচ্ছেদেরই পুনর্লিখিত সংস্করণ বলা যেতে পারে। "পায়ে চলার পথ" 'পথপ্রান্তে'রই নবরূপায়ণ, আর 'রুদ্ধগৃহে'র ভাব নিয়েই দেখা দিয়েছে "পুরানো বাড়ি"। ভাব ও সুরের দিক দিয়ে এসব রচনায় কালের ব্যবধান ক্রিয়াশীল হয়েছে সন্দেহ নেই। কিন্তু

তার দ্বারা মৌলিক কোন পার্থক্য রচিত হয় নি। দু-একটি উদাহরণের সাহায্যেই বক্তব্য স্পষ্ট হবে। 'রুদ্ধগৃহ' প্রবন্ধে কবি বলেছিলেন, 'বৃহৎ বাড়ির কেবল একটি ঘর বন্ধ। দুইখানি দরজা ঝাঁপিয়া ঘর মাঝখানে দাঁড়াইয়া আছে।...এ-ঘর বিধবা। একজন কে ছিল সে গেছে, সেই হইতে এ গৃহের দ্বার রুদ্ধ। সেই অবধি এখানে আর কেহ আসেও না, এখান হইতে আর কেহ যায়ও না।

"পুরানো বাড়ি"তে বলা হয়েছে, 'অনেক কালের ধনী গরীব হয়ে গেছে, তাদেরই ঐ বাড়ি।...

'উত্তর দিকের এক পাল্লা দরজা কবে ভেঙে পড়েছে কেউ খবর নিলে না। বাকি দরজাটা, শোকাতুরা বিধবার মতো, বাতাসে ক্ষণে ক্ষণে আছাড় খেয়ে পড়ে—কেউ তাকিয়ে দেখে না।'

এই বর্ণনা দুটি পড়লেই বুঝতে পারা যায়, একই বিষয়কে অবলম্বন করে দুটি রচনা গড়ে উঠেছে। কেবল প্রথমোক্ত রচনায় যে গৃহ রুদ্ধ ছিল দ্বিতীয়টিতে কালের অভিঘাতে তার দরজার একটি পাল্লা ভেঙে পড়েছে, সেদিকে কারোরই নজর নেই। প্রথমটিতে কল্পিত রুদ্ধগৃহের বৈধব্যদশা দ্বিতীয়টিতে যেন উজ্জ্বলতর হয়ে উঠেছে। দরজার একটি পাল্লা শোকাতুরা বিধবার মত বাতাসে ক্ষণে ক্ষণে আছাড় খেয়ে পড়ছে, এ ছবি বিলাপচারী শোকের আছড়ে-পড়া আর্তনাদকে যেন জীবন্ত করে তুলেছে।

"পথপ্রান্তে" এবং "পায়ে চলার পথে"র মধ্যে পার্থক্য এই যে, প্রথম রচনায় কবির স্থান ছিল পথের পাশের একটি আসনে; কিন্তু দ্বিতীয়টিতে কবি নিজেই পথিক। "পায়ে চলার পথ" 'লিপিকা'র আলোচ্য রচনাগুচ্ছের শুধু প্রথমেই বসে নি, ওটিই এই লেখাগুলির ভূমিকা। কবি বলছেন:

'এই তো পায়ে চলার পথ।

* * *

'এই পথে কত মানুষ কেউ বা আমার পাশ দিয়ে চলে গেছে, কেউ বা সঙ্গ নিয়েছে, কাউকে বা দূর থেকে দেখা গেল; কারো বা ঘোমটা আছে, কারো বা নেই; কেউ বা জল ভরতে চলেছে, কেউ বা জল নিয়ে ফিরে এল।

'একদিন এই পথকে মনে হয়েছিল আমারই পথ, একান্তই আমার ; এখন দেখছি, কেবল একটিবার মাত্র এই পথ দিয়ে চলার হুকুম নিয়ে এসেছি, আর নয়।

* * *

'আজ ধূসর সন্ধ্যায় একবার পিছন ফিরে তাকালুম, দেখলুম এই পথটি বহুবিস্মৃত পদচিহ্নের পদাবলী, ভৈরবীর সুরে বাঁধা।

'যতকাল যত পথিক চলে গেছে তাদের জীবনের সমস্ত কথাকেই এই পথ আপনার একটিমাত্র ধূলিরেখায় সংক্ষিপ্ত ক'রে এঁকেছে ; সেই একটি রেখা চলেছে সূর্যোদয়ের দিক থেকে সূর্যাস্তের দিকে, এক সোনার সিংহদ্বার থেকে আর-এক সোনার সিংহদ্বারে।'

এই রচনাটি যে সবকটি রচনার ভূমিকা "প্রথম শোকে"র সঙ্গে একে মিলিয়ে পড়লেই তার প্রমাণ পাওয়া যাবে। "প্রথম শোকে"র আরম্ভে আছে :

বনের ছায়াতে যে পথটি ছিল সে আজ ঘাসে ঢাকা।

সেই নির্জনে হঠাৎ পিছন থেকে কে বলে উঠল, "আমাকে চিনতে পার না ?"

কবি তার দিকে ফিরে তাকালেন। তাঁকে স্বীকার করতে হল, চিনেও তাকে তিনি ঠিক চিনতে পারছেন না।

সে বললে, "আমি তোমার সেই অনেক কালের সেই পঁচিশ বছর বয়সের শোক।"

তার চোখের কোণে একটু ছল্‌ছলে আভা দেখা দিলে, যেন দিঘির জলে চাঁদের রেখা।

অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেম। বললেম, "সেদিন তোমাকে শ্রাবণের মেঘের মতো কালো দেখেছি, আজ যে দেখি আশ্বিনের সোনার প্রতিমা। সেদিনকার সব চোখের জল কি হারিয়ে ফেলেছ ?"

কোনো কথাটি না বলে সে একটু হাসলে ; বুঝলেম, সবটুকু রয়ে গেছে ঐ হাসিতে। বর্ষার মেঘ শরতে শিউলিফুলের হাসি শিখে নিয়েছে।

কবি জানতে চাইলেন, তাঁর সেই পঁচিশ বছরের যৌবনকে কি আজো সে

তার কাছে রেখে গিয়েছে? বিস্ময়ের সঙ্গে তিনি লক্ষ্য করলেন, তার গলায় সেদিনকার বসন্তের মালার একটি পাপড়িও খসে নি। কবি বুঝলেন, তাঁর আর তো সব জীর্ণ হয়ে গেছে, কিন্তু তার গলায় তাঁর সেই পঁচিশ বছরের যৌবন আজো তো ম্লান হয় নি। তারপর:

আস্তে আস্তে সেই মালাটি নিয়ে সে আমার গলায় পরিয়ে দিলে। বললে, "মনে আছে? সেদিন বলেছিলে, তুমি সান্ত্বনা চাও না, তুমি শোককেই চাও।"

লজ্জিত হয়ে বললেম, "বলেছিলেম। কিন্তু তার পরে অনেক দিন হয়ে গেল, তার পরে কখন ভুলে গেলেম।"

সে বললে, "যে অন্তর্যামীর বর, তিনি তো ভোলেন নি। আমি সেই অবধি ছায়াতলে গোপনে বসে আছি। আমাকে বরণ করে নাও।"

আমি তার হাতখানি আমার হাতে তুলে নিয়ে বললেম, "এ কী তোমার অপরূপ মূর্তি।"

সে বললে, "যা ছিল শোক, আজ তাই হয়েছে শান্তি।"

শেষ বাক্যটি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করবার মত। 'যা ছিল শোক আজ তাই হয়েছে শান্তি'। কিন্তু প্রাপ্তির দিক থেকে কমতি কিছুই পড়ে নি। আটাশ বছর বয়স পেরিয়ে সেদিনকার পঁচিশ বছরের বসন্তের মালাটি গলায় পরে পুনর্মিলনের এ এক অভিনব আস্বাদন! অন্তরের দিক থেকে প্রাণের মধ্যে ফিরে পেয়ে বাইরের দিক থেকে দেহরূপকে হারানোর ব্যথা ভোলবার এ এক অপূর্ব হরণপূরণলীলা! ভৎর্সনাচ্ছলে এই প্রতিশ্রুতিই বাঙ্‌ময় হয়ে উঠেছে "কৃতঘ্ন শোক" রচনায়।

ভোরবেলায় সে বিদায় নিলে।

আমার মন আমাকে বোঝাতে বসল, "সবই মায়া।"

আমি রাগ করে বললেম, "এই তো টেবিলে সেলাইয়ের বাক্স, ছাতে ফুলগাছের টব, খাটের উপর নামলেখা হাতপাখাখানি—সবই তো সত্য।"

মন বললে, "তবু ভেবে দেখো—"

আমি বললেম, "থামো তুমি। ঐ দেখো-না। গল্পের বইখানি,

মাঝের পাতায় একটি চুলের কাঁটা, সবটা, পড়া শেষ হয় নি ; এও যদি মায়া হয়, সে এর চেয়েও বেশি মায়া হল কেন।"

*　　　*　　　*

ছোটো ছেলে যেমন রাগ করে মাকে মারে তেমনি করেই বিশ্বে আমার যা-কিছু আশ্রয় সমস্তকেই মারতে লাগলেম। বললেম, "সংসার বিশ্বাসঘাতক।"

হঠাৎ চমকে উঠলেম। মনে হল কে বললে, "অকৃতজ্ঞ!"

জানলার বাইরে দেখি ঝাউগাছের আড়ালে তৃতীয়ার চাঁদ উঠছে, যে গেছে যেন তারই হাসির লুকোচুরি। তারা-ছিটিয়ে-দেওয়া অন্ধকারের ভিতর থেকে একটি ভর্ৎসনা এল, "ধরা দিয়েছিলেম সেটাই কি ফাঁকি, আর আড়াল পড়েছে এইটেকেই এত জোরে বিশ্বাস?"

এ প্রতীতি দিনের আলোর মতই স্বচ্ছ ও স্বতঃস্ফূর্ত! সামান্যতম টীকাভাষ্যের ভারও যেন এর সইবে না! কিন্তু শুধু 'ধরা দেওয়া'ই নয়, আট বছর বয়স থেকে চব্বিশ বছর পর্যন্ত কবির সমগ্র জীবনটাই যে তাঁর রচনা এ কথাও আটাত্তর বছর বয়সে কবি পুনরায় স্বীকার করে বলছেন:

আমি তার সতেরো বছরের জানা।

কত আসা-যাওয়া, কত দেখাদেখি, কত বলাবলি; তারই আশেপাশে কত স্বপ্ন, কত অনুমান, কত ইশারা; তারই সঙ্গে সঙ্গে কখনো বা ভোরের ভাঙা ঘুমে শুকতারার আলো, কখনো বা আষাঢ়ের ভরসন্ধ্যায় চামেলিফুলের গন্ধ, কখনো বা বসন্তের শেষ প্রহরে ক্লান্ত নহবতের পিলুবারোয়াঁ; সতেরো বছর ধরে এই-সব গাঁথা পড়েছিল তার মনে।

আর, তারই সঙ্গে মিলিয়ে সে আমার নাম ধরে ডাকত। ঐ নামে যে মানুষ সাড়া দিত সে তো একা বিধাতার রচনা নয়। সে যে তারই সতেরো বছরের জানা দিয়ে গড়া; কখনো আদরে কখনো অনাদরে, কখনো কাজে কখনো অকাজে, কখনো সবার সামনে কখনো একলা আড়ালে, কেবল একটি লোকের মনে মনে জানা দিয়ে গড়া সেই মানুষ।

এখানেও আবার 'জীবনদেবতা'র কথা মনে পড়ছে। 'কেবল একটি লোকের

মনে মনে জানা দিয়ে গড়া সেই মানুষ!' সে তো একা বিধাতার রচনা হতেই পারে না। তবু কবির জীবন-রচয়িত্রী তাঁর জীবনদেবতার স্বরূপ-বিশ্লেষণের প্রসঙ্গ এখানে উত্থাপন করব না। কেবল কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুর ৩৫ বৎসর পরে ব্যক্তিসীমার জগতে দাঁড়িয়ে কবির এই অকুণ্ঠ স্বীকৃতির গুরুত্ব কী ও কতটা সে সম্পর্কে সহৃদয় পাঠক-সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেই 'লিপিকা'র সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখানেই শেষ করলাম।

৬

'লিপিকা' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিল ১৩২৯ সালের শ্রাবণ মাসে। তার ঠিক তিন বৎসর পরে ৩২ সালের শ্রাবণে প্রকাশিত হল 'পূরবী'। 'বলাকা' আর 'পূরবী'র মধ্যে প্রায় এক যুগের ব্যবধান। মাঝখানে 'পলাতকা' আর 'শিশু ভোলানাথ' এই যুগে কবিজীবনের দুটি ক্রোড়পত্রের মতই দেখা দিয়েছে। 'শিশু ভোলানাথ' একেবারেই স্বতন্ত্র গোত্রের কবিতা, আর 'পলাতকা'র গল্প-কবিতায় কবিচিত্তের প্রতিফলন হয়েছে তির্যক্ ভঙ্গিতে। কাজেই 'বলাকা'র পরে সত্যকার গীতিকাব্যের বাঁশি প্রথম বেজে উঠল 'পূরবীতে'ই। 'বলাকা'-'পূরবী'র মধ্যবর্তী এই যুগে কাব্যের অনুপস্থিতি সম্পর্কে কবি লিখেছেন, 'বর্তমান বয়সে আমার জীবনের প্রধান সংকট এই যে, যদিচ স্বভাবত আমি আরণ্যক তবু আমার কর্মস্থানের কুগ্রহ সকৌতুকে আমাকে সাধারণ্যক করে দাঁড় করিয়েছেন।...কাব্যসরস্বতীর সেবক হয়ে গোলমালে আজ গণপতির দরবারের তকমা পরে বসেছি, তার ফলে কাব্যসরস্বতী আমাকে প্রায় জবাব দিয়েছেন, আর গণপতির বাহনটি আমার সকল কাজেরই ছিদ্র অন্বেষণ করছেন।'' এ যুগের লেখা একটি গানেও কবি তাঁর চিরসুন্দরের কাছে আক্ষেপের সুরে বলেছেন, প্রাণের বীণার তারে তারে ধুলো জমে উঠেছে। মালা গাঁথবার মত কুসুম আর নেই। দিনের পরে দিন যায় কেটে, হৃদয় কোন্ পিপাসায় পিপাসিত যেন সে কথাও সে ভুলে গেছে। শূন্য ঘাটে কবি অপেক্ষা করে আছেন রঙিন পালে আবার কবে তরীখানি আসবে; সুধারসের পারাবারে কবে আবার তিনি দেবেন পাড়ি!

এমন দিনে আবার বাজল সানাই। শৈশব-কৈশোরের পরিচিত পরিবেশে কবির চিত্তবংশীর কুহরে কুহরে বেজে উঠল অতীত দিনের হারানো সুরগুলি। ১৩৩০ সালের ফাল্গুন মাস। কবি এসেছিলেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাহিত্য সম্পর্কে তিনটি বক্তৃতা করতে। ১৮, ১৯ ও ২০—এই তিনদিন তাঁর বক্তৃতা হল। শেষ দিনের বক্তৃতার মুখবন্ধে কবি বললেন, 'আজ এই বক্তৃতাসভায় আসব বলে যখন প্রস্তুত হচ্ছি তখন শুনতে পেলুম, আমাদের পাড়ার গলিতে সানাই বাজছে। কী জানি কোন্ বাড়িতে বিবাহ। খাম্বাজের করুণ তান শহরের আকাশে আঁচল বিছিয়ে দিল।

'উৎসবের দিনে বাঁশি কেন বাজে। সে কেবল সুরের লেপ দিয়ে প্রত্যহের সমস্ত ভাঙাচোরা মলিনতা নিকিয়ে দিতে চায়। যেন আপিসের প্রয়োজনে লোহপথে কুশ্রীতার রথযাত্রা চলছে না, যেন দরদাম কেনাবেচা ও-সমস্ত কিছুই না। সব ঢেকে দিলে।

'ঢেকে দিলে কথাটা ঠিক হল না; পর্দাটা তুলে দিলে—এই ট্রাম-চলাচলের, কেনা-বেচার, হাঁকডাকের পর্দা। বর-বধূকে নিয়ে গেল নিত্যকালের অন্তঃপুরে, রসলোকে।'[৮]

বাঁশি শুধু বর-বধূকেই 'নিত্যকালের অন্তঃপুরে, রসলোকে' নিয়ে গেল না; কবিচিত্তেও অকস্মাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে নিত্যকালের অন্তঃপুরে রসলোকের রুদ্ধদ্বার মুক্ত হয়ে গেল। 'পুষ্পাঞ্জলি' 'লিপিকা'র পাঠক অবশ্যই লক্ষ্য করেছেন, বিবাহবাসর থেকে ভেসে-আসা সানাইয়ের সুর কবিচেতনায় বার বার বিরহ-বিপ্রলম্ভের উদ্দীপন বিভাব-রূপে ক্রিয়াশীল হয়েছে। 'পুষ্পাঞ্জলি'তে কবি লিখেছিলেন, 'কোথায় নহবৎ বসিয়াছে। সকাল হইতে না হইতেই বাঁশি বাজিয়া উঠিয়াছে। আগে বিছানা হইতে নূতন ঘুম ভাঙিয়া যখন এই বাঁশি শুনিতে পাইতাম তখন জগৎকে কি উৎসবময় বলিয়া মনে হইত! ·· এখন আর তাহা হয় না। আজি ওই বাঁশি শুনিয়া প্রাণের এক জায়গা কোথায় হাহাকার করিতেছে। এখন কেবল মনে হয়, বাঁশি বাজাইয়া যে-সকল উৎসব আরম্ভ হয় সে সব উৎসবও কখন একদিন শেষ হইয়া যায়।'[৯] 'লিপিকা'র "বাঁশি"তে আরো একটু গভীর সুরে কবি বলছেন, 'পথের ধারে দাঁড়িয়ে বাঁশি শুনি আর মন যে কেমন করে বুঝতে পারিনে। সে ব্যথাকে চেনা সুখদুঃখের সঙ্গে মেলাতে যাই, মেলে না। দেখি,

চেনা হাসির চেয়ে সে উজ্জ্বল, চেনা চোখের জলের চেয়ে সে গভীর।' ১৩৩০ সালের ফাল্গুনে কবিচিত্তে আবার যে বাঁশির সুর বেজে উঠল তা তাঁর চেতনার উপর থেকে সমস্ত চেনা কথার পর্দা যেন এক টানে ছিঁড়ে ফেলে দিলে। নির্বারিত মর্মলোকে কবি ফিরে পেলেন তাঁর সেই হৃদয়বেদনাকে—চেনা হাসির চেয়ে যা উজ্জ্বল, চেনা চোখের জলের চেয়ে যা গভীর। সেদিনই তিনি লিখলেন "উৎসবের দিন" কবিতাটি। তাঁর অনুভূতিতে ধরা পড়ল :

অশ্রুর অশ্রুত ধ্বনি ফাল্গুনের মর্মে করে বাস,
দূর বিরহের দীর্ঘশ্বাস।

বিবাহোৎসবের বংশীধ্বনিতে কবির চেতনা ফিরল নিজের জীবনের কেন্দ্রস্থলে। বেদনাপদ্মের বীণাপাণি 'দূর বিরহের দীর্ঘশ্বাস' মিশিয়ে কবির গীতিকাব্যের বীণায় যে নতুন সুর ফুটিয়ে তুললেন তাতে কবির অন্তরঙ্গতর আত্মকথাই ধ্বনিত হয়ে উঠল :

দিগন্তের স্বর্ণদ্বারে কতবার বারে বারে
এসেছিল সৌভাগ্য-লগন।
আশার লাবণ্যে-ভরা জেগেছিল বসুন্ধরা,
হেসেছিল প্রভাত-গগন।

* * *

আজ উৎসবের সুরে তারা মরে ঘুরে ঘুরে
বাতাসেরে করে যে উদাস।
তাদের পরশ পায় কি মায়াতে ভরে যায়
প্রভাতের স্নিগ্ধ অবকাশ।

দিগন্তের স্বর্ণদ্বারে যে সৌভাগ্য-লগ্নগুলি কবিজীবনের প্রভাত-গগনে দেখা দিয়েছিল তাদের উদাসকরা স্পর্শে নবপ্রভাতের স্নিগ্ধ অবকাশ অপরূপ মায়াতে ভরে উঠল। ১৩৩০ সালের ফাল্গুনের এই দিনগুলিতে কবি পর পর "উৎসবের দিন", "গানের সাজি", "লীলাসঙ্গিনী", "শেষ অর্ঘ্য", "বেঠিক পথের পথিক" ও "বকুল-বনের পাখি"—এই ছ'টি কবিতায় তাঁর প্রভাত-গগনের সৌভাগ্য-লগ্নগুলিকেই স্মরণ করলেন। কবির মনে হল তাঁর জীবনের অপরাহ্ণ-লগ্ন সমুপস্থিত। পূরবীর ছন্দে শেষ-রাগিণীর বীণা বেজে উঠেছে। বিস্ময়ক্ষণের গোধূলিক্ষণের আলোয় তাঁর মানসপটে ভেসে উঠল তাঁর মানসলক্ষ্মীর

মূর্তি। জীবনের অপরাহ্ণ-লগ্নে পূরবী রাগিণীতে তাঁরই উদ্দেশে 'শেষ অর্ঘ্য' সাজিয়ে তিনি লিখলেন :

যে সুন্দরী, যে ক্ষণিকা
নিঃশব্দ চরণে আসি, কম্পিত পরশে
চম্পক-অঙ্গুলি-পাতে তন্দ্রা-যবনিকা
সহাস্যে সরায়ে দিল, স্বপ্নের আলসে
ছোঁয়াল পরশমণি জ্যোতির কণিকা;
অন্তরের কণ্ঠহারে নিবিড় হরষে
প্রথম দুলায়ে দিল রূপের মণিকা;
এ-সন্ধ্যার অন্ধকারে চলিনু খুঁজিতে
সঞ্চিত অশ্রুর অর্ঘ্যে তাহারে পূজিতে।

৭

১৩৩০ সালের ফাল্গুনে লেখা এই কবিতাগুলি 'পূরবী' কাব্যগ্রন্থের প্রথমভাগ "পূরবী"র শেষ স্তর রচনা করেছে। 'পূরবী'র এই পূর্বভাগে আরও কিছুদিন আগের লেখা কয়েকটি কবিতাও স্থান পেয়েছে। মর্ত্য থেকে বিদায় নেবার আগে মর্ত্যপ্রেম যে কবিমানসে নূতন আসক্তি রচনা করেছে তারই সুর এই ভাগের বিচিত্রবন্ধে গ্রথিত গীতিকবিতাগুলির মুখ্য উপজীব্য। "তপোভঙ্গ" কবিতায় কবি কালের অধীশ্বরকে জিজ্ঞাসা করেছেন 'যৌবন-বেদনা-রসে উচ্ছল' তাঁর দিনগুলি কোথায় গেল?

শূন্যের অকূলে তারা অযত্নে গেল কি সব ভাসি?
* * *
গেল বিস্মৃতির ঘাটে স্বেচ্ছাচারী হাওয়ার খেলায়
নির্মম হেলায়?

এই জিজ্ঞাসারই উত্তর কবি পেলেন 'পূরবী' কাব্যগ্রন্থে।—

নহে নহে, আছে তারা; নিয়েছ তাদের সংহরিয়া
নিগূঢ় ধ্যানের রাত্রে, নিঃশব্দের মাঝে সম্বরিয়া
রাখ সংগোপনে।

কবি নিজেও এক 'নিগূঢ় ধ্যানের রাত্রে' স্মরণের পটে সেই দিনগুলিকে ফিরে পেলেন। 'পূরবী'র 'পথিক'-অংশের "কিশোর প্রেম" পর্যন্ত কবিতাগুলি সেই স্মৃতি-মন্থন-করা ধন। 'পূরবী'র এই অংশের কবিতাগুলি লেখা ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দের সেপ্টেম্বর-অক্টোবর-নভেম্বর মাসে দক্ষিণ-আমেরিকা-যাত্রার সমুদ্র-পথে। কবিজীবনে এই সমুদ্রযাত্রা যে কী গুরুত্ব অর্জন করেছে আমরা তার আলোচনা করেছি প্রথম অধ্যায়ে। পেরুর স্বাধীনতালাভের শতবার্ষিক উৎসবে যোগদানের জন্তে আমন্ত্রিত হয়ে সেপ্টেম্বরের পনেরোই কলিকাতা থেকে যাত্রার দিন স্থির হয়েছিল। কিন্তু কবি হঠাৎ ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত হওয়ায় তিন চার দিন তাঁকে কলিকাতায় অপেক্ষা করতে হল। শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ হবার পূর্বেই ১৯শে সেপ্টেম্বর তিনি রওনা হয়ে গেলেন। কলিকাতা থেকে মাদ্রাসের পথে কলম্বো গিয়ে য়ুরোপগামী জাপানী জাহাজ 'হারুনা-মারু'তে উঠলেন ২৪শে সেপ্টেম্বর। অষ্টাদশ দিবসে 'হারুনা-মারু' পৌঁছল মার্সাই বন্দরে। সেখান থেকে প্যারিসে গিয়ে কাটলো এক সপ্তাহ। কবির সঙ্গী যাঁরা ছিলেন—সুরেন্দ্রনাথ কর, রথীন্দ্রনাথ ও প্রতিমা দেবী—তাঁদের কেউ গেলেন ইংলণ্ডে, কেউ রইলেন প্যারিসে। দক্ষিণ-আমেরিকায় কবির সঙ্গী হলেন শুধু এলম্‌হার্স্ট। ১৮ই অক্টোবর কবি এলম্‌হার্স্টকে সঙ্গে নিয়ে শেরবুর্গ বন্দর থেকে 'আণ্ডেস' জাহাজে উঠলেন আর্জেনটিনার রাজধানী বুয়েনোস এয়ারিসের উদ্দেশে। শেরবুর্গ থেকে বুয়েনোস এয়ারিস তিন সপ্তাহের পথ। কবির শরীর অসুস্থ, মন ক্লান্ত ও অবসন্ন। এ অবস্থায় জাপানী জাহাজ হারুনা-মারুতে 'আতিথ্যের যে প্রচুর দাক্ষিণ্য' পেয়েছিলেন আণ্ডেসে তারো অভাব ঘটল। শরীরের সেই অবস্থায় আরামের পক্ষে যে-সব সুবিধার প্রয়োজন ছিল তা পাওয়া গেল না। আণ্ডেসের ক্যাবিনে প্রবেশ করেই কবির মনটা প্রসন্নতা হারাল। বিষুবরেখা পার হতে না হতেই হঠাৎ কখন শরীর গেল বিগড়ে; বিছানা ছাড়া আর গতি রইল না। শান্তিহীন দিন আর নিদ্রাহীন রাত কবিকে পিঠমোড়া করে শিকল কষতে লাগল। রোগ-গারদের দারোগা তাঁর বুকের উপর দুর্বলতার বিষম একটা বোঝা চাপিয়ে রেখে দিলে; মাঝে মাঝে মনে হত, এটা স্বয়ং যমরাজের চাপ। কবি লিখছেন, 'কয়দিন সংকীর্ণ শয্যায় পড়ে পড়ে মৃত্যুকে খুব কাছে

দেখতে পেয়েছিলাম, মনে হয়েছিল প্রাণকে বহন করবার যোগ্য শক্তি আমার শেষ হয়ে গেছে।'

শরীর-মনের সেই বিশেষ অবস্থাকেই আমরা বলেছি 'নিগূঢ় ধ্যানের রাত্রি'। "পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি"তে আর 'পূরবী'র পূর্বোল্লিখিত কবিতাগুলিতে তার ইতিহাস লিপিবদ্ধ হয়েছে। ২রা অক্টোবর ডায়ারিতে কবি লিখছেন, 'দিন চলে গেল। ভুলেছিলুম যে, সমুদ্রে পাড়ি দিয়ে চলেছি। মন চলেছিল আপন রাস্তায়; এক ভাবনা থেকে আর-এক ভাবনায়। চলেছিল বললে বেশি বলা হয়। উট যেমন বোঝা পিঠে নিয়ে মরুর মধ্যে পথ আন্দাজ করে চলে, এ তেমন চলা নয়; এ যেন পথের খেয়াল না রেখে ভেসে যাওয়া, কোনো বিশেষ ঘাটের কাছে বায়না না নিয়ে শুধু-শুধু বেরিয়ে পড়া, কথাগুলোকে নিজের চেষ্টায় চালনা না করে, দিকের হিসেব না রেখে, তাদের আপনার ঝোঁকে চলতে দেওয়া। তার সুবিধা হচ্ছে এই যে, কথাগুলো নিজেরাই হয় বক্তা, আর মনটা হয় শ্রোতা। মন তখন অন্যকে কিছু দেবার কথা ভাবে না, নিজের কাছ থেকে নিজে পায়।' 'এই নিজের কাছ থেকে নিজে পাওয়া'র অন্তরঙ্গ মুহূর্তে মহাসমুদ্র ও মহাকাশের সংগমস্থলে কবির চোখে ভেসে উঠল একখানি ছবি। কবি লিখছেন:

'এই জনশূন্য সমুদ্র ও আকাশের সংগমস্থলে পশ্চিমদিগন্তে একখানি ছবি দেখলুম। অল্প কয়েকটি রেখা, অল্প কিছু উপকরণ; আকাশ এবং সমুদ্রের নীলের ভিতর দিয়ে অবসানদিনের শেষ আলো যেন তার শেষ কথাটি কোনো একটা জায়গায় রেখে যাবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে বেরিয়ে আসতে চায়, কিন্তু উদাস শূন্যের মধ্যে ধরে রাখবার জায়গা কোথাও না পেয়ে ম্লান হয়ে পড়েছে—এই ভাবটিই যেন সেই ছবিটির ভাব।

'ডেকের উপর স্তব্ধ দাঁড়িয়ে শান্ত একটি গভীরতার মধ্যে তলিয়ে গিয়ে আমি যা দেখলুম তাকে আমি বিশেষ অর্থেই ছবি বলছি, যাকে বলে দৃশ্য এ তা নয়। অর্থাৎ, এর মধ্যে যা-কিছুর সমাবেশ হয়েছে কেউ যেন সেগুলিকে বিশেষভাবে বেছে নিয়ে, পরস্পরকে মিলিয়ে, একটি সম্পূর্ণতার মধ্যে সাজিয়ে ধরেছে। এমন একটি সরল গভীর মহৎ সম্পূর্ণতার ছবি কলকাতার আকাশে একমুহূর্তে এমন সমগ্র হয়ে আমার কাছে হয়তো দেখা দিত না। এখানে চারিদিকের এই বিপুল রিক্ততার মাঝখানে এই ছবিটি এমন একান্ত এক হয়ে

উঠে আমার কাছে প্রকাশ পেলে। একে সম্পূর্ণ করে দেখবার জন্যে এতবড়ো আকাশ এবং এত গভীর স্তব্ধতার দরকার ছিল।'[১০]

ডায়ারির এই 'ছবি'রই দোসর সেই দিনই লেখা পূরবীর "ছবি" কবিতাটি। 'ছবি'র উপসংহারে আকাশপটের চিত্রটি কবির নিজের মানসপটে প্রতিবিম্বিত হয়েছে। কবি লিখছেন:

এমনি রঙের খেলা নিত্য খেলে আলো আর ছায়া,
এমনি চঞ্চল মায়া
জীবন-অম্বরতলে;
দুঃখে সুখে বর্ণে বর্ণে লিখা
চিহ্নহীন পদচারী কালের প্রান্তরে মরীচিকা।
তার পরে দিন যায়, অস্ত যায় রবি;
যুগে যুগে মুছে যায় লক্ষ লক্ষ রাগরক্ত ছবি।
তুই হেথা কবি,
এ বিশ্বের মৃত্যুর নিশ্বাস
আপন বাঁশিতে ভরি গানে তারে বাঁচাইতে চাস।

চারদিকের বিপুল রিক্ততার মাঝখানে শান্ত একটি গভীরতার মধ্যে তলিয়ে গিয়ে আকাশ-সমুদ্রের মহাসঙ্গমে সমুদ্ঘাটিত হল কবির অন্তরঙ্গতম মনোবাসনাটি। প্রত্যাবর্তনের পথেও ক্রাকোভিয়া জাহাজে ১২ই ফেব্রুয়ারির ডায়ারিতে কবি লিখছেন:

'দিনের আলো যখন নিবে আসছে, সামনের অন্ধকারে যখন সন্ধ্যার তারা দেখা দিল, যখন জীবনযাত্রার বোঝা খালাস করে অনেকখানি বাদ দিয়ে অল্প কিছু বেছে নেবার জন্যে মনকে তৈরি হতে হচ্ছে, তখন কোন্‌টা রেখে কোন্‌টা নেবার জন্যে মনের ব্যগ্রতা আমি তাই লক্ষ্য করে দেখছি। সমস্ত দিন প্রাণপণ চেষ্টায় যা-কিছু সে জমিয়েছিল, গড়ে তুলেছিল, সংসারের হাটে যদি তার কিছু দাম থাকে তবে তা সেইখানেই থাক্‌, যারা আগলে রাখতে চায় তারাই তার খবরদারি করুক; রইল টাকা, রইল খ্যাতি, রইল কীর্তি, রইল পড়ে বাইরে; গোধূলির আঁধার যতই নিবিড় হয়ে আসছে ততই তারা ছায়া হয়ে এল; তারা মিলিয়ে গেল মেঘের গায়ে সূর্যাস্তের বর্ণচ্ছটার সঙ্গে।'

অনেকখানি বাদ দিয়ে যে অল্প-কিছু বেছে নেবার জন্মে কবির মন তৈরি হল তার কথা আরো স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করে তিনি বললেন :

"যখন ক্লান্তি আসে, যখন পথ ও পাথেয় দুই-ই যায় কমে অথচ সামনে পথটা দেখতে পাই সুদীর্ঘ, তখন ছেলেবেলা থেকে যে-ঘর বাঁধবার সময় পাইনি সেই ঘরের কথা মন জিজ্ঞাসা করতে থাকে। তখনি আকাশের তারা ছেড়ে দীপের আলোর দিকে চোখ পড়ে। জীবলোকে ছোটো ছোটো মাধুরীর দৃশ্য যা তীরের থেকে দেখা দিয়ে সরে সরে গিয়েছে, চোখের উপরকার আলো ম্লান হয়ে এলে সেই অন্ধকারে তাদের ছবি ফুটে ওঠে; তখন বুঝতে পারি, সেই সব ক্ষণিকের দেখা প্রত্যেকেই মনের মধ্যে কিছু-না-কিছু ডাক দিয়ে গেছে। তখন মনে হয়, বড়ো বড়ো কীর্তি গড়ে তোলাই যে বড়ো কথা তা নয়, পৃথিবীতে যে-প্রাণের যজ্ঞ সম্পন্ন করবার জন্মে নিমন্ত্রণ পেয়েছি তাতে উৎসবের ছোটো পেয়ালাগুলি রসে ভরে তোলা শুনতে সহজ, আসলে দুঃসাধ্য।"

এই অসম্পূর্ণ প্রাণের যজ্ঞে কবির মন তাই প্রাণশক্তির ভাণ্ডারীর সন্ধানে ফিরছে। জানতে চেয়েছে শুষ্ক তপস্যার পিছনে কোথায় আছে অন্নপূর্ণার ভাণ্ডার।

৮

কবি যখন কলম্বো থেকে জাহাজে উঠবার জন্মে প্রস্তুত হচ্ছেন তখন একটি বাঙালি মেয়ে ["শিলঙের চিঠি"র শ্রীমতী নলিনী দেবী] তাঁকে শুভেচ্ছা জানিয়ে অনুরোধ করেছিলেন তিনি যেন ডায়ারি লেখেন। ডায়ারি লেখাতে কবির চিরকালের আপত্তির কথা সবারই জানা আছে। তবু শরীর-মনের সেই অবস্থায় তাঁর মনের ভাব স্বগতোক্তির মতই ডায়ারির আকারে প্রকাশিত হতে লাগল। ২৯শে সেপ্টেম্বর কবি লিখছেন, 'বিশেষ-কোনো একজনকে চিঠি লেখবার একটা প্রচ্ছন্ন বীথিকা যদি সামনে পাওয়া যেত তাহলে তারই নিভৃতছায়ার ভিতর দিয়ে আমার নিরুদ্দেশ বাণীকে অভিসারে পাঠাতুম। কিন্তু সে-বীথিকা আজ নেই। তাই অপরিচিত ক্যাবিনে আলো জেলে নিজের কাছেই নিজে বকতে লাগলুম।' এই নিজের কাছেই নিজের কথা বলার ফল হল "পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি।" পূর্বোদ্ধৃত আর-একদিনের ডায়ারি থেকেও জানা যাচ্ছে, কবির মন তখন অন্তকে কিছু দেবার কথা ভাবে নি,

উঠে আমার কাছে প্রকাশ পেলে। একে সম্পূর্ণ করে দেখবার জন্যে এতবড়ো আকাশ এবং এত গভীর স্তব্ধতার দরকার ছিল।'[১১]

ডায়ারির এই 'ছবি'রই দোসর সেই দিনই লেখা পূরবীর "ছবি" কবিতাটি। 'ছবি'র উপসংহারে আকাশপটের চিত্রটি কবির নিজের মানসপটে প্রতিবিম্বিত হয়েছে। কবি লিখছেন:

এমনি রঙের খেলা নিত্য খেলে আলো আর ছায়া,
এমনি চঞ্চল মায়া
জীবন-অম্বরতলে,
দুঃখে সুখে বর্ণে বর্ণে লিখা
চিহ্নহীন পদচারী কালের প্রান্তরে মরীচিকা।
তার পরে দিন যায়, অস্ত যায় রবি,
যুগে যুগে মুছে যায় লক্ষ লক্ষ রাগরক্ত ছবি।
তুই হেথা কবি,
এ বিশ্বের মৃত্যুর নিশ্বাস
আপন বাঁশিতে ভরি গানে তারে বাঁচাইতে চাস।

চারদিকের বিপুল রিক্ততার মাঝখানে শান্ত একটি গভীরতার মধ্যে তলিয়ে গিয়ে আকাশ-সমুদ্রের মহাসঙ্গমে সমুদ্ঘাটিত হল কবির অন্তরঙ্গতম মনোবাসনাটি। প্রত্যাবর্তনের পথেও ক্রাকোভিয়া জাহাজে ১২ই ফেব্রুয়ারির ডায়ারিতে কবি লিখছেন:

'দিনের আলো যখন নিবে আসছে, সামনের অন্ধকারে যখন সন্ধ্যার তারা দেখা দিল, যখন জীবনযাত্রার বোঝা খালাস করে অনেকখানি বাদ দিয়ে অল্প কিছু বেছে নেবার জন্যে মনকে তৈরি হতে হচ্ছে, তখন কোন্‌টা রেখে কোন্‌টা নেবার জন্যে মনের ব্যগ্রতা আমি তাই লক্ষ্য করে দেখছি। সমস্ত দিন প্রাণপণ চেষ্টায় যা-কিছু সে জমিয়েছিল, গড়ে তুলেছিল, সংসারের হাটে যদি তার কিছু দাম থাকে তবে তা সেইখানেই থাক্, যারা আগলে রাখতে চায় তারাই তার খবরদারি করুক, রইল টাকা, রইল খ্যাতি, রইল কীর্তি, রইল পড়ে বাইরে; গোধূলির আঁধার যতই নিবিড় হয়ে আসছে ততই তারা ছায়া হয়ে এল, তারা মিলিয়ে গেল মেঘের গায়ে সূর্যাস্তের বর্ণচ্ছটার সঙ্গে।'

অনেকখানি বাদ দিয়ে যে অল্প-কিছু বেছে নেবার জন্যে কবির মন তৈরি হল তার কথা আরো স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করে তিনি বললেন :

"যখন ক্লান্তি আসে, যখন পথ ও পাথেয় দুই-ই যায় কমে অথচ সামনে পথটা দেখতে পাই সুদীর্ঘ, তখন ছেলেবেলা থেকে যে-ঘর বাঁধবার সময় পাইনি সেই ঘরের কথা মন জিজ্ঞাসা করতে থাকে। তখনি আকাশের তারা ছেড়ে দীপের আলোর দিকে চোখ পড়ে। জীবলোকে ছোটো ছোটো মাধুরীর দৃশ্য যা তীরের থেকে দেখা দিয়ে সরে সরে গিয়েছে, চোখের উপরকার আলো ম্লান হয়ে এলে সেই অন্ধকারে তাদের ছবি ফুটে ওঠে; তখন বুঝতে পারি, সেই সব ক্ষণিকের দেখা প্রত্যেকেই মনের মধ্যে কিছু-না-কিছু ডাক দিয়ে গেছে। তখন মনে হয়, বড়ো বড়ো কীর্তি গড়ে তোলাই যে বড়ো কথা তা নয়, পৃথিবীতে যে-প্রাণের যজ্ঞ সম্পন্ন করবার জন্যে নিমন্ত্রণ পেয়েছি তাতে উৎসবের ছোটো পেয়ালাগুলি রসে ভরে তোলা শুনতে সহজ, আসলে দুঃসাধ্য।"

এই অসম্পূর্ণ প্রাণের যজ্ঞে কবির মন তাই প্রাণশক্তির ভাণ্ডারীর সন্ধানে ফিরছে। জানতে চেয়েছে শুষ্ক তপস্যার পিছনে কোথায় আছে অন্নপূর্ণার ভাণ্ডার।

৮

কবি যখন কলম্বো থেকে জাহাজে উঠবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছেন তখন একটি বাঙালি মেয়ে ["শিলঙের চিঠি"র শ্রীমতী নলিনী দেবী] তাঁকে শুভেচ্ছা জানিয়ে অনুরোধ করেছিলেন তিনি যেন ডায়ারি লেখেন। ডায়ারি লেখাতে কবির চিরকালের আপত্তির কথা সবারই জানা আছে। তবু শরীর-মনের সেই অবস্থায় তাঁর মনের ভাব স্বগতোক্তির মতই ডায়ারির আকারে প্রকাশিত হতে লাগল। ২৯শে সেপ্টেম্বর কবি লিখছেন, 'বিশেষ-কোনো একজনকে চিঠি লেখবার একটা প্রচ্ছন্ন বীথিকা যদি সামনে পাওয়া যেত তাহলে তারই নিভৃতছায়ার ভিতর দিয়ে আমার নিরুদ্দেশ বাণীকে অভিসারে পাঠাতুম। কিন্তু সে-বীথিকা আজ নেই। তাই অপরিচিত ক্যাবিনে আলো জেলে নিজের কাছেই নিজে বকতে লাগলুম।' এই নিজের কাছেই নিজের কথা বলার ফল হল "পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি।" পূর্বোদ্ধৃত আর-একদিনের ডায়ারি থেকেও জানা যাচ্ছে, কবির মন তখন অন্যকে কিছু দেবার কথা ভাবে নি,

নিজের কাছ থেকে নিজেই কিছু পাবার জন্মে আকুল হয়েছে। 'পূরবী'র সমসাময়িক কবিতাগুলিতেও কবির এই একই মনোভাব পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। তাই "পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি"র দোসর হল 'পূরবী'র এই পর্যায়ের লেখাগুলি। দোসরও বটে, আবার পরিপূরকও বটে। তাই "পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি"র সঙ্গে 'পূরবী'র কবিতাগুলি মিলিয়ে পড়লেই এযুগের কবিমানসের পূর্ণ পরিচয়টি পাওয়া যাবে। ডায়ারির প্রথম পর্যায় শুরু হয়েছে ২০শে সেপ্টেম্বর, মাঝখানে ১লা অক্টোবর বাদ দিয়ে [সেদিন কবির কথা "পূর্ণতা" ও "আহ্বান" এই দুটি কবিতার মধ্যে অভিব্যক্ত] ৭ই অক্টোবর পর্যন্ত লেখা চলেছে। "পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি"র মূলকথা ওই কদিনের ডায়ারিতেই পাওয়া যাবে। ডায়ারির দ্বিতীয় পর্যায়ের শুরু চার মাস পরে ৭ই ফেব্রুয়ারি ক্রাকোভিয়া জাহাজে প্রত্যাবর্তনের পথে। প্রথম পর্যায়ের শেষদিনে যেখানে কবি তাঁর নিজের কাছে নিজের কথা বলা শেষ করছেন সেখানে তিনি বলছেন, 'যে-লীলালোকে জীবনযাত্রা শুরু করেছিলুম, যে-লীলাক্ষেত্রে জীবনের প্রথম অংশ অনেকটা কেটে গেল, সেইখানেই জীবনটার উপসংহার করবার উদ্বেগে কিছুকাল থেকেই মনের মধ্যে একটা মন-কেমন-করার হাওয়া বইছে। * * * বিদায়ের গোধূলিবেলায় সেই আরম্ভের কথাগুলো সাঙ্গ করে যেতে হবে। সেইজন্যেই সকালবেলার মল্লিকা সন্ধ্যাবেলাকার রজনীগন্ধা হয়ে তার গন্ধের দূত পাঠাচ্ছে। বলছে, তোমার খ্যাতি তোমাকে না টানুক, তোমার কীর্তি তোমাকে না বাঁধুক, তোমার গান তোমাকে পথের পথিক করে তোমাকে শেষযাত্রায় রওনা করে দিক। প্রথম বয়সের বাতায়নে বসে তুমি তোমার দূরের বঁধুর উত্তরীয়ের সুগন্ধি হাওয়া পেয়েছিলে। শেষ বয়সের পথে বেরিয়ে গোধূলিরাগের রাঙা আলোতে তোমার সেই দূরের বঁধুর সন্ধানে নির্ভয়ে চলে যাও।'[১১]

৯

হারুনা-মারু জাহাজে ৫ই অক্টোবর কবি ডায়ারিতে যে আত্মপরিচয় উদ্‌ঘাটিত করেছিলেন, প্রথম অধ্যায়ে আমরা তা উদ্ধার করেছি। এই আত্মপরিচয়ের শেষদিকে কবি বলেছিলেন, 'মন কাঁদছে, মরবার আগে

গাখোলা ছেলের জগতে আর-একবার শেষ ছেলেখেলা খেলে নিতে, দায়িত্বহীন খেলা। আর, কিশোর বয়সে যারা আমাকে কাঁদিয়েছিল, হাসিয়েছিল, আমার কাছ থেকে আমার গান লুঠ করে নিয়ে ছড়িয়ে ফেলেছিল, আমার মনের কৃতজ্ঞতা তাদের দিকে ছুটল। * * * মধ্যাহ্নে মনে হল তারা তুচ্ছ; বোধ হল তাদের ভুলেই গেছি। তারপরে সন্ধ্যার অন্ধকারে যখন নক্ষত্রলোক সমস্ত আকাশ জুড়ে আমার মুখের দিকে চাইল তখন জানলুম, সেই ক্ষণিকা তো ক্ষণিকা নয়, তারাই চিরকালের; ভোরের স্বপ্নে বা সন্ধ্যাবেলার স্বপ্নাবেশে জানতে না-জানতে তারা যার কপালে একটুখানি আলোর টিপ পরিয়ে দিয়ে যায় তাদের সৌভাগ্যের সীমা নেই।'

ডায়ারির এই কথাগুলির সঙ্গে মিলিয়ে পড়লেই পরদিন লেখা "ক্ষণিকা" কবিতাটির পূর্ণ তাৎপর্য প্রাঞ্জল হয়ে ওঠে। কবিজীবনের প্রথম ঘুমভাঙা প্রভাতে যারা এনেছিল নতুন-ফোটা বেলফুলের মালা, জীবনের অপরাহ্ণ-লগ্নে কবি বুঝলেন 'সেই ক্ষণিকা তো ক্ষণিকা নয়, তারাই চিরকালের।' তাদেরই একজন "ক্ষণিকা" কবিতার আলম্বন। 'বিদেশী পাখি' শীর্ষক পঞ্চম অধ্যায়ে আমরা এই 'ক্ষণিকা'-প্রসঙ্গ আলোচনা করেছি।

"শেষ অর্ঘ্য" কবিতায়ও কবি যে 'ক্ষণিকা'র কথা বলেছেন, যে 'স্বপ্নের আলসে ছোঁয়াল পরশমণি জ্যোতির কণিকা'—সেই 'ক্ষণিকা'ও তাঁর মুগ্ধ সজল নয়নের একটি স্বপ্ন, তাঁর অসীম চিত্ত-গগনের একটি চন্দ্র। এই প্রসঙ্গে ১২৮৮ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রকাশিত "দোসর" [অষ্টম অধ্যায় দ্রষ্টব্য] প্রবন্ধটির মূল বক্তব্যের কথা স্মরণ করা যেতে পারে। সেখানে কবি বলেছেন, 'এ জগৎ মিত্রাক্ষরের কবিতা।' 'প্রেম একটি পাত্র অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছে।...একটি হৃদয়ের জন্য একটি হৃদয় গঠিত হইয়া আছেই। তাহারা পরস্পর পরস্পরের জন্য।...হৃদয়ে সেই দোসরের একটি অশরীরী প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহাকেই ভালবাস, তাহার সহিত কথোপকথন কর। তাহাকে বল, হে আমার প্রাণের দোসর, আমার হৃদয়ের হৃদয়। আমি সিংহাসন প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি, কবে তুমি আসিবে?' কবিমানসের সিংহাসনে তাঁর 'যথার্থ দোসরে'র বিগ্রহ চিরপ্রতিষ্ঠিত। বৈষ্ণবের কিশোর-কিশোরী-লীলার কৃষ্ণবল্লভাগণের রাজ্যে সখী ও মঞ্জরীবৃন্দের মধ্যে মহাভাব-স্বরূপিণী শ্রীরাধার যে আসন, কবিমানসে তাঁর 'যথার্থ দোসর' সেই আসনেই

অধিষ্ঠিতা। ডায়ারিতে লিপিবদ্ধ ব্যক্তিজীবনের অভিজ্ঞতার রাজ্য পেরিয়ে কবি যখন কাব্যের কল্পনালোকে বিহার করেন তখনি তিনি তাঁর "চিরকালের যথার্থ আপনার মধ্যেই" প্রবেশ করেন। 'ছিন্নপত্রে' তিনি বলেছেন, 'যেমনি কবিতা লিখতে আরম্ভ করি অমনি আমার চিরকালের যথার্থ আপনার মধ্যে প্রবেশ করি * * *। জীবনে জ্ঞাতসারে এবং অজ্ঞাতসারে অনেক মিথ্যাচরণ করা যায় কিন্তু কবিতায় কখনো মিথ্যা কথা বলিনে—সেই আমার জীবনের সমস্ত গভীর সত্যের একমাত্র আশ্রয়স্থান।'[১২]

"স্বপ্ন" কবিতায় কবি যখন বলেন, 'তোমায় আমি দেখি নাকো, শুধু তোমার স্বপ্ন দেখি' তখন বুঝতে পারা যায় তাঁর অন্তর্বর্তিনী মানসীমূর্তি সম্পর্কে কেন তিনি বলেছেন, 'যে-তুমি মোর দূরের মানুষ সেই-তুমি মোর কাছের কাছে।' কবিমানসীর মধ্যে 'এই জনমের রূপের তলে আর-জনমের ভাবের স্মৃতি' জড়িয়ে আছে বলেই তিনি 'নিত্যকালের বিদেশিনী'। তাঁরই উদ্দেশে কবি বলছেন:

চিত্তে তোমার মূর্তি নিয়ে ভাবসাগরের খেয়ায় চড়ি।
বিধির মনের কল্পনারে আপন মনে নতুন গড়ি।
আমার কাছে সত্য তাই,
মন-ভরানো পাওয়ায় ভরা বাইরে-পাওয়ার ব্যর্থতাই।

এই 'বাইরে-পাওয়ার ব্যর্থতা' দিয়েই যে 'মন-ভরানো পাওয়ায়' কবির মন ভরে আছে, অর্থাৎ তাঁর জীবনের ব্যর্থ লগ্নই যে তাঁর 'পরম লগ্ন' এই সত্য এইসব কবিতায় কাব্যের ভাষাকে আশ্রয় করে অভিব্যক্ত হয়েছে।

১০

'পূরবী'র যুগে কবিমানসে কিশোর প্রেমের পুনরুজ্জীবনের মধ্য দিয়েই কবি-কিশোরের নবজন্ম হল। এই দ্বিতীয় জন্মের পরবর্তী ষোলো-সতেরো বৎসর, অর্থাৎ রবীন্দ্র-জীবনের শেষ অধ্যায় তাঁর প্রাণের দোসরের সঙ্গে যে লীলারস আস্বাদিত হবে তারই আভাস বহন করে এনেছে 'পূরবী'র "খেলা" ও "দোসর" কবিতা দুটি। "খেলা" কবিতায় কবি তাঁর 'খেলার সাথি'কে জিজ্ঞাসা করছেন, 'সন্ধ্যাবেলায় এ কোন্ খেলায় করলে নিমন্ত্রণ, ওগো খেলার

সাথি।' সাঁঝের বাতি জ্বালিয়ে অস্ত-সোনায় এঁকে উদয়-ছবি কি শেষ হবে? তাঁর হারিয়ে-ফেলা বাঁশি লুকোচুরির ছলে পালিয়েছিল। তাঁর 'খেলার গুরু' বনের পারে শুকনো পাতার তলে আবার তাকে খুঁজে পেয়েছেন। সকালবেলায় বটের তলায় শিশির-ভেজা ঘাসে পাশে বসে তিনি যে-সুর শিখিয়েছিলেন সেই সুরই আজ বুকের দীর্ঘশ্বাসে, উছল চোখের জলে ক্ষণে ক্ষণে বেজে উঠছে। তাই কবির জিজ্ঞাসা:

আমার কাছে কি চাও তুমি, ওগো খেলার গুরু,
কেমন খেলার ধারা।
চাও কি তুমি যেমন করে হল দিনের শুরু,
তেমনি হবে সারা।

* * *

বাঁধা পথের বাঁধন মেনে চলতি কাজের স্রোতে
চলতে দেবে নাকো?
সন্ধ্যাবেলায় জোনাক-জ্বালা বনের আঁধার হতে
তাই কি আমায় ডাক?

এই 'খেলার গুরু'ই কবির যৌবনলগ্নে তাঁর কৌতুকময়ী অন্তর্যামী রূপে পদে পদে দিক্ ভুলিয়ে তাঁকে নূতন দেশে নিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁরই পরশ-রস-তরঙ্গে কবির নিখিল গগন আনন্দে আন্দোলিত হয়ে উঠেছিল। জীবনদেবতার সেই নিবিড় গভীর প্রেমের আনন্দই আবার ফিরে এল কবির জীবনে। কিন্তু এ তো পূজামন্দিরে আরতির প্রদীপ জ্বালানো নয়! নির্জন অঙ্গনে গন্ধপ্রদীপ জ্বালিয়ে শেষ-অভিসারের জন্যে বাসক-সজ্জা রচনা! তাই কবি বলছেন:

জানি জানি, তুমি আমার চাও না পূজার মালা,
ওগো খেলার সাথি।
এই জনহীন অঙ্গনেতে গন্ধপ্রদীপ জ্বালা,
নয় আরতির বাতি।
তোমার খেলায় আমার খেলা মিলিয়ে দেব তবে
নিশীথিনীর স্তব্ধ সভায় তারার মহোৎসবে,
তোমার বীণার ধ্বনির সাথে আমার বাঁশির রবে
পূর্ণ হবে রাতি।

তোমার আলোয় আমার আলো মিলিয়ে খেলা হবে,
নয় আরতির বাতি।

১১

অন্তরে কিশোর-প্রেমের প্রদীপ জ্বালিয়ে জীবনের এই অন্তিমলীলার প্রতীক্ষার কথা "দোসর" কবিতায় আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। "পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারিতে" কবি নিজের সম্পর্কে বলেছেন, 'জন্মকাল থেকে আমাকে একখানা নির্জন নিঃসঙ্গতার ভেলার মধ্যে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে।' এই নিঃসঙ্গতাবোধই দোসর-জনের প্রতীক্ষার অভিলাষকে আরো মধুর করে তুলেছে। কবি বলছেন :

দোসর আমার, দোসর ওগো, কোথা থেকে
কোন্ শিশুকাল হতে আমায় গেলে ডেকে।
তাই তো আমি চিরজনম একলা থাকি,
সকল বাঁধন টুটল আমার, একটি কেবল রইল বাকি—
সেই তো তোমার ডাকার বাঁধন, অলখ ডোরে
দিনে দিনে বাঁধল মোরে।

জীবনের সকল বাঁধন যখন টুটল তখনো কবির মনে হচ্ছে কেবল একটি বাঁধন এখনো বাকি; সেটি তাঁর দোসরের 'ডাকার বাঁধন'। তাঁরই সঙ্গে চিরপ্রত্যাশিত মিলনের আনন্দে সারা জীবনব্যাপী নিঃসঙ্গতার বেদনার অবসান হবে সেই আশাতেই কবি বলছেন :

দোসর ওগো, দোসর আমার, দাও না দেখা,
সময় হল একার সাথে মিলুক একা।
নিবিড় নীরব অন্ধকারে রাতের বেলায়
অনেক দিনের দূরের ডাকা পূর্ণ করো কাছের খেলায়।
তোমায় আমায় নতুন পালা হোক না এবার
হাতে হাতে দেবার নেবার।

'অনেক দিনের দূরের ডাকা পূর্ণ করো কাছের খেলায়।' এই হল কবি-কিশোরের দ্বিতীয় জন্মের ঐকান্তিক প্রার্থনা। 'পূরবী'র "লীলাসঙ্গিনী" ও

"আহ্বান" কবিতায় কবিজীবনের অপরাহ্নলগ্নের এই মর্মবাণীই অমর কাব্যছন্দে উদ্‌গীত হয়েছে। 'জীবনদেবতা' প্রসঙ্গে কবিমানসীর কাব্যভাষ্য খণ্ডে এই অন্তিম আহ্বায়িকা লীলাসঙ্গিনীর সম্যক্ পরিচয় উদ্‌ঘাটিত হবে। "খেলা" ও "দোসর" কবিতাযুগলে কবির কণ্ঠ 'নিজের কাছে নিজের কথা বলা'র মতই অন্তরঙ্গ। "পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি"তে ৩০শে সেপ্টেম্বর যে প্রেমতত্ত্বের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ কবি করেছেন,[১৩] তারই আলোকে কবির এই দ্বিতীয় জন্মের লীলা আস্বাদনীয়। অস্তাচলের পারে দাঁড়িয়ে উদয়াচলের সংগীতে প্রাণের নিঃশ্বাস পূর্ণ করে নবকৈশোরের এই লীলারস 'পূরবী'র কাব্যমালঞ্চকে চিরমধুর করে রেখেছে।

॥ উল্লেখ-পঞ্জী ॥

১ পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি, ১৩ই ফেব্রুয়ারি ১৯২৫ ; যাত্রী, পৃ° ১৩১।

২ শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত রচিত 'রবীন্দ্র-চিত্রকলা', পৃ° ৩২।

৩ জীবনস্মৃতি, রবীন্দ্র-রচনাবলী-১৭, পৃ° ২৬৪।

৪ কবিকথা, বিশ্বভারতী পত্রিকা, কার্তিক-পৌষ ১৩৫৩, পৃ° ১৪৭-৪৮।

৫ দ্রষ্টব্য : কানাই সামন্ত প্রণীত 'রবীন্দ্র-প্রতিভা' গ্রন্থ, পৃ° ৩৯৬।

৬ আত্মপরিচয়, পৃ° ৭।

৭ পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি, যাত্রী, পৃ° ১৬-১৮।

৮ সৃষ্টি, সাহিত্যের পথে ; রবীন্দ্র-রচনাবলী-২৩, পৃ° ৩৯২।

৯ রবীন্দ্র-রচনাবলী-১৭, পৃ° ৪৯০-৯১।

১০ যাত্রী, পৃ° ৬৫-৬৬।

১১ তদেব, পৃ° ৯০।

১২ ছিন্নপত্র, পত্রসংখ্যা ৮০, পৃ° ১৫৭।

১৩ দ্রষ্টব্য, যাত্রী, পৃ° ৪৫-৬০।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

'বিজয়া'

১

…এমন সময়ে অবসাদের অপরাহ্নে
অপ্রত্যাশিত পথে এসেছে
অমরাবতীর মর্ত্যপ্রতিমা—
সেবাকে তারা সুন্দর করে,
তপঃক্লান্তের জন্যে তারা
আনে সুধার পাত্র ;
ভয়কে তারা অপমানিত করে
উল্লোল হাস্যের কলোচ্ছ্বাসে ;
তারা জাগিয়ে তোলে দুঃসাহসের শিখা
ভস্মে-ঢাকা অঙ্গারের থেকে ;
তারা আকাশবাণীকে ডেকে আনে
প্রকাশের তপস্যায়।…

কবিজীবনের অপরাহ্ণলগ্নে তাঁর দেহ যখন রোগজর্জর, মন ক্লান্ত ও অবসন্ন, তখন সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত পথে তাঁর জীবনে এলেন এক আশ্চর্য রমণী ; সেবাকে তিনি সুন্দর করলেন, তপঃক্লান্তের জন্যে তিনি আনলেন সুধার পাত্র। 'আণ্ডেস' জাহাজ কবিকে নিয়ে আর্জেন্টিনার রাজধানী বুয়োনেস এয়ারিসে পৌছল ৭ই নভেম্বর। অ্যাটলান্টিক মহাসাগরের বুকে এই তিন সপ্তাহের সমুদ্রপাড়ি যে কবির পক্ষে খুবই পীড়াদায়ক হয়েছিল তার কথা 'পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি' থেকে আমরা জেনেছি। আর্জেন্টিনায় পৌছে কবি তাঁর বৌমা প্রতিমা দেবীকে এক চিঠিতে লিখছেন, ডাঙায় পৌছবার দিন সাতেক আগে আবার তিনি ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত হন। বুকে এমন ব্যথা আর দুর্বলতায় চেপে ধরেছিল যে, তাঁর প্রায়ই মনে হত, এ যাত্রায় বুঝি আর তিনি দেশে ফিরে যেতে পারবেন না। সেই অসুস্থ শরীরে একমাত্র সঙ্গী এল্‌ম্‌হার্স্ট‌কে নিয়ে কবি পৌছলেন বুয়োনেস এয়ারিসে। দক্ষিণ গোলার্ধের

এই বৃহত্তম নগরীর অগণিত নরনারীর কাছ থেকে তিনি পেলেন বিপুল সম্বর্ধনা। নগরীর একটি বিশিষ্ট হোটেলে তাঁদের থাকার ব্যবস্থা হল। চিকিৎসা এবং সেবাশুশ্রূষার দিক দিয়ে এই মহামান্য অতিথির প্রতি কর্তব্যপালনে আর্জেন্টিনা কোন ত্রুটিই রাখল না। নগরীর নামজাদা ডাক্তার তাঁর চিকিৎসা করলেন। কিন্তু তবু তাঁর স্বাস্থ্যের তেমন কোনো উন্নতির লক্ষণ দেখা গেল না। বুয়োনেস এয়ারিস থেকে পেরুর রাজধানী লিমাতে পৌছতে তখনো দীর্ঘ গিরিপথ ট্রেনে অতিক্রম করা বাকি ছিল। কবির স্বাস্থ্যের কথা চিন্তা করে ডাক্তাররা পেরু-যাত্রা নিষেধ করলেন। স্থির হল, কিছুদিন বিশ্রামের পর আরেকটু সুস্থ বোধ করলে রেলপথের বদলে কবি সমুদ্রপথে পেরুতে যাবেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কবির আর পেরু যাওয়া কিছুতেই সম্ভব হল না। আর্জেন্টিনায় পৌছবার মাসেক কাল পরে কবি আবার প্রতিমা দেবীকে লিখছেন, 'দ্বিতীয়বার পেরু যাবার আয়োজন যখন পাকা করেচি এমন সময় কাল ডাক্তার এসে আবার আমাকে পরীক্ষা করলেন, আমার কিছুতেই যাওয়া চলবে না, না সমুদ্রপথে, না শৈলপথে। তাতে হঠাৎ বিপদ ঘট্‌তে পারে—আমার যথাসম্ভব সম্পূর্ণ বিশ্রাম দরকার। তাই এখানকার আশা ছেড়ে দিয়ে য়ুরোপে পাড়ি দেবার ব্যবস্থা করা গেল।'[১]

এই চিঠি লেখারও মাসেক কাল পরে জানুয়ারি মাসের ৪ তারিখ (১৯২৫) কবি ইতালীয় জাহাজ 'জুলিয়ো চেজারে' করে য়ুরোপ যাত্রা করলেন। ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দের ৭ই নভেম্বর থেকে ১৯২৫ খ্রীস্টাব্দের ৩রা জানুয়ারি—এই প্রায় দু মাস কাল—কবির জীবননাট্যের একটি বিস্ময়কর দৃশ্যে কল্পনাতীত ঘটনা-সন্নিবেশে এক অপূর্ব লীলারস আস্বাদিত হল। আর্জেন্টিনা স্পেনীশভাষী দেশ। কবির বহু গ্রন্থই এর আগে স্পেনীয় ভাষায় অনূদিত হয়েছে। কাজেই আর্জেন্টিনার সাহিত্যরসিক-সমাজে কবির অনুরাগীর সংখ্যা নগণ্য ছিল না। পেরুর স্বাধীনতাপ্রাপ্তির শতবার্ষিক উৎসবে পেরু-সরকার পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বহু বৈজ্ঞানিক ও সাহিত্যিককে আমন্ত্রণ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথও ছিলেন তাঁদের অন্যতম। কিন্তু আর্জেন্টিনায় কবি তাঁর অনুরাগী ভক্তদের কাছে পেলেন রাজসম্মান। সাধারণের কাছে পাওয়া সেই স্বতঃস্ফূর্ত সম্মান আবার একটি বিশেষ নারীর অনুরাগে অভিসিঞ্চিত হয়ে কবিচিত্তকে মাধুর্যরসে অভিভূত করে তুলল। এই বিশেষ নারীটি হলেন আর্জেন্টিনার

বিখ্যাত কবি-লেখিকা ও ললিতকলার উৎসাহদাত্রী কুমারী ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো (Victoria Ocampo)। ভিক্টোরিয়া নয়াদিল্লীর 'সাহিত্য আকাদামি'-প্রকাশিত রবীন্দ্র-শতবার্ষিকী গ্রন্থে [Rabindranath Tagore—A Centenary Volume] 'Tagore on the Banks of the River Plate' প্রবন্ধে অনুরাগরঞ্জিত ভাষায় রবীন্দ্রনাথের দক্ষিণ আমেরিকা ভ্রমণের কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি বলেছেন, কবির আবির্ভাব দক্ষিণ-আমেরিকাবাসী অনেকের কাছেই ছিল বছরের একটা বড় ঘটনা। তাঁর নিজের কাছে তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড়ো ঘটনাগুলির অন্যতম। ভিক্টোরিয়া ছিলেন গান্ধীভক্ত। গান্ধীজি সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, "the Indian I worship—for whom I find no adequate qualification." রবীন্দ্র-সাহিত্যের পরিচয় তিনি পেয়েছিলেন ইংরেজি ও ফরাসী অনুবাদের মধ্য দিয়ে। সান ইসিড্রোতে ১৯২৪-এর বসন্ত ছিল বড়ো সুন্দর। অজস্র গোলাপ ফুটেছিল। নিজের ঘরে বসে গোলাপের গন্ধে আমোদিত প্রতিটি সকাল তাঁর কেটেছে ভারতীয় কবির প্রতীক্ষায়—"reading Tagore, thinking of Tagore, writing to Tagore, waiting for Tagore." [পৃ° ২৭]

ভিক্টোরিয়ার জীবনে 'গীতাঞ্জলি' এসেছিল দেবতার আশীর্বাদের মতো। তিনি তখন একটি মানস-সংকটের মধ্য দিয়ে চলেছিলেন। 'গীতাঞ্জলি'র মধ্যে তিনি পেয়েছিলেন পথনির্দেশ। তাই কবিগুরু ছিলেন তাঁর প্রাণের চেয়েও প্রিয়। তারই ইঙ্গিত দিয়ে তিনি লিখেছেন, "Now as in rose-loaded spring of 1924, he is as near to me as my life, because he helped me to pass 'from the unreal to the real'." [পৃ° ২৮]

গান্ধীজি ও কবিগুরুর প্রতি তাঁর সুগভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ করে প্রবন্ধশেষে তিনি লিখেছেন, "The debt that I, a Westerner and a South American, owe to men like Gandhiji and Gurudev is like the restitution of a treasure I had inherited without being aware of it." [পৃ° ৪৭]

স্বভাবতই, ভিক্টোরিয়ার জীবনে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব একটি সুমধুর স্বপ্নের বাস্তবীভবনের মতোই পরম রোমাঞ্চকর। কবির অসুস্থতাও যেন

তাঁর জীবনে দেবতার বর হয়ে এল। আত্মীয়পরিজনহীন সেই সুদূর প্রবাসে তিনি অসুস্থ কবির সেবাশুশ্রূষার সমস্ত দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নিলেন। রাজধানী থেকে ক্রোশ দশেক দূরে সান ইসিড্রোতে তাঁর সুন্দর বাগানবাড়িতে তিনি নিয়ে গেলেন কবিকে। সেখানে অনুক্ষণ কবির সঙ্গে থেকে তিনি তাঁর নারীহৃদয়ের লাবণ্য এবং সুমধুর সেবার মাধুর্য দিয়ে ভরে তুললেন অসুস্থ কবির নিঃসঙ্গ প্রবাসের দিনগুলিকে। বুয়েনোস এয়ারিসে পৌঁছবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবেই কবির এই অবসর যাপনের সমস্ত আয়োজন সুন্দর ভাবে সম্পন্ন হল। প্রতিমা দেবীকে কবি লিখছেন, 'এখানকার একজন মহিলা আমাকে ঘরের লোকের মত যত্ন করছেন। তিনি আমার সঙ্গে [পেরুতে] যেতে রাজি হয়েছেন। তিনি তাঁর একটা বাগানবাড়ি আমাদের ছেড়ে দিয়েছেন। তিনি এখানকার খুব একজন বিখ্যাত লেখিকা—অনেকদিন থেকে আমার লেখা পড়ে আমাকে বিশেষ ভক্তি করেন।'[২]

রবীন্দ্রনাথের তরুণ যৌবনে তাঁর জীবনে আনা তরখড়ের আবির্ভাব প্রসঙ্গে আমরা বলেছিলাম, "যাঁরা জীবনে অসামান্যের স্বাক্ষর নিয়ে এসেছেন, 'অলৌকিক আনন্দের ভার' বিধাতা যাঁদের দিয়েছেন, তাঁদের জীবনে এমন সব ঘটনা ঘটে যা সাধারণের কল্পনারও বাইরে। রবীন্দ্র-জীবনে আনা-পর্ব এমনি একটি কল্পনাতীত কাহিনী। বিকশিতযৌবনা সুন্দরী বিদেশিনীর গৃহবিদ্যার্থী-রূপে সাড়ে-সতেরো বৎসরের এক অসামান্য কবি-কিশোরের উপস্থাপনা মহাকবির কল্পনাতেই শুধু সম্ভব। বিশ্বকবির জীবন-মহাকাব্যের স্রষ্টাকেও তাই মহাকবি বলতে হবে।" রবীন্দ্রজীবনের প্রভাতলগ্নে তাঁর মানসলোকে অন্নপূর্ণার আবির্ভাবের মতো তাঁর জীবনের অপরাহ্নলগ্নে ভিক্টোরিয়ার আবির্ভাবও একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা।

ভিক্টোরিয়া শুধু কবি লেখিকা ও শিল্পরসিকামাত্রই নন, অসামান্য-ব্যক্তিত্বসম্পন্না এই মহীয়সী নারীর মধ্যে নারীত্বের এক দুর্লভ মহিমাও বিকশিত হয়েছে। দার্শনিক-পরিব্রাজক কাউন্ট কাইজারলিং তাঁর 'Significant Memories' গ্রন্থে লিখেছেন, বিশ্বপরিক্রমায় বহু মনীষী পুরুষের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছে, কিন্তু আধুনিক পৃথিবীতে মহীয়সী নারীর সাক্ষাৎ তিনি পেয়েছেন অল্পই। তাঁর মতে, পাশ্চাত্ত্য জগতের বর্তমান

পরিবেশ নারীত্বের পূর্ণ বিকাশের পক্ষে অনুকূল নয়। কিন্তু দক্ষিণ-আমেরিকায় স্পেনীয় ও রোমক-ঐতিহ্যের ভিত্তিতে উত্তর-আমেরিকার নবলব্ধ জীবনাদর্শের পরিশীলনে এক নূতন নারীত্বের উদ্ভব হয়েছে। ভিক্টোরিয়ার মধ্যে এই দুর্লভ নারীত্বের মহিমা কাইজারলিং প্রত্যক্ষ করেছেন। তিনি লিখছেন, "In recent years, however, I have come in contact with one woman whose superlative eminence is beyond question, namely the Argentinian, Victoria Ocampo. A wonderfully beautiful woman of great vitality, acute intelligence, fine aesthetic feeling, enormous power of work and great social position. Her picture has inspired many, very many 'Views of American Meditations'"[৩] সামাজিক জীবনে ভিক্টোরিয়ার প্রভাবের কথা উল্লেখ করে কাইজারলিং বলছেন যে, দক্ষিণ-আমেরিকায় সামাজিক জীবনে পুরুষের চেয়ে নারীর স্থান অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। তা ছাড়া বিশ্বপরিক্রমায় দক্ষিণ-আমেরিকাতেই তিনি প্রথম দেখলেন যে, মানুষের আত্মিক দিকটাই সেখানে সবচেয়ে প্রাধান্য লাভ করেছে। আদর্শবাদী কাইজারলিং মানুষের নবসংস্কৃতির সন্ধানে যে সাধনা করেছেন, সে সাধনায় তিনি সর্বাধিক সহযোগিতা পেয়েছেন ভিক্টোরিয়ার কাছে। দক্ষিণ-আমেরিকায় তাঁর প্রভাবের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেছেন, "with her striking personality she exercised great influencc in the southern world, as very few women in the old world, have been able to do."[৪]

প্রতিমা দেবীও ভিক্টোরিয়া প্রসঙ্গে লিখেছেন, 'ভিক্টোরিয়া ইংরেজি খুব ভাঙা ভাঙা বলতেন, ফরাসী ভাষাতেই তাঁর দক্ষতা ছিল বেশী, তাঁকে সুন্দরী বলা চলে না, কিন্তু বুদ্ধির প্রখরতা তাঁর মুখে একটি সৌন্দর্যের দীপ্তি এনে দিত। তাঁর বড়ো-বড়ো কালো পল্লব-ঢাকা গাঢ় নীল চোখে একটি স্বপ্নময় আকর্ষণী ক্ষমতা ছিল। তাঁর দীর্ঘ দেহ গৌরবময় আভিজাত্যের পরিচয় দিত। তিনি যখন নতজানু হয়ে বাবামশায়ের পায়ের কাছে বসতেন, মনে হোত ক্রাইস্টের পুরানো কোনো ছবির পদতলে তাঁর হিব্রু ভক্তমহিলার নিবেদন-মূর্তি।'[৫]

এই অসামান্যা নারী কবিকে তাঁর আপন গৃহে ডেকে নিয়ে নিজেকে নিবেদন করলেন অসুস্থ কবির স্বেচ্ছাসেবিকা-রূপে। এ যোগাযোগ শুধু অপ্রত্যাশিতই নয়, কল্পনাতীতও বটে। কোথায় ভারতবর্ষ, আর কোথায় আর্জেন্টিনা! দুই দেশের দুই কবি-প্রতিনিধির মিলন হল, অথচ উভয়ের মধ্যে অন্তরঙ্গ আত্মপ্রকাশের কোন সাধারণ ভাষা পর্যন্ত নেই। কিন্তু উভয়ের মধ্যে উপচীয়মান অনুরাগের সৃষ্টি হল প্রায় প্রথম দৃষ্টিতেই। উভয়েই অতুলনীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী। তাঁদের একজন—কাইজারলিংয়ের ভাষায়—এমন এক পুরুষ যাঁর সমকক্ষ বহু-বহু শতাব্দী ধরে পৃথিবীর কোথাও পরিদৃষ্ট হয় নি (There has been no one like him anywhere on our globe for many and many centuries)। আর আরেকজন এমন এক নারী যাঁর সর্বাতিশায়ী গরিমা প্রশ্নের অতীত [a woman whose superlative eminence is beyond question]। এই দুটি দুর্লভ কবিচিত্তের মিলনে মানুষের অনুভূতির জগৎ সমৃদ্ধতর হবে, এ প্রত্যাশা অসঙ্গত নয়।

২

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'স্প্যানিশরা ভাবপ্রবণ জাত, ওদের সামলানো বড় কঠিন, তবে এই জাতই আবার পারে আবেগের উদ্দীপনায় আত্মোৎসর্গ করতে। এই বিদেশিনীর মধ্যে দেখেছিলুম সেই অনুরাগের আগুন।'* ভিক্টোরিয়া রবীন্দ্রনাথকে কি চোখে দেখেছিলেন তার পরিচয় পাওয়া যাবে তাঁর নিজের প্রবন্ধে। প্রথম দর্শনে তাঁর মনের কি প্রতিক্রিয়া হয়েছিল তা বর্ণনা করে তিনি লিখেছেন, "On his light-brown face there was not a single wrinkle in spite of his 64 years (my father's age). * * The eyes, black, with often lowered, perfect lids, still retained their youth and fire. * * * I felt frozen by the sudden and real presence of this distant man with whom my dreams had made me so familiar and who had been so close to my heart when all I had known of him were his poems."

[পৃ° ৩২] কবির সেবায় আত্মনিয়োগ করে তাঁর মনোভাব কোথায় গিয়ে পৌঁছেছিল তারই আভাস দিয়ে তিনি লিখছেন, "Thus I came, little by little, to know Tagore and his moods. Little by little he partially tamed the young animal, by turns wild and docile, who did not sleep, dog-like, on the floor outside his door, simply because it was not done." [পৃ° ৩৪] এই শেষ বাক্যটির ব্যঞ্জনা অপরিসীম। ভিক্টোরিয়ার মতো অসামান্য রমণীই এভাবে আত্মবিশ্লেষণ করতে পারেন। রবীন্দ্রনাথের প্রতি এই 'পরানুরক্তি'র সঙ্গে মিশেছিল অসুস্থ পুরুষের প্রতি সেবাময়ী নারীর হৃদয়সিন্ধুমথিত করুণা। তিনি বলেছেন, "And I discovered in myself a strong *maternal* sense of duty towards this man, my father's contemporary, whom I could not help myself treating at times like a child." [পৃ° ৩৬]

কবি ভিক্টোরিয়ার নামকরণ করেছিলেন 'বিজয়া'। 'পূরবী' গ্রন্থখানি তিনি বিজয়ার করকমলে উৎসর্গ করেছেন। শুধু গ্রন্থোৎসর্গই নয়, 'পূরবী'র "পথিক" অংশের ১০ই নভেম্বর [১৯২৪] থেকে ২৯শে ডিসেম্বর [১৯২৪] পর্যন্ত যে কবিতাগুলি লেখা হয়েছে তার বেশির ভাগ কবিতাতেই 'বিজয়া'র আবির্ভাব অনুভব করতে পারা যায়। তার মধ্যে বিশেষভাবে "বিদেশী ফুল", "অতিথি", "অন্তর্হিতা", "আশঙ্কা", "শেষ বসন্ত", "বিপাশা", "চাবি", "প্রভাতী", "মধু", "অদেখা", "প্রবাহিনী", "না-পাওয়া" ও "বনস্পতি"—এই কবিতাগুলি রবীন্দ্রনাথের প্রেমকাব্যে একান্তভাবে বিজয়ারই দান বলে পরিচিহ্নিত হতে পারে।

সান ইসিড্রোর সুরম্য পরিবেশে কবি যে অনুভবকে নূতন করে আস্বাদন করলেন তার কাব্যরূপ যেমন এই গীতিকবিতাগুলির মধ্যে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে তেমনই এই নূতন অভিজ্ঞতার আলোকে প্রেম সম্পর্কে কবির অনুভাবনা পরিচ্ছন্ন গদ্যরূপ পেয়েছে 'পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি'তে। স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পথে ক্রাকোভিয়া জাহাজে এডেন বন্দরে ১২ই ফেব্রুয়ারি [১৯২৫] তারিখে লেখা ডায়ারির প্রথম ভাগে এবং তার পরের দিনকার সমগ্র ডায়ারিতে কবি যে প্রেমতত্ত্ব বিশ্লেষণ করেছেন, নূতন অভিজ্ঞতার কষ্টিপাথরেই তার স্বর্ণকান্তি

উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। কাজেই সান ইসিড্রোতে লেখা প্রেমের কবিতাগুলিকে ডায়ারির গদ্যভাষ্যের সঙ্গে মিলিয়ে দেখাই সবদিক দিয়ে সমীচীন।

প্রথমেই মনে রাখতে হবে, সান ইসিড্রোর বাগানবাড়িতে কবি যখন পৌঁছলেন তখন তাঁর শরীর বিশেষভাবেই অসুস্থ, মন ক্লান্ত ও অবসাদগ্রস্ত। সঙ্গে রয়েছেন এলম্‌হার্স্ট আর ভিক্টোরিয়া। সান ইসিড্রোর সুন্দর পরিবেশ তাঁর ভাল লাগল। দুর্যোগভরা দুঃখরাত্রির অবসানে এ যেন আলোঝলমল নবপ্রভাতের আবির্ভাব। কবি লিখছেন—

স্বর্ণসুধা-ঢালা এই প্রভাতের বুকে
যাপিলাম সুখে,
পরিপূর্ণ অবকাশ করিলাম পান।
মুদিল অলস পাখা মুগ্ধ মোর গান।
যেন আমি নিস্তব্ধ মৌমাছি
আকাশ-পদ্মের মাঝে একান্ত একেলা বসে আছি।

[প্রভাত, ১১ই নভেম্বর]

স্বর্ণসুধা-ঢালা প্রভাতের বুকে আকাশ-পদ্মের মাঝে নিস্তব্ধ মৌমাছির মতো কবির মন একান্ত একেলা মুগ্ধ হয়ে আছে। মনের সেই বিশেষ অবস্থায় যে-নারী অনুক্ষণ সেবা ও পরিচর্যার মধ্য দিয়ে তাঁর অন্তরঙ্গ সান্নিধ্যে এলেন, তিনি যেন সেই রহস্যময়ী নারীসত্তারই বাস্তবী মূর্তি—যাকে একদিন কবি তাঁর 'জীবনস্মৃতি'তে বিশেষ অর্থে বলেছেন "বিদেশিনী"।' কবি যেন "সেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিশ্ববিমোহিনী বিদেশিনীর দ্বারে"ই আজ অতিথি হয়েছেন। একদিন প্রাণের যে-স্বপ্নকে কবি গানের সুরে ভাষা দিয়ে বলেছিলেন—

ভুবন ভ্রমিয়া শেষে
এসেছি তোমারি দেশে,
আমি অতিথি তোমারি দ্বারে, ওগো বিদেশিনী।—

আজ যেন সেই স্বপ্নই সত্য হয়ে এল কবির জীবনে। বস্তুত, ভিক্টোরিয়া 'জীবনস্মৃতি'তে ব্যাখ্যাত সেই বিশেষ অর্থেই বিদেশিনী। সেবার মধ্য দিয়ে কবি তাঁর প্রতিমুহূর্তের সঙ্গ পাচ্ছেন অথচ ভাষার মধ্য দিয়ে ভাবের আদান-প্রদানে রয়েছে দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান। আসলে ভিক্টোরিয়ার মুখে অনুরাগ প্রকাশের ভাষা গিয়েছিল হারিয়ে। রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন তিনি ইংরেজি ভালো

জানেন না বলেই এই নীরবতা। কিন্তু ভাষার অভাব নয়, অনুরাগের নিবিড়তাই ছিল এই নীরবতার হেতু। ভিক্টোরিয়া লিখছেন, "When we were alone together, shyness deprived me of all means of expression. Tagore thought I did not easily find words in English. But it was not the language that stopped me ; it was Tagore himself." [পৃ° ৪২] এই অপূর্ব অভিজ্ঞতার কথা কবি বলেছেন "বিদেশী ফুল" কবিতায়—

হে বিদেশী ফুল, আমি কানে কানে শুধানু আবার,
"ভাষা কী তোমার ?"
হাসিয়া দুলালে শুধু মাথা,
চারিদিকে মর্মরিল পাতা।
আমি কহিলাম, "জানি, জানি,
সৌরভের বাণী
নীরবে জানায় তব আশা।
নিঃশ্বাসে ভরেছে মোর সেই তব নিঃশ্বাসের ভাষা।"

অর্থবান ধনির জগতের বাইরে নিঃশ্বাসের ভাষায় আত্মপ্রকাশের এই রীতিতে প্রাণের গভীর চেতনা সত্যসত্যই রহস্যময় হয়ে উঠেছে। ভাষা যেখানে ব্যর্থ, অন্তরের যোগাযোগ সেখানে নিগূঢ়সঞ্চারী। কবি তাই বলছেন—

বোঝ নি কি তোমার পরশে
হৃদয় ভরেছে মোর রসে ?
কেই বা আমারে চেনে এর চেয়ে বেশি,
হে ফুল বিদেশী !

বারো তারিখে লেখা এই কবিতার তিন দিন পরে "অতিথি" কবিতায় কবি তাঁর কৃতজ্ঞচিত্তের অনুরাগ প্রকাশ করে বলছেন—

প্রবাসের দিন মোর পরিপূর্ণ করে দিলে, নারী,
মাধুর্যসুধায় ; কত সহজে করিলে আপনারি
দূরদেশী পথিকেরে।

* * *

জানি না তো ভাষা তব, হে নারী, শুনেছি তব গীতি,
"প্রেমের অতিথি কবি, চিরদিন আমারি অতিথি"।

যে নারী তাঁর মাধুর্যসুধায় কবির প্রবাসের দিনগুলি পরিপূর্ণ করে দিলেন, তাঁর প্রতি দিনে দিনে পরিবর্ধমানা প্রীতির পরিচয়বাহী পরবর্তী কবিতাগুলি বিশ্লেষণ করার পূর্বে একটি কথা মনে রাখা অত্যাবশ্যক। শারীরিক অসুস্থতার ফলে কবির মন তখন দুর্বল। দেহমনের সেই অবস্থায় যাঁর স্পর্শে কবির হৃদয় আনন্দরসে পূর্ণ হয়ে উঠেছে, তাঁর সঙ্গলাভের আকাঙ্ক্ষা, তাঁর কাছে আদর কুড়োবার জন্যে শিশুর মতো অবুঝ বাসনা তাঁর মানস-আকাশে মেঘ ও রৌদ্রের আলো-ছায়ায় লীলায়িত হয়ে ওঠা খুবই স্বাভাবিক। ষোলো ও সতেরো তারিখে লেখা "অন্তর্হিতা" ও "আশঙ্কা" কবিতায় এই মেঘ ও রৌদ্রের লীলা পরিদৃশ্যমান। প্রথম কবিতায় কবি বলছেন, আঁধার রাতে প্রদীপ যখন নিবেছিল, দুয়ার ছিল বন্ধ, ঘরে কেউ সাথী ছিল না; তখন হঠাৎ তাঁর মনে হল অন্ধকারে বাহির-দ্বারে তিনি যেন কার পায়ের ধ্বনি শুনতে পেলেন। বারেক ইচ্ছে হল দুয়ার খুলে দিতে। কিন্তু ক্ষণেক পরে ঘুমের ঘোরে সে কথা তিনি ভুলে গেলেন। তন্দ্রাবিষ্ট এই স্বপ্নকামনা বাস্তবে সত্য হয়ে উঠুক—এই প্রত্যাশাকে কাব্যচ্ছন্দে গ্রথিত করে কবি বলছেন—

আজ হতে মোর ঘরের দুয়ার
রাখব খুলে রাতে।
প্রদীপখানি রইবে জ্বালা
বাহির-জানালাতে।
আজ হতে কার পরশ লাগি
পথ তাকিয়ে রইব জাগি;
আর কোনোদিন আসবে না কি
আমার পরান ছেয়ে
যূথীর মালার গন্ধখানি
রাতের বাতাস বেয়ে?

স্বপ্নকামনার এই উজ্জ্বল আলো পরের দিনই "আশঙ্কা"র মেঘে ঢাকা পড়ল। আশঙ্কিতচিত্ত কবি লিখছেন —

পাছে আমার আপন ব্যথা মিটাইতে
ব্যথা জাগাই তোমার চিতে,
পাছে আমার আপন বোঝা লাঘব তরে
চাপাই বোঝা তোমার 'পরে,
পাছে আমার একলা প্রাণের ক্ষুব্ধ ডাকে
রাত্রে তোমায় জাগিয়ে রাখে,
সেই ভয়েতেই মনের কথা কইনে খুলে ;
ভুলতে যদি পার তবে
সেই ভালো গো যেয়ো ভুলে।

প্রথম কবিতায় যে-অনুভূতির প্রকাশ তাকে বলা যেতে পারে মানবিক দুর্বলতা, আর দ্বিতীয় কবিতায় যে উপলব্ধি অভিব্যঞ্জিত হয়েছে কবিরই ভাষায় তাকে বলা যাবে "ত্যাগের সাধন"। 'পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি'তে যেন এরই ভাষ্যরূপে কবি বলছেন, 'বাংলা ভাষায় প্রেম অর্থে দুটো শব্দের চল আছে, ভালোলাগা আর ভালোবাসা। এই দুটো শব্দে আছে প্রেমসমুদ্রের দুই উলটোপারের ঠিকানা। যেখানে ভালোলাগা সেখানে ভালো আমাকে লাগে; যেখানে ভালোবাসা সেখানে ভালো অন্যকে বাসি। আবেগের মুখটা যখন নিজের দিকে তখন ভালোলাগা, যখন অন্যের দিকে তখন ভালোবাসা। ভালোলাগায় ভোগের তৃপ্তি, ভালোবাসায় ত্যাগের সাধন।'[৮]

এর পূর্বদিনের ডায়ারিতে কবি বলছেন, 'যাকে আমরা ভালোবাসি তারি মধ্যে সত্যকে আমরা নিবিড় করে উপলব্ধি করি। কিন্তু, সেই সত্য-উপলব্ধির লক্ষণ হচ্ছে পাওয়ার সঙ্গে না-পাওয়াকে অনুভব করা।' এ সত্য চিরকালের রসিকজনের অনুভববেদ্য সত্য। কবিবল্লভের রাধা যখন বলেন, "লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখলুঁ তবু হিয়া জুড়ন না গেল" তখন তিনি ব্রজবুলির ধ্বনিঝংকারে এই একই অনুভবকে ভাষা দেন। রবীন্দ্রনাথের কবিমানসে চিরদিনই অনুরাগের অন্তরে বৈরাগ্য বাসা বেঁধে আছে। তাই ভালবাসার মধ্য দিয়ে তাঁর ব্যক্তিস্বরূপের পরম প্রকাশ যখনি ঘটেছে তখনি বন্ধনের মধ্যে মুক্তির আহ্বান ধ্বনিত হয়ে উঠেছে; মিলনের মধ্যেই বেজে উঠেছে চিরবিরহের সুর। "শেষবসন্ত" কবিতার আদিতেই তাই দেখি কবির আকুল প্রার্থনা—

তোমার কাননতলে ফাল্গুন আসিবে বারম্বার,
তাহারি একটি শুধু মাগি আমি দুয়ারে তোমার।

কিন্তু কবিতার অস্তিমস্তবকে বসন্তের ফুল-কুড়ানোর স্বপ্ন ভুলে গিয়ে সব-ছেড়ে-যাওয়ার জন্যেই নিজেকে প্রস্তুত করে কবি বলছেন—

রাত্রি যবে হবে অন্ধকার
বাতায়নে বসিয়ো তোমার।
সব ছেড়ে যাব, প্রিয়ে,
সমুখের পথ দিয়ে,
ফিরে দেখা হবে না তো আর।
ফেলে দিয়ো ভোরে-গাঁথা ম্লান মল্লিকার মালাখানি।
সেই হবে স্পর্শ তব, সেই হবে বিদায়ের বাণী।

পয়লা ডিসেম্বর "প্রভাতী" কবিতায় বলছেন—

এল যে আমার মন-বিলাবার বেলা,
খেলিব এবার সব-হারাবার খেলা,
যা-কিছু দেবার রাখিব না আর ঢাকি,

কিন্তু তিনদিন পরে "মধু" কবিতায় নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে কবিকণ্ঠে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র সুর লেগেছে—

মৌমাছির মতো আমি চাহি না ভাণ্ডার ভরিবারে
বসন্তেরে ব্যর্থ করিবারে

*　　*　　*

পাখির মতন মন শুধু উড়িবার সুখ চাহে
উধাও উৎসাহে ;
আকাশের বক্ষ হতে ডানা ভরি তার
স্বর্ণ-আলোকের মধু নিতে চায়, নাহি যার ভার,
নাহি যার ক্ষয়,
নাহি যার নিরুদ্ধ সঞ্চয়,
যার বাধা নাই,
যারে পাই তবু নাহি পাই।

এখানে কবির প্রেমচেতনা অনুভূতির এক নূতন স্তরে উন্নীত হয়েছে। তরুণ

যৌবনেই কবি অনুভব করেছিলেন, পথিক-সত্তাই মানুষের আসল সত্তা। প্রেমকে সেদিন তিনি বলেছিলেন, পথের আলো [পথপ্রান্তে, 'বিচিত্র প্রবন্ধ']। 'গীতাঞ্জলি'র যুগে সৌন্দর্য-সম্ভোগের আনন্দকে তিনি জ্যোতিঃসমুদ্রে শতদলপদ্মের মধুপানের সঙ্গে তুলনা করেছেন। আজ অন্তরের প্রেমানুভূতিকে ভাষা দিতে গিয়ে কবি সৌন্দর্যচেতনার সেই রূপকল্পটিকেই ব্যবহার করে বলেছেন, আকাশের বক্ষ হতে স্বর্ণ-আলোকের মধু ডানা ভরে নিয়ে পাখির মতন উধাও উৎসাহে ওড়ার আনন্দই তাঁর মনের কামনা। মৌমাছির মতো পুষ্পের মর্মকোষে সঞ্চিত মধুপানের আকাঙ্ক্ষা নয়, জীবনের শেষ-বসন্ত চেতনার আকাশে যে স্বর্ণ-আলোকের মধু ছড়িয়ে দিয়েছে, তারই প্রেরণায় প্রাণবিহঙ্গের নিঃসীম নভোবিহারের আকুলতা!

৩

বলাই বাহুল্য, কবি এই বিদেশিনীর মধ্যে অনুরাগের যে আগুন দেখেছিলেন প্রেমের হোমাগ্নিতে তার শিখাগুলিও দিনে দিনে দীপ্ত হয়েই উঠেছিল। রথীন্দ্রনাথ বলেছেন, ভিক্টোরিয়া শেষ পর্যন্ত কবিকে কিছুতেই পেরুতে যেতে দেন নি; এই নিয়ে পেরু এবং আর্জেন্টিনা এই দুই রাষ্ট্রের মধ্যে একটা বড় রকমের রাজনৈতিক সংকট পর্যন্ত পাকিয়ে উঠেছিল।[৯] দ্বিতীয়বার ডাক্তারি পরীক্ষার পর যখন স্থির হল কবি য়ুরোপ হয়ে দেশেই ফিরে যাবেন তখন এল্‌মহার্স্ট প্রত্যাবর্তনের আয়োজনে ব্যস্ত হলেন। কবি বলছেন, 'যদি বা ফেরবার জাহাজ পাওয়া গেল কিন্তু ভিক্টোরিয়া আমাকে কিছুতেই ছাড়তে চায় না। সাহেবের সঙ্গে তার ছিল একটু রেষারেষির সম্পর্ক, কারণ সাহেব সর্বদা আমার কাছাকাছি থাকত, সেটা সে সইতে পারত না। অবশেষে সে ভাবলে সাহেব আমাকে নিজের স্বার্থের জন্য এত তাড়াতাড়ি ইংলণ্ডে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে; গেল সাহেবের উপর খাপ্পা হয়ে।'[১০]

বস্তুত, ভিক্টোরিয়ার চরিত্রে স্প্যানিশ-জাতিসুলভ ভাবপ্রবণতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল তাঁর প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বের বলিষ্ঠতা। সেবার মাধুর্যের সঙ্গে অনুরাগের লাবণ্য মিশিয়ে তিনি রোগদুর্বল কবিচিত্তকে অভিভূত করেছিলেন

নিশ্চয়ই, কিন্তু নিজের অনুরক্ত চিত্তকে সংযম-সুন্দর করার প্রেরণাও তিনি পেয়েছিলেন কবির কাছ থেকেই। সান ইসিড্রো থেকে বিদায় নেবার সাত দিন আগে লেখা "বনস্পতি" কবিতায় বনস্পতি ও দিগঙ্গনার প্রতীকে কবি যে-কথা বলতে চেয়েছেন তার মধ্যেই তার ইঙ্গিত পাওয়া যাবে। কিন্তু তারও আগে 'পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি' থেকে প্রেম সম্পর্কে কবির নূতন উপলব্ধির কথা শুনে নেওয়া প্রয়োজন। কবি লিখছেন—

'নারীর প্রেম পুরুষকে পূর্ণশক্তিতে জাগ্রত করতে পারে; কিন্তু সে প্রেম যদি শুক্লপক্ষের না হয়ে কৃষ্ণপক্ষের হয় তবে তার মালিন্যের আর তুলনা নেই। পুরুষের সর্বশ্রেষ্ঠ বিকাশ তপস্যায়, নারীর প্রেমে ত্যাগধর্ম সেবাধর্ম সেই তপস্যারই সুরে সুর-মেলানো; এই দুয়ের যোগে পরস্পরের দীপ্তি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। নারীর প্রেমে আর-এক সুরও বাজতে পারে, মদনধনুর জ্যায়ের টংকার—সে মুক্তির সুর নয়, সে বন্ধনের সংগীত।

* * *

'পুরুষের সাধনায় চিরকালই প্রকৃতির সঙ্গে বিরুদ্ধতা আছে। নারীর প্রেম যেখানে এই বিরোধের সমন্বয় করে দেয়, কঠোর জ্ঞানের বেদিপ্রাঙ্গণে সে যখন পূজামাধুর্যের আসন রচনা করে—পুরুষের মুক্তিকে যখন সে লুপ্ত করে না, তাকে সুন্দর করে তোলে—তার পথকে অবরুদ্ধ করে না, পথের পাথেয় যুগিয়ে দেয়—ভোগবতীর জলে ডুবিয়ে দেয় না, সুরধুনীর জলে স্নান করায়—তখন বৈরাগ্যের সঙ্গে অনুরাগের, হরের সঙ্গে পার্বতীর, শুভপরিণয় সার্থক হয়।'[১১]

প্রত্যাবর্তনের পথে জাহাজ থেকে ১৯২৫ সনের ১৩ জানুয়ারি তারিখে লেখা এক চিঠিতে কবি ভিক্টোরিয়াকে লিখছেন, "My true home is there where from my surroundings comes the call to me to bring out the best that I have, for that inevitably leads me to the touch of the universal. My mind must have a nest to which the voice of the sky can descend freely, the sky that has no other allurements but light and freedom. * * * I assure you that through me a claim comes that is not mine. A child's claim upon its mother

has a sublime origin—it is not a claim of an individual, it is that of humanity. Those who come on some special errand of God are like that child; if they ever attract love and service it should be for a higher end than merely their own enjoyment" ['সেন্টিনারি ভল্যুম', পৃ° ৩০-৩১]

এই আত্মভাষ্যের আলোকে "বনস্পতি" কবিতার মর্মার্থ গ্রহণ করা সহজ হবে। উদ্ধৃত গদ্যাংশে কবি বলেছেন, 'পুরুষের সর্বশ্রেষ্ঠ বিকাশ তপস্যায়।' "বনস্পতি" কবিতায় বনস্পতিকে বলা হয়েছে 'আরণ্যক তপস্বী।' দিগঙ্গনা অকস্মাৎ-দস্যুতায় তার সর্বস্ব লুণ্ঠন করে নিয়ে যেতে চায়। কবি বলছেন—

দয়া কোরো, দয়া কোরো, আরণ্যক এই তপস্বীরে,
ধৈর্য ধরো, ওগো দিগঙ্গনা,
ব্যর্থ করিবারে তায় অশান্ত আবেগে ফিরে ফিরে
বনের অঙ্গনে মাতিয়ো না।
এ কী তীব্র প্রেম, এযে শিলাবৃষ্টি নির্মম দুঃসহ,—
দুরন্ত চুম্বনবেগে তব
ছিঁড়িতে ঝরাতে চাও অন্ধসুখে, কহ মোরে কহ,
কিশোর কোরক নব নব।

এখানে দিগঙ্গনার প্রেমে ভালবাসার আমন্ত্রণ নেই, আছে ভাললাগার দৌরাত্ম্য; তাই তাতে যে-সুর বেজে উঠেছে, সে তো মুক্তির সুর নয়, সে যে বন্ধনের সংগীত! নারীর ভালবাসায় যে ত্যাগধর্ম যে সেবাধর্ম আছে সে যখন পুরুষের তপস্যারই সুরে সুর মেলায় তখনই উভয়ের ব্যক্তিস্বরূপের পরম প্রকাশ ঘটে। পুরুষের মুক্তিকে তখন সে লুপ্ত করে না, তাকে সুন্দর করে তোলে—তার পথকে অবরুদ্ধ করে না, পথের পাথেয় যুগিয়ে দেয়। দিগঙ্গনার কাছে তাই কবির অনুনয়—

আসুক তোমার প্রেম দীপ্তিরূপে নীলাম্বরতলে,
শান্তিরূপে এসো দিগঙ্গনা।
উঠুক স্পন্দিত হয়ে শাখে শাখে পল্লবে বল্কলে
সুগম্ভীর তোমার বন্দনা।

দাও তারে সেই তেজ মহত্ত্বে যাহার সমাধান,
সার্থক হোক সে বনস্পতি।
বিশ্বের অঞ্জলি যেন ভরিয়া করিতে পারে দান
তপস্যার পূর্ণ পরিণতি।

যে তপস্যার মধ্য দিয়ে পুরুষের সর্বশ্রেষ্ঠ বিকাশ, সেই তপস্যার পূর্ণ পরিণতি বিশ্বের অঞ্জলি ভরে যেন কবি দান করতে পারেন, এই প্রেরণাই তিনি চেয়েছেন বিদেশিনী অনুরাগিণীর কাছে। তাঁর প্রেমকে তিনি আহ্বান করেছেন নীলাম্বরতলে দীপ্তিরূপে, শান্তিরূপে। তারপর সেই স্বর্ণ-আলোকের মধু ডানায় ভরে নিয়ে শুরু হবে সুদূরচারী দিব্যবিহঙ্গের নবতর নভোবিহার। তাই সান ইসিড্রোর শেষ কবিতা "পথ"; তাই 'পূরবী'র এই অংশের নাম "পথিক"!

৪

৩০শে ডিসেম্বর [১৯২৪] কবি আর্জেন্টিনা-সাধারণতন্ত্রের সভাপতির সঙ্গে দেখা করে বিদেশী বন্ধুদের কাছে বিদায় গ্রহণ করলেন। ৪ঠা জানুয়ারি ইতালীয় জাহাজে জেনোয়া বন্দরের উদ্দেশে তাঁর যাত্রা শুরু হল। ভিক্টোরিয়া জাহাজে Cabin de luxe রিজার্ভ করে দিলেন, পাছে কবির কোন কষ্ট ব অসুবিধা হয়। ক্যাবিনের আসবাবপত্রে তিনি সন্তুষ্ট হতে পারেন নি, তাই নিজের ড্রইংরুমের একখানি আরামচেয়ার তুলে দিলেন জাহাজে। এ নিয়ে জাহাজের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তাঁর ঝগড়া হল। অত বড় চেয়ার জাহাজের দরজায় প্রবেশ করবে না এই ছিল ক্যাপ্টেনের আপত্তি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভিক্টোরিয়াই বিজয়িনী হলেন। মিস্ত্রী ডাকিয়ে ক্যাবিনের দরজা খুলে তাঁর মনোনীত চেয়ারখানিই তিনি তুলে দিলেন কবির কামরায়।[১২]

প্লেইট নদীর তীরে সান ইসিড্রোর সেই অজস্র গোলাপ-ফোটানো বসন্তের দিনগুলি থেকে বিদায় নিয়ে আসতে কবির মন কিছুতেই চায় নি। শান্তিনিকেতনে ফিরে এসে ১৯২৫-এর আগস্ট মাসে লেখা এক চিঠিতে তিনি ভিক্টোরিয়াকে লিখছেন :

"You express regret in your letter that I could not continue to stay at that beautiful house near the river till the end of the summer. You do not know how often I wish I could do so. It was some lure of duty which drove me from the sweet corner with its inspiration for seemingly futile idling; but to-day I discover that my basket, while I was there, was being daily filled with shy flowers of poems that thrive under the shade of lazy hours. I can assure you, most of them will remain fresh long often the time when the laboriously built towers of my benificient deeds will crumble into oblivion." ['সেন্টিনারি ভল্যুম', পৃ° ৩১]

ভিক্টোরিয়ার সঙ্গে কবির পুনর্বার সাক্ষাৎ হয় ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দে প্যারিসে। সেবার য়ুরোপ-পরিক্রমায় কবি তাঁর সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন নিজের আঁকা অনেক ছবি। ফ্রান্সের যে-সব শিল্পী সেই ছবিগুলি দেখেছিলেন, তাঁরা চাইলেন প্যারিসে কবির চিত্রপ্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হোক। কিন্তু অনুসন্ধান করে বোঝা গেল যে, অত অল্প সময়ের মধ্যে প্যারিসে কোন প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা এক রকম অসাধ্য ব্যাপার। একটি উপযুক্ত ঘর পেতেই প্রায় বৎসর খানেক লাগে। নিরুপায় কবি স্মরণ করলেন ভিক্টোরিয়াকে। বুয়োনেস এয়ারিসে তাঁকে কেব্‌ল্ করে দেওয়া হল। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি চলে এলেন, এবং অত্যল্প সময়ের মধ্যে প্রদর্শনীর সমস্ত ব্যবস্থা করে দিলেন। এ সম্পর্কে কবি প্রতিমা দেবীকে লিখছেন, 'ভিক্টোরিয়া যদি না থাকত তাহলে ছবি ভালোই হোক্ মন্দই হোক কারো চোখে পড়ত না। একদিন রথী ভেবেছিল ঘর পেলেই ছবির প্রদর্শনী আপনি ঘটে—অত্যন্ত ভুল। এর এত কাঠখড় আছে যে সে আমাদের পক্ষে অসাধ্য—আন্দ্রের পক্ষেও। খরচ কম হয় নি—তিন চারশো পাউণ্ড হবে। ভিক্টোরিয়া অবাধে টাকা ছড়াচ্ছে। এখানকার সমস্ত বড়ো বড়ো গুণীজ্ঞানীদের ও জানে—ডাক দিলেই তারা আসে।'[১৬]

কবির সেই চিত্রপ্রদর্শনী উপলক্ষে আহূত হয়ে সেবার ভিক্টোরিয়া মাসেক কালের মত ছিলেন প্যারিসে। ১৯৩০ সনের ২রা মার্চ দেশ থেকে রওনা হয়ে কবি দক্ষিণ-ফ্রান্সের বন্দরে পৌঁছেছিলেন ২৬শে মার্চ। চিত্রপ্রদর্শনী

হয় ২রা মে। রথীন্দ্রনাথ এই যাত্রায় কবির সঙ্গে ছিলেন। প্যারিসে ভিক্টোরিয়াকে দেখে তাঁর কী মনে হয়েছিল, সে কথা তাঁর গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করে তিনি লিখেছেন—

"Her dignified bearing and charm of manners made her a very attractive personality. Whenever she came she would go straight to Father, in utter disregard of all formalities and completely oblivious of the presence of others. Her devotion to father was extraordinary. She had the deepest regard and affection for him and she was willing to go to any length to satisfy his slightest fancy."[১৪]

কবির সঙ্গে ভিক্টোরিয়ার অন্তরঙ্গ ঘনিষ্ঠতার কথা এর চেয়ে সুন্দর ভাষায় প্রকাশ করা দুঃসাধ্য। প্যারিসে দ্বিতীয়বার সাক্ষাতের ফলে কবি ভিক্টোরিয়াকে নিয়ে নূতন কোন কবিতা লিখেছিলেন বলে আমাদের জানা নেই। কিন্তু ভিক্টোরিয়া-প্রসঙ্গে কবির একটি গানের কথা বিশেষ ভাবেই মনে হয়। সেবার কবির য়ুরোপযাত্রার বাংলা তারিখ হল ১৩৩৬ সালের ১৮ই ফাল্গুন। চৈত্র ও বৈশাখের প্রায় সবটাই কাটল প্যারিসে। আমরা যে গানটির কথা বলছি সেটি লেখা হয় ১৩৩৬ সালে। সেই গানটি হল—

সুনীল সাগরের শ্যামল কিনারে
দেখেছি পথে যেতে তুলনাহীনারে।
সেকথা কভু আর পারে না ঘুচিতে,
আছে সে নিখিলের মাধুরীরুচিতে।
একথা শিখানু যে আমার বীণারে,
গানেতে চিনালেম সে চির-চিনারে।

*　　*　　*

শরতে ক্ষীণমেঘে ভাসিবে আকাশে
স্মরণ-বেদনার বরণে আঁকা সে।
চকিতে ক্ষণে ক্ষণে পাব যে তাহারে
ইমনে কেদারায় বেহাগে বাহারে॥

৫

প্রতিমা দেবী কবিজীবনের শেষের দিনগুলির বর্ণনায় লিখেছেন, 'বাবামশায় দক্ষিণ-আমেরিকার গল্প প্রায়ই করতেন।' ভিক্টোরিয়া যে আরামচেয়ারখানি কবির জন্তে ক্যাবিনে তুলে দিয়েছিলেন, সেবার নানাদেশ ঘুরে অবশেষে তা 'উত্তরায়ণে' পৌছেছিল। প্রতিমা দেবী লিখেছেন, 'অনেক দিন আর তিনি ওই চৌকি ব্যবহার করেন নি, আমাদের কাছেই পড়েছিল। আজ আবার ব্যামোর মধ্যে দেখলুম ওই চৌকিখানিতে বসা তিনি পছন্দ করছেন, সমস্ত দিনই প্রায় ঘুম বা বিশ্রামান্তে ওই আসনের উপর বসে থাকতেন।'[১৫]

আসনদাত্রীর উদ্দেশে কবির শেষ উপলব্ধির সাক্ষী হিসাবে "শেষ লেখা"র পঞ্চম কবিতাটি স্মরণীয়। মর্ত্য থেকে বিদায় নেবার মাস চারেক আগে কবি লিখছেন—

আরো একবার যদি পারি
খুঁজে নেব সে আসনখানি
যার কোলে রয়েছে বিছানো
বিদেশের আদরের বাণী।

অতীতের পালানো স্বপন
আবার করিবে সেথা ভিড়,
অস্ফুট গুঞ্জনস্বরে
আরবার রচি দিবে নীড়।

*   *   *

বিদেশের ভালোবাসা দিয়ে
যে প্রেয়সী পেতেছে আসন
চিরদিন রাখিবে বাঁধিয়া
কানে কানে তাহারি ভাষণ।

ভাষা যার জানা ছিল নাকো,
আঁখি যার কয়েছিল কথা,

জাগায়ে রাখিবে চিরদিন
সকরুণ তাহারি বারতা।

এ কবিতার ভাষা আলোর মতই স্বচ্ছ! শুধু এই কবিতাই নয়, সান ইসিড্রোর কবিতাগুলিতেও 'বিজয়া'-প্রসঙ্গে কবির উপলব্ধি ও অভিজ্ঞতা যে ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে তাতে কুণ্ঠার বা গুণ্ঠনরচনার কোন প্রয়াসই দেখা যায় নি। সান ইসিড্রোকে কবি কোনদিনই ভোলেন নি। আর্জেন্টিনা-ভ্রমণের পনেরো বৎসর পরে, ১৯৩৯ সনের মার্চ মাসে ভিক্টোরিয়াকে এক চিঠিতে কবি লিখছেন, "The picture of that building near the great river where you housed us in strange surroundings with its cactus beds that bent their grotesque gestures to the atmosphere of an exotic remoteness, often comes to my vision with an invitation from across an impossible barrier. There are some experiences which are like treasure islands detached from the continent of the immediate life, their charts ever remaining vaguely deciphered. And my Argentine episode is one of them. Possibly you know that the memory of those sunny days and tender care has been encircled by some of my verses—the best of their kind ; the fugitives are made captive, and they will remain, I am sure, though unvisited by you, separated by an alien language." ['সেন্টিনারি ভল্যুম', পৃ° ৩৮-৩৯]

কবি-জীবনের এই পর্বকে আমরা বলেছি তাঁর নবকৈশোর। 'পূরবী'র যুগে কবিমানসে "কিশোর প্রেমে"র পুনরুজ্জীবনের মধ্য দিয়েই কবি-কিশোরের নবজন্ম হয়েছে। কৈশোরের অনবদ্য স্বপ্নের মতই এই নবানুরাগ শুভ্র ও সুন্দর। কবি বলেছেন, যাকে আমরা ভালবাসি তারই মধ্যে সত্যকে আমরা নিবিড় করে উপলব্ধি করি। দক্ষিণ-আমেরিকার সমুদ্রপথে কবি তাঁর অন্তরতম ব্যক্তিস্বরূপের যে পরিচয় পেয়েছিলেন, তাকেই তিনি নিবিড় করে উপলব্ধি করলেন ভিক্টোরিয়ার মধ্যে। কবির শেষ বসন্তে এই বিদেশিনীর আবির্ভাবের পরম সার্থকতা সেখানেই।

॥ উল্লেখ-পঞ্জী ॥

১ চিঠিপত্র-৩, পৃ° ৪১।

২ তদেব, পৃ° ৩৪-৩৫।

৩ এই উদ্ধৃতি 'ক্যালকাটা মুনিসিপাল গেজেটে'র 'টেগোর মেমোরিয়াল স্পেশাল সাপ্লিমেণ্ট' থেকে গৃহীত। দ্রষ্টব্য, উক্ত সংখ্যা, পৃ° xxxii।

৪ তদেব।

৫ 'নির্বাণ', পৃ° ৬৪।

৬ তদেব, পৃ° ৬২-৬৩।

৭ 'আমাদের এই জগতের মধ্যে একটি কোন্ বিদেশিনী আনাগোনা করে—কোন্ রহস্যসিন্ধুর পরপারে ঘাটের উপরে তাহার বাড়ি—তাহাকেই শারদপ্রাতে মাধবীরাত্রিতে ক্ষণে ক্ষণে দেখিতে পাই—হৃদয়ের মাঝখানেও মাঝে মাঝে তাহার আভাস পাওয়া গেছে, আকাশে কান পাতিয়া তাহার কণ্ঠস্বর কখনো বা শুনিয়াছি।'—জীবনস্মৃতি, রবীন্দ্র-রচনাবলী-১৭, পৃ° ৩৯০।

৮ পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি, পৃ° ১২৮-২৯।

৯ "This almost led to a major political crisis between Argentine and Peru."—On the Edges of Time, পৃ° ১৪৯।

১০ 'নির্বাণ', পৃ° ৬২।

১১ পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি, পৃ° ১৩২-৩৩।

১২ দ্রষ্টব্য, 'নির্বাণ', পৃ° ৬৩। রথীন্দ্রনাথের 'On The Edges of Time' গ্রন্থেও ১৪৯ পৃষ্ঠায় অনুরূপ বর্ণনাই আছে।

১৩ চিঠিপত্র-৩, পৃ° ৯৫-৯৬।

১৪ On The Edges of Time, পৃ° ১৪৮। রথীন্দ্রনাথ লিখেছেন ১৯২০ সনের চার বছর পরে, অর্থাৎ ১৯২৪ সনে প্যারিসে ভিক্টোরিয়ার সঙ্গে তাঁদের সাক্ষাৎ হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ১৯৩০ সনেই রথীন্দ্রনাথ ভিক্টোরিয়াকে প্রথম দেখেন প্যারিসে।

১৫ 'নির্বাণ', পৃ° ৬৩।

চতুর্দশ অধ্যায়

"তব অন্তর্ধান-পটে হেরি তব রূপ চিরন্তন"

১

'পূরবী'-পরবর্তী শেষ ষোলো বৎসরকে আমরা বলেছি কবি-জীবনের দ্বিতীয় কৈশোর। অন্তরে কিশোর-প্রেমের প্রদীপ জ্বালিয়ে প্রাণের দোসরের সঙ্গে পুনর্মিলনের আকাঙ্ক্ষাই এ যুগের কবিচিত্তের মুখ্য অভিলাষ। তা ছাড়া, জীবনের শেষবসন্ত চেতনার আকাশে যে স্বর্ণ-আলোকের মধু ছড়িয়ে দিয়েছে তারই প্রেরণা ক্রিয়াশীল হয়েছে এ যুগের বিচিত্র সৃষ্টিকর্মে। তাই রবীন্দ্রনাথের অন্তিম পরিচয়: তিনি প্রেমের কবি। 'গীতাঞ্জলি'-যুগের ভগবন্মুখী কবিচিত্ত জীবনের গোধূলিলগ্নে একান্তভাবেই মানবপ্রেমাভিমুখী হয়ে উঠেছে। 'পূরবী'র যুগে যে-প্রেম পুনরুজ্জীবিত হল তারই সার্থক প্রকাশ পরবর্তী কাব্য 'মহুয়া'য়। বস্তুত, রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থাবলীতে 'মহুয়া'ই হল প্রথম প্রেমসর্বস্ব কাব্য। 'মহুয়া'র পরেও যে সতেরো-আঠারোখানি কাব্যসংকলন প্রকাশিত হয়েছে সেগুলিতেও প্রেমের কবিতার আবির্ভাব ঘটেছে বার বার। কখনো তার প্রকাশ কবির ব্যক্তিসীমার মধ্যেই, কখনো তা অভিব্যক্ত হয়েছে ব্যক্তি-পরিচ্ছেদের সীমানা পেরিয়ে। কবির শেষ পর্যায়ের কথাসাহিত্যেরও মুখ্য উপজীব্য হল প্রেম। যোগাযোগ, শেষের কবিতা, দুই বোন, মালঞ্চ, চার অধ্যায়, তিন সঙ্গী—সর্বত্রই জীবনের বিচিত্র রূপের মধ্যে প্রেমের মূল্য নিরূপণের প্রয়াস নূতন আকারে দেখা দিয়েছে। কবির শেষ জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ হল তাঁর প্রেমসংগীত। কাব্যোৎকর্ষের বিচারে তাঁর শেষ অধ্যায়ের কবিতাগুলি সম্পর্কে রসিকমহলে দ্বিমত থাকা অস্বাভাবিক নয়, কিন্তু তাঁর শেষজীবনের প্রেমের গানগুলি যে সবদিক দিয়েই অনবদ্য ও অতুলনীয়, সে বিষয়ে মতভেদ থাকার অবকাশ আছে বলে মনে হয় না।

বলাই বাহুল্য, কবিজীবনে প্রেমের এই নব মূল্যায়নের মূল প্রেরণা রয়েছে তাঁর অন্তরের অন্তর্লোকে। যে-নিরুপমা সৌন্দর্যপ্রতিমাকে তিনি সারা জীবন অন্তরে বহন করে চলেছেন তাঁর প্রেমেই তৃপ্ত হয়েছে জীবনের সর্বপ্রেমতৃষা। তিয়াত্তর বৎসর বয়সে 'বীথিকা' কাব্যগ্রন্থে সেই "কৈশোরের প্রিয়া"র উদ্দেশেই কবি বলছেন:

তুমি ভেসে চল সাথে।
চিরন্ধপখানি নবরূপে আসে প্রাণে;
নানা পরশের মাধুরীর মাঝখানে
তোমারি সে হাত মিলেছে আমার হাতে।
[কৈশোরিকা]

পূর্বেই বলা হয়েছে, মধ্যযুগে 'ক্ষণিকা' কাব্যগ্রন্থেও কবি এই একই সুরে বলেছিলেন :

পথে যতদিন ছিনু, ততদিন
অনেকের সনে দেখা।
সব শেষ হল যেখানে সেথায়
তুমি আর আমি একা।
["সমাপ্তি", 'ক্ষণিকা']

সেদিন অবশ্য এই "তুমি"-র পরিচয় পাঠকচিত্তে স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি। কিন্তু 'বলাকা'র "ছবি" কবিতার পর থেকে তাঁকে চেনবার একটি সূত্র বার-বার ধরা দিয়েছে। "ছবি" কবিতার উপসংহারে কবি বলেছেন :

তোমারে পেয়েছি কোন্ প্রাতে,
তার পরে হারায়েছি রাতে।
তার পরে অন্ধকারে অগোচরে তোমারেই লভি।

"ছবি"র পর থেকে যখন কবি তাঁর মানসপ্রতিমার ধ্যান করেছেন তখন তাঁর অনুভূতি অনেকক্ষেত্রেই এই তিনটি স্তরে বিন্যস্ত হয়ে দেখা দিয়েছে। এই প্রসঙ্গে 'বিচিত্রিতা' কাব্যগ্রন্থের "নীহারিকা" কবিতাটি বিশেষ ভাবে মনে পড়ে। 'বিচিত্রিতা'র কবিতাগুলি রচনায় একটা ইতিহাস আছে। বিভিন্ন শিল্পীর আঁকা একত্রিশখানি ছবি অবলম্বন করে এই গ্রন্থের একত্রিশটি কবিতা রচিত। যে ছবিটিকে উপলক্ষ করে "নীহারিকা" লেখা হয়েছে সেটি প্রতিমা দেবীর আঁকা। আকাশপটের বাষ্পকুহেলিকায় একটি নারীর মুখ ভেসে উঠেছে। তার সামনে একটি উৎকণ্ঠ পুরুষের মূর্তি। তার আবিষ্ট চোখে বিস্ময়ভরা জিজ্ঞাসার চিহ্ন। শিল্পীর আঁকা এই ছবিখানি দেখে কবির চোখ ফিরেছে নিজের মানসপটে আঁকা তাঁর মানসীর ছবিখানির দিকে।

"কে গো তুমি, ওগো ছায়ায় লীন"—এই প্রশ্নের উত্তরে কবির মানস-আকাশের নীহারিকা-লোক যেন বাঙ্‌ময় হয়ে উঠল :

সে কহিল, "ছিল এমন দিন
জেনেছ মোর নাম।
নীরব রাতে নিস্তৃত দ্বিপ্রহরে
প্রদীপ তোমার জেলে দিলেম ঘরে,
চোখে দিলেম চুমো ;
সেদিন আমায় দেখ্‌লে আলসভরে
আধ্‌জাগা-আধ্‌ঘুমো।

*   *   *

তারপরে কোন্ সব-ভুলিবার দিনে
নাম হল মোর হারা।
আমি যেন অকালে আশ্বিনে
এক-পসলার ধারা।
তারপরে তো হল আমার জয় ;—
সেই প্রদোষের ঝাপসা পরিচয়
ভরল তোমার ভাষা ;
তারপরে তো তোমার ছন্দোময়
বেঁধেছি মোর বাসা।

চেন কিম্বা নাই বা আমায় চেন,
তবু তোমার আমি।
সেই সেদিনের পায়ের ধ্বনি জেনো
আর যাবে না থামি।
যে-আমারে হারালে সেই কবে
তারি সাধন করে গানের রবে
তোমার বীণাখানি।
তোমার বনে প্রোল্লোল-পল্লবে
তাহার কানাকানি।

*   *   *

রইল তোমার সকল গানের সাথে
ভোলা নামের ধুয়া।
রেখে গেলেম সকল প্রিয়হাতে
এক নিমেষের ছুঁয়া।
মোর বিরহ সব মিলনের তলে
রইল গোপন স্বপন-অশ্রুজলে,—
মোর আঁচলের হাওয়া
আজ রাতে ঐ কাহার নীলাঞ্চলে
উদাস হয়ে ধাওয়া।"

এখানে যে পাওয়া, হারানো এবং পুনরায় ফিরে-পাওয়ার কথা আছে, 'বীথিকা'র "কৈশোরিকা" কবিতায়ও ভিন্ন রূপকল্পের সাহায্যে মিলন-বিচ্ছেদের সেই একই ক্রমপর্যায় পরিলক্ষিত হবে। জীবনের অরুণরাঙা প্রভাতে ভরা-জোয়ারের উচ্ছল নদীজলে কবি যে-তরী একদিন ভাসিয়েছিলেন তাতে তাঁর যাত্রাসহচরী ছিলেন তাঁর কিশোর প্রাণের দোসর।[১] সে কথা স্মরণ করে কবি বলছেন :

পেলব প্রাণের প্রথম পশরা নিয়ে
সে তরণী-পরে পা ফেলেছ তুমি প্রিয়ে,
পাশাপাশি সেথা খেয়েছি ঢেউয়ের দোলা।
কখনো বা কথা কয়েছিলে কানে কানে,
কখনো বা মুখে ছলোছলো দুনয়ানে
চেয়েছিলে ভাষা-ভোলা।

কিন্তু ভাঁটার বেলায় তরী যখন থেমে গেল তখন "মলিন ছায়ার ধূসর গোধূলিকালে" কবির দোসর নেমে গেলেন অচেনা পুলিনে। বহুদিন পরে আবার তিনি জীবনের-স্মৃতি-সঞ্চয়-করা তরীতে কবির সহযাত্রিণী হয়েছেন। তাঁকে পুনরায় ফিরে-পাওয়ার আনন্দে কবি বলছেন :

আবার রচিলে নবকুহকের পালা,
সাজালে ডালিতে নূতন বরণমালা,
নয়নে আনিলে নূতন চেনার হাসি।
কোন্ সাগরের অধীর জোয়ার লেগে

আবার নদীর নাড়া নেচে ওঠে বেগে,
আবার চলিনু ভাসি।

অমনি করেই কবির কৈশোর-প্রিয়ার 'চিররূপখানি' তাঁর প্রাণে 'নবরূপে' আবির্ভূত হয়েছে। নানা পরশের মাধুরীর মাঝখানে তাঁরই হাতখানি মিলেছে কবির হাতে।

একদিকে 'বলাকা'র "ছবি" কবিতার সঙ্গে এই সব কবিতা মিলিয়ে পড়লে, এবং অন্যদিকে 'পূরবী'র "কিশোর প্রেম" ও "দোসর" কবিতার সঙ্গে 'বিচিত্রিতা'র "নীহারিকা" ও 'বীথিকা'র "কৈশোরিকা"র ভাবানুষঙ্গ বিশ্লেষণ করলে সংশয়ের অবকাশ থাকে না যে, কবি সর্বত্র একটি মানসীমূর্তিকেই ধ্যান করেছেন,—একটি প্রেমই সর্বদা নব নব রূপে তাঁর চিত্তে আস্বাদ্যমান হয়ে উঠেছে। 'ক্ষণিকা'র "সমাপ্তিতে" বলেছিলেন, "সব শেষ হল যেখানে সেথায় তুমি আর আমি একা।" 'পূরবী'র "দোসর" কবিতায় বলেছেন, চিরজনম তাঁর একেলা কেটেছে, এবার তাঁর চিত্ত আকুল হয়েছে দোসরের দেখা পাবার জন্যে। অন্তরে প্রার্থনা জেগেছে, "সময় হল একার সাথে মিলুক একা।" "অনেক দিনের দূরের ডাকা" এবার যেন "কাছের খেলায়" পূর্ণ হয়। এবার যেন দুজনের মধ্যে "হাতে হাতে দেবার নেবার" "নতুন পালা" শুরু হয়।

২

ভাবতেও অবাক্ লাগে, দুজনে মৃত্যুর দু-পারে দাঁড়িয়ে হাতে হাতে দেবার নেবার এই নতুন পালা কবিকে কি ভাবে আবিষ্ট করে রেখেছিল! স্মৃতির অতল সমুদ্র মন্থন করে কেবল "ভালোবাসার অমৃত" পাওয়ার আকুলতা এ নয়, যিনি তাঁর জীবনে একদিন এই ভালবাসার অমৃত বহন করে এনেছিলেন, মৃত্যুর শাসন লঙ্ঘন করে তাঁকেই জীবনে ফিরে-পাওয়ার জন্যে এই মর্ত্যদুর্লভ আকাঙ্ক্ষা। কবির এই অনুভূতি উত্তররামচরিতের কবিকল্পনাকেও হার মানিয়েছে। 'মেঘদূতে'র কবি বলেছিলেন, প্রেমাবিষ্টের চোখে চেতন-অচেতনের ব্যবধান ঘুচে যায়। রবীন্দ্রনাথের চেতনায় সম্ভব-অসম্ভবের ব্যবধানও যেন ঘুচে গেছে। অতীত-বর্তমানে ভাগ-করা কালপরিধির গণ্ডি হয়েছে বিলুপ্ত, ইহলোক ও পরলোকের সীমান্তরেখা গেছে নিশ্চিহ্ন হয়ে।

কবিমানসের এই রহস্যলোকের সন্ধানে দুটি দৃষ্টান্ত বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। তার একটি হল "মিডিয়ামে"র সাহায্যে নতুন-বৌঠানের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের আগ্রহ, আর অন্যটি হল নৌকা-গৃহ 'পদ্মা'য় চড়ে কিছুদিনের জন্যে চন্দননগরে মোরান সাহেবের বাগানবাড়ির ধারে গঙ্গাবক্ষে কবির অবসর যাপন।

রবীন্দ্র-জীবনীকার লিখেছেন, 'বাল্যকালে ও যৌবনে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং প্লানচেট লইয়া বহুবার পরীক্ষা করিয়াছিলেন—কখনো কৌতুকছলে, কখনো কৌতূহলবশে।'[২] কবি 'জীবনস্মৃতি'র "বিলাত" অধ্যায়ে ডাক্তার স্কটের গৃহে এক-একদিন সন্ধ্যাবেলায় "টেবিল-চালা"র গল্প করেছেন। ছেলেবেলার সেই কাহিনীকে তিনি বলেছেন "ছেলেমানুষি কাণ্ড", বলেছেন "অনাচার"। কিন্তু পরিণত বয়েসে এদিকে তাঁর কৌতূহল নতুন করে জাগ্রত হল। তার একটি উপলক্ষও ঘটেছিল। স্বর্গত মোহিতচন্দ্র সেনের কন্যা উমা দেবী ছিলেন কবির স্নেহের পাত্রী। উমার ডাক-নাম ছিল বুলা। বুলা তাঁর খুব অল্প বয়সে তাঁর মা ও দিদির সঙ্গে বছর দু-তিন কাটিয়েছিলেন শান্তিনিকেতনে। এই বুলাই হলেন "বাতায়নে"র কবি উমা দেবী। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিত্বশক্তিতে মুগ্ধ হয়ে "বাতায়নে"র একটি ভূমিকাও লিখে দিয়েছিলেন। শিশিরকুমার গুপ্তের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। শুধু কবিত্বশক্তিই নয়, ধীরে ধীরে বুলার মধ্যে আর-একটি শক্তির বিকাশ ঘটেছিল, সেটি হল অতিপ্রাকৃত "মিডিয়ামে"র শক্তি। এই সূত্রেই রবীন্দ্রনাথ বুলার প্রতি নতুন করে আকৃষ্ট হলেন। ১৩৩৬ সালের পূজাবকাশের শেষদিকে বুলা আসেন শান্তিনিকেতনে। রবীন্দ্রনাথের কৌতূহলী চিত্ত সেই সুযোগ গ্রহণ করল। তিনি এই পরিচিতা মিডিয়ামের সাহায্যে অপরিদৃশ্যমান জগতের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপনে প্রবৃত্ত হলেন। বুলার অসামান্যতা ছিল। রবীন্দ্র-জীবনীকার লিখেছেন, কবির মুখে তিনি শুনেছেন যে, তিনি অত্যন্ত জটিল প্রশ্ন করে চলেছেন, মুহূর্তমাত্র চিন্তা না করে বুলা আপন ঘোরে অসম্ভব ক্ষিপ্রবেগে উত্তর লিখে যাচ্ছে। প্রশ্নের উত্তর পাঠ করে কবির বিস্ময়ের অবধি থাকত না।

দুর্ভাগ্যবশত বুলা তরুণ যৌবনে অকালে পরলোকগমন করেন। ১৯৩১ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যু উপলক্ষে কবি শ্রীযুক্ত অমল হোম ও শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবীকে যে দুখানি পত্র লেখেন তাতে পরলোক

ও মৃত্যু-তীর্ণ জীবন সম্পর্কে তাঁর বিশ্বাসের একটি স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে। বুলার যেদিন মৃত্যু হয় সেদিন অমল হোম মহাশয় ছিলেন কবির সঙ্গে শান্তিনিকেতনে। কবি তাঁর আচরণে অকারণ উদ্বেগচাঞ্চল্য লক্ষ্য করেছিলেন। তখন দুজনের কারোরই জানা ছিল না এ অন্যমনস্কতার হেতু কী ও কোথায়। পরে যখন কবির কাছে মৃত্যুর খবর পৌঁছল তখন তিনি অমল হোম মহাশয়কে লিখছেন, 'সেদিন এখান থেকে যাবার আগে তোমার অকারণ উদ্বেগচাঞ্চল্য আমার মনকেও নাড়া দিয়েছিল। অলক্ষ্য মনের তার বহন করে এনেছিল আসন্ন বিচ্ছেদবার্তা। তা পাঠাবার শক্তি ছিল বুলার। এ মৃত্যুর বেদনা কত তীব্র হয়ে বেজেচে তোমার আমি জানি। মর্ত্যবন্ধনমুক্ত যোগ নিত্য করে রাখুক তোমাদের সখ্য।'[৩]

শেষ বাক্যটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। বুলার শ্রাদ্ধ-সভায় পড়ার জন্যে যে বাণীট কবি পাঠিয়েছিলেন তার মধ্যেও তাঁর বিশ্বাস উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। সেই বাণীতে তিনি বলেছেন, 'জীবিতকালেই সে [বুলা] অনুভব করেছিল যে, তার স্পর্শশক্তি মৃত্যুর অন্তরাল অতিক্রম করেচে ; আজ শ্রদ্ধার সঙ্গে যেন মনে করি যে তার আত্মিক শক্তি ইহলোক পরলোকের মাঝখানে আত্মীয়তার সেতু রচনা করে আছে।'[৪]

এই উপলক্ষে মৈত্রেয়ী দেবীও কবির কাছ থেকে যে চিঠি পান তাতে আছে : 'বুলা একেবারেই নেই এই কথাটা যখন তোমার মন কোনমতেই স্বীকার করতে চাচ্চে না, তখন তাকে স্বীকার করবার দরকার কি? থাকা ব্যাপারটার কত বৈচিত্র্যই আছে। কখনো ঘুমিয়ে থাকি কখনো জেগে থাকি, কখনো কাছে থাকি কখনো দূরে থাকি—কখনো দৃশ্য কখনো অদৃশ্য—তার সঙ্গে আরো একটা কথা যোগ করে দিতে দোষ কি—অর্থাৎ কখনো এ লোক কখনো অন্য লোক—কখনো মর্ত্য শরীরের অবস্থায় কখনো এ শরীরের অতীত অবস্থায়। তুমি বলবে, নিশ্চিত জানিনে যে। সেই জন্যেই ইন্দ্রিয়ের প্রমাণকেই বলবান না করে আকাঙ্ক্ষার প্রমাণকেই তো মানা ভাল।'[৫]

এ চিঠিতে কবি অস্তিত্বের দুটি অবস্থাকেই স্বীকার করে নিতে চাইছেন—"মর্ত্য শরীরের অবস্থা" আর "এ শরীরের অতীত অবস্থা।" এবং এই বিশ্বাস-সৃষ্টির জন্যে ইন্দ্রিয়ের প্রমাণকেই বলবান না করে "আকাঙ্ক্ষার প্রমাণ"কেই তিনি মানতে চাইছেন। এ সম্পর্কে 'পথে ও পথের প্রান্তে' গ্রন্থে ৪৪-সংখ্যক

পত্রে কবি তাঁর বিশ্বাসকে বিশ্লেষণের দ্বারা বিশদীভূত করতে চেয়েছেন। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ কবিকে লিখেছিলেন, বুলার পেনসিল দিয়ে যে লেখাগুলো বেরোয়, বিশেষ করে তার পরীক্ষা আবশ্যক। এই সম্পর্কে মহলানবিশ মহাশয়ের সহধর্মিণী শ্রীমতী রানী [নির্মলকুমারী] দেবীকে কবি এই চিঠিতে লিখেছেন, এসব ব্যাপারে অতি নিঃসংশয় প্রমাণ পাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু তিনি মিডিয়ামের সাহায্যে অলক্ষ্য মৃতজনের সঙ্গে কথা বলাকে টেলিফোনে কথা বলার তুলনা দিয়ে বলেছেন, 'টেলিফোনে আমার সঙ্গে কথা বলার সময়ে তুমি যা নিয়ে আমার সম্বন্ধে নিঃসংশয় সেটা তোমার ধারণামাত্র। তুমি জোর করে বলছ ঠিক আমার স্বর, আমার ভাষা, আমার ভঙ্গি, আর কেউ যদি বলে, না, তার পরে আর কথা নেই। কেননা তোমার মনে আমার ব্যক্তিত্বের যে একটা মোট ছবি আছে, অন্যের মনে তা না থাকতে পারে কিংবা অন্য রকম থাকতে পারে। অথচ এই ব্যক্তিত্বের সাক্ষ্যই সবচেয়ে সত্য সাক্ষ্য, কেননা এটাকে কেউ বানাতে পারে না।'*

যে-ব্যক্তিত্বকে কেউ বানাতে পারে না সেই ব্যক্তিত্বের সাক্ষ্যকেই কবি এ বিষয়ে অভ্রান্ত বলে গ্রহণ করেছেন। ১৯২৯ খ্রীস্টাব্দের ১০ই নবেম্বর তারিখে লেখা এই চিঠিতে তারই সমর্থক উদাহরণ হিসাবে লিখছেন, 'ইতিমধ্যে পশু´ বুলার হাতে একটা লেখা বেরিয়েছে তাতে নাম বেরোল না। বললে, নাম জিজ্ঞাসা কোরো না, তুমি মনে যা ভাবছ আমি তাই। তারপরে যে সব কথা বেরোল সে ভারি আশ্চর্য। তার সত্যতা আমি যেমন জানি আর দ্বিতীয় কেউ না।'

কবি ৬ই নবেম্বর ১৯২৯ তারিখে এ সম্পর্কে শ্রীমতী নির্মলকুমারী [রানী] মহলানবিশকে যে সুদীর্ঘ পত্র দিয়েছেন তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পত্রের বিষয় একই। বুলার মাধ্যমে পরলোকের সঙ্গে কথাবার্তা। চিঠিতে দেখা যাচ্ছে, প্রথমে এলেন মণিলাল, তারপর সত্যেন ; তারপর অজিত।

'সত্যেন্দ্রর পালা শেষ হবার মুখে সে [মিডিয়াম] বললে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর এসেছেন। তাঁর সমস্ত কথা শুনে আমরা অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে গেছি। উপস্থিত থাকলে বুঝতে পারতে তার একটা ব্যক্তিগত বাস্তবতা। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলুম যেসব রচনা প্রভৃতি নিয়ে পৃথিবীতে নিযুক্ত ছিলেন এখনো কি তার কোনো অনুবৃত্তি আছে? তিনি বললেন, "ঠিক তেমন

নয়, এখানে কেবল আত্মসৃষ্টিতেই আনন্দ।" আমি জিজ্ঞাসা করলুম, "সৃষ্টির কোনো উপকরণ নেই?" তিনি বললেন, "আত্মাইতো আমাদের সব—তাকে গঠন করে পরিপূর্ণ করাই আনন্দ।" * * * জ্যোতিদাদা একটা ভারি নতুন রকমের কথা বলেছিলেন—"পৃথিবীতে থাকতে বারবার কেবল শান্তি চেয়েছিলুম, এখানে এসে ভাবছি সুখই বা মন্দ কি?" এর একটা অর্থ আমি ঠাউরেচি যে, সুখ জিনিসটা সীমাবদ্ধ দেহ এবং ইচ্ছা থেকেই উৎপন্ন—বস্তুর সঙ্গে ভাবের সঙ্গে সে জড়িত, তাকে ধরবার জন্যে ভোগ করবার জন্যে বাস্তব উপকরণের দরকার। * * * জ্যোতিদাদাকে প্রশ্ন করেছিলুম, দেহ নিতে ইচ্ছা হয়? তিনি বললেন, "আমি ইচ্ছা করি নে, যারা সুখ চায় তারাই ইচ্ছা করে।" * * * জিজ্ঞাসা করলুম, "কোনো বিশেষ স্থানে বাস করেন?" তিনি বললেন, "শূন্য আকাশে।" প্রশ্ন, সে কি সীমাবদ্ধ আকাশ? তিনি বললেন, "এখনো তো সীমারেখা দেখতে পাইনে।" * * আমি জিজ্ঞাসা করেছিলুম, পৃথিবীতে আমরা যে সব অধ্যবসায়ে প্রবল ইচ্ছায় ও চেষ্টায় প্রবৃত্ত তাতে কি পরলোকগত আত্মার যোগ থাকে? জ্যোতিদাদা বললেন, "ঠিক আমাদের মনে সে বাসনা থাকে না। কিন্তু পৃথিবীতে যদি কেউ কিছু সৃষ্টি করে অথবা কিছু একটা ভালো কাজ হয় সে আমরা অনুভব করি।" জন্মান্তরের কথা জিজ্ঞাসা করতে বললেন, "জন্মান্তর আছে কিন্তু পৃথিবীতে থাকতে আমরা যে রকম বুঝতেম সে রকম নয়।" * * পৃথিবীতে যাদের ভালবাসি পরলোকে তাদের সঙ্গে আমাদের কী সম্বন্ধ—তার উত্তরে বললেন, "যাদের ভালবাসি তারা অন্তরের দেবতার সঙ্গে এক হয়ে যায়। আর তো হারাবার ভয় নেই।" * * * নতুন বৌঠানের সঙ্গে দেখা হয় কিনা জিজ্ঞাসা করেছিলুম। তিনি বললেন, "তোমার নতুন বৌঠান সমভাবেই আছেন।" আমি শুধালাম, পৃথিবীর প্রতি তাঁর কি আকর্ষণ আছে? তিনি বললেন, "আছে, সেইজন্যেই তো দেখা হয় না।" আমি বললুম, "আমি এখনো তাঁকে ভুলতে পারিনে—বেদনার সঙ্গে মনে পড়ে।" তিনি বললেন, "জানি, তোমার নতুন বৌঠানকে আমি বলব।"''

এই অপূর্ব সংলাপ লিপিবদ্ধ করে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, 'ব্যাপারখানা ঠিক কি তা জোর করে বলতে পারি নে। মনে হল যেন ভিন্ন ভিন্ন লোকের সঙ্গেই কথা কওয়া হোলো। সন্দেহমাত্র নেই যে বুলার ভাষা নয় ভাবও

নয়। আমারও নয় যেহেতু আমি যা ভাবি ও ভাবতে পারতুম তার সঙ্গে অনেকটাই মেলে না। আমার অজ্ঞাতসারে আমার মন যদি জবাব দিত তবে সে অন্যরকম হত। অবশ্য এ কথা যদি বলো আমার অবচেতনচিত্ত কি বিশ্বাস করে কি বলে তা আমি জানিইনে। তাহলে তর্ক চলে না। দেহহীন আত্মা কি রকম এবং তার চিত্তবৃত্তি কি ভাবের, কল্পনা করা কঠিন। কিন্তু আজকালকার বিজ্ঞান মানলে দেহটাই যে কেন বস্তুর মত প্রতীত হয় সে রহস্য ভেদ করা যায় না।—বস্তুর মূলে অবস্তু, অর্থাৎ সম্পূর্ণ অনির্বচনীয় পদার্থ; এই মায়াকে যদি মানতে পারি তবে দেহহীন সত্তাকেও মানতে দোষ নেই অবশ্য যদি তার প্রমাণ পাওয়া যায়। আজকাল প্রমাণ সংগ্রহ চলচে এখনো সর্বজনসম্মত বিশ্বাসে পৌঁচয় নি।'[৮]

মিডিয়ামের সাহায্যে অতিপ্রাকৃত সত্যানুসন্ধান সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমাদের বক্তব্য হল এই যে, উদ্ধৃত চিঠিপত্র থেকে দেখা যাচ্ছে, কবি নিজে ওতে বিশ্বাস করতেন এবং মিডিয়ামের সাহায্যে নতুন-বৌঠানের সঙ্গে কথাবার্তা বলার জন্যে তিনি আগ্রহান্বিত ছিলেন। অবশ্য অতিপ্রাকৃত তথ্যানুসন্ধানের কৌতূহলের ফলেই তিনি নতুন-বৌঠানের সঙ্গে যোগাযোগের একটি সূত্র খুঁজে পেয়েছিলেন, না তাঁর সঙ্গে যুক্ত হবার উদ্দেশ্যেই মিডিয়ামের সাহায্য গ্রহণ করেছিলেন, সে সম্পর্কে নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হবার মত উপকরণ উদ্ধৃত চিঠিপত্রে নেই। তবে কবির তৎকালীন মানসিকতার কথা চিন্তা করে এ কথা বলা যেতে পারে যে, তাঁর প্রাণের দোসরের সঙ্গে হাতে হাতে দেবার নেবার নতুন পালা-রচনার যে অভিলাষ তাঁর চিত্তে উদগ্র হয়ে উঠেছিল, তার সঙ্গে এই বিশ্বাসের একটি অবিচ্ছেদ্য যোগ রয়েছে। মৈত্রেয়ী দেবীকে লেখা চিঠিতে কবি যে "আকাঙ্ক্ষার প্রমাণে"র কথা বলেছেন সেদিক থেকে চিন্তা করলেও বলা যায় যে, "কৈশোরিকা"র সঙ্গে পুনর্মিলনের আকাঙ্ক্ষাই অতিপ্রাকৃত অস্তিত্বে বিশ্বাসের ভিত্তিমূলকে সুদৃঢ় করে রেখেছে। "মর্ত্যবন্ধনমুক্ত যোগ" নিত্য করে রেখেছে উভয়ের সখ্যকে।

৩

কবির যৌবনলগ্নের সবচেয়ে স্মরণীয় বৎসর হল তাঁর জীবনের একবিংশ বর্ষ। এই বৎসরটি অতিবাহিত হয় কাদম্বরী দেবীর ঘনিষ্ঠতম সান্নিধ্যে চন্দননগরে মোরান সাহেবের বাগানবাড়িতে। আমরা অষ্টম অধ্যায়ে গঙ্গা-তীরের সেই সুন্দর দিনগুলির কথা বলেছি। পঁচাত্তর বৎসর বয়সে কবি ফিরে পেলেন সেই সুন্দর দিনগুলিকে, সেই চন্দননগরকে, সেই মোরান সাহেবের বাগানবাড়ির স্মৃতিকে, আর বলাই বাহুল্য, তাঁর নতুন বৌঠানকে। ১৩৪২ সালের জ্যৈষ্ঠের প্রথম সপ্তাহ থেকে ১৯শে আষাঢ় পর্যন্ত কবি কাটালেন সেই মায়াময় স্বপ্নলোকে। এই দিনগুলির কাব্যফসল সংকলিত হয়েছে 'বীথিকা' কাব্য-গ্রন্থে। 'বীথিকা'র শেষ কবিতা "জাগরণে" কবি এই দিনগুলিকে চৈতন্যলোকে আকস্মিক কল্পান্তরের সঙ্গে তুলনা করেছেন। সুপ্তিতে যেমন জাগ্রত জগৎ মিথ্যার কোঠায় চলে যায়, তেমনি কবির মনে প্রশ্ন জেগেছে, "মায়ার স্বপন" দিয়ে গাঁথা তাঁর সেই চেতনা মৃত্যুর আঘাতে জেগে উঠে সেই মায়াকেই সত্য বলে গ্রহণ করবে কি ?

সহসা কি উদিবে স্মরণে
ইহাই জাগ্রত সত্য অন্য কালে ছিল তার মনে।

অন্যকালের সেই জাগ্রত সত্যকে কবি অকস্মাৎ খুঁজে পেয়েছিলেন "মায়ার স্বপন" দিয়ে গড়া এই দিনগুলিতে। কবিমানসের সেই অবস্থার ভূমিকা রচিত হয়েছে এর কিছুদিন আগে ইন্দিরা দেবীকে লেখা একখানি চিঠিতে। কবি শান্তিনিকেতন থেকে ১৯৩৫ খ্রীস্টাব্দের ৭ই এপ্রিল তাঁকে লিখছেন, 'তোদের অনেক দিন দেখিনি। দেখতে ইচ্ছে করে। তার কারণ জীবন-আকাশের আলো ম্লান হয়ে এসেচে—এখন মনের সব বিক্ষিপ্ত ভাবনাগুলো যেন গোষ্ঠে ফেরবার মুখে—বাইরের দিকটা অবরুদ্ধ হয়ে আসচে। এই অবস্থায় নিজেকে একলা মনে হয়। এ জন্মের যাত্রাপথের যারা সঙ্গী ছিল তারা অনেকেই নেই—* * *। চেষ্টা করচি অন্তরের দিকে নতুন পালা আরম্ভ করতে—সেটা উত্তর অয়ন পেরিয়ে উত্তরতর অয়ন।'[১]

১৩৪২ সালের গ্রীষ্মকালে কবির 'শরীর ক্লান্তিতে অবসন্ন।' শান্তিনিকেতনের প্রচণ্ড গ্রীষ্ম সে বছর প্রচণ্ডতর হয়ে দেখা দিয়েছে। কবি চিরদিনই

গরমকে উপেক্ষা করে এসেছেন, কিন্তু সেবার তাঁর অহংকার টিকল না। শেষকালে আশ্রয় নিলেন বোটে। উত্তরপাড়া শ্রীরামপুর পেরিয়ে অবশেষে ফরাসডাঙা চন্দননগরে এসে পৌঁছল নৌকা-গৃহ 'পদ্মা'। নৌকো যেখানে স্থায়ীভাবে বাঁধা হল, কবি লিখছেন, 'তার ঠিক সামনেই সেই দোতলা বাড়ি, যেখানে একদা জ্যোতিদাদার সঙ্গে অনেকদিন কাটিয়েছি।'[১০]

চন্দননগরে মোরান সাহেবের বাগানবাড়ি ভাড়া নেবার আগে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এই দোতলা বাড়িতেই এসে থাকতেন। রবীন্দ্রনাথ বাল্যে ও কৈশোরে একাধিকবার জ্যোতিদাদা ও নতুন বৌঠানের সঙ্গে সেই বাড়িতে কাটিয়েছেন। বাড়িটা তখন অত্যন্ত বেমেরামতী অবস্থায় পড়ে ছিল। যদি তাতে থাকার সুযোগ পাওয়া যেত তা হলে কবি নিশ্চয় সেখানে থাকতেন। তার পাশেই একটা একতলা বাড়ি ছিল। সেখানে তখন একজন ভাড়াটে ছিলেন। কবি যখন শুনলেন দিন কয়েক পরে সেই ভাড়াটে চলে যাবেন তখন তিনি স্থির করলেন সেই একতলা বাড়িটাই ভাড়া নেবেন। প্রতিমা দেবীকে লিখছেন, 'জুন মাসটা ওটা হাতে রাখতে চাই।'

বাইরের এই তথ্যরাজির সঙ্গে সেই দিনগুলিতে লেখা কবিতাগুলি মিলিয়ে পড়লেই ধরতে পারা যাবে, গঙ্গাবক্ষে কবিমানসে কী জোয়ার-ভাঁটার লীলা চলছিল। চন্দননগরের প্রথম কবিতা "বিদ্রোহী"তেই কবিমানস নির্বারিত হয়েছে। "অকিঞ্চন অদৃষ্টে"র বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে কবি বলছেন :

> পর্বতের অন্তপ্রান্তে ঝর্ঝরিয়া ঝরে রাত্রিদিন
> নির্ঝরিণী ;
> এ মরুপ্রান্তের তৃষ্ণা হল শান্তিহীন
> পলাতকা মাধুর্যের কলস্বরে।
> শুধু ওই ধ্বনি
> তৃষিত চিত্তের যেন বিদ্যুতে খচিত বজ্রমণি
> বেদনায় দোলে বক্ষে।

* * * *

আশাহারা বিচ্ছেদের তাপ ;
দুঃসহ দাহনে তার দীপ্ত করি হানিব বিদ্রোহ
অকিঞ্চন অদৃষ্টেরে।

পলাতকা নির্ঝরিণীর প্রসাদবঞ্চিত মরুপ্রান্তের তৃষ্ণার সঙ্গে আপন অন্তরের অতৃপ্ত বাসনাকে তুলনা করেই কবি ক্ষান্ত হন নি, বিচ্ছেদবহ্নিকে দুঃসহ দাহনে দীপ্ত করে তিনি অদৃষ্টকে জয় করবেন এই সংকল্পই গ্রহণ করছেন।

চন্দননগরের গঙ্গাবাসকালে কবির রচিত কবিতার সংখ্যা বেশি নয়। তার মধ্যে "বিদ্রোহী", "গীতচ্ছবি", "ছুটির লেখা", "নিমন্ত্রণ", "ছায়াছবি" ও "নাট্যশেষ" কবিতাগুলি আমাদের আলোচনা প্রসঙ্গে বিশেষ ভাবে স্মরণীয়। এই পর্যায়ের সর্বশেষ কবিতা "নাট্যশেষে" কবি যেন দর্শকের ভূমিকায় বসে তাঁর জীবন-নাট্যকে প্রত্যক্ষ করেছেন। সে নাট্যের প্রথম অঙ্কটিই তাঁর চোখে সবচেয়ে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। কৈশোরের সদ্যজাগা চক্ষে "অস্পষ্ট কী প্রত্যাশার অরুণিম প্রথম উন্মেষে"র পরেই অকস্মাৎ দেখা হল প্রাণের দোসরের সঙ্গে। তারপর :

দুই অজানার মাঝে দেশকাল হইল বিলীন
সীমাহীন নিমেষেই ; পরিব্যাপ্ত হল জানাশোনা
জীবনের দিগন্ত পারায়ে। * * *
কুঞ্জপথে মেলিল সে স্ফুরিত অঞ্চলতল হতে
কনকচাঁপার আভা। গন্ধে শিহরিয়া গেল হাওয়া
শিথিল কেশের স্পর্শে। দুজনে করিল আসাযাওয়া
অজানা অধীরতায়।

তারপর এল চিরবিচ্ছেদের লগ্ন :

সহসা রাত্রে সে গেল চলি
যে-রাত্রি হয়না কভু ভোর। অদৃষ্টের যে-অঞ্জলি
এনেছিল সুধা, নিল ফিরে। সেই যুগ হল গত
চৈত্রশেষে অরণ্যের মাধবীর সুগন্ধের মতো।
তখন সেদিন ছিল সবচেয়ে সত্য এ ভুবনে,
সমস্ত বিশ্বের যন্ত্র বাঁধিত সে আপন বেদনে
আনন্দ ও বিষাদের সুরে।

এখানে বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, জীবননাট্যের শেষ অঙ্কে পৌঁছে কবি সে-নাট্যের একটি অঙ্ককেই বার বার ফিরে ফিরে দেখছেন। প্রথম অঙ্কের সেই মিলন-বিচ্ছেদই যেন তাঁর কাছে তাঁর জীবননাট্যের একটিমাত্র স্মরণীয় দৃশ্য!

আমরা বলেছি, রবীন্দ্রনাথের বিরহী-চিত্তে অতীত-বর্তমানে ভাগ-করা কালপরিধির গণ্ডি হয়েছে বিলুপ্ত, ইহলোক ও পরলোকের সীমান্তরেখা গেছে নিশ্চিহ্ন হয়ে। চন্দননগরে লেখা "নিমন্ত্রণ" কবিতাটি তারই উজ্জ্বলতম নিদর্শন। প্রেমের কবিতা হিসাবে কবিতাটির তুলনা নেই। দেশকাল অভিভূত-করা মিলনের এমন অপূর্ব স্বপ্নকামনা এমন মধুচ্ছন্দা কাব্য-মালিকা দ্বিতীয়বার গ্রথিত হয়েছে বলেও আমরা জানি নে। প্রাণের দোসরের সঙ্গে চিরপ্রত্যাশিত মিলনের আকাঙ্ক্ষায় কবিমানসে "হাতে হাতে দেবার নেবার" যে নতুন পালা গড়ে উঠেছে তার চূড়ান্ত অভিব্যক্তি ঘটেছে এই কবিতাটিতে।

কবি তাঁর মানসীকে বিনা নামেই আহ্বান করে বলেছেন, যে-কোনো ছুতায় যেন তিনি চলে আসেন কবির কাছে, সময় ফুরোলে ফিরে যেতেও কোন মানা নেই, আর যদি অবসর থাকে তা হলে যেন তিনি এসে বসেন কবির মুখোমুখি। তাঁর সেই বসার ভঙ্গিকে ধ্যান করে কবি লিখছেন:

গৌরবরন তোমার চরণমূলে
ফলসাবরন শাড়িটি ঘেরিবে ভালো;
বসনপ্রান্ত সীমন্তে রেখো তুলে,
কপোলপ্রান্তে সরু পাড় ঘন কালো।
একগাছি চুল বায়ু-উচ্ছ্বাসে কাঁপা
ললাটের ধারে থাকে যেন অশাসনে।
ডাহিন অলকে একটি দোলনচাঁপা
দুলিয়া উঠুক গ্রীবাভঙ্গীর সনে।
বৈকালে গাঁথা যূথীমুকুলের মালা
কণ্ঠের তাপে ফুটিয়া উঠিবে সাঁঝে;
দূরে থাকিতেই গোপনগন্ধ-ঢালা
সুখসংবাদ মেলিবে হৃদয় মাঝে।
এই সুযোগেতে একটুকু দিই খোঁটা—

আমারি দেওয়া সে ছোট্ট চুনির দুল,
রক্তে জমানো যেন অশ্রুর ফোঁটা,
কতদিন সেটা পরিতে করেছ ভুল।

প্রতিমায় প্রাণপ্রতিষ্ঠা করার মতো এই ধ্যানের মন্ত্র উচ্চারণ করে কবি আমন্ত্রিতার কাছে কী প্রত্যাশা করেন সে কথাও অব্যক্ত রাখেন নি। তিনি জানেন, সোনার প্রদীপ আনা একালে চলে না, সোনার বীণাও আয়ত্তগত নয়; কাব্যে মানানসই না হলেও একটা তুচ্ছ ফরমাশ তাঁর কাছে কবির রয়েছে। রেশমি-রুমাল-টানা বেতের ডালায় অরুণবরন গোটাকতক আম যেন তিনি সঙ্গে আনেন। কবির অজানা নেই যে, অমরার পথহারা কোন দূত জঠরগুহায় যাওয়া-আসা করে না; তবু তিনি বলছেন:

শোভন হাতের সন্দেশ, পানতোয়া,
মাছমাংসের পোলাও ইত্যাদিও
যবে দেখা দেয় সেবামাধুর্যে-ছোঁওয়া
তখন সে হয় কী অনির্বচনীয়!

আর যদি কোন-কিছুই সঙ্গে আনা সম্ভব নাও হয় তা হলেও তিনি যেন খালি হাতেই আসেন, কেন না "সেতুটি হাতেরও কিছু কম নহে দাম।" এ পর্যন্ত কবিতাটি পরিহাসের ভঙ্গিতে লেখা বলে মধুর রস আরো রহস্যময় হয়ে উঠেছে। ভ্রম হয় বুঝি পরিহাসযোগ্যা কোন পাত্রী এ নিমন্ত্রণ-পত্রের উদ্দিষ্টা। কিন্তু তারপরেই কবি লিখছেন:

যত লিখে যাই ততই ভাবনা আসে,
লেফাফার 'পরে কার নাম দিতে হবে;
মনে মনে ভাবি গভীর দীর্ঘশ্বাসে,
কোন্ দূর যুগে তারিখ ইহার কবে।

এখানেই রহস্যের আবরণ অনাবৃত হয়েছে। কার উদ্দেশে এই নিমন্ত্রণলিপি লেখা হয়েছে এর পর থেকে সেকথা আর অস্পষ্ট নেই। কবি বলছেন:

মনে ছবি আসে—ঝিকিমিকি বেলা হল,
বাগানের ঘাটে গা ধুয়েছ তাড়াতাড়ি;
কচি মুখখানি, বয়স তখন ষোল;
তনু দেহখানি ঘেরিয়াছে ডুরে শাড়ি।

কুঙ্কুমফোঁটা ভুরুসংগমে কিবা,
　　　　শ্বেতকরবীর গুচ্ছ কর্ণমূলে ;
পিছন হইতে দেখিনু কোমল গ্রীবা
　　　　লোভন হয়েছে রেশমচিকন চুলে।
তাম্রথালায় গোড়ে মালাখানি গেঁথে
　　　　সিক্ত রুমালে যত্নে রেখেছ ঢাকি ;
ছায়া-হেলা ছাদে মাদুর দিয়েছ পেতে,
　　　　কার কথা ভেবে বসে আছ জানি না কি।

এ ছবি কার এবং কোন্ সময়কার সে সম্বন্ধে আর অধিকদূর গবেষণার প্রয়োজন হয় না। রবীন্দ্র-জীবনীকার লিখেছেন এর সঙ্গে 'ছেলেবেলা'র নিম্নলিখিত অংশটুকু তুলনীয় : 'দিনের শেষে ছাদের উপর পড়ত মাদুর আর তাকিয়া। একটা রুপার রেকাবিতে বেলফুলের গোড়ে মালা ভিজে রুমালে, পিরিচে একগ্লাস বরফ দেওয়া জল আর বাটাতে ছাঁচিপান। বৌঠাকরুন গা ধুয়ে চুল বেঁধে তৈরি হয়ে বসতেন। গায়ে একখানা পাতলা চাদর উড়িয়ে আসতেন জ্যোতিদাদা।'[১১]

এ কবিতার আদিতে কবি যে পরিহাস-রসিকতাকে মুখ্য-সঞ্চারী হিসাবে কাজে লাগিয়েছেন, কবি-জীবনের কৈশোরিকার সঙ্গে তাঁর প্রাকৃত-সম্পর্কের কথা চিন্তা করলে তাব সার্থকতা উপলব্ধি করতে পারা যায়। উদ্ধৃত স্তবকের শেষ পংক্তি "কার কথা ভেবে বসে আছ জানি না কি"—এর উত্তর পরের পংক্তিতে কবি নিজেই দিয়েছেন : "আজি এই চিঠি লিখিছে তো সেই কবি।" সেদিনের কিশোরী-চিত্তের সেই প্রতীক্ষা আজ কবির চিত্তকেই আশ্রয় করেছে। মিলনের প্রত্যাশায় তাই তাঁর কাছে কবির অন্তিম অনুনয় :

পার যদি এসো শব্দবিহীন পায়,
　　　　চোখ টিপে ধোরো হঠাৎ পিছন থেকে।
আকাশে চুলের গন্ধটি দিয়ো পাতি,
　　　　এনো সচকিত কাঁকনের রিনিরিন,
আনিয়ো মধুর স্বপ্নসঘন রাতি,
　　　　আনিয়ো গভীর আলস্যঘন দিন।
তোমাতে আমাতে মিলিত নিবিড় একা—

স্থির আনন্দ, মৌন মাধুরীধারা,
মুগ্ধ প্রহর ভরিয়া তোমারে দেখা,
তব করতল মোর করতলে হারা।

একান্তবাঞ্ছিতা দয়িতার সঙ্গে চিরন্তন প্রেমিকের মিলনাকাঙ্ক্ষাকেই কবি এখানে ভাষা দিয়েছেন। স্বপ্ন এখানে বাস্তবকেও হার মানিয়েছে। বিচ্ছেদের দুঃসহ দাহনে নিজেকে দগ্ধ করে অকিঞ্চন অদৃষ্টের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী কবি যেন পরমা সিদ্ধি লাভ করলেন।

৪

গ্রীষ্মাবকাশের পর কবি নদীবাস থেকে শান্তিনিকেতনে ফিরে এলেন উনিশে আষাঢ়। কিন্তু চন্দননগরের সেই স্বপ্নাবেশ তাঁকে ঘিরে রইল আরো কিছুদিন। এই প্রেরণায় 'বীথিকা'র শেষ কবিতা "জাগরণ" লিখিত হয় ২৯শে ভাদ্র। চন্দননগরে এবং সেখান থেকে ফিরে এসে শান্তিনিকেতনে লেখা কবিতাগুলিই 'বীথিকা'র মূল কবিতা। এদিক থেকে এই সংকলনের 'বীথিকা' নামকরণেরও একটা সার্থকতা খুঁজে পাওয়া যায়। 'পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি'তে কবি লিখেছিলেন, 'বিশেষ-কোন একজনকে চিঠি লেখবার একটা প্রচ্ছন্ন বীথিকা যদি সামনে পাওয়া যেত তাহলে তারই নিভৃত ছায়ার ভিতর দিয়ে আমার নিরুদ্দেশ বাণীকে অভিসারে পাঠাতুম। কিন্তু, সে বীথিকা আজ নেই।'[১২] এই চিঠি লেখার এগারো বৎসর পরে চন্দননগরে কবি সেই বীথিকারই সন্ধান পেয়েছিলেন। সেই বিশেষ একজনের উদ্দেশ্যেই বীথিকার মূল কবিতাগুলি নিবেদিত হয়েছে।

শান্তিনিকেতনে প্রত্যাবর্তনের পর কবির কোন কবিতাই "নিমন্ত্রণে"র উৎকর্ষকে অতিক্রম করে যেতে পারে নি। কিন্তু একুশে শ্রাবণ থেকে আটাশে শ্রাবণের মধ্যে লেখা চারটি গানের মধ্য দিয়ে যেন এই প্রেরণার পূর্ণাহুতি ঘটেছে। বর্ষণমুখরিত শ্রাবণরাত্রিতে একলা বসে কবি স্মৃতিবেদনার মালা গেঁথে চলেছেন তাঁর "দুখরজনীর মরমসাথি"কে পাবেন এই প্রত্যাশায়। আপন অন্তরের বেদনাকে তাঁর উদ্দেশ্যে নিবেদন করে কবি বলছেন:

কী বেদনা মোর জান সে কি তুমি, জান,
ওগো মিতা মোর, অনেক দূরের মিতা।

কিন্তু "অনেক দূরের মিতা"কে একান্ত করে কাছে পাওয়ার সাধনাতেও তো তিনি আজ সিদ্ধিলাভ করেছেন! তা ছাড়া এ উপলব্ধিও তাঁর হয়েছে যে, তাঁর জন্যে যে বেদনা, একমাত্র তাঁকে পেলেই সে বেদনার অবসান হতে পারে। নির্ঝরিণীর প্রসাদ না পেলে মরুপ্রান্তের তৃষ্ণা যে আর কিছুতেই নিবৃত্ত হবার নয়! তাই তো তিনি "মরুতীর হতে সুধাশ্যামলিম পারে" অন্তবিহীন পথ পেরিয়ে এসেছেন। ঝড়ের অন্ধকারে পথহারা কুলায়প্রত্যাশী পাখির মতো জীবনের শেষ আশ্রয় চাইছেন তাঁরই বাতায়নে। বাইশে শ্রাবণের সেই অবিনশ্বর প্রেমসংগীতে তাঁর সেদিনকার শেষ আকৃতি ভাষা পেয়েছে:

সজল মেঘের ছায়া ঘনাইছে
বনে বনে,
পথ-হারানোর বাজিছে বেদনা
সমীরণে।
দূর হতে আমি দেখেছি তোমার
ঐ বাতায়ন তলে
নিভৃতে প্রদীপ জ্বলে,
আমার এ আঁখি উৎসুক পাখি
ঝড়ের অন্ধকারে।

॥ উল্লেখ-পঞ্জী ॥

১ এই প্রসঙ্গে তুলনীয় 'সোনার তরী'র "নিরুদ্দেশ যাত্রা" কবিতা।
২ রবীন্দ্রজীবনী-৩, পৃ° ২৬৮।
৩ বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১৪শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, পৃ° ৩।
৪ তদেব।
৫ বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১৩শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, পৃ° ৩।

৬ পথে ও পথের প্রান্তে, পৃ° ৯৯-১০০।

৭ দ্রষ্টব্য : 'দেশ' পত্রিকা, ২৮ বর্ষ, ৩০ সংখ্যা, ১০ জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ। পৃ° ৩৮৬-৩৮৮।

৮ তদেব। পৃ° ৩৮৮।

৯ চিঠিপত্র-৫, পৃ° ১০২।

১০ প্রতিমা দেবীকে লেখা পত্র ; দ্রষ্টব্য চিঠিপত্র-৩, পৃ° ১১৪-১৬।

১১ দ্রষ্টব্য : রবীন্দ্রজীবনী-৪, পৃ° ১৫।

১২ যাত্রী, পৃ° ৪৪।

পঞ্চদশ অধ্যায়

"সৃষ্টির শেষ রহস্য,—ভালোবাসার অমৃত"

১

রবীন্দ্র-কাব্যপ্রবাহে 'বীথিকা'র পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ হল 'পত্রপুট'। রচনাকাল ১৩৪২-৪৩ সাল; গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশ ১৩৪৩ সালের পঁচিশে বৈশাখ। 'পত্রপুট' নামকরণের তাৎপর্য তেরো-সংখ্যক কবিতায় ব্যাখ্যাত হয়েছে। কবি বলছেন "হৃদয়ের অসংখ্য অদৃশ্য পত্রপুট গুচ্ছে গুচ্ছে অঞ্জলি মেলে আছে আমার চারদিকে চিরকাল ধরে।" "আমি-বনস্পতির এরা কিরণ-পিপাসু পল্লবস্তবক।" "এরা মাধুকরী ব্রতীর দল।" "আমি-বনস্পতি" রূপকল্পটি স্বভাবতই 'পূরবী'র "বনস্পতি" কবিতাটিকে স্মরণ করিয়ে দেবে। ত্রয়োদশ অধ্যায়ে "বিজয়া" প্রসঙ্গে তার আলোচনা করা হয়েছে। 'পত্রপুটে' বনস্পতি-চেতনাকে বিশ্লেষণ করে কবি বলছেন, তাঁর হৃদয়ের অসংখ্য অদৃশ্য পত্রপুট প্রতিদিন আকাশ থেকে ভরে নিয়েছে আলোকের তেজোরস, জীবনের গূঢ়তম মজ্জার মধ্যে তাকে করেছে সঞ্চালিত।—

সুন্দরের কাছে পেয়েছে অমৃতের কণা
ফুলের থেকে, পাখির গানের থেকে,
প্রিয়ার স্পর্শ থেকে, প্রণয়ের প্রতিশ্রুতি থেকে,
আত্মনিবেদনের অশ্রুগদ্‌গদ আকূতি থেকে,
মাধুর্যের কত স্মৃতরূপ কত বিস্মৃতরূপ
দিয়ে গেছে অমৃতের স্বাদ
আমার নাড়ীতে নাড়ীতে।

*　　　*　　　*

এরা নারীর হৃদয় থেকে এনে দিয়েছে আমার হৃদয়ে
প্রাণলীলার প্রথম ইন্দ্রজাল আদিযুগের,
অনন্ত পুরাতনের আত্মবিলাস
নব নব যুগলের মায়ারূপের মধ্যে।

কবিতাটির উপসংহারে কবি বলছেন, তাঁর এই পত্রদূতগুলির সংবাহিত দিনরাত্রির অসংখ্য অপূর্ব অপরিমেয় সঞ্চয় জীবনের অলক্ষ্য গভীরে অখণ্ড ঐক্যে মিলে গিয়েছে তাঁর আত্মরূপে, সে রূপের দ্বিতীয় নেই কোনোখানে কোনো কালে। সেই অদ্বিতীয় আত্মরূপের কথাই 'পত্রপুটে'র কবিতাগুলিতে গদ্যচ্ছন্দে গ্রথিত হয়েছে।

সমগ্রভাবে এই কাব্যগ্রন্থ সম্পর্কে যে কথা সত্য তাই বিশেষভাবে সত্যতর হয়ে উঠেছে পনেরো-সংখ্যক কবিতায়। 'পত্রপুটে'র এই কবিতাটি [ওরা অন্ত্যজ, ওরা মন্ত্রবর্জিত] কবির অন্তরঙ্গতম আত্মপরিচয়মূলক কবিতাবলীর অন্যতম। এই কবিতাতেই কবি বলেছেন, তাঁর গানের মধ্যে সঞ্চিত হয়েছে দিনে দিনে "সৃষ্টির প্রথম রহস্য,—আলোকের প্রকাশ, আর সৃষ্টির শেষ রহস্য,—ভালোবাসার অমৃত।" এই কবিতাতেই কবি নিজেকে 'ব্রাত্য' ও 'মন্ত্রহীন' বলে পরিচয় দিয়ে বলেছেন, সকল মন্দিরের বাহিরে তাঁর পূজা সমাপ্ত হল 'দেবলোক থেকে মানবলোকে, আকাশে জ্যোতির্ময় পুরুষে আর মনের মানুষে আমার অন্তরতম আনন্দে।' এই কবিতার প্রথমাংশে বিশ্লেষিত কবির ধর্মচেতনা, অর্থাৎ "আকাশে জ্যোতির্ময় পুরুষ" সম্পর্কে কবির উপলব্ধি, এ প্রসঙ্গে আমাদের আলোচনার বিষয় নয়। কবিতার শেষাংশে কবি মনের মানুষে তাঁর অন্তরতম আনন্দের যে লীলারহস্য উদ্‌ঘাটিত করেছেন তার প্রতিই বিশেষভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ করব। কবি বলছেন :

একদিন বসন্তে নারী এল সঙ্গীহারা আমার বনে
প্রিয়ার মধুর রূপে।
এল সুর দিতে আমার গানে,
নাচ দিতে আমার ছন্দে,
সুধা দিতে আমার স্বপ্নে।

* * *

ভালোবেসেছি তাকে।
সেই ভালোবাসার একটা ধারা
ঘিরেছে তাকে স্নিগ্ধ বেষ্টনে
গ্রামের চিরপরিচিত অগভীর নদীটুকুর মতো।

অল্পবেগের সেই প্রবাহ
বহে চলেছে প্রিয়ার সামান্য প্রতিদিনের
অনুচ্চ তটচ্ছায়ায়।

* *

তুচ্ছতার আবরণে অনুজ্জ্বল
অতি সাধারণ স্ত্রী-স্বরূপকে
কখনো করেছে লালন, কখনো করেছে পরিহাস,
আঘাত করেছে কখনো বা।

কবিচিত্তে ভালোবাসার এই রূপ, কবি যাকে বলেছেন অল্পবেগের প্রবাহ, গ্রামের চিরপরিচিত অগভীর নদীটুকু যার উপমান, তার কথা আমরা দশম অধ্যায়ে কবিজায়া প্রসঙ্গে আলোচনা করেছি। প্লেটোর পরিভাষায় তাকে বলা যাবে কবিজীবনে জৈব-এরসের লীলা। এবার কবিকণ্ঠে শুনতে পাওয়া যাবে তাঁর জীবনে দৈব-এরসের লীলারহস্যের স্বরূপ-কথা। কবি বলছেন:

আমার ভালোবাসার আর-একটা ধারা
মহাসমুদ্রের বিরাট ইঙ্গিতবাহিনী।
মহীয়সী নারী স্নান করে উঠেছে
তারি অতল থেকে।
সে এসেছে অপরিসীম ধ্যানরূপে
আমার সর্বদেহে-মনে,
পূর্ণতর করেছে আমাকে, আমার বাণীকে।
জ্বেলে রেখেছে আমার চেতনার নিভৃত গভীরে
চিরবিরহের প্রদীপশিখা।

অর্থাৎ, ভালোবাসার এই ধারা মহাসমুদ্রের বিরাট ইঙ্গিতবাহিনী। অতি-সাধারণ স্ত্রী-স্বরূপ নয়, মহীয়সী নারী সমুদ্রসম্ভূতা লক্ষ্মীর মতই কবিমানসে উদিত হয়েছে। সে এসেছে অপরিসীম ধ্যানরূপে, কবির সর্বদেহে-মনে। পূর্ণতর করেছে কবিকে, কবির বাণীকে। সে প্রেম নিত্যবিরহরূপেই কবিমানসে বর্তমান। কবিচেতনার নিভৃত গভীরে সে জ্বেলে রেখেছে চিরবিরহের প্রদীপশিখা। নয়নে চিরবিরহের সেই অমৃতবর্তির আলোকে ত্রিভুবন তন্ময় হয়ে উঠেছে। কবি বলছেন:

সেই আলোকে দেখেছি তাকে অসীম শ্রীলোকে,
দেখেছি তাকে বসন্তের পুষ্পপল্লবের প্লাবনে,
সিসুগাছের কাঁপনলাগা পাতাগুলির থেকে
ঠিকরে পড়েছে যে রৌদ্রকণা
তার মধ্যে শুনেছি তার সেতারের দ্রুতঝংকৃত সুর।
দেখেছি ঋতুরঙ্গভূমিতে
নানা রঙের ওড়না-বদল-করা তার নাচ
ছায়ায় আলোয়।

এ স্তবকে সৌন্দর্যলক্ষ্মীরূপেই কবিমানসীর আবির্ভাব। বিশ্বসৌন্দর্যের মধ্যে—অসীম শ্রীলোকে—বিচিত্ররূপিণী মানসলক্ষ্মীকেই কবি প্রত্যক্ষ করেছেন। কিন্তু এখানেই তাঁর বিবর্তন শেষ হয়ে যায় নি। তৃতীয় স্তরে তাঁর প্রকাশ জীবনদেবতারই রূপ নিয়ে। কবি বলছেন:

ইতিহাসের সৃষ্টি-আসনে
ওকে দেখেছি বিধাতার বামপাশে;
দেখেছি সুন্দর যখন অবমানিত
কদর্য কঠোরের অশুচি স্পর্শে
তখন সেই রুদ্রাণীর তৃতীয় নেত্র থেকে
বিচ্ছুরিত হয়েছে প্রলয়-অগ্নি,
ধ্বংস করেছে মহামারীর গোপন আশ্রয়।

ইতিহাসের সৃষ্টি-আসনে বিধাতার বামপাশে যাঁর স্থান তিনি আনন্দস্বরূপেরই হ্লাদিনী শক্তি। প্রলয়ের দিনে তাঁর রূপান্তর হয় মহেশ্বরের মহাশক্তি রূপে। তখন সেই রুদ্রাণীর তৃতীয় নেত্র থেকে বিচ্ছুরিত হয় প্রলয়-অগ্নি। বলাই বাহুল্য, এই শেষ পর্যায়ে কবিচেতনা চণ্ডীদাসেরই প্রেমচেতনার সহোদর। বৈষ্ণব কবিসাধক তাঁর সাধন-সঙ্গিনীকে ডেকে বলেছিলেন, "তুমি বেদবাদিনী, হরের ঘরণী, তুমি সে নয়নের তারা।" রবীন্দ্রনাথ এই উপলব্ধির বিশ্লেষণে বলেছেন, "হোক সে নয়নের তারা তবুও যে নারী বেদ-বাদিনী, হরের ঘরণী, সে আছে বিরহলোকে। সেখানে তার সঙ্গ নেই, ভাব আছে।"

আলোচ্য কবিতাটি কবিমানসের একটি অপূর্ব সংকেত। কবিচিত্তে প্রেমচেতনা, সৌন্দর্যচেতনা এবং জীবনদেবতা-চেতনা যে একই উৎসমূল থেকে

উৎসারিত, এই সত্যই আমাদের উদ্ধৃত তিনটি স্তবকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু তার পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা কবিমানসীর কাব্যভাষ্য খণ্ডের অপেক্ষায় থাকবে। এখানে তার দিগ্‌দর্শনীমাত্র।

২

'পত্রপুটে'র পাঁচ এবং বারো-সংখ্যক কবিতায়ও কবিমানসী-কথাই রূপ পেয়েছে। পাঁচ-সংখ্যক কবিতাটি ১৯৩৫ সনের ২৫ অক্টোবর তারিখে লেখা, সাময়িকপত্রে প্রকাশের সময় নাম ছিল "হাটে" [প্রবাসী, পৌষ ১৩৪২]। একটি "বসন্তরাত্রের বিহ্বলতা"য় কবিচিত্তে কবিমানসীর আবির্ভাব ঘটেছে। সন্ধ্যা এল চুল এলিয়ে অস্তসমুদ্রে সদ্য স্নান করে। কবির মনে হল, স্বপ্নের ধূপ উঠছে নক্ষত্রলোকের দিকে। মায়াবিষ্ট নিবিড় সেই শুভক্ষণে কবি লাভ করলেন একটি অভিজ্ঞতা। কবি বলছেন, 'তার নাম করব না, সবে সে চুল বেঁধেছে, পরেছে আসমানি রঙের শাড়ি, খোলা ছাদে গান গাইছে একা। আমি দাঁড়িয়ে ছিলেম পিছনে, ও হয়তো জানে না, কিংবা হয়তো জানে।' সিন্ধু কাফির সুরে গাওয়া গানের ভাষা হল :

চলে যাবি এই যদি তোর মনে থাকে
ডাকব না ফিরে ডাকব না,
ডাকিনে তো সকালবেলার শুকতারাকে।—

গান শুনতে শুনতে কবির চোখ থেকে সরে গেল সংসারের ব্যবহারিক আচ্ছাদনটা। যেন কুঁড়ি থেকে পূর্ণ হয়ে ফুটে বেরোল অগোচরের অপরূপ প্রকাশ। তার লঘু গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল আকাশে। অপ্রাপণীয়ের সে দীর্ঘশ্বাস, দুরূহ দুরাশার সে অনুচ্চারিত ভাষা। কবির মন ডুবে গেল তাঁর আত্মমানসের অতল গভীরতায়। তিনি বলছেন, একদা মৃত্যুশোকের বেদমন্ত্র তুলে ধরেছিল বিশ্বের আবরণ, বলেছিল,—পৃথিবীর ধূলি মধুময়। সেই মৃত্যু, সেই মধুময় মৃত্যুই তাঁকে নিয়ে চলল লোকান্তরে গানের পাখায়। কবিচেতনা হয়ে উঠল অতীতচারী। তিনি বলছেন :

আমি ওকে দেখলেম,
যেন নিকষবরন ঘাটে সন্ধ্যার কালো জলে
অরুণবরন পা-দুখানি ডুবিয়ে বসে আছে অপ্সরী,

অকূল সরোবরে সুরের ঢেউ উঠেছে মুহুমুহু,
আমার বুকের কাঁপনে কাঁপন-লাগা হাওয়া
ওকে স্পর্শ করছে ঘিরে ঘিরে।

আমি ওকে দেখলেম,
যেন আলো-নেবা বাসরঘরে নববধূ,
আসন্ন প্রত্যাশার নিবিড়তায়
দেহের সমস্ত শিরা স্পন্দিত।
আকাশে ধ্রুবতারার অনিমেষ দৃষ্টি,
বাতাসে সাহানা রাগিণীর করুণা।

আমি ওকে দেখলেম,
ও যেন ফিরে গিয়েছে পূর্বজন্মে
চেনা-অচেনার অস্পষ্টতায়।
সে যুগের পালানো বাণী ধরবে বলে
ঘুরিয়ে ফেলছে গানের জাল,
সুরের ছোঁয়া দিয়ে খুঁজে খুঁজে ফিরছে
হারানো পরিচয়কে।

এখানে কবির চোখে চির-অতৃপ্তিরই ব্যঞ্জনা। তাই উৎপ্রেক্ষার মালা গেঁথে তিনি তাকে দেখছেন, যেন নিকষবরন ঘাটে সন্ধ্যার কালো জলে অরুণবরন পা-দুখানি ডুবিয়ে বসে আছে অপ্সরী, যেন সে আলো-নেবা বাসরঘরে নববধূ, যেন সে ফিরে গিয়েছে পূর্বজন্মে চেনা-অচেনার অস্পষ্টতায়। উৎপ্রেক্ষার এই বিভ্রান্তির ফলেই কবিচিত্তেও অতীত-বর্তমানের ভেদরেখা মুছে গেল। কিন্তু স্বপ্নের সঙ্গে বাস্তবের ঘটল অমিল। মধুময়ের উপর পড়ল ধূলার আবরণ। পরদিন ছিল হাটবার। দিনের রৌদ্রের স্পষ্ট আলোয় বিগত বসন্তরাত্রের বিহ্বলতা গেছে হারিয়ে। কবি তাঁর জানলায় বসে দেখলেন হাটের পাশে অশথ-তলায় বসে অন্ধ বৈরাগী হাঁড়ি বাজিয়ে গান গাইছে :

কাল আসব বলে চলে গেল,
আমি যে সেই কালের দিকে তাকিয়ে আছি।—

কবির মনে হল হাটের কেনাবেচার বিচিত্র গোলমালের জমিনে ওই সুরের শিল্পে বুনে উঠছে যেন সমস্ত বিশ্বের একটা উৎকণ্ঠার মন্ত্র—"তাকিয়ে আছি।" কবি তারই সুরে ফিরে পেলেন তাঁর বেদমন্ত্রের ছন্দকে, তাঁর মন বললে, মধুময় এই পার্থিব ধূলি। হাটের ভিড়ে তাঁর চোখে পড়ল একজন একেলে বাউলকে। তালি-দেওয়া আলখাল্লার উপরে কোমরে-বাঁধা একটা বাঁয়া। লোক জমেছে চারিদিকে। কবি দেখলেন অদ্ভুতেরও সঙ্গতি আছে এইখানে, এও এসেছে হাটের ছবি ভরতি করতে। কবি ওকে ডেকে নিলেন তাঁর জানলার কাছে। ও গাইতে লাগল:

হাট করতে এলেম আমি অধরার সন্ধানে,
সবাই ধরে টানে আমায়, এই যে গো এইখানে।

বলাই বাহুল্য, তিনটি গানের তিনটি কলি দিয়ে কবি এই কবিতার মূল সুরটি ফুটিয়ে তুলেছেন। "হাটে" নামকরণের তাৎপর্যটি তার মধ্যেই ধরা পড়েছে। 'বলাকা'র "সাজাহান" কবিতায় কবি হাটের রূপকল্প ব্যবহার করেই বলেছিলেন, এক হাটে বোঝা নিয়ে অন্য হাটে তা শূন্য করে হৃদয়ের সঞ্চয়কে পথপ্রান্তে ফেলে দিয়েই সংসার থেকে মানুষকে বিদায় নিয়ে যেতে হবে। বাউলের গানে বলছে, অধরার সন্ধানেই সে এসেছে হাট করতে, কিন্তু এইখানে সবাই ধরে তাকে টানে। ১৩৪২ সালের পঁচিশে বৈশাখে কবি তাঁর আত্মপরিচয় দিতে গিয়ে 'শেষ সপ্তকে'র তেতাল্লিশ-সংখ্যক কবিতায় বলেছিলেন, তাঁর তরুণ যৌবনের বাউল একতারাতে সুর বেঁধে নিরুদ্দেশ মনের মানুষকে অনির্দেশ্য বেদনার খেপা সুরে ডেকে বেড়িয়েছে। সেই শুনে বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মীর আসন টলেছিল, তিনি পাঠিয়ে দিয়েছেন তাঁর কোনো-কোনো দূতীকে পলাশবনের রংমাতাল ছায়াপথে কাজ-ভোলানো সকাল বিকালে। একেলে বাউলের গানে কবিচেতনার সেই উপলব্ধিই ভাষা পেল নূতন গানের ছন্দে।

৩

'পত্রপুটে'র বারো-সংখ্যক কবিতাটি ১৩৪৩ সালের পয়লা বৈশাখ তারিখে লেখা। সাময়িকপত্রে প্রকাশকালে প্রথম পংক্তি অনুসারেই এর নামকরণ

হয়েছিল "বসেছি অপরাহ্ণে পারের খেয়াঘাটে।" এই কবিতার পূর্বাংশে হাটের রূপকল্পটি ব্যবহার করে কবি বলছেন :

কতদিন যখন মূল্য ছিল হাতে
হাট জমেনি তখনো,
বোঝাই নৌকো লাগল যখন ডাঙায়
তখন ঘণ্টা গিয়েছে বেজে,
ফুরিয়েছে বেচাকেনার প্রহর।

অন্তরে অচরিতার্থতার এই ক্ষোভ নিয়ে জীবনের অপরাহ্ণে পারের খেয়াঘাটের শেষধাপের কাছটাতে বসে কবি স্মরণ করছেন তাঁর প্রভাতলগ্নকে। বলছেন :

অকালবসন্তে জেগেছিল ভোরের কোকিল ;
সেদিন তার চড়িয়েছি সেতারে,
গানে বসিয়েছি সুর।
যাকে শোনাব তার চুল যখন হল বাঁধা,
বুকে উঠল জাফরানি রঙের আঁচল
তখন ঝিকিমিকি বেলা,
করুণ ক্লান্তি লেগেছে মূলতানে।
ক্রমে ধূসর আলোর উপরে কালো মরচে পড়ে এল।
থেমে-যাওয়া গানখানি নিভে-যাওয়া প্রদীপের ভেলার মতো
ডুবল বুঝি কোন্ একজনের মনের তলায়,
উঠল বুঝি তার দীর্ঘনিশ্বাস,
কিন্তু জ্বালানো হল না আলো।

কবি বলছেন, এ নিয়ে আজ কোনো নালিশ নেই তাঁর মনে। বিরহের কালোগুহা ক্ষুধিত গহ্বর থেকে ঢেলে দিয়েছে ক্ষুভিত সুরের ঝরনা রাত্রিদিন। তারই ফলে :

সাত রঙের ছটা খেলেছে তার নাচের উড়নিতে
সারাদিনের সূর্যালোকে,
নিশীথরাত্রের জপমন্ত্র ছন্দ পেয়েছে
তার তিমিরপুঞ্জ কলোচ্ছল ধারায়।

আমার তপ্ত মধ্যাহ্নের শূন্যতা থেকে উচ্ছ্বসিত
গৌড়-সারঙের আলাপ।

এই প্রাপ্তির মধ্য দিয়েই কবির বঞ্চিত জীবন সার্থক হয়ে উঠেছে। কবি বলছেন, নিঃশেষ হয়ে এল তার দুঃখের সঞ্চয় মৃত্যুর অর্ঘ্যপাত্রে। কিন্তু তার দক্ষিণা রয়ে গেল কালের বেদিপ্রান্তে।

৪

'পত্রপুটে'র পরবর্তী গ্রন্থ 'শ্যামলী'। গ্রন্থাকারে ১৩৪৩ সালের ভাদ্র মাসে প্রকাশিত। কবিতাগুলি লেখা ১৯৩৬ সনের ২৩ মে থেকে ৬ আগস্টের মধ্যে। অর্থাৎ ১৩৪৩ সালের জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়-শ্রাবণে। 'শ্যামলী'র প্রথম কবিতা "তুমি"র মধ্যে প্রেমের তুমি-আমি চেতনাই ভাষা পেয়েছে। কবি বলছেন, আমি তোমার কারিগরের দোসর। একদিন আপন সহজ নিরালায় তুমি ছিলে অধরা, ছিলে তুমি একলা বিধাতার; একের মধ্যে একঘরে। আমি বেঁধেছি তোমাকে দুইয়ের গ্রন্থিতে। তোমার সৃষ্টি আজ তোমাতে আমাতে, তোমার বেদনায় আর আমার বেদনায়। এখানে কবির প্রেমচেতনায় তাঁর যে-দোসর "তুমি"-রূপে দেখা দিয়েছে তার মূলে যে ব্যক্তি-রূপই থাক্ না কেন, নির্বিশেষ নৈর্ব্যক্তিকতার স্তরে তার ব্যক্তিপরিচ্ছেদ হয়েছে বিগলিত। কিন্তু 'শ্যামলী'র "বিদায়-বরণ" এবং "মিলভাঙা" কবিতা দুটিতে নতুন বৌঠানের প্রকাশ স্পষ্ট।

"বিদায়-বরণ" কবিতাটি লেখা তেসরা জুন, অর্থাৎ জ্যৈষ্ঠের তৃতীয় সপ্তাহের শেষদিকে। আগের দিন সারারাত বৃষ্টি হয়েছে, বর্ষা-প্রকৃতি হয়েছে বিরহ-চেতনার যোগ্য উদ্দীপক। চারপহর রাতের বৃষ্টিভেজা ভারি হাওয়ায় থমকে আছে সকালবেলাটা। রাতজাগার ভারে যেন মুদে এসেছে মলিন আকাশের চোখের পাতা। বাদলার পিছল পথে পা টিপে চলেছে প্রহরগুলো। কবির মনের আকাশেও যত সব ভাবনার আবছায়া ঝাঁক বেঁধে উড়ে চলেছে হালকা বেদনার রঙ মেলে দিয়ে। কবি বলছেন:

এ কান্না নয়, হাসি নয়, চিন্তা নয়, তত্ত্ব নয়,
যত-কিছু ঝাপসা-হয়ে-যাওয়া রূপ,

ফিকে হয়ে যাওয়া গন্ধ,
কথা হারিয়ে যাওয়া গান,
তাপহারা স্মৃতি-বিস্মৃতির ধূপছায়া—
সব নিয়ে একটি মুখ-ফিরিয়ে-চলা স্বপ্নছবি
যেন ঘোমটাপরা অভিমানিনী।

শেষের চিত্রটিতে ভাবনার আবছায়া একটি স্পষ্ট রূপ নিয়ে ভেসে উঠেছে। একটি মুখ-ফিরিয়ে-চলা স্বপ্নছবি—যেন ঘোমটাপরা অভিমানিনী। কবির মন বলে উঠল, 'ডাকো ডাকো, ঐ ভেসে-যাওয়া পারের খেয়ার আরোহিণী, ওকে একবার ডাকো ফিরে। দিনান্তের সন্ধ্যাদীপটি তুলে ধরো ওর মুখের দিকে; করো ওকে বিদায়-বরণ।'

কবিতাটির শিরোনামার প্রতি একটু বিশেষ দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে—"বিদায়-বরণ"। ওর মধ্যে বাঙালী জীবনচর্যার যে ভাবানুষঙ্গগুলি জড়িয়ে আছে তার বিচিত্র ব্যঞ্জনা ওই নামকরণটিতে পুঞ্জীভূত। আর বরণের ভাষাটিও যেন কবিকণ্ঠে স্বগতোচ্চারিত মন্ত্র। ঘোমটাপরা অভিমানিনীর মুখের দিকে দিনান্তের সন্ধ্যাদীপটি তুলে ধরে অনুরক্ত কবি বলছেন:

তুমি সত্য, তুমি মধুর,
তোমারই বেদনা আজ লুকিয়ে বেড়ায়
বসন্তের ফুলফোটা আর ফুলঝরার ফাঁকে।
তোমার ছবি-আঁকা অক্ষরের লিপিখানি
সবখানেই,
নীলে সবুজে সোনায়
রক্তের রাঙা রঙে।

তুমি সত্য তুমি মধুর—এ চেতনা নূতন নয়, এ স্বীকৃতি কবিকণ্ঠ থেকে বারবার উচ্চারিত হয়েছে; বসন্তের ফুলফোটা আর ফুলঝরার ফাঁকে তোমারই বেদনা লুকিয়ে বেড়ায়; এ কথাও পুনঃপুন উচ্চারিত। কিন্তু শেষ বাক্যটিতে কবির উপলব্ধি নূতন স্তরে উপনীত হল: 'তোমার ছবি-আঁকা অক্ষরের লিপিখানি সবখানেই, নীলে সবুজে সোনায়, রক্তের রাঙা রঙে।' 'বলাকা'র "ছবি" কবিতায় কবি বলেছিলেন, 'নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাঁই, আজি তাই শ্যামলে শ্যামল তুমি নীলিমায় নীল, আমার নিখিল

তোমাতে পেয়েছে তার অন্তরের মিল।' এখানে কবি বললেন নীলে সবুজে সোনায় বিশ্বভুবনের সর্বত্রই তোমার লিপিখানি; কিন্তু শুধু বহির্ভুবনেই নয়, আমার রক্তের রাঙা রঙেও রয়েছে তোমার ছবি-আঁকা অক্ষরের ওই লিপিখানি। এই বাণীচিত্র চিত্রশিল্পী রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধির এক অভিনব শিল্পরূপ!

৫

'শ্যামলী'র "মিলভাঙা" কবিতাটিতে কবিচিত্তের অন্তরঙ্গ কথাটি যেমন কুণ্ঠাহীন তেমনি বেদনামধুর। 'শেষ সপ্তকে'র তেতাল্লিশ-সংখ্যক কবিতায় কবির যে আত্মপরিচয় পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে, 'শ্যামলী'র "মিলভাঙা" যেন তারই পুনশ্চ-ভাষণ। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা দেখেছি প্র্যাকেট-যোগে কবি তাঁর নতুন বৌঠানের সঙ্গে যেন মুখোমুখি বসে কথা বলছেন। "মিলভাঙা" কবিতাটিতেও দুজনে মুখোমুখি বসে কথা বলার ভঙ্গিটি অনুসৃত হয়েছে। কবি বলছেন, 'এসেছিলে কাঁচা জীবনের পেলব রূপটি নিয়ে। এনেছিলে আমার হৃদয়ে প্রথম বিস্ময়, রক্তে প্রথম কোটালের বান। মনের মধ্যে তখনো অসংশয় হয় নি পাখির কাকলি; বনের মর্মর একবার জাগে, একবার যায় মিলিয়ে।' অস্ফুট অনুরাগের সেই প্রথম অনতিব্যক্ত রূপটিকে একটি অনবদ্য উপমানের সাহায্যে প্রকাশ করে কবি বলছেন:

আধোচেনার ভালোবাসার মাধুরী
ছিল যেন ভোরবেলাকার
কালো ঘোমটায় সূক্ষ্ম সোনার কাজ—
গোপন শুভদৃষ্টির আবরণ।

আধোচেনার ভালোবাসার মাধুরী অন্য কোনো উপমায় সার্থকতর ভাবে উপমিত হতে পারত না, এ যেন গোপন শুভদৃষ্টির আবরণ! তারপর নিরত-উপচীয়মান অনুরাগের কাহিনী বর্ণনা করে কবি বলছেন, 'বহুলোকের সংসারের মাঝখানে চুপিচুপি তৈরি হতে লাগল আমাদের দুজনের নিভৃত জগৎ। পাখি যেমন প্রতিদিন খড়কুটো কুড়িয়ে এনে বাসা বাঁধে তেমনি সেই জগতের উপকরণ সামান্য, চলতি মুহূর্তের খসে-পড়া উড়ে-আসা সঞ্চয় দিয়ে গাঁথা। তার মূল্য তার বস্তুতে ছিল না, ছিল তার রচনায়।'

তারপর কবিজীবনের প্রত্যক্ষ জগৎ থেকে একদিন এল তাঁর বিদায় নেবার মুহূর্ত। নৌকো-বাওয়ার বার বার ব্যবহৃত উপমানের সাহায্যে কবি বললেন, 'শেষে একদিন দুজনের নৌকো-বাওয়া থেকে কখন একলা গেছ নেমে। আমি ভেসে চলেছি স্রোতে, তুমি বসে রইলে ওপারের ডাঙায়। মিলল না আর আমার হাতে তোমার হাতে, কাজে কিংবা খেলায়। জোড় ভেঙে ভাঙল আমাদের জীবনের গাঁথনি।' জীবনের সেই কচি শ্যামল দিনগুলির কথা বলতে গিয়ে কবি 'শেষ সপ্তকে' বলেছিলেন :

সে-কয়দিনের জন্মদিন
একটা দ্বীপ
কিছুকাল ছিল আলোতে,
কালসমুদ্রের তলায় গেছে ডুবে। ৪৩॥

সেই রূপকল্পটিকেই পূর্ণতর করে এখানে বলছেন :

যে-দ্বীপের শ্যামল ছবিখানি সদ্য আঁকা পড়েছে
সমুদ্রের লীলাচঞ্চল তরঙ্গপটে
তাকে যেমন দেয় মুছে
এক জোয়ারের তুমুল তুফানে,
তেমনি মিলিয়ে গেল আমাদের কাঁচা জগৎ
সুখদুঃখের নতুন-অঙ্কুর-মেলা
শ্যামল রূপ নিয়ে।

কবি বলছেন, 'তারপরে অনেক দিন গেছে কেটে। আষাঢ়ের আসন্নবর্ষণ সন্ধ্যায় যখন তোমাকে দেখি মনে মনে, দেখতে পাই তুমি আছ সেদিনকার কচি যৌবনের মায়া দিয়ে ঘেরা।...সুন্দর তুমি বাঁধা রেখায়, প্রতিষ্ঠিত তুমি অচল ভূমিতে।'

কিন্তু কবির জীবনধারা তো কোথাও থেমে রইল না। দুর্গমের মধ্যে, গভীরের মধ্যে, মন্দভালোর দ্বন্দ্ববিরোধে, চিন্তায় সাধনায় আকাঙ্ক্ষায় কবি চলে এসেছেন তাঁর অর্থাৎ নতুন বৌঠানের জানা সীমার বহুদূর বাইরে। সেখানে তাঁর কাছে তিনি 'বিদেশী'। কবি তাই বলছেন 'সেই তুমি আজ এই মেঘ-ডাকা সন্ধ্যায় যদি এসে বস আমার সামনে দেখতে পাবে আমার চোখে দিক্‌হারানো চাহনি অজানা আকাশের সমুদ্রপারে নীল অরণ্যের পথে।'

কবির চোখে এই দিক্‌হারানো চাহনি কার সন্ধানে অজানা আকাশের সমুদ্রপারে নীল অরণ্যের পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে? তিনি বলছেন, 'তুমি কি পাশে বসে শোনাবে সেদিনকার কানে কানে কথার উদ্‌বৃত্ত?' সেই কানে কানে কথার উদ্‌বৃত্ত নতুন করে শোনবার জন্যে কবির এই ব্যাকুলতা তাঁর অন্তরের সুনিভৃত বাসনারই স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ। শুধু তাই নয়, সেদিনকার সেই অনুভূতির মধ্যেই যে জীবনের পরম সার্থকতা লুকিয়ে আছে! কবির কুণ্ঠাহীন ভাষাতেই অভিব্যক্ত হয়েছে তার অকপট স্বীকৃতি। তিনি বলছেন :

সেদিন আমার সব মন
মিলেছিল তোমার সব মনে,
তাই প্রকাশ পেয়েছে নূতন গান
প্রথম সৃষ্টির আনন্দে।
মনে হয়েছে,
বহুযুগের আশা মিটল তোমাতে আমাতে।
সেদিন প্রতিদিনই বয়ে এনেছে
নূতন আলোর আগমনী
আদিকালে সদ্য-চোখ-মেলা তারার মতো।

কিন্তু কবিজীবনের সেই দিনগুলিকে অবশেষে একদিন বিদায় দিতে হল। সেদিনকার কবিকিশোর যে-একতারায় সুর সেধেছিলেন একে একে তাতে চড়িয়ে দিতে হল তারের পর নতুন তার। জীবনের বন্ধুর পথ দিয়ে তরঙ্গমন্দ্রিত জনসমুদ্রতীরে পৌঁছে তাঁর সহস্রতন্ত্রী সেতারযন্ত্রে বেজে উঠল বিচিত্র বিশ্বজীবনের মহাসংগীত। কিন্তু কবির মন আজো ডুবে আছে তাঁর হৃদয়ের প্রথম বিস্ময়সৃষ্টি-করা তরুণ অনুরাগের আধোচেনা মাধুরীর স্বপ্নে। তাই তিনি বলছেন :

তবু জল আসে চোখে।
এই সেতারে নেমেছিল তোমার আঙুলের
প্রথম দরদ ;
এর মধ্যে আছে তার জাদু।

এই তরীটিকে প্রথম দিয়েছিলে ঠেলে
কিশোর-বয়সের শ্যামল পারের থেকে ;
এর মধ্যে আছে তার বেগ।
আজ মাঝনদীতে সারিগান গাইব যখন
তোমার নাম পড়বে বাঁধা
তার হঠাৎ তানে।

৬

'শ্যামলী'র পরবর্তী দুখানি কাব্যগ্রন্থ 'খাপছাড়া' [মাঘ ১৩৪৩] এবং 'ছড়ার ছবি' [আশ্বিন ১৩৪৪] রবীন্দ্রকাব্যপ্রবাহে প্রক্ষিপ্ত। 'ছড়ার ছবি'তে 'স্মৃতি দিয়ে আঁকা' ব্যক্তিজীবনের চিত্রশিল্প রচিত হয়েছে "কাঠের সিঙ্গি", "প্রবাসে", "পদ্মায়", "বালক", "আতার বিচি" প্রভৃতি কয়েকটি কবিতায়। কিন্তু 'শ্যামলী'র পরে কবির উল্লেখযোগ্য কাব্যসংকলন হল 'প্রান্তিক'। প্রকাশ-কাল পৌষ ১৩৪৪।

'প্রান্তিক' কবিজীবনের এক অভিনব অভিজ্ঞতার কাব্য। ১৩৪৪ সালের পঁচিশে ভাদ্র শান্তিনিকেতনে উত্তীর্ণ-সন্ধ্যায় কবি অকস্মাৎ অচেতন হয়ে পড়েছিলেন। সেই মগ্নচেতন অবস্থায় দুদিন অতিবাহিত হল। কবির অসুস্থতার কথা চারদিকে তড়িৎবার্তায় প্রচারিত হয়েছিল। কলকাতা থেকে প্রসিদ্ধ ডাক্তার নীলরতন সরকার শান্তিনিকেতন পৌঁছে রোগ নির্ণয় করলেন, এবং তাঁর চিকিৎসায় কবি পুনরায় চেতনা ফিরে পেয়ে ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠলেন। জীবন ও মৃত্যুর মাঝখানে দাঁড়িয়ে, চেতনার প্রান্তসীমানায় পৌঁছে, কবিমানসের যে অভিজ্ঞতা তারই ছন্দিত বাণীরূপ 'প্রান্তিক'। 'অন্ধতামসগহ্বর' হতে সূর্যালোকে প্রত্যাবর্তন করে কবি পরম বিস্ময়ে নূতন চোখে আপনার পানে তাকিয়েছেন। অসুস্থ হবার এক পক্ষকাল কেটে যাবার পর 'প্রান্তিকে'র প্রথম কবিতা লিখিত হল ২৫শে সেপ্টেম্বর। বিশ্বের আলোকলুপ্ত তিমিরের অন্তরালে চুপে চুপে মৃত্যুদূতের আবির্ভাব এবং পুনশ্চেতনপ্রাপ্তির অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে কবি বলছেন :

কোন্ ক্ষণে নটলীলা-বিধাতার নবনাট্যভূমে
উঠে গেল যবনিকা। শূন্য হতে জ্যোতির তর্জনী
স্পর্শ দিল একপ্রান্তে স্তম্ভিত বিপুল অন্ধকারে,
আলোকের থরহর শিহরণ চমকি চমকি
ছুটিল বিদ্যুৎবেগে অসীম তন্দ্রার স্তূপে স্তূপে,
দীর্ণ দীর্ণ করি দিল তারে।১॥

গ্রীষ্মরিক্ত অবলুপ্ত নদীপথে অকস্মাৎ প্লাবনের দুরন্ত ধারায় বন্যার প্রথম নৃত্য যেভাবে শাখায় শাখায় বিসর্পিত গতিবেগে প্রবাহিত হয়, তেমনি চেতনার নবজাগরণ শূন্য আঁধারে গূঢ় নাড়ীতে নাড়ীতে অন্তঃশীলা জ্যোতির্ধারা প্রবাহিত করে দিল। অচেতন অবস্থা থেকে ধীরে ধীরে চেতনলোকে পৌছবার সেই অনুভূতিকে ভাষা দিয়ে কবি বলছেন :

আলোকে আঁধারে মিলি
চিত্তাকাশে অর্ধস্ফুট অস্পষ্টের রচিল বিভ্রম।
অবশেষে দ্বন্দ্ব গেল ঘুচি। পুরাতন সম্মোহের
স্থূল কারাপ্রাচীর-বেষ্টন, মুহূর্তেই মিলাইল
কুহেলিকা। নূতন প্রাণের সৃষ্টি হল অবারিত
স্বচ্ছ শুভ্র চৈতন্যের প্রথম প্রত্যূষ-অভ্যুদয়ে।১॥

"স্বচ্ছ শুভ্র চৈতন্যের প্রথম প্রত্যূষ-অভ্যুদয়ে" যে নূতন প্রাণের সৃষ্টি হল তার নিগূঢ় পরিচয় কবিমানসের বিশ্লেষণে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, ২৫ সেপ্টেম্বর থেকে ৯ অক্টোবরের মধ্যে লেখা 'প্রান্তিকে'র প্রথম কবিতাগুচ্ছের আটটি কবিতায় কবিমানসে 'আকাশের নির্মলতম মুক্তি' থেকে 'মর্তের মধুরতম আসক্তি'র লীলা নবভাবে বিলসিত হয়ে উঠেছে। উপলব্ধির প্রথম দিকে মুক্তিচেতনাই মুখ্য, কিন্তু ধীরে ধীরে মর্তের মধুর আসক্তিতে কবিমানস পুনরায় আবিষ্ট হয়ে পড়েছে। প্রথম কবিতাটি রচনার চারদিন পরে তৃতীয় কবিতায় কবি বলছেন :

এ জন্মের সাথে লগ্ন স্বপ্নের জটিল সূত্র যবে
ছিঁড়িল অদৃশ্য ঘাতে, সে মুহূর্তে দেখিনু সম্মুখে
অজ্ঞাত সুদীর্ঘ পথ অতিদূর নিঃসঙ্গের দেশে

নিরাসক্ত নির্মমের পানে। অকস্মাৎ মহা-একা
ডাক দিল একাকীরে প্রলয়তোরণচূড়া হতে

*　　　*　　　*

পুরাতন আপনার ধ্বংসোন্মুখ মলিন জীর্ণতা
ফেলিয়া পশ্চাতে, রিক্তহস্তে মোরে বিরচিতে হবে
নূতন জীবনচ্ছবি শূন্য দিগন্তের ভূমিকায় ।৩॥

দুদিন পরে পয়লা অক্টোবরে লেখা চতুর্থ কবিতায় কবি আবার বলছেন :

আদিম সৃষ্টির যুগে
প্রকাশের যে-আনন্দ রূপ নিল আমার সত্তায়
আজ ধূলিমগ্ন তাহা, নিদ্রাহারা রুগ্ন বুভুক্ষার
দীপধূমে কলঙ্কিত। তারে ফিরে নিয়ে চলিয়াছি
মৃত্যুস্নানতীর্থতটে সেই আদিনির্ঝরতলায় ।৪॥

এই কবিতার তিনদিন পরে লেখা পঞ্চম কবিতায় আসক্তি-মুক্তির দ্বন্দ্বটি প্রথম পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। এই কবিতাটি একটি অমিত্রা চতুর্দশী। তার অষ্টকবন্ধে আসক্তির সুরটি স্পষ্টোচ্চারিত :

পশ্চাতের নিত্যসহচর, অকৃতার্থ হে অতীত,
অতৃপ্ত তৃষ্ণার যত ছায়ামূর্তি প্রেতভূমি হতে
নিয়েছ আমার সঙ্গ, পিছু-ডাকা অক্লান্ত আগ্রহে
আবেশ-আবিল সুরে বাজাইছ অস্ফুট সেতার,
বাসাছাড়া মৌমাছির গুন গুন গুঞ্জরণ যেন
পুষ্পরিক্ত মৌনী বনে।

কবির "পশ্চাতের নিত্যসহচর", তাঁর "অকৃতার্থ অতীতে"র "অতৃপ্ত তৃষ্ণা" যে পুনরায় তাঁর সঙ্গ নিয়েছে, অষ্টকবন্ধের এই অংশে কবি তা স্বীকার না করে পারেন নি। কিন্তু ষট্‌কবন্ধে আসক্তি থেকে মুক্তির সুরই প্রবলতর :

পশ্চাতের সহচর, ছিন্ন করো স্বপ্নের বন্ধন ;
রেখেছ হরণ করি মরণের অধিকার হতে
বেদনার ধন যত, কামনার রঙিন ব্যর্থতা,
মৃত্যুরে ফিরায়ে দাও। আজি মেঘমুক্ত শরতের

দূরে-চাওয়া আকাশেতে ভারমুক্ত চিরপথিকের
বাঁশিতে বেজেছে ধ্বনি, আমি তারি হব অনুগামী।৫।

ভারমুক্ত চিরপথিকের বংশীধ্বনি শুনে তারি অনুগামী হবার আকাঙ্ক্ষা এই কবিতায় উচ্চারিত হলেও, বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করতে হয় যে, ওই একই দিনে লেখা ষষ্ঠ কবিতায় কবিচিত্তে নূতন সুর বেজে উঠেছে। সে সুর আসক্তির, নবানুরাগের। কবি বলছেন :

সন্ন্যাসীর গৈরিক বসন লুকায়েছে তৃণতলে
সর্ব-আবর্জনাগ্রাসী বিরাট ধূলায়, জপমন্ত্র
মিলে গেছে পতঙ্গগুঞ্জনে।*

*　　　　*　　　　*

যেথায় রোমন্থরত ধেনু
আলস্যে শিথিল-অঙ্গ, তৃপ্তিরসসম্ভোগ তাদের
সঞ্চারিছে ধীরে মোর পুলকিত সত্তার গভীরে।
দলে দলে প্রজাপতি রৌদ্র হতে নিতেছে কাঁপায়ে
নীরব আকাশবাণী শেফালির কানে কানে বলা,
তাহারি বীজন আজি শিরায় শিরায় রক্তে মোর
মৃদু স্পর্শে শিহরিত তুলিছে হিল্লোল।৬।

এই কবিতারই শেষাংশে অভিব্যক্ত হয়েছে রবীন্দ্র-মানসে অভিলষিত মর্ত-আসক্তির অবিস্মরণীয় বাসনা :

হে সংসার,
আমাকে বারেক ফিরে চাও ; পশ্চিমে যাবার মুখে
বর্জন কোরো না মোরে উপেক্ষিত ভিক্ষুকের মতো।

এই সকরুণ কাঙালপনা বলিষ্ঠ প্রেমের রূপ নিয়ে দেখা দিয়েছে পরবর্ত কবিতায়। শুধু মর্তপ্রেম নয়, তার মর্মমূলে নিত্যবিরাজমান মানসী-প্রেমের অকুণ্ঠ জয়ধ্বনিই সেখানে বিঘোষিত। মুমুক্ষাকে কবি বলেছেন, "অকৃতজ্ঞতার বৈরাগ্য-প্রলাপ", "বিকারের রোগীসম অকস্মাৎ ছুটে যেতে চাওয়া আপনার আবেষ্টন হতে।" এই বৈরাগ্যপ্রলাপকে ধিক্কার দিয়ে কবি বলছেন, প্রভাতে প্রথমজাগা পাখি যে সুরে আপনাতে আপনার আনন্দ ঘোষণা করে তিনি সেই সুরেই গাইবেন : "ধন্য এ জীবন মোর"। জীবনে দুঃখ দেখা দিয়েছিল,

ব্যথার বাঁশির সুরে তিনি দুঃখনাগিনীকে খেলিয়েছেন। অন্তরের নানা বেদনায় নানা রন্ধ্রে প্রাণের ফোয়ারা উৎসারিত হয়েছে—

এঁকেছি বুকের রক্তে মানসীর ছবি বারবার
ক্ষণিকের পটে, মুছে গেছে রাত্রির শিশিরজলে,
মুছে গেছে আপনার আগ্রহস্পর্শনে—তবু আজো
আছে তারা সূক্ষ্মরেখা স্বপনের চিত্রশালা জুড়ে
আছে তারা অতীতের শুষ্কমাল্যগন্ধে বিজড়িত।

কালের অঞ্জলি হতে ভ্রষ্ট কত অব্যক্ত মাধুরী থরে থরে মনের বাতাসকে রসে পূর্ণ করে রেখেছে।

আত্মমানসের নিগূঢ় রহস্যলীলা সম্পর্কে কবির এই অকপট স্বীকৃতিই এই কবিতাংশের কাব্যজীবিত। যে প্রেমের অমৃতরস বহু সাধনা করেও তিনি পান নি, অথচ অযাচিতভাবেই যা অন্য পাত্রে তাঁর ওষ্ঠাধরলগ্ন হয়েছে, বিরহমিলনের দ্বিধাবিভক্ত প্রেমের সেই দুই ধারা মিশেছিল তাঁর পীড়িত যৌবনে। আজ "মৃত্যুর সংগ্রামশেষে নবতর জীবনযাত্রায়" কবি প্রেমের সেই যুগল-প্রবাহকেই পরম স্বীকৃতি দান করলেন। রবীন্দ্রমানসলোকে কবিমানসীর প্রেম কোন্ আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে কতটুকু স্থান অধিকার করে আছে তার গুরুত্ব নির্ণয়ে 'প্রান্তিকে'র এই কবিতা-সপ্তক অভ্রান্ত উপকরণ রূপেই গ্রহণযোগ্য।

৭

'প্রান্তিকে'র পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ হল 'সেঁজুতি'। প্রকাশ—ভাদ্র ১৩৪৫। সেঁজুতির অর্থ সাঁঝের বাতি। কবি বলছেন, 'সন্ধ্যাবেলার প্রদীপ হিসাবে ওর মানেটা ভালো।' "উৎসর্গ" কবিতায় কবি লিখেছেন:

মর্তের প্রাণরঙ্গভূমিতে
যে-চেতনা সারারাতি
সুখদুঃখের নাট্যলীলায়
জ্বেলে রেখেছিল বাতি

সে আজি কোথায় নিয়ে যেতে চায়
অচিহ্নিতের পারে,
নবপ্রভাতের উদয়সীমায়
অরূপলোকের দ্বারে।

প্রাণরঙ্গভূমির সুখদুঃখের নাট্যলীলায় যে চেতনার বাতি সারারাত প্রোজ্জ্বল হয়ে ছিল জীবনের সন্ধ্যালগ্নে তাই হয়েছে সাঁঝের বাতি। এই সময়কার কবির মনোভাব ১৩৪৪ সালের ৭ই মাঘ তারিখে অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা একখানি পত্রে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কবি লিখছেন, 'আজ আমার মন যে-ঋতুকে আশ্রয় করে আছে, সে দক্ষিণ হাওয়ার ঋতু, অন্তরের দিকে তার প্রবাহ, কিছুকালের জন্যে ফুল ফুটিয়ে ফুল ঝরিয়ে দেবে দৌড়। সেই মাতালটা বড়ো হাটের জন্যে ফসল-ফলানো কেয়ার করে না।'[1]

'সেঁজুতির'র প্রথম কবিতা "জন্মদিনে"র উপান্ত স্তবকে সাঁঝের বাতির তাৎপর্য আরো সুন্দর হয়ে উঠেছে। ১৩৪৫ সালের "পঁচিশে বৈশাখ" কবিতাটি কালিম্পং থেকে আকাশবাণীর উদ্যোগে কবিকণ্ঠে সর্বত্র প্রচারিত হয়। "জন্মদিন" 'প্রান্তিকে'র প্রথম-গুচ্ছের কবিতাবলীর দোসর। কবি বলছেন তাঁর এবারকার জন্মদিনটি "বিলুপ্তির অন্ধকার হতে মরণের ছাড়পত্র নিয়ে" "প্রাণের প্রান্তপথে" ডুব দিয়ে উঠেছে। জন্মদিন মৃত্যুদিন একাসনে বসে কবি-চেতনায় নূতন উপলব্ধি রচনা করেছে। মর্ত থেকে বিদায় নেবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে পৃথিবীকে সম্বোধন করে কবি বলছেন :

তব দেহলিতে শুনি ঘণ্টা বাজে,
শেষ প্রহরের ঘণ্টা; সঙ্গে সঙ্গে ক্লান্ত বক্ষোমাঝে
শুনি বিদায়ের দ্বার খুলিবার শব্দ যে অদূরে
ধ্বনিতেছে সূর্যাস্তের রঙে রাঙা পূরবীর সুরে।
জীবনের স্মৃতিদীপে আজিও দিতেছে যারা জ্যোতি
সেই ক'টি বাতি দিয়ে রচিব তোমার সন্ধ্যারতি
সপ্তর্ষির দৃষ্টির সম্মুখে; দিনান্তের শেষ পলে
রবে মোর মৌন বীণা মূর্ছিয়া তোমার পদতলে।

জীবনের স্মৃতিদীপে যে কটি বাতি জ্বলছে তাই দিয়েই কবি তাঁর 'সেঁজুতি' রচনা করেছেন। "জন্মদিন" কবিতাটিতে এই যুগের কবিমানসের মর্মবাণী

নির্বারিত হয়েছে। আসক্তি ও মুক্তির নীলে আর হলুদে মিলে কাব্যের যে ময়ূরকণ্ঠী রঙ ওর মধ্যে ফুটে উঠেছে তার তুলনা খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এখানেও, মুক্তির আনন্দ নয়, বিদায়ের মর্মন্তুদ বেদনাই মূর্ত হয়ে উঠেছে। কবিতাটির অন্তিম চতুষ্ক সেই বেদনারই অবিস্মরণীয় বাণীরূপ :

আর রবে পশ্চাতে আমার, নাগকেশরের চারা
ফুল যার ধরে নাই, আর রবে খেয়াতরীহারা
এপারের ভালোবাসা—বিরহস্মৃতির অভিমানে
ক্লান্ত হয়ে রাত্রিশেষে ফিরিবে সে পশ্চাতের পানে।

"নাগকেশরের চারা—ফুল যার ধরে নাই" আর "খেয়াতরীহারা এপারের ভালোবাসা"—কবিমানসের অনুরাগরঞ্জিত চেতনার এই দুটি প্রতীক রবীন্দ্রকাব্য-প্রবাহেও সুদুর্লভ।

'সেঁজুতি' ১৩৪৩ থেকে ১৩৪৫ সালের মধ্যে লেখা ইতস্তত-বিক্ষিপ্ত কবিতার সংকলন। নানা রঙের দিনগুলি ওতে ধরা দিয়েছে। কিন্তু তার মধ্যেও মূল সুরটি চিনে নিতে পারা যায়। "যাবার মুখে" [২২ মাঘ, ১৩৪৩] কবিতায় তারি আভাস পাওয়া যাবে। মুক্তবন্ধ ধ্বনিপ্রধান ছন্দে কবি ঘোষণা করছেন, "যাক এ জীবন পুঞ্জিত তার জঞ্জাল নিয়ে যাক।" কিন্তু জীবনের যত কিছু পুঞ্জিত জঞ্জাল, যত কিছু ফাঁকি, সব যখন নিঃশেষ হয়ে যাবে তখনো এমন সম্পদ থাকবে যা অমূল্য, যা অনির্বচনীয়। সেই বিশ্বাসেই কবি বলছেন :

নিঃশেষ যবে হয় যত কিছু ফাঁকি
তবুও যা রয় বাকি—
জগতের সেই
সকল-কিছুর অবশেষেতেই
কাটায়েছি কাল যত অকাজের বেলায়,
মন-ভোলাবার অকারণ গানে কাজ-ভোলাবার খেলায়।
সেখানে যাহারা এসেছিল মোর পাশে
তারা কেহ নয় তারা কিছু নয় মানুষের ইতিহাসে।
শুধু অসীমের ইশারা তাহারা এনেছে আঁখির কোণে,
অমরাবতীর নৃত্যনূপুর বাজিয়ে গিয়েছে মনে।

দখিন হাওয়ার পথ দিয়ে তারা উঁকি মেরে গেছে দ্বারে,
কোনো কথা দিয়ে তাদের কথা যে বুঝাতে পারি নি কারে।

"মন-ভোলাবার অকারণ গানে, কাজ-ভোলাবার খেলায়" কবিজীবনে যারা যোগ দিয়েছিল কবির মানসলোকে যারা অমরাবতীর নৃত্যনূপুর বাজিয়ে গিয়েছে, দখিন হাওয়ার পথ দিয়ে যাদের আনাগোনা তাদের যাওয়া-আসার মধ্যেই কবি পেয়েছেন "নিত্যের পরিচয়।" তাদের স্পর্শেই কবির "অসীম আমি" তাঁর সংগীতে ধরা দিয়েছে।—

প্রেমের পরশে সে অসীম আমি বেজে ওঠে মোর গানে।

সেই আমির রহস্য সবচেয়ে যার চোখের আলোয় অনাবৃত হয়েছিল তার সঙ্গে অন্তরঙ্গ পরিচয় দিনের আলোয় নয়, সন্ধ্যার অন্ধকারেই সম্ভব। 'সন্ধ্যা'র কাছে তাই কবির প্রার্থনা :

দিনের আলো সবার আলো
লাগিয়েছিল ধাঁধা,—
অনেক সেথায় নিবিড় হয়ে
দিল অনেক বাধা।
নানান-কিছু ছুঁয়ে ছুঁয়ে
হারানো আর পাওয়ায়
নানান দিকে ধাওয়ায়।
সন্ধ্যা ওগো কাছের তুমি,
ঘনিয়ে এসো প্রাণে,—
আমার মধ্যে তারে জাগাও
কেউ যারে না জানে।
ধীরে ধীরে দাও আঙিনায় আনি
একলারই দীপখানি,
মুখোমুখি চাওয়ার সে দীপ,
কাছাকাছি বসার,
অতি-দেখার আবরণটি খসার।

["সন্ধ্যা", 'সেঁজুতি']

৮

'সেঁজুতি'র পরবর্তী 'আকাশপ্রদীপে'র নামকরণের তাৎপর্য ওই "সন্ধ্যা" কবিতাটির মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে। সন্ধ্যাকে কবি বলছেন, 'ধীরে ধীরে দাও আঙিনায় আনি একলারই দীপখানি; মুখোমুখি চাওয়ার সে দীপ, কাছাকাছি বসার।' এখানে উল্লেখযোগ্য 'সেঁজুতি' আর 'আকাশপ্রদীপে'র মাঝখানে 'প্রহাসিনী' নামে হাস্যরসাত্মক একখানি প্রক্ষিপ্ত কাব্যগ্রন্থ আছে; আমাদের আলোচনায় তার স্থান নেই।

'আকাশপ্রদীপে'র নাম-কবিতায় আকাশপ্রদীপ নামকরণের অর্থ ও তাৎপর্য পরিস্ফুট। কবি বলছেন, গোধূলিতে আঁধার নেমেছে, ফুরিয়ে এসেছে বেলা। "ঘরের মাঝে সাঙ্গ হল চেনা মুখের মেলা।"

দূরে তাকায় লক্ষ্যহারা
নয়ন ছলোছলো,
এবার তবে ঘরের প্রদীপ
বাইরে নিয়ে চলো।

'সেঁজুতি'র সঙ্গে 'আকশপ্রদীপে'র এখানেই পার্থক্য। "জীবনের স্মৃতিদীপে" যে-কটি বাতি জ্বলছিল সেগুলির সাহায্যেই কবি সপ্তর্ষির দৃষ্টির সম্মুখে সন্ধ্যারতির 'সেঁজুতি' জ্বালিয়েছিলেন। কিন্তু ধীরে ধীরে সেই বাতিগুলিও একটি একটি নির্বাপিত হয়ে ঘরের মাঝে চেনা মুখের মেলা যখন সাঙ্গ হল তখনি দেখা দিল 'আকাশপ্রদীপে'র "একলারই দীপখানি"। "মুখোমুখি চাওয়ার সে দীপ, কাছাকাছি বসার"। কবি বলছেন:

মিলনরাতে সাক্ষী ছিল যারা
আজো জ্বলে আকাশে সেই তারা।
পাণ্ডু-আঁধার বিদায়রাতের শেষে
যে তাকাত শিশির-সজল শূন্যতা-উদ্দেশে
সেই তারকাই তেমনি চেয়েই আছে
অস্তলোকের প্রান্তদ্বারের কাছে।
অকারণে তাই এ প্রদীপ জ্বালাই আকাশ-পানে—
যেখান হতে স্বপ্ন নামে প্রাণে।

['আকাশপ্রদীপ']

কবিমানসের আকাশে উদ্ভাসিত সেই একটি তারা তাঁর জীবনসন্ধ্যার সেই শেষ তারাটির উদ্দেশেই কবি তাঁর আকাশপ্রদীপ জ্বালিয়েছেন। রবীন্দ্র-জীবনীকার বলেছেন, "এই কবিতাটি পূরবীর 'তারা' কবিতাটি স্মরণ করাইয়া দেয়—'ওই কি আমার হবে আপন তারা।' আজ জীবনের সন্ধ্যায় আসিয়া প্রথম জীবনপ্রত্যূষের ধ্রুবতারার কথা কি মনে হইতেছে।"[২]

কিন্তু এখানে সংশয়িত জিজ্ঞাসার কোন অবকাশই নেই। কবির জীবনসন্ধ্যার 'আকাশপ্রদীপে'র সঙ্গে জীবনপ্রভাতের 'সন্ধ্যাসংগীতে'র "উপহার" কবিতাটি মিলিয়ে পড়লেই তাঁর মানস-আকাশের এই তারাটির অভ্রান্ত পরিচয় পাওয়া যাবে। 'সন্ধ্যাসংগীতে'র "উপহার" কবিতায় কবি বলছেন:

ভুলে গেছি কবে তুমি ছেলেবেলা একদিন
মরমের কাছে এসেছিলে,
স্নেহময়, ছায়াময়, সন্ধ্যাময় আঁখি মেলি
একবার বুঝি হেসেছিলে।
বুঝি গো সন্ধ্যার কাছে শিখেছে সন্ধ্যার মায়া
ওই আঁখি দুটি,
চাহিলে হৃদয় পানে মরমেতে পড়ে ছায়া
তারা উঠে ফুটি।

বলাই বাহুল্য, কবিতাটি নতুন বৌঠানকে উৎসর্জিত। তাঁরই স্নেহময়, ছায়াময়, সন্ধ্যাময় আঁখি তরুণ-কবির মানস-আকাশে তারা হয়ে ফুটে উঠেছিল। সেই তারাই তাঁর জীবনসন্ধ্যার শেষ তারা রূপে দেখা দিয়েছে।

'আকাশপ্রদীপে'র তাৎপর্য 'শ্যামলী'র "বিদায়-বরণ" কবিতাটিতেও স্পষ্ট। সেখানে কবি বলছেন:

মন বলছে, ডাকো ডাকো,
ঐ ভেসে-যাওয়া পারের খেয়ার আরোহিণী,
ওকে একবার ডাকো ফিরে;
দিনান্তের সন্ধ্যাদীপটি তুলে ধরো
ওর মুখের দিকে;
করো ওকে বিদায়-বরণ।

'আকাশপ্রদীপে'র বেশির ভাগ কবিতাই 'স্মৃতিরে আকার দিয়ে আঁকা।'[৩] আর সেই স্মৃতির কেন্দ্রভূমিতে আছেন নতুন বৌঠান। প্রত্যক্ষভাবে তাঁরি স্মৃতি নিয়ে তিনটি কবিতা রচিত :—"শ্যামা", "জানা-অজানা" এবং "কাঁচা আম"। "জানা-অজানা" কবিতায় একটি সংকেত লুকিয়ে আছে। সেই সংকেতের সাহায্যেই কবি-চেতনার উৎস সন্ধান করতে হবে। সারাজীবনে রবীন্দ্রনাথ একবারই মাত্র এই সংকেতটি ব্যবহার করেছেন।

টেবিলে হেলানো ক্যালেণ্ডার,
হঠাৎ ঠাহর হল আটই তারিখ।

এই "আটই তারিখ" রবীন্দ্রজীবনে সবচেয়ে মর্মান্তিক স্মৃতি-বিজড়িত দিন। ১২৯১ সালের আটই বৈশাখ নতুন বৌঠানের মৃত্যু হয়েছিল। কবি তাঁর স্মৃতিচেতনাকে "স্পষ্ট আর অস্পষ্টের উপাদানে ঠাসা" ঘরের সঙ্গে তুলনা করে বলছেন :

এই ঘরে আগে পাছে
বোবা কালা বস্তু যত আছে
দলবাঁধা এখানে সেখানে,
কিছু চোখে পড়ে, কিছু পড়ে না মনের অবধানে।

শুধু স্মৃতিলোকেই যে "জানা-অজানা"র ভিড় জমেছে, তাই নয়, অতীত-বর্তমানেও গরমিল দেখা দিয়েছে।—

আগেকার দিন আর আজিকার দিন
পড়ে আছে হেথা হোথা একসাথে সম্বন্ধবিহীন।

কিন্তু তবু বাস্তব থেকে স্বপ্নলোকে, বর্তমান থেকে অতীতে, জানা থেকে অজানায় যাতায়াতের জন্যে আছে "সরু এক চৈতন্যের সাঁকো।"—

জানা-অজানার মাঝে সরু এক চৈতন্যের সাঁকো,
ক্ষণে ক্ষণে অন্যমনা
তারি 'পরে চলে আনাগোনা।
আয়না-ফ্রেমের তলে ছেলেবেলাকার ফোটোগ্রাফ
কে রেখেছে, ফিকে হয়ে গেছে তার ছাপ।
পাশাপাশি ছায়া আর ছবি।
মনে ভাবি, আমি সেই রবি,

স্পষ্ট আর অস্পষ্টের উপাদানে ঠাসা
ঘরের মতন, ঝাপসা পুরানো ছেঁড়া-ভাঙা
আসবাবগুলো যেন আছে অন্যমনে।

* * *

ছায়া তারা
নূতনের মাঝে পথহারা,
যে অক্ষরে লিপি তারা লিখিয়া পাঠায় বর্তমানে
সে কেহ পড়িতে নাহি জানে।

এখানে আর একটি সংকেত উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে—"আমি সেই রবি।" এই স্নেহের ডাক-নামটি যে-কণ্ঠে উচ্চারিত হত, এই ধ্বনিরূপের মধ্যে কবি যেন সেই প্রিয়কণ্ঠের ডাকটি শুনতে পেলেন।

৯

'আকাশপ্রদীপে'র দুটি অতুলনীয় কবিতা "শ্যামা" ও "কাঁচা আম"। এই কবিতাযুগলে কবি শিল্পীর তুলিতে নতুন বৌঠানের দুখানি অনবদ্য কিশোরী-চিত্র রচনা করেছেন। নতুন বৌঠান সম্পর্কে 'জীবনস্মৃতি'র পাঠক-সমাজে যে অতৃপ্তি ছিল তা অনেকখানি পূর্ণ হয়েছে 'ছেলেবেলা'য়। কিন্তু "শ্যামা" ও "কাঁচা আমে" কাব্যের ভাষায় তাঁর প্রাকৃত-মূর্তি যে-ভাবে জীবন্ত হয়ে উঠেছে সমগ্র রবীন্দ্র-সাহিত্যেও তার তুলনা নেই।

তা ছাড়া এই দুটি কবিতায় কবির নিজের বাল্যকৈশোরের নবারুণরাগরঞ্জিত মূর্তিটিও নয়নাভিরাম। এই গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে 'পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি' থেকে ১৯২৪ সনের ৫ই অক্টোবর তারিখে লেখা কবির দিনপঞ্জির যে অংশ আমরা উদ্ধার করেছি তাও এই প্রসঙ্গে বিশেষ ভাবে স্মরণযোগ্য। সেদিনকার ডায়ারিতে কবি লিখেছিলেন, 'এমন সময় ঘাটে পড়লুম। একদিন বিকেলবেলায় সামনের বাড়ির ছাতে দেখি, দশ-বারো বছরের একটি ছেলে খালি-গায়ে যা-খুশি করে বেড়াচ্ছে। * * কিসে যেন একটা ধাক্কা দিয়ে আমাকে মনে করিয়ে দিলে যে, অমনি করেই নগ্ন হয়ে সমস্তর মধ্যে মগ্ন হয়ে নিখিলের আঙিনায় আমিও একদিন এসে দাঁড়িয়ে-

ছিলুম। * * * ঐ গা-খোলা ছেলেটা দিনের শেষ প্রহরের বেকার বেলাতে ছাদের উপরে ঘুরে বেড়ায়। আকাশের আলিঙ্গনে-বাঁধা ওই ভোলা-মন ছেলেটিতে একটি নিত্যকালের কথা আছে। * * * আজ মনে হচ্ছে ওই ছেলেটার কথা আমারই খুব ভিতরের কথা, গোলেমালে অনেককাল তার দিকে চোখ পড়ে নি। বারো বছরের সেই নিত্য-ভোলা ইস্কুল-পালানো লক্ষ্মীছাড়াটা গাম্ভীর্যের নিবিড় ছায়ায় কোথায় লুকিয়ে লুকিয়ে খেলা করছিল। * * * মন কাঁদছে, মরবার আগে গা-খোলা ছেলের জগতে আর একবার শেষ ছেলেখেলা খেলে নিতে, দায়িত্বহীন খেলা।'[৪]

এই ডায়ারি লেখার পর চোদ্দ বছর অতিবাহিত হয়েছে। এই চোদ্দ বছর ধরে কবি তাঁর কৈশোরের নানা রঙের দিনগুলির স্মরণোৎসবে আবিষ্ট হয়ে আছেন। কিন্তু আকাশের আলিঙ্গনে বাঁধা বারো বছরের সেই ভোলামন ছেলেটাকে তিনিও এর আগে এমন দিব্যকান্তিতে ফুটিয়ে তুলতে পারেন নি। "তখন যেমন-খুশির ব্রজধামে ছিল বালগোপালের লীলা।"[৫] "শ্যামা" ও "কাঁচা আম" কবিতায় সেই গা-খোলা ছেলের জগতেই কবির শেষ ছেলেখেলা। আমরা তৃতীয় অধ্যায়ে কবিতা দুটি থেকে পর্যাপ্ত উদ্ধৃতি সংকলন করেছি। কিন্তু এখানে পুনরায় তার রস-বিশ্লেষণ না করলে আমাদের আলোচনা অঙ্গহীন হয়ে পড়বে।

"শ্যামা" কবিতায় কবি সত্য সত্যই তাঁর বারো বছর বয়সের স্মৃতিকে কল্পনায় ধ্যান করেছেন। কবিতায় আছে :

অসংকোচে ছিল চেয়ে
নবকৈশোরের মেয়ে,
ছিল তারি কাছাকাছি বয়স আমার।

পাণ্ডুলিপির আদি-পাঠে বয়ঃসীমা আরো নির্দিষ্ট। সেখানে আছে :

তেরো-চোদ্দ বছরের মেয়ে,
বারো ছিল বয়স আমার।[৬]

নতুন বৌঠানের নবীনা কিশোরী-মূর্তির বর্ণনায় কবি বলছেন, "উজ্জ্বল শ্যামল বর্ণ", "বড়ো বড়ো কাজল নয়ান"। আবরণ-আভরণের দিক নিতান্তই তুচ্ছ :

একখানি শাদা শাড়ি কাঁচা কচি গায়ে,
কালো পাড় দেহ ঘিরে ঘুরিয়া পড়েছে তার পায়ে।

আভরণের মধ্যে "দুখানি সোনার চুড়ি নিটোল দু হাতে", আর "গলায় পলার হারখানি"। কবি অকুণ্ঠ কণ্ঠে স্বীকার করছেন, "ছুটির মধ্যাহ্নে পড়া কাহিনীর পাতে ওই মূর্তিখানি ছিল।" এই নবীনা কিশোরী বালকচিত্তকে মাঝে মাঝে ডাক দিয়ে নিয়ে গিয়েছে সেখানে, যেখানে বিধির খেয়াল নানাবিধ সাজে নাগালের পারে মরীচিকালোক রচনা করে। সে মরীচিকালোক "বালকের স্বপ্নের কিনারে"। কবি তাঁর স্বপনচারিণী কিশোরীকে বলেছেন—"সূক্ষ্মস্পর্শময়ী"।

দেহ ধরি মায়া
আমার শরীরে মনে ফেলিল অদৃশ্য ছায়া
সূক্ষ্মস্পর্শময়ী।

বালকচিত্তে তখনো অনুরাগ-প্রকাশের ভাষা ফুটে ওঠে নি, ["সাহস হল না কথা কই"], শুধু হৃদয়ে কি এক অজানা বেদনা গুঞ্জরিত হয়ে উঠল। তার কারণ বিশ্লেষণ করে কবি বলছেন :

ও যে দূরে, ও যে বহু দূরে,
যত দূরে শিরীষের ঊর্ধ্বশাখা যেথা হতে ধীরে
ক্ষীণ গন্ধ নেমে আসে প্রাণের গভীরে।

সুরভিত সূক্ষ্মস্পর্শের অনবদ্য উপমাটি লক্ষণীয়।

অনুরাগের কয়েকটি উদ্দীপনচিত্র এর পরে কবিতায় পর পর সজ্জিত হয়েছে। একদিন এল কিশোরীর খেলাঘর থেকে পুতুলের বিয়ের নিমন্ত্রণ। "কলরব করেছিল হেসে খেলে নিমন্ত্রিত দল।" কবি চিরদিনই আবেগপ্রকাশে অনুচ্ছল। "আমি মুখচোরা ছেলে একপাশে সংকোচে পীড়িত।" সন্ধ্যা বুঝি বৃথাই কাটল। পরিবেশনের ভাগে কি পেয়েছিলেন তাও মনে নেই। কিন্তু সেই নিমন্ত্রণশালা থেকে বালক যে দুর্লভ কিছু সম্পদ কুড়িয়ে এনেছিল তাতেও সন্দেহ নেই—

দেখেছিনু, দ্রুতগতি দুখানি পা আসে যায় ফিরে,
কালো পাড় নাচে তারে ঘিরে।
কটাক্ষে দেখেছি, তার কাঁকনে নিরেট রোদ
দুহাতে পড়েছে যেন বাঁধা। অনুরোধ উপরোধ
শুনেছিনু তার স্নিগ্ধ স্বরে।

সেই দ্রুতগতি দুখানি পা-কে ঘিরে কালো পাড়ের নাচ, সেই কাঁকনে বাঁধা-পড়া নিরেট রোদ, সেই স্নিগ্ধ কণ্ঠস্বর বালকচিত্তকে আচ্ছন্ন করে রাখল অর্ধেক রজনী—

ফিরে এসে ঘরে
মনে বেজেছিল তারি প্রতিধ্বনি
অর্ধেক রজনী।

তারপর একদিন জানাশোনা বাধাহীন হল। ডাকনাম ধরে ডাকবার সাহস এল কণ্ঠে। ভয় গেল ঘুচে। পরিহাসে পরিহাসে শুরু হল কথা-বিনিময়। কখনো গড়ে-তোলা দোষ ছল-করা রোষের সৃষ্টি করেছে। কখনো কৌতুকময়ীর শ্লেষবাক্যে নিষ্ঠুর কৌতুক দিয়েছে দুঃখ। ওরই মধ্যে মনোময়ী রতির একটি সূক্ষ্ম বাসনার সুকুমার অঙ্কুরও উদ্গত হল :

কখনো দেখেছি তার অযত্নের সাজ—
রন্ধনে ছিল সে ব্যস্ত, পায় নাই লাজ।

অসংবৃতবাসা কিশোরীর নবোদ্ভিন্ন রূপের প্রতি বাসনার এই সলজ্জ কৌতূহল বালকচিত্তে কৈশোর-আবির্ভাবেরই দ্যোতক। বাল্য-কৈশোরের বয়ঃসন্ধিতে দাঁড়িয়ে আর এক দিনের একটি স্পর্শসুধাময় অভিজ্ঞতা দিয়েই উদ্দীপনচিত্রগুলি সম্পূর্ণ হয়েছে। হাত দেখার ছলনা করে হাতখানি হাতে তুলে নেওয়ার গোপন বাসনার মধুক্ষরা অনুভূতিই ওতে প্রকাশিত।—

একদিন বলেছিল, "জানি হাত দেখা।"
হাতে তুলে নিয়ে হাত নতশিরে গনেছিল রেখা—
বলেছিল, "তোমার স্বভাব
প্রেমের লক্ষণে দীন।" দিই নাই কোনোই জবাব।
পরশের সত্য পুরস্কার
খণ্ডিয়া দিয়েছে দোষ মিথ্যা সে নিন্দার।

এখানে পরশের পুরস্কার 'সত্য' হয়েছে বলেই নিন্দা হয়েছে 'মিথ্যা'। কিন্তু "তোমার স্বভাব প্রেমের লক্ষণে দীন"—এই উক্তিটির মধ্যে একটি সূক্ষ্মতর ব্যঞ্জনা লুকিয়ে আছে। উক্তিটি আসলে ঘুম-ভাঙানিয়া গান। অনুরাগকুতূহলা কিশোরীকর্তৃক কিশোরচিত্তের ঘুম ভাঙাবার তির্যক প্রয়াস ওর মধ্যে নিহিত আছে। তা ছাড়া কিশোর রবীন্দ্রনাথের মনের গড়ন সম্পর্কে এই

উক্তিটি যে অভ্রান্ত তার পরিচয় আনা তরখড় এবং ইংলণ্ড-প্রবাসে স্কট-দুহিতা প্রসঙ্গে কবির পরিণত বয়সের আত্মবিশ্লেষণেও ধরা পড়েছে।

কৌতুকময়ী কিশোরীটি কিন্তু কবিচিত্তে চিরদিনই রহস্যময়ী হয়ে রইল। কবি "শ্যামা"র উপান্ত স্তবকে বলছেন, "তবু ঘুচিল না অসম্পূর্ণ চেনার বেদনা।" পরিণত মন নিয়ে কবি তার হেতু বিশ্লেষণ করেছেন:

সুন্দরের দূরত্বের কখনো হয় না ক্ষয়,
কাছে পেয়ে না-পাওয়ার দেয় অফুরন্ত পরিচয়।

সীমার মধ্যে সীমাহীনতাই সৌন্দর্যের ধর্ম। প্রেমানুভূতি যেখানে সৌন্দর্যানুভূতির সহোদর সেখানে প্রিয়বস্তু চিরদিনই নাগালের বাইরে। এমন কি কাছে পেয়েও তাকে কিছুতেই পাওয়া যায় না। নতুন বৌঠান সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের অনুরাগের স্বরূপটি এই লক্ষণ দিয়েই চিনতে হবে। আমরা অন্যত্র তরুণ কবির অনুরাগকে ক্রবাদুর প্রেমের সঙ্গে, দান্তে ও পেত্রার্কার প্রেমের সঙ্গে তুলনা করেছি।' কিন্তু সেখানেও তুলনা সর্বাঙ্গীণ নয়। ক্রবাদুরদের মানস-সুন্দরী চিরদিনই তাঁদের কাছে অপ্রাপণীয়া। সে নাগালের পরপারে মায়া-মরীচিকা মাত্র। দান্তের জীবনেও বেয়াত্রিচে এবং পেত্রার্কার জীবনেও লরা চিরদিনই নাগালের বাইরে ছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের জীবনে নতুন বৌঠান ষোলো বছর ধরে কবিকিশোরকে দিয়েছেন সঙ্গ ও সান্নিধ্য। বাল্যে তাঁর অকৃপণ সেবাযত্ন পেয়েছেন কবি। কৈশোর-লগ্নে আদরও পেয়েছেন। কিন্তু সঙ্গ সান্নিধ্য ও আদর লাভের এই উপচীয়মান বাসনা প্রতিদিনের অগ্নিপরীক্ষায় বিশুদ্ধীভূত হয়ে পরিণত হয়েছে নিকষিত হেমে। 'সরস্বতীকণ্ঠাভরণ' ও 'অলংকার-কৌস্তভে' বর্ণিত প্রীতিরূপা রতি, 'সিম্পোসিয়ামে' প্লেটো-বর্ণিত দিব্য-এরসের মহৎ-সুন্দর লীলা কিশোর-মানসে যে নিত্য-নবীন রূপ লাভ করেছে তাকে চেনারই অভিজ্ঞান রয়েছে "শ্যামা" কবিতায়:

ও যে দূরে, ও যে বহুদূরে,
যতদূরে শিরীষের ঊর্ধ্বশাখা যেথা হতে ধীরে
ক্ষীণ গন্ধ নেমে আসে প্রাণের গভীরে।

কাছে পেয়েও যে চিরদিনের না-পাওয়া, সেই অপ্রাপণীয়া সুদূরবর্তিনীর প্রতি চিরবিরহী-চিত্তের নিত্যনবায়মান অনুরাগই রবীন্দ্রচিত্তে মানসী-প্রেমের স্বরূপ।

সেই অমুরাগের স্বপ্নে বোঝাই তরীতে চলেছে কবির শেষযাত্রা। "শ্যামা"র অন্তিম স্তবকে আছে তারই ধ্বনিমণ্ডিত কাব্যরূপ :

পুলকে বিষাদে মেশা দিন পরে দিন
পশ্চিমে দিগন্তে হয় লীন।
চৈত্রের আকাশতলে নীলিমার লাবণ্য ঘনাল,
আশ্বিনের আলো
বাজাল সোনার ধানে ছুটির সানাই।
চলেছে মন্থর তরী নিরুদ্দেশে স্বপ্নেতে বোঝাই।

১০

আলংকারিক পরিভাষায় "শ্যামা" কবিতা যদি প্রীতিময়ী রতির 'সুখভোগানুকূল্যকারী' গুণের উদাহরণ হয় তা হলে "কাঁচা আম" হচ্ছে 'প্রিয়তা'র নিদর্শন। চৈত্র মাসের সকালে মৃদু রোদ্দুরে গাছতলায় পড়ে-থাকা তিনটে কাঁচা আম এ কবিতার উদ্দীপনবিভাব। গাছতলায় ওই তিনটে কাঁচা আম পড়ে থাকতে দেখে কবির মন চলে গেছে স্মৃতির উজান বেয়ে একেবারে 'বালগোপালের ব্রজধামে'। তখনকার দিনে দৈবে-পাওয়া দুটি-একটি কাঁচা আম ছিল বালকের সোনার চাবি। খুলে দিত সমস্ত দিনের খুশীর গোপন কুঠুরি।

সেদিনকার কথা কবি একেবারে গোড়া থেকে শুরু করেছেন। তাঁর শৈশবে যেদিন প্রথম বাড়িতে বউ এল পরের ঘর থেকে, সেদিন যে-মনটা ছিল নোঙর-ফেলা নৌকোর মতো তাকে বান ডেকে দিলে একেবারে তোলপাড় করে। 'জীবনের বাঁধা বরাদ্দ ছাপিয়ে দিয়ে এল অদৃষ্টের বদান্যতা। পুরোনো ছেঁড়া আটপৌরে দিনরাত্রিগুলো খসে পড়ল সমস্ত বাড়িটা থেকে। * * * বালকের দৃষ্টিতে এই প্রথম প্রকাশ পেল—জগতে এমন কিছু যাকে দেখা যায় কিন্তু জানা যায় না।'

বাঁশী থামল, বাণী থামল না—
আমাদের বধূ রইল
বিস্ময়ের অদৃশ্য রশ্মি দিয়ে ঘেরা।

তার ডুরে শাড়িটি মনে ঘুরিয়ে দেয় আবর্ত। কিন্তু তার ভাব, তার আড়ি, তার খেলাধুলো ননদের সঙ্গে। সেখানে বালকের প্রবেশাধিকার নেই। অথচ মন একান্তই চাইত, ওকে কিছু একটা দিয়ে সাঁকো বানিয়ে নিতে।

অবশেষে বহু সাধনায় জানতে পারা গেল, প্রসাদ-লাভের একটি ছোট্ট দরজা খোলা আছে।—

ও ভালোবাসে কাঁচা আম খেতে
শুল্‌পো শাক আর লংকা দিয়ে মিশিয়ে।

গাছে চড়তে ছিল কড়া নিষেধ। হাওয়া দিলেই বালক ছুটে যেত বাগানে। দৈবে যদি পাওয়া যেত একটি মাত্র ফল তা হলে তার আনন্দের সীমা থাকত না। দেখত, "সে কী শ্যামল, কী নিটোল, কী সুন্দর।"

একদিন শিলবৃষ্টির মধ্যে আম কুড়িয়ে এনেছিলুম ;
ও বলল, "কে বলেছে তোমাকে আনতে।"
আমি বললুম, "কেউ না।"
ঝুড়িসুদ্ধ মাটিতে ফেলে চলে গেলুম।
আর-একদিন মৌমাছিতে আমাকে দিলে কামড়ে ;
সে বললে, "এমন করে ফল আনতে হবে না।"
চুপ করে রইলুম।

অতি তুচ্ছ ঘটনা। কিন্তু বালকের অনুরাগে রঞ্জিত হয়ে কাব্যলোকে অসামান্য লাবণ্য লাভ করেছে। কবি বলছেন, 'এখনো কাঁচা আম পড়ছে খসে খসে গাছের তলায়, বছরের পর বছর। ওকে আর খুঁজে পাবার পথ নেই।' এই দীর্ঘনিঃশ্বসিত বেদনা দিয়েই কবিতাটির উপসংহার রচিত হয়েছে। কবিতার উপান্ত পর্বে কবির মন বাল্য-লীলার স্মৃতিচারণ শেষ করে চলে গেছে কৈশোর-লগ্নে। তিনি বলছেন :

বয়স বেড়ে গেল।
একদিন সোনার আংটি পেয়েছিলুম ওর কাছ থেকে ;
তাতে স্মরণীয় কিছু লেখাও ছিল।
স্নান করতে সেটা পড়ে গেল গঙ্গার জলে—
খুঁজে পাইনি।

গঙ্গার জলে হারিয়ে-যাওয়া এই সোনার আংটির কথা একদিন মংপুতে কবি

বলেছিলেন মৈত্রেয়ী দেবীকে।—'একবার মাত্র জীবনে গয়না পরেছিলুম, আংটি। নতুন বৌঠান দিয়েছিলেন, গাজিপুরে গঙ্গায় স্নান করতে গিয়ে জলে পড়ে গেল, খুব দুঃখ হয়েছিল।'[৮] কবিতায় কবি বলছেন, "তাতে স্মরণীয় কিছু লেখাও ছিল।" আংটিতে স্মরণীয় এমন আর কিই বা লেখা থাকতে পারে! কিন্তু চিরস্মরণের পথে অবিস্মরণীয় হয়ে রয়েছে স্বর্ণাঙ্গুরীয়ের সেই অনাবিষ্কৃত অভিজ্ঞানটি।

॥ উল্লেখ-পঞ্জী ॥

১ দ্রষ্টব্য : রবীন্দ্র-জীবনী, চতুর্থ খণ্ড, পৃ° ১২৪।

২ তদেব। পৃ° ১৪৫।

৩ ভূমিকা, আকাশপ্রদীপ।

৪ যাত্রী, পৃ° ৭৪-৭৭।

৫ ফাঁক, পুনশ্চ। রবীন্দ্র-রচনাবলী-১৬, পৃ° ২৪।

৬ দ্রষ্টব্য : রবীন্দ্র-রচনাবলী-১৬, গ্রন্থপরিচয়, পৃ° ৫৪০।

৭ দ্রষ্টব্য : সনেটের আলোকে মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ। পৃ° ২১১-২১২।

৮ মংপুতে রবীন্দ্রনাথ। প্রথম সংস্করণ, পৃ° ২০৫।

ষোড়শ অধ্যায়

"শেষ অভিসার"

১

'কবিমানসী'র প্রতি রবীন্দ্রনাথের অনুরাগের পূর্ণাহুতি হয়েছে 'সানাই' গ্রন্থে। কবির চৌষট্টি বৎসর থেকে আশি বৎসর বয়স পর্যন্ত যে কালপারধিকে আমরা বলেছি কবিজীবনের দ্বিতীয় কৈশোর, তার আদিতে আছে 'পূরবী' আর শেষ প্রান্তে 'সানাই'। কাব্যগ্রন্থ হিসাবে 'সানাই'য়ের প্রকাশকাল শ্রাবণ ১৩৪৭। 'আকাশপ্রদীপ' প্রকাশের পর যে কবিতাগুলি সঞ্চিত হয়েছিল তাদের দু ভাগে ভাগ করে প্রকাশ করা হল 'নবজাতক' [প্রকাশকাল বৈশাখ ১৩৪৭] আর 'সানাই' গ্রন্থে। কাব্যগ্রন্থনের ভার পড়েছিল অমিয় চক্রবর্তীর উপর। তিনি 'নবজাতকে' সেই কবিতাগুলিকে স্থান দিলেন যারা কবির ভাবনায় "বসন্তের ফুল নয়" "প্রৌঢ় ঋতুর ফসল", "বাইরে থেকে মন ভোলাবার দিকে এদের ঔদাসীন্য", "ভিতরের দিকের মননজাত অভিজ্ঞতা" থেকেই এরা উদ্ভূত। 'সানাই'য়ের কবিতাগুলি সম্পূর্ণ ভিন্ন গোত্রের। সেগুলিকে বলা যেতে পারে কবির "শেষ বসন্তে"র ফসল। এই সংকলনের প্রথম কবিতা "দূরের গানে" কবি বলছেন, বাসহারা তাঁর মন "তারার আলোতে কোন্ অধরাকে করে অন্বেষণ, পথে পথে দূরের জগতে।" সেই দূরবাসীর উদ্দেশে শেষবারের মত কবি-কণ্ঠে "চিরপ্রবাসের বাঁশি" বেজে উঠেছে 'সানাই' গ্রন্থে। কবি বলছেন :

দিগন্তের নীলিমার স্পর্শ দিয়ে ঘেরা
গোধূলিলগ্নের যাত্রী মোর স্বপনেরা।
নীল আলো প্রেয়সীর আঁখিপ্রান্ত হতে
নিয়ে যায় চিত্ত মোর অকূলের অবারিত স্রোতে ;
চেয়ে চেয়ে দেখি সেই নিকটতমারে
অজানার অতিদূর পারে।

[দূরের গান।

মূলত 'সানাই' প্রেমকাব্য। কিন্তু 'মহুয়া' যে অর্থে প্রেমকাব্য সে অর্থে নয়।

'মহুয়া'য় নিখিল নরনারীর চির-পুরাতন বিরহ-মিলন-কথাই কবিকণ্ঠে উদ্গীত হয়েছে। ব্যক্তি-পরিচ্ছেদ-বিগলিত সাধারণীকৃত মানবপ্রেমই 'মহুয়া'র উপজীব্য। কিন্তু 'সানাই'য়ের আটত্রিশটি কবিতা ও বাইশটি গানের অধিকাংশই কবির উত্তমপুরুষের অন্তরঙ্গ অনুরাগের কাব্যরূপ। সারাজীবন কবিমানসে যে প্রেম সংগুপ্ত ছিল, স্মৃতিসিন্ধু মন্থন করে তারই অমৃত শেষ বারের মত পরিবেষিত হল এই গ্রন্থে। এই দিক দিয়ে রবীন্দ্র-কাব্যলোকে 'সানাই' অদ্বিতীয় অতুলনীয়।

'সানাই'য়ের মানসী-প্রেমকে আমরা বলেছি স্মৃতিসিন্ধু মন্থনসঞ্জাত অমৃত। কবিজীবনের উত্তরার্ধে তাঁর প্রথম যৌবনের সেই অনুরাগ স্মরণ-সরণিতেই কবিমানসে বিলসিত হয়েছে। কিন্তু সেই স্মৃতি শুধু অতীতের পুনরুজ্জীবকই নয়, সে নবরূপের স্রষ্টাও বটে। রবীন্দ্র-জীবনীকার একটি অপূর্ব-সুন্দর উদ্ধৃতির সাহায্যে এর স্বরূপ বিশ্লেষণ করেছেন :—'Symbolic memory is the process by which man not only repeats his past experience but also reconstructs this experience. Imagination becomes a necessary element of true recollection.'[১]

কবি নিজেও বত্রিশ বৎসর বয়সে ইন্দিরা দেবীকে লেখা একখানি চিঠিতে [৩০ এপ্রিল ১৮৯৩] স্মৃতির এই জাদুমন্ত্রের কথা বলেছেন। কবি তখন জোড়াসাঁকোয় ছিলেন। ৩০ এপ্রিল মানে বৈশাখের প্রথমার্ধ। আকাশে ছিল চতুর্দশীর চাঁদ। রাত দশটায় নির্জন ছাতে একলা পড়ে পড়ে কবি সমস্ত জীবনের কথা ভাবছিলেন। সেই তেতলার ছাত, সেই জ্যোৎস্না, সেই দক্ষিণের বাতাস স্বভাবতই কবিকে স্মৃতিচারী করে তুলছিল। অর্ধেক চোখ বুজে কবি তাঁর ছেলেবেলাকার মনের ভাবগুলিকে মনে আনবার চেষ্টা করছিলেন। সেই অনুভূতিকে ভাষা দিয়ে তিনি লিখছেন, 'পুরোনো স্মৃতিগুলো মদের মতো—যত বেশিদিন মনের মধ্যে সঞ্চিত হয়ে থাকে, ততই তার বর্ণ এবং স্বাদ এবং নেশা যেন মধুর হয়ে আসে। আমাদের এই স্মৃতির বোতলগুলি বুড়ো বয়সের জন্যে in deep-delved earth ঠাণ্ডা করে রেখে দেওয়া যাচ্ছে—তখন বোধ হয় ছাতের উপর জ্যোৎস্না-রাতে এক এক ফোঁটা করে আস্বাদ করতে বেশ লাগবে। * * * তখন জ্যোৎস্নারাত্রের স্থির

জলাশয়ের মতো আমাদের অচঞ্চল মনে পূর্বস্মৃতির ছায়া এমনি পরিষ্কার স্পষ্টভাবে পড়ে যে বর্তমান ব্যাপারের সঙ্গে তার প্রভেদ বোঝা শক্ত।'[৫]

কবিমানসে এই 'Symbolic memory'র সৃষ্টিক্রিয়া অতীত বর্তমানের প্রভেদ বিলুপ্ত করে দিয়েছে। কালপ্রবাহ নিত্যবর্তমানের রূপ নিয়ে দেখা দিয়েছে।

২

রবীন্দ্রনাথের এই শেষ প্রেমকাব্য, মানসীর উদ্দেশ্যে তাঁর এই শেষ 'পুষ্পাঞ্জলি'র 'সানাই' নামকরণটি বিশেষ তাৎপর্যমণ্ডিত। কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুর পর থেকে কবিমানসে বাঁশি বা সানাই বা নহবতের আবেদন বার-বার বিচিত্রভাবে ক্রিয়াশীল হয়েছে। দ্বাদশ অধ্যায়ে ১৩৩০ সালের ফাল্গুন মাসে বিবাহ-বাসর থেকে ভেসে-আসা সানাইয়ের সুর কি ভাবে "উৎসবের দিন", "গানের সাজি", "লীলাসঙ্গিনী", "শেষ অর্ঘ্য", "বেঠিক পথের পথিক", ও "বকুল-বনের পাখি"—'পুরবী'র এই একগুচ্ছ কবিতার জন্ম দিয়েছিল তার কথা বলা হয়েছে। "উৎসবের দিনে" সানাইয়ের সুর শুনে কবির মনে হয়েছে :

অশ্রুর অশ্রুতধ্বনি ফাল্গুনের মর্মে করে বাস,
দূর বিরহের দীর্ঘশ্বাস।

এই প্রসঙ্গে পুনশ্চ মনে পড়বে 'লিপিকা'র "মেঘদূত" ও "বাঁশি"র কথা। সেখানে কবি বলেছেন :

মিলনের প্রথম দিনে বাঁশি কী বলেছিল।

সে বলেছিল, "সেই মানুষ আমার কাছে এল যে মানুষ আমার দূরের।"

আর, বাঁশি বলেছিল, "ধরলেও যাকে ধরা যায় না তাকে ধরেছি, পেলেও সকল পাওয়াকে যে ছাড়িয়ে যায় তাকে পাওয়া গেল।"

["মেঘদূত", লিপিকা।

বাঁশির বাণী চিরদিনের বাণী—শিবের জটা থেকে গঙ্গার ধারা, প্রতিদিনের মাটির বুকে বয়ে চলেছে; অমরাবতীর শিশু নেমে এল মর্ত্যের ধূলি নিয়ে স্বর্গ-স্বর্গ খেলতে।

* * *

গানের সুর সংসারের উপর থেকে এই-সমস্ত চেনা কথার পর্দা একটানে ছিঁড়ে ফেলে দিলে। চিরদিনকার বর-কনের শুভদৃষ্টি হচ্ছে কোন্ রক্তাংশুকের সলজ্জ অবগুণ্ঠনতলে, তাই তার তানে তানে প্রকাশ হয়ে পড়ল।

যখন সেখানকার মালাবদলের গান বাঁশিতে বেজে উঠল তখন এখানকার এই কনেটির দিকে চেয়ে দেখলেম; তার গলায় সোনার হার, তার পায়ে দুগাছি মল, সে যেন কান্নার সরোবরে আনন্দের পদ্মটির উপর দাঁড়িয়ে।

সুরের ভিতর দিয়ে তাকে সংসারের মানুষ বলে আর চেনা গেল না। সেই চেনা ঘরের মেয়ে অচিন ঘরের বউ হয়ে দেখা দিলে।

বাঁশি বলে, এই কথাই সত্য।

"বাঁশি," লিপিকা।

উদ্ধৃত অংশে "শিবের জটা থেকে গঙ্গার ধারা" আর "কান্নার সরোবরে আনন্দের পদ্ম"—এই দুটি রূপকল্প বংশীধ্বনি ও তার আবেদনের নূতন ব্যঞ্জনা বহন করে এনেছে।

'ছিন্নপত্রাবলী'র ২১০ ও ২১১—এই দুখানি পত্রেও স্মৃতির সঙ্গে বাঁশির বা নহবতের সুরের সম্পর্কের কথা কবি বলেছেন অন্তরঙ্গতর ভাষায়। এই পত্র দুখানি ১৮৯৫ সনের বৈশাখ মাসে জোড়াসাঁকো থেকে লেখা। দ্বিতীয় পত্রে লিখছেন, 'আজ কোথা থেকে একটা নহবৎ শোনা যাচ্ছে। সকাল-বেলাকার নহবতে মনটা বড়ই ব্যাকুল করে তোলে। * * * সংগীত তার নিজের ভিতরকার সুন্দর সামঞ্জস্যের দ্বারা মুহূর্তের মধ্যে যেন কী এক মোহমন্ত্রে সমস্ত সংসারটিকে এমন একটি পারস্‌পেক্‌টিভের মধ্যে দাঁড় করায় যেখানে ওর ক্ষুদ্র ক্ষণস্থায়ী অসামঞ্জস্যগুলো আর চোখে পড়ে না—* * * সৌন্দর্যমাত্রেই আমাদের মনে অনিত্যের সঙ্গে নিত্যের একটা বিরোধ বাধিয়ে দিয়ে অকারণ বেদনার সৃষ্টি করে।'*

২১০-সংখ্যক পত্রখানি কবিমানসে স্মৃতি ও সুরের যুগ্ম-লীলাকে আরো ঘনিষ্ঠভাবে উন্মীলিত করেছে। কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুদিনের কাছাকাছি কোন একটি মুহূর্তের "অকারণ চঞ্চলতা" এই পত্রে ধরা পড়েছে। সেদিন [১৮৯৫ সনের ২৪ এপ্রিল] সকালবেলা থেকে সুগভীর আলস্যে কবিকে

আক্রমণ করেছে। জোড়াসাঁকোর দোতলার নির্জন ঘর এবং বারান্দায় তিনি অকর্মণ্যভাবে কেবলই ঘুরঘুর করে বেড়িয়েছেন। শরীরের সমস্ত সন্ধিগুলো যেন শিথিল হয়ে পড়েছিল। দেখতে দেখতে সমস্ত আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে এসে গুর্‌গুর্‌ করে মেঘ ডাকতে লাগল। মধ্যাহ্নটি স্নিগ্ধ ছায়াচ্ছন্ন হয়ে চারদিকে খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে এল। কবির মনের ভিতরটা একটা অকারণ চঞ্চলতায় বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল—তার হাতে যে কাজই দেওয়া যায় সে সমস্তই ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলতে লাগল। কবি লিখছেন :

'মাসের মধ্যে উনত্রিশ দিন সে ছোটখাটো উপস্থিত কাজ নিয়ে বেশ চালিয়ে দেয়, কোনো গোল করে না—হঠাৎ ত্রিশ দিনের দিন সে-সমস্ত কাজে সে পদাঘাত করতে থাকে। বলে, 'আমাকে এমন একটা-কিছু দাও যা খুব মস্ত—যাতে আমার সমস্ত দিনরাত্রি, সমস্ত ছোটো বড়ো, সমস্ত ভূত-ভবিষ্যৎ একেবারে গ্রাস করে ফেলতে পারে।' * * * মানুষের যথার্থ স্বাভাবিক অবস্থাই হচ্ছে সেই একটি প্রবল নিষ্ঠার মধ্যে আপনার সমস্ত জীবনকে ঐক্যবন্ধনে বদ্ধ করবার ইচ্ছা। * * * সেই জন্যেই প্রতিদিন সমাজের মধ্যে থেকে, এক-একদিন মনে হয়—

'আমায় বাঁশিতে ডেকেছে কে !'[৪]

ভ্রাতুষ্পুত্রীকে লেখা এই পত্রে আত্মমানসের গোপন রহস্যকে যতটা উন্মীলন করা সম্ভব কবি ততটা করেছেন। "একটি প্রবল নিষ্ঠার মধ্যে আপনার সমস্ত জীবনকে ঐক্যবন্ধনে বদ্ধ করবার ইচ্ছা।"—এই বাক্যটি যেন কবিমানস সম্পর্কে একটি দিব্য নির্দেশ। চৌত্রিশ বৎসর বয়সে উচ্চারিত এই ইচ্ছাই তো কবির সারাজীবনব্যাপী স্বপ্ন ও সাধনার মর্মবাণী। এই ডাককেই তো কবি বলেছেন বাঁশির ডাক।

'সানাই'য়ের কেন্দ্রগত কবিতাগুচ্ছ রচনার মূলেও রয়েছে ওই বাঁশির ডাক। এই সংকলনের বহু কবিতা ও গান ১৯৪০ সনের জানুয়ারি মাসে লেখা। রথীন্দ্রনাথের পালিতা কন্যা নন্দিনীর বিবাহ হয় ১৯৩৯ সনের ৩০ ডিসেম্বর। নন্দিনীর [ডাকনাম পুপে] পিতা চতুর্ভুজ ছিলেন কচ্ছদেশীয় জনৈক বণিক। তিনি কিছুদিন শান্তিনিকেতনে সপরিবারে বাস করতে আসেন। তাঁর স্ত্রী ছিলেন উন্মাদ-রোগগ্রস্তা। রথীন্দ্রনাথের পত্নী প্রতিমা দেবী চতুর্ভুজের শিশুকন্যা পুপেকে নিজের কাছে নিয়ে নিজের মেয়ের মতই

লালনপালন করন। পুপেও ছেলেবেলা থেকে প্রতিমা দেবীকেই নিজের গর্ভধারিণী জননী বলে জানতেন। মীরা দেবীর মেয়ে নন্দিতা আর রথীন্দ্রনাথের এই পালিতা কন্যা নন্দিনী—কবির এই দুই নাতনী তাঁর শেষজীবনের অপরিসীম স্নেহের পাত্রী ছিলেন। নন্দিনীর বিবাহ হয় বম্বের অজিত সিং মোরারজি খাটাউয়ের সঙ্গে। বিবাহোৎসবে বিপুল আড়ম্বর হয়েছিল। কবি তখন ছিলেন 'উদীচী' নামে নূতন বাড়িতে। বিবাহের উচ্ছলিত কলকোলাহলের মধ্যে ভেসে আসছিল আলিহোসেনের সানাইয়ের সুর। এই সুরের জাদুমন্ত্রই জন্ম দিল পাঁচদিন পরে, চৌঠো জানুয়ারি তারিখে লেখা, 'সানাই'য়ের নামকবিতার। সমস্ত ছন্দভাঙা অসংগতির মধ্যে সানাই লাগাল তার সারঙের তান। এক নিবিড় ঐক্যমন্ত্রে সমস্ত বাঁধা পড়ল। কবি লিখছেন :

অরূপের মর্ম হতে সমুচ্ছ্বাসি
উৎসবের মধুচ্ছন্দ বিস্তারিছে বাঁশি।
সন্ধ্যাতারা-জ্বালা অন্ধকারে
অনন্তের বিরাট পরশ যথা অন্তর-মাঝারে,
তেমনি সুদূর স্বচ্ছ সুর
গভীর মধুর
অমর্ত লোকের কোন্ বাক্যের অতীত সত্যবাণী
অন্যমনা ধরণীর কানে দেয় আনি।
নামিতে নামিতে এই আনন্দের ধারা
বেদনার মূর্ছনায় হয় আত্মহারা।

কবিতার উপসংহারে কবির অন্তরঙ্গ আত্মকথাটিও নির্বারিত হয়েছে। কবি বলছেন :

এই সুর প্রত্যহের অবরোধ-'পরে
যতবার গভীর আঘাত করে
ততবার ধীরে ধীরে কিছু কিছু খুলে দিয়ে যায়,
ভাবী যুগ-আরম্ভের অজানা পর্যায়।
নিকটের দুঃখদ্বন্দ্ব নিকটের অপূর্ণতা তাই
সব ভুলে যাই,

মন যেন ফিরে
সেই অলক্ষ্যের তীরে তীরে
যেথাকার রাত্রিদিন দিনহারা রাতে
পদ্মের কোরকসম প্রচ্ছন্ন রয়েছে আপনাতে।

সানাইয়ের সুর কবির মনকে নিয়ে গেছে সেই অলক্ষ্যের তীরে তীরে যেখানকার রাত্রিদিন "দিনহারা রাতে পদ্মের কোরকসম প্রচ্ছন্ন রয়েছে আপনাতে।" 'সানাই'য়ের প্রেমের কবিতাগুলিতে রয়েছে 'আপনাতে প্রচ্ছন্ন' রাত্রিদিনের পদ্মকলির মতো উন্মীলন-লীলা।

৩

১৯৪০ সনের জানুয়ারি মাসে লেখা রচনাগুলি এখানে পর পর সাজিয়ে দেওয়া গেল। ৪ জানুয়ারি—সানাই। ১০ জানুয়ারি—পূর্ণা, দেওয়া-নেওয়া, রূপকথায়, আহ্বান। ১১ জানুয়ারি—শেষবেলা। ১২ জানুয়ারি—শেষ দৃষ্টি। ১৩ জানুয়ারি—অনাবৃষ্টি, নতুন রঙ, গানের খেয়া, অধরা, ব্যথিতা। ১৫ জানুয়ারি—জানালায়, ক্ষণিক, দ্বিধা, আধোজাগা। ২১ জানুয়ারি—বিপ্লব। ২৮ জানুয়ারি—রূপ-বিরূপ, কর্ণধার।

লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে ১০, ১৩ ও ১৫ জানুয়ারি এই তিন দিন কবি চার পাঁচটা করে কবিতা লিখেছেন। জানুয়ারির এই দিনগুলিতে কাব্যরচনার যেন জোয়ার এসেছিল। 'সানাই' গ্রন্থের ছোট ছোট রচনাগুলির একটা বৈশিষ্ট্য চোখে পড়বে। এইগুলি প্রায় গানের রূপ নিয়েই জন্মগ্রহণ করেছে। 'সানাই'য়ের এই রচনাগুলিকে নূতন নামে বিশেষিত করে বলা যেতে পারে—গীতিকল্প কবিতা। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, সর্বদা কবিতা থেকেই গানের রূপান্তর হয় নি। কোথাও বা গান রচিত হয়েছে আগে, কোথাও বা কবিতা। এই প্রসঙ্গে 'সানাই'য়ের গীতিকল্প কবিতাগুলির সঙ্গে 'গীতিবিতানে'র গানগুলির তুলনা করা যেতে পারে :

১। "পূর্ণা" কবিতা :

তুমি গো পঞ্চদশী
শুক্লা নিশার অভিসারপথে
চরম তিথির শশী।

গীতবিতানের গীতিরূপ :

ওগো তুমি পঞ্চদশী, পৌঁছিলে পূর্ণিমাতে।

[প্রকৃতি ১১৫, গীতিবিতান পৃ° ৪৮১।

২। "দেওয়া-নেওয়া" কবিতা :

বাদল দিনের প্রথম কদমফুল
আমায় করেছ দান,
আমি তো দিয়েছি ভরা শ্রাবণের
মেঘমল্লারগান।

গীতবিতানের রূপ :

বাদল-দিনের প্রথম কদমফুল করেছ দান ;
আমি দিতে এসেছি শ্রাবণের গান।

[প্রকৃতি ১০১, পৃ° ৪৭৫।

৩। "রূপকথায়" কবিতা :

কোথাও আমার হারিয়ে যাবার নেই মানা
মনে মনে।
মেলে দিলেম গানের সুরের এই ডানা
মনে মনে।

গীতবিতানের রূপ :

অপরিবর্তিত :

[নাট্যগীতি—১০০, পৃ° ৮০৩।

৪। "আহ্বান" কবিতা :

জ্বেলে দিয়ে যাও সন্ধ্যাপ্রদীপ
বিজন ঘরের কোণে।
নামিল শ্রাবণ, কালো ছায়া তার
ঘনাইল বনে বনে।

গীতবিতানের রূপ :

এসো গো, জ্বেলে দিয়ে যাও প্রদীপখানি
বিজন ঘরের কোণে, এসো গো।

[প্রকৃতি ১০৩ পৃ° ৪৭৬।

৫। "অনাবৃষ্টি" কবিতা :

প্রাণের সাধন কবে নিবেদন
করেছি চরণতলে,
অভিষেক তার হল না তোমার
করুণ নয়নজলে।

গীতবিতানের রূপ :

মম দুঃখের সাধন যবে করিনু নিবেদন
তব চরণতলে,
শুভলগন গেল চলে,
প্রেমের অভিষেক কেন হল না তব নয়নজলে॥
[প্রেম—১৯৮, পৃ° ৩৬১।

৬। "নতুন রঙ" কবিতা :

এ ধূসর জীবনের গোধূলি,
ক্ষীণ তার উদাসীন স্মৃতি,
মুছে-আসা সেই ম্লান ছবিতে
রঙ দেয় গুঞ্জনগীতি।

গীতবিতানের দুটি রূপ :

(ক) ধূসর জীবনের গোধূলিতে
ক্লান্ত আলোয় ম্লান স্মৃতি।
সেই সুরের কায়া মোর
সাথের সাথি,
স্বপ্নের সঙ্গিনী।
[প্রেম—২০৯, পৃ° ৩৬৫।

(খ) ধূসর জীবনের গোধূলিতে
ক্লান্ত মলিন যেই স্মৃতি
মুছে-আসা সেই ছবিটিতে
রঙ এঁকে দেয় মোর গীতি।
[প্রেম—২২৯, পৃ° ৩৭৪।

৭। "গানের খেয়া" কবিতা :

যে গান আমি গাই
জানি নে সে
কার উদ্দেশে।

গীতবিতানের রূপ :

আমি যে গান গাই
জানি নে সে কার উদ্দেশে।

[প্রেম—২০৪, পৃ° ৩৬৩।

৮। "অধরা" কবিতা :

অধরা মাধুরী ধরা পড়িয়াছে
এ মোর ছন্দবন্ধনে।
বলাকাপাঁতির পিছিয়ে-পড়া ও পাখি,
বাসা সুদূরের বনের প্রাঙ্গণে।

গীতবিতানের রূপ :

অধরা মাধুরী ধরেছি ছন্দবন্ধনে।
ও যে সুদূর প্রাতের পাখি
গাহে সুদূর রাতের গান॥

[প্রেম—২০৩, পৃ° ৩৬৩।

৯। "ব্যথিতা" কবিতা :

জাগায়ো না, ওরে জাগায়ো না।
ও আজি মেনেছে হার
ক্রূর বিধাতার কাছে।
সব চাওয়া ও যে দিতে চায় নিঃশেষে
অতলে জলাঞ্জলি।

গীতবিতানের রূপ :

ওরে জাগায়ো না,
ও যে বিরাম মাগে
নির্মম ভাগ্যের পায়ে
ও যে সব চাওয়া দিতে চাহে
অতলে জলাঞ্জলি।

[প্রেম—২০৭, পৃ° ৩৬৪

১০। "কৃপণা" কবিতা :

এসেছিনু দ্বারে ঘনবর্ষণ রাতে,
প্রদীপ নিবালে কেন অঞ্চলঘাতে।

গীতবিতানের রূপ :

এসেছিনু দ্বারে তব শ্রাবণরাতে,
প্রদীপ নিবালে কেন অঞ্চলঘাতে

[প্রকৃতি ১০৯, পৃ° ৪৭৮।

১১। "দ্বিধা" কবিতা :

এসেছিলে তবু আস নাই, তাই
জানায়ে গেলে
সমুখের পথে পলাতকা
পদ-পতন ফেলে।

গীতবিতানের রূপ :

এসেছিলে তবু আস নাই জানায়ে গেলে
সমুখের পথ দিয়ে পলাতকা ছায়া ফেলে।

[প্রকৃতি ১০৮, পৃ° ৪৭৮।

১২। "আধোজাগা" কবিতা :

রাত্রে কখন মনে হল যেন
ঘা দিলে আমার দ্বারে,
জানি নাই আমি জানি নাই, তুমি
স্বপ্নের পরপারে।

গীতবিতানের রূপ :

স্বপ্নে আমার মনে হল
কখন ঘা দিলে আমার দ্বারে, হায়।
আমি জাগি নাই, জাগি নাই গো,
তুমি মিলালে অন্ধকারে, হায়॥

[প্রকৃতি ১০৬, পৃ° ৪৭৭।

এই বারোটি গীতিকল্প কবিতা শুধু ১৯৪ -এর জানুয়ারি মাসেই লেখা। তা ছাড়া 'সানাই'য়ের ১৯৩৮-৩৯-৪০ সনের মধ্যে লেখা অনুরূপ যে সব রচনা

আছে সেগুলি হল : "বিদায়" [গীতবিতানে—বসন্ত সে যায় তো হেসে, যাবার কালে], "যাবার আগে" [এই উদাসী হাওয়ার পথে পথে], "ছায়া ছবি" [আমার প্রিয়ার ছায়া], "উদ্‌বৃত্ত" [যদি হায় জীবন পূরণ নাই হল], "ভাঙন" [তুমি কোন ভাঙনের পথে এলে সুপ্তরাতে], "গানের জাল" [দৈবে তুমি কখন নেশায় পেয়ে], "মরিয়া" [আজি মেঘ কেটে গেছে সকাল বেলায়], "গান" [যে ছিল আমার স্বপনচারিণী], "বাণীহারা" [বাণী মোর নাহি] এবং "আত্মছলনা" [দোষী করিব না, করিব না তোমারে]।

এই গীতিকল্প কবিতাগুলির বিষয়ালম্বন প্রেম; আশ্রয় কবিমানসী। কবি একদিন তাঁর কণ্ঠের গানকে বলেছিলেন তাঁর 'শেষ পারানির কড়ি'। বলেছিলেন :

গানের ভিতর দিয়ে যখন দেখি ভুবন খানি।
তখন তারে চিনি, আমি তখন তারে জানি।

প্রেমের লীলায় আরো অন্তরঙ্গ সুরে শুনিয়েছিলেন :

দাঁড়িয়ে আছ তুমি আমার গানের ওপারে।
আমার সুরগুলি পায় চরণ,
আমি পাইনে তোমারে ॥
বাতাস বহে মরি মরি,
আর বেঁধে রেখো না তরী,
এসো এসো পার হয়ে মোর হৃদয়-মাঝারে ॥

কবি তাঁর জীবন-গোধূলিতে এই গানের সুরেই প্রেমের শেষপূজা সাঙ্গ করলেন। কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুর অব্যবহিত পরে তরুণ কবির হৃদয়বেদনা ভাষা পেয়েছিল 'পুষ্পাঞ্জলি'তে। তাঁর প্রতি সারাজীবনব্যাপী অনুরাগের সর্বশেষ পর্যায়ে গানই হল তাঁর আত্মপ্রকাশের অন্তিম বাহন। কবি সারাজীবন যে প্রেমের সংগীত রচনা করেছেন তার মধ্যে কোথায় কি ভাবে তাঁর মানসলক্ষ্মীর প্রতি হৃদয়ানুরাগ অনুরণিত হয়েছে তা বিস্তৃত আলোচনার অপেক্ষায় রইল। কিন্তু 'সানাই'য়ের এই রচনাগুলি প্রেমের মন্দিরে ভক্তপ্রেমিকের শেষ গীতি-পুষ্পাঞ্জলি।

৪

'সানাই'কে আমরা সাধারণভাবে বলেছি কবির শেষ প্রেমকাব্য। কবিমানসের প্রেমের বিচিত্র লীলা ওর মধ্যে ধরা দিয়েছে। স্মৃতিচারণ থেকে আরম্ভ করে অতীত বর্তমানের বিভেদ লুপ্ত করা নিত্যনবায়মান অনুরাগের কত মধুর ভাবানুষঙ্গ এই কবিতাগুলিকে মধুস্বাদী করে রেখেছে! প্রেম সম্পর্কে কবির ভাবনা ও উপলব্ধি কখনো অন্তরঙ্গ আত্মকথায়, কখনো নির্বিশেষ নৈর্ব্যক্তিকতায়, কখনো উত্তমপুরুষের স্বগতোক্তিতে, কখনো কাহিনী-রূপের ঈষৎ-প্রগল্‌ভতায় প্রসাধিত হয়েছে। এই কাব্যগ্রন্থেই কবি শেষবারের মত ধ্বনিপ্রধান ছন্দে গীতিকাব্য-সংগীতের শেষসপ্তকে সুরসৃষ্টি করলেন। কবির বাণীসাধনা যেখানে কাব্য-সংগীতের চরমোৎকর্ষকে স্পর্শ করেছে সেই শ্রেণীর কয়েকটি অবিস্মরণীয় রচনা এই কাব্যগ্রন্থে শেষবারের মতো সহৃদয় পাঠক খুঁজে পাবেন। ইতস্তত-আহরণ-করা দু-একটি উদাহরণ এখানে সংকলিত হল :

করুণ ধৈর্যে গনে না দিবস,
সহে না পলেক গৌণ,
তাপসের তপ করে না মান্য,
ভাঙে সে মুনির মৌন।
মৃত্যুরে দেয় টিটকারি তার হাস্যে,
মঞ্জীরে বাজে যে-ছন্দ তার লাস্যে
নহে মন্দাক্রান্তা—
প্রদীপ লুকায়ে শঙ্কিত পায়ে
চলে না কোমলকান্তা

["অধীরা"]

ঘুমের ঘোরেতে পেয়েছি তাহার
রুক্ষ চুলের গন্ধ।
আধেক রাত্রে শুনি যেন তার—
দ্বার-খোলা, দ্বার-বন্ধ।
নীপবন হতে সৌরভে আনে
ভাষাবিহীনার ভাষ্য।

জোনাকি আঁধারে ছড়াছড়ি করে
মণিহার-ছেঁড়া হাস্য।

* * *

তারার আলোকে ভরে সেই সাকী
মদিরোচ্ছল পাত্র,
নিবিড় রাতের মুগ্ধ মিলনে
নাই বিচ্ছেদ মাত্র।

["মানসী"]

পূর্ণ হয়েছে বিচ্ছেদ, যবে ভাবিনু মনে,
একা একা কোথা চলিতেছিলাম নিষ্কারণে।
শ্রাবণের মেঘ কালো হয়ে নামে বনের শিরে,
খর বিদ্যুৎ রাতের বক্ষ দিতেছে চিরে,
দূর হতে শুনি বারুণী নদীর তরল রব—
মন শুধু বলে, অসম্ভব এ অসম্ভব।

এমনি রাত্রে কতবার, মোর বাহুতে মাথা,
শুনেছিল সে যে কবির ছন্দে কাজরি-গাথা।
রিমিঝিমি ঘন বর্ষণে বন রোমাঞ্চিত,
দেহে আর মনে এক হয়ে গেছে যে-বাঞ্ছিত
এল সেই রাতি বহি শ্রাবণের সে-বৈভব—
মন শুধু বলে, অসম্ভব এ অসম্ভব।

দূরে চলে যাই নিবিড় রাতের অন্ধকারে,
আকাশের সুর বাজিছে শিরায় বৃষ্টিধারে।
যূথীবন হতে বাতাসেতে আসে সুধার স্বাদ,
বেণীবাঁধনের মালায় পেতেম যে-সংবাদ
এই তো জেগেছে নবমালতীর সে-সৌরভ—
মন শুধু বলে, অসম্ভব এ অসম্ভব।

["[illegible]"]

৫

গোধূলিলগ্নের অতুলনীয় প্রেমকাব্য হিসাবে একদিকে যেমন 'সানাই'য়ের গুরুত্ব, অন্যদিকে তেমনি কবিমানসী সম্পর্কে কবিচেতনার বিচিত্র স্তরের কাব্য-রূপায়ণ হিসাবেও তার মূল্য অপরিসীম। দ্বাদশ অধ্যায়ে 'চিত্রা' কাব্যের একদিকে "স্নেহস্মৃতি" [সেই চাঁপা, সেই বেলফুল], "নববর্ষে", "দুঃসময়", "মৃত্যুর পরে" প্রভৃতি কবিতা এবং অন্যদিকে "অন্তর্যামী", "জীবনদেবতা" প্রভৃতি কবিতার প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশ করে আমরা বলেছিলাম, প্রথম স্তরের কবিতাগুলি ব্যক্তিসীমার প্রাকৃত জগতে থেকে কবির নিঃসঙ্গ মুহূর্তের স্বগতোক্তির মতোই উচ্চারিত। আর দ্বিতীয় স্তরের কবিতাগুলি অসীমের কোটিতে উন্নীত হয়ে মানসসুন্দরী-অন্তর্যামী-জীবনদেবতার স্তবগান। কবিচেতনায় প্রেমতত্ত্ব ও জীবনদেবতাতত্ত্বের এই যুগ্মবেণীর লীলাবিলসন প্রসঙ্গে প্রথম পরিচ্ছেদে আমরা বলেছি, এক পাত্রে পরিবেশিত হয়েছে প্রেম, অন্য পাত্রে লীলারস। একটি ব্যক্তিসীমার জগতে দাঁড়িয়ে প্রাকৃত ভাষায় কথা, আর একটি বিশ্বাত্মবোধে প্রবুদ্ধ হয়ে অসীমের দিকে তাকিয়ে রসতত্ত্বের গান।

কবিচেতনার এই বিচিত্র স্তরকে 'চিত্রা' কাব্যগ্রন্থের নামকবিতার আলোকেও বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। সেখানে বিশ্বের দিকে তাকিয়ে কবি বলছেন :

জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে
তুমি বিচিত্ররূপিণী।

আর অন্তরের দিকে তাকিয়ে বলছেন :

অন্তর মাঝে তুমি শুধু একা একাকী
তুমি অন্তরবাসিনী।

এই কবিতার উপলব্ধি অনুসারে বলা যায় অন্তর্লোকে ও বিশ্বলোকে কবিমানসীর ভিন্ন রূপ, ভিন্ন মূর্তি। 'চিত্রা'য় বিশ্বলোকের বিচিত্ররূপিণীকে ধ্যান করে কবি বলেছিলেন :

অযুত আলোকে ঝলসিছ নীল গগনে,
আকুল পুলকে উলসিছ ফুল-কাননে,

দ্যুলোক ভূলোকে বিলসিছ চল-চরণে,
তুমি চঞ্চলগামিনী।
মুখর নূপুর বাজিছে সুদূর আকাশে,
অলকগন্ধ উড়িছে মন্দ বাতাসে,
মধুর নৃত্যে নিখিল চিত্তে বিকাশে
কত মঞ্জুল রাগিণী।

'পত্রপুটে'র পনেরো-সংখ্যক কবিতায় এই বিশ্বময়ীকেই আবার দেখেছেন "ইতিহাসের সৃষ্টি-আসনে বিধাতার বামপাশে।" "সুন্দর যখন অবমানিত কদর্য কঠোরের অশুচি স্পর্শে তখন সেই রুদ্রাণীর তৃতীয় নেত্র থেকে বিচ্ছুরিত হয়েছে প্রলয়-অগ্নি, ধ্বংস করেছে মহামারীর গোপন আশ্রয়।" 'সানাই'য়ের "বিপ্লব" এবং "শেষ অভিসার" কবিতা দুটিতে এই রুদ্রাণী-রূপেরই প্রকাশ। "বিপ্লব" রচনার তারিখ ২১ জানুয়ারি ১৯৪০, আর "শেষ অভিসার" লেখা হয় ২৩ এপ্রিল ১৯৪০। তখন পৃথিবী জুড়ে দ্বিতীয়-মহাযুদ্ধের তাণ্ডব চলছে। "বিপ্লবে"র অন্তিম যুগ্মকে কবি বলছেন:

বেজে ওঠে ডঙ্কা, শঙ্কা শিহরায় নিশীথগগনে—
হে নির্দয়া, কী সংকেত বিচ্ছুরিল স্খলিত কঙ্কণে।

এই কবিতার একটি সংক্ষিপ্ত পূর্বপাঠ পাণ্ডুলিপিতে রয়েছে। তার নাম "নির্দয়া"।[৫] দুটি রচনার মধ্যে ব্যবধান এক সপ্তাহের। এই "নির্দয়া" "নর্তিনী"ই যে একদিন কবির রহঃসখী ছিলেন সে কথা কবিতায় অস্পষ্ট নেই। কবি বলছেন:

মাঝে মাঝে কটুস্বাদ দুখে
তীব্র রস দিতে ঢালি রজনীর অনিদ্র কৌতুকে
যবে তুমি ছিলে রহঃসখী।
প্রেমেরি সে দানখানি, সে যেন কেতকী
রক্তরেখা এঁকে গায়ে
রক্তস্রোতে মধুগন্ধ দিয়েছে মিশায়ে।
আজ তব নিঃশব্দ নীরস হাস্যবাণ
আমার ব্যথার কেন্দ্র করিছে সন্ধান।

বিগত দিনের এই "রহঃসখী," আজকের এই "নির্দয়া" "নর্তিনী"ই যে কবির

অন্তর্যামী জীবনদেবতা তার একটি অভ্রান্ত সাক্ষ্য পাওয়া যাবে উদ্ধৃত অংশের সঙ্গে "অন্তর্যামী"র অন্তিম স্তবকান্তের তুলনায়। সেখানে কবি বলেছিলেন :

এবারের মতো পুরিয়া পরান
তীব্র বেদনা করিয়াছি পান ;
সে-সুরা তরল অগ্নিসমান
তুমি ঢালিতেছ বুঝি।
আবার এমনি বেদনার মাঝে
তোমারে ফিবিব খুঁজি।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বিশ্বজোড়া বেদনার মাঝেই কবি জীবনগোধূলিতে আবার খুঁজে পেলেন তাঁর জীবনদেবতাকেই।

"শেষ অভিসার" কবিতার মধ্যেও মসীপুঞ্জ মেঘপূর্ণ ঈশানকোণের দুর্যোগের ভূমিকায় তাঁরই আবির্ভাব। "শেষ অভিসারে"র সঙ্গে "শেষ হিসাব" [রচনা ডিসেম্বর ১৯৩৮], "শেষ বেলা" [১১ জানুয়ারি ১৯৪০], "শেষদৃষ্টি" [১২ জানুয়ারি ১৯৪০] এবং "শেষ কথা" [৪ এপ্রিল ১৯৪০] এই চারটি কবিতাও স্মরণীয়। এই কবিতাচতুষ্টয় সংকলিত হয়েছে 'নবজাতক' গ্রন্থে। কিন্তু এগুলির সুরের মিল 'সানাই'য়ের সঙ্গেই। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে "শেষ হিসাব", "শেষ বেলা", "শেষদৃষ্টি", "শেষ কথা", "শেষ অভিসার" —পাঁচটি কবিতায়ই "শেষে"র সুর বেজে উঠেছে। কবিজীবনের এই শেষের কথাটি কী, তার নিঃশেষ পরিচয় পাওয়া যাবে এই কবিতাপঞ্চকে। "শেষ হিসাবে" কবি বলছেন :

আর যা-কিছু জুটেছিল
না চাহিতেই পাওয়া—
আজকে তারা ঝুলিতে নেই,
রাত্রিদিনের হাওয়া
ভরল তারাই, দিল তারা
পথে চলার মানে,
রইল তারাই একতারাতে
তোমার গানে গানে।

"শেষ বেলায়" বলছেন :

জীবনের রস আজ মজ্জায় বহে,
বাহিরে প্রকাশ তার নহে।
অন্তরবিধাতার সৃষ্টিনিদেশে
যে অতীত পরিচিত সে নূতন বেশে
সাজবদলের কাজে ভিতরে লুকালো—
বাহিরে নিবিল দীপ, অন্তরে দেখা যায় আলো।
* * *
যত বেড়ে ওঠে রাতি
সত্য যা সেদিনের উজ্জ্বল হয় তার ভাতি।
এই কথা ধ্রুব জেনে, নিভৃতে লুকায়ে
সারা জীবনের ঋণ একে একে দিতেছি চুকায়ে।

"শেষদৃষ্টি"তে কবি বলছেন :

একদা জীবনে সুখের শিহর
নিখিল করেছে প্রিয়।
মরণপরশে আজি কুণ্ঠিত
অন্তরালে সে অবগুণ্ঠিত,
অদেখা আলোকে তাকে দেখা যায়
কী অনির্বচনীয়।
যা গিয়েছে তার অধরারূপের
অলথ পরশখানি
যা রয়েছে তারি তারে বাঁধে সুর,
দিক্‌সীমানার পারের সুদূর
কালের অতীত ভাষার অতীত
শুনায় দৈববাণী।

"শেষ কথা" কবিতায় পাই :

বিলয়বিলীন দিনশেষে
ফিরিয়া দাঁড়াও এসে
যে ছিলে গোপনচর
জীবনের অন্তরতর।
* * *

কাছের দেখায় দেখা পূর্ণ হয় নাই,
মনে-মনে ভাবি তাই—
বিচ্ছেদের দূরদিগন্তের ভূমিকায়
পরিপূর্ণ দেখা দিবে অস্তরবিরশ্মির রেখায়।
জানি না, বুঝিব কিনা প্রলয়ের সীমায় সীমায়
শুভ্রে আর কালিমায়
কেন এই আসা আর যাওয়া,
কেন হারাবার লাগি এতখানি পাওয়া।

"শেষ অভিসারে" "গোপনচর জীবনের অন্তরতর"কেই সম্বোধন করে কবি বলছেন :

দুর্যোগের ভূমিকায় তুমি আজ কোথা হতে এলে
এলোচুলে অতীতের বনগন্ধ মেলে।
জন্মের আরম্ভপ্রান্তে আর-একদিন
এসেছিলে অম্লান নবীন
বসন্তের প্রথম দূতিকা,
এনেছিলে আষাঢ়ের প্রথম যূথিকা
অনির্বচনীয় তুমি।
মর্মতলে উঠিলে কুসুমি
অসীম বিস্ময়-মাঝে, নাহি জানি এলে কোথা হতে
অদৃশ্য আলোক হতে দৃষ্টির আলোতে।

কবি বলছেন, "বসন্তের প্রথম দূতিকা" সেই তুমিই তেমনি রহস্যপথে আজ এসেছ শেষ অভিসারে। যে পথ বেয়ে তুমি আসছ সেদিনের সেই চেনা পথের রেখা আজ কোথাও বা ক্ষীণ, "কোথাও চিহ্নের সূত্র লেশমাত্র নাহি যায় দেখা।" ডালিতে যে স্মৃত-বিস্মৃত ফুল এনেছ তার কিছু পরিচিত, কিছু-বা অপরিচিত।

জীবনের এই শেষ অভিসারে লীলাসঙ্গিনীর কাছে কবির কী প্রার্থনা? তিনি বলছেন :

হে দূতী, এনেছ আজ গন্ধে তব যে ঋতুর বাণী
নাম তার নাহি জানি।

মৃত্যু-অন্ধকারময়
পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে আসন্ন তাহার পরিচয়।
তারি বরমাল্যখানি পরাইয়া দাও মোর গলে
স্তিমিতনক্ষত্র এই নীরবের সভাঙ্গনতলে;
এই তব শেষ অভিসারে
ধরণীর পারে
মিলন ঘটায়ে যাও অজানার সাথে
অন্তহীন রাতে।

৬

"শেষ অভিসারে"র এই উপসংহারের বাসনার সঙ্গে মিলিয়ে দেখলেই "কর্ণধার" কবিতার পূর্ণ তাৎপর্য পরিস্ফুট হবে। 'সানাই'য়ের এই কবিতাটির সৃষ্টিরহস্য বিশ্লেষণ করলে রবীন্দ্র-মানসের এক অপূর্ব রহস্য-নিকেতনের দ্বার উন্মোচিত হবে। প্রথমেই মনে রাখা প্রয়োজন, ১৯৪০ সনের জানুয়ারি মাসে কবি যে কবিতাগুচ্ছ রচনা করেছিলেন তার আদিতে রয়েছে চৌঠা জানুয়ারি লেখা "সানাই", আর অন্তিমে আছে ২৮ জানুয়ারি লেখা "কর্ণধার"। অর্থাৎ এই কবিতাগুচ্ছে প্রকাশিত প্রেম-চেতনার শেষ ও পূর্ণ পরিণতি কর্ণধারে। কবিতাটির আদিরূপ কিন্তু সৃষ্ট হয়েছে মাস চারেক পূর্বে ১৯৩৯ সনের সেপ্টেম্বরের দ্বিতীয়ার্ধে। কবি তখন ছিলেন মংপুতে। মৈত্রেয়ী দেবী তাঁর 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে এই কবিতার আদিসৃষ্টি থেকে আরম্ভ করে 'সানাই'য়ে প্রকাশিত শেষসৃষ্টি পর্যন্ত পাঁচটি নব নব রূপের কথা বলেছেন [দ্রষ্টব্যঃ মংপুতে রবীন্দ্রনাথ, প্রথম সংস্করণ, পৃ° ১৭৭-১৭৯]। আসলে কিন্তু পাঁচটি নয়, সবশুদ্ধ সাতটি রূপ আছে কবিতাটির। প্রথম, "হে তরুণী তুমিই আমার ছুটির কর্ণধার।" দ্বিতীয়, "কে অদৃশ্য ছুটির কর্ণধার।" তৃতীয়, "কে অসীমের লীলার কর্ণধার।" চতুর্থ, "ছুটির কর্ণধার।" পঞ্চম, "ওগো কর্ণধার।" ষষ্ঠ, "সমূখে শান্তি-পারাবার, ভাসাও তরণী হে কর্ণধার।" এবং সপ্তম, "ওগো আমার প্রাণের কর্ণধার।"

এই রূপসপ্তকের মধ্যে পঞ্চমটি 'প্রবাসী' পত্রিকায় "লীলা" নামে প্রকাশিত হয়। ষষ্ঠ রূপটি কবিতা নয়, সর্বজনপরিচিত বিখ্যাত গান। এবং সপ্তম রূপটিই 'সানাই'য়ের "কর্ণধার" কবিতা। প্রথম রূপটির আলম্বন মৈত্রেয়ী দেবী। তাঁকে সম্বোধন করেই কবি লিখেছেন:

হে তরুণী তুমিই আমার ছুটির কর্ণধার
অলস হাওয়ায় বাইছ স্বপনতরী
নিয়ে যাবে কর্মনদীর পার।

মৈত্রেয়ী দেবী লিখছেন, "বিকেল বেলা যখন ফিরে এলুম, দেখি লেখাটা প্রায় সবই বদল হয়ে গেছে, এবং বিচিত্রিত-ভাবে আগেকার লেখাটিকে কালির আচ্ছাদনে মণ্ডিত করে আঁকা হয়েছে সুন্দর একটি ছবি, তার ফাঁকে ফাঁকে নূতন যে লেখাটা পড়া যাচ্ছে—

কে অদৃশ্য ছুটির কর্ণধার
অলস হাওয়ায় দিচ্ছ পাড়ি
কর্মনদীর পার।
দিগন্তরের কুঞ্জবনে
অশ্রুত কোন্ গুঞ্জরণে
বাতাসেতে জাল বুনে দেয়
মদির তন্দ্রার।
নীল নয়নের মৌনখানি
সেই সে দূরের আকাশবাণী
দিনগুলি মোর ওরই ডাকে
যায় ভেসে যায় বাঁকে বাঁকে
উদ্দেশহীন অকর্মণ্যতার।[৬]

বলাই বাহুল্য, এখানে কর্ণধাররূপে কবিমানসীরই আবির্ভাব ঘটেছে। এই দুই রূপে সীমার কোটিতেই কবিচেতনা বিলসিত। কিন্তু তৃতীয় রূপায়ণে কবিচেতনা উন্নীত হয়েছে অসীমের কোটিতে। তাই কর্ণধার হলেন "অসীমের লীলার কর্ণধার।" তৃতীয় থেকে সপ্তম পর্যায়ে কবিমানসীর জীবনদেবতা-রূপটিরই অভিব্যক্তি পরিলক্ষণীয়। আমরা প্রথমে "কর্ণধার" কাব্যরূপের অন্তিম অর্থাৎ সপ্তম রূপটি এবং পরে গীতিরূপটির ভাববিশ্লেষণ

করব। বলাই বহুল্য, "কর্ণধার" লীলারসের কবিতা। প্রথম স্তবকেই কবি বলছেন :

ওগো আমার প্রাণের কর্ণধার,
দিকে দিকে ঢেউ জাগালো
লীলার পারাবার।

দ্বিতীয় স্তবকে প্রাণের কর্ণধারই হলেন লীলার কর্ণধার। তাঁকে কবির জিজ্ঞাসা, "জীবন-তরী মৃত্যুভাঁটায় কোথায় কর পার।" নীল আকাশের মৌনখানি দূরের দৈববাণী বহন করে আনছে। উদ্দেশহীন অকূল শূন্যতার গান উঠছে বেজে। রহস্যময় মন্ত্রের ঝংকার বাজছে রক্তে। এ সমস্ত চিত্রই মৃত্যুপারের লীলার আভাস বহন করে আনছে। তৃতীয় স্তবকে তা স্ফুটতর হল। দিনশেষের প্রথম তারা যখন নিমেষহারা নয়নে তাকিয়ে বাতাসেতে মদির তন্দ্রার জাল বুনে দেয় তখন লীলার কর্ণধার স্বপ্নস্রোতে গোধূলির ধূসরচ্ছন্দার পাল তুলে দেন। চতুর্থ স্তবকে গোধূলি বিলীন হয়েছে বিধুর সন্ধ্যায়। রজনীগন্ধার মোহপরশ লাগছে হাওয়ায়। হৃদয়-মাঝে একতারাতে বাজছে বেহাগ। পঞ্চম স্তবকে ঘনিয়ে এসেছে রাত্রি :

সঙ্গবিহীন চিরন্তনের
বিরহগান বিরাট মনের
শূন্যে করে নিঃশবদের
বিষাদবিস্তার।

তখন কবির লীলার কর্ণধার তারার ফেনা ফেনিয়ে তোলেন আকাশগঙ্গার। অন্তিম স্তবকে গোধূলি সন্ধ্যা ও রাত্রির রূপকল্পগুলি মৃত্যুর চিররাত্রিতে পরিসমাপ্ত হয়েছে। কবি বলেন :

বক্ষে যবে বাজে মরণভেরি
ঘুচিয়ে ত্বরা ঘুচিয়ে সকল দেরি,
প্রাণের সীমা মৃত্যুসীমায়
সূক্ষ্ম হয়ে মিলায়ে যায়,
ঊর্ধ্বে তখন পাল তুলে দাও
অন্তিম যাত্রার।
ব্যক্ত কর, হে মোর কর্ণধার,

আঁধারহীন অচিন্ত্য সে
অসীম অন্ধকার।

লীলার কর্ণধারের সঙ্গে অসীম অন্ধকারে এই অন্তিম যাত্রার কথাই আরো স্বচ্ছ ও সংহত বাণীরূপ লাভ করেছে "কর্ণধারে"র গীতিরূপটির মধ্যে। তাই "কর্ণধারে"র ভাববিশ্লেষণ সহজতর হবে এর গীতিরূপ থেকে। গানটি লেখা হয় শান্তিনিকেতনে ১৯৩৯-এর তেসরা ডিসেম্বর। নিঃশেষ বিশ্লেষণের জন্যে গানটি এখানে সমগ্ররূপে উদ্ধারযোগ্য :

সমুখে শান্তিপারাবার,
ভাসাও তরণী হে কর্ণধার।
তুমি হবে চিরসাথি,
লও লও হে ক্রোড় পাতি,
অসীমের পথে জ্বলিবে
জ্যোতি ধ্রুবতারকার।

মুক্তিদাতা, তোমার ক্ষমা, তোমার দয়া
হবে চিরপাথেয় চিরযাত্রার।

হয় যেন মর্ত্যের বন্ধন ক্ষয়,
বিরাট বিশ্ব বাহু মেলি লয়,
পায় অন্তরে নির্ভয় পরিচয়
মহা-অজানার।

প্রথমেই জিজ্ঞাস্য- কে এই কর্ণধার? এই প্রসঙ্গে সঙ্গে সঙ্গে ভেসে আসবে একটি বহুপ্রচলিত গানের সুর—"হরি, দিন তো গেল, সন্ধ্যা হল, পার কর আমারে।" কিন্তু বাঙালীর চেতনার অন্তঃপুরে অনুবিষ্ট এই গানের কথা আমাদের ভুলে যেতে হবে। কেন না রবীন্দ্রচেতনায় কর্ণধার বারবার যে রূপ নিয়ে আবির্ভূত হয়েছেন তার পরিচয় স্বতন্ত্র। 'সোনার তরী'-'চিত্রা'র যুগে কবির জীবনদেবতাই তাঁর কর্ণধার। 'সোনার তরী'র "নিরুদ্দেশ যাত্রা"য় সুন্দরী "বিদেশিনী"ই তাঁর সোনার তরীর কর্ণধার। ১৩১১ সালে জীবনদেবতা-চেতনার বিশ্লেষণ করে কবি বলেছিলেন, "যে আবির্ভাব অতীতের

মধ্য হইতে অনাগতের মধ্যে প্রাণের পালের উপরে প্রেমের হাওয়া লাগাইয়া আমাকে কাল-মহানদীর নূতন নূতন ঘাটে বহন করিয়া লইয়া চলিয়াছেন, সেই জীবন-দেবতার কথা বলিলাম।"' এই বিশ্লেষণেও জীবনদেবতাই কবি-জীবনের কর্ণধার।

স্বভাবতই এবার জিজ্ঞাস্য—কে এই জীবনদেবতা? যে প্রচলিত অর্থে আমরা 'দেবতা' কথাটি ব্যবহার করি সে অর্থে কিন্তু জীবনদেবতা দেবতা নন। জীবন এবং দেবতা এই দুটি উপাদান দিয়ে গড়া হলেও আসলে ওটি একটি যোগরূঢ় শব্দ। রবীন্দ্র-কাব্যলোকে বিশেষ অর্থেই কথাটি প্রযুক্ত। "অন্তর্যামী" কবিতা থেকে একটি অংশ উদ্ধার করলেই আপাতত আমাদের বক্তব্য স্পষ্ট হবে। অন্তর্যামী জীবনদেবতাকে সম্বোধন করে কবি বলছেন:

মোর প্রেমে দিয়ে তোমার রাগিণী
কহিতেছ কোন্ অনাদি কাহিনী,
কঠিন আঘাতে ওগো মায়াবিনী
　　জাগাও গভীর সুর।
হবে যবে তব লীলা অবসান,
ছিঁড়ে যাবে তার, থেমে যাবে গান,
আমারে কি ফেলে করিবে প্রয়াণ
　　তব রহস্যপুর?
জ্বেলেছ কি মোরে প্রদীপ তোমার
করিবারে পূজা কোন্ দেবতার
রহস্যঘেরা অসীম আঁধার
　　মহা-মন্দিরতলে?
নাহি জানি, তাই কার লাগি প্রাণ
মরিছে দহিয়া নিশিদিনমান,
যেন সচেতন বহ্নিসমান
　　নাড়িতে নাড়িতে জ্বলে।

এই অংশের বিশেষভাবে "জ্বেলেছ কি মোরে প্রদীপ তোমার করিবারে পূজা কোন্ দেবতার"—এই চরণযুগলের দিকে দৃষ্টিনিবদ্ধ করা যাক। কবি এখানে তাঁর জীবনদেবতাকে জিজ্ঞাসা করছেন, তুমি কোন্ দেবতার পূজায় আমাকে

প্রদীপরূপে জ্বালিয়েছ? স্পষ্টই বুঝতে পারা যাচ্ছে, জীবনদেবতাও এখানে স্বয়ং দেবতা নন, দেবতার পূজারিণী।

এই প্রসঙ্গে পুনরায় স্মরণীয় যে, কবি তরুণ বয়সে দান্তের জীবনে বেয়াত্রিচের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করে বলেছিলেন "বিয়াত্রীচেই তাঁহার [দান্তের] সমুদয় কাব্যের নায়িকা, বিয়াত্রীচেই তাঁহার জীবনকাব্যের নায়িকা। বিয়াত্রীচেকে বাদ দিয়া তাঁহার কাব্য পাঠ করা বৃথা, বিয়াত্রীচেকে বাদ দিলে তাঁহার জীবন-কাহিনী শূন্য হইয়া পড়ে। তাঁহার জীবনের দেবতা বিয়াত্রীচে, তাঁহার সমুদয় কাব্য বিয়াত্রীচের স্তোত্র।"[৮]

"তাঁহার জীবনের দেবতা বিয়াত্রীচে"—এই বাক্যটিতে আছে দৈবে-পাওয়া একটি দিব্য সংকেত। "জীবনের দেবতা" কথা দুটি সমাসবদ্ধ ও সংশ্লিষ্ট হলেই হয় "জীবনদেবতা"। কিন্তু বেয়াত্রিচে খ্রীস্টভক্ত দান্তের দেবতা ছিলেন না। তবু ত্রিভুবন পরিক্রমায় তিনিই ছিলেন দান্তের কর্ণধার। রবীন্দ্র-জীবনের বেয়াত্রিচেও এই অর্থেই তাঁর জীবনদেবতা, এই অর্থেই তাঁর কর্ণধার।

৭

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ধর্মচেতনা সম্পর্কেও একটু আলোচনা, সংক্ষিপ্ত আকারেই, করে নেওয়া প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথ মুখ্যত শান্তিনিকেতন-পর্বে মন্দিরের আচার্যের বেদীতে বসে যে ধর্মতত্ত্বের ব্যাখ্যা করেছেন তার মূলভিত্তি উপনিষদের ধর্ম। 'নৈবেদ্য'-'গীতাঞ্জলি'-পর্বে তাঁর চেতনা ঈশ্বরনিষ্ঠ। অবশ্য 'নৈবেদ্য'-'গীতাঞ্জলি'তে তাঁর ঈশ্বরচেতনার বিচিত্র স্তর বর্তমান। কখনো উপনিষদের ব্রহ্মবাদ, কখনো মধ্যযুগীয় সাধু-সন্তগণের ভক্তিবাদ, আবার কখনো বৈষ্ণব-বাউলের লীলাবাদ তাঁর চিত্তে লীলায়িত হয়েছে। ভারতীয় ঐতিহ্যের বিচিত্রপথগামী ধর্মচেতনা থেকে রবীন্দ্রনাথ নানাভাবে প্রেরণা লাভ করেছেন। কিন্তু ওর মধ্যে কবির অন্তরতর ধর্ম কোন্‌টি এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া সহজ নয়। তাই নিজের ধর্মচেতনা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ নানাসময়ে কি বলেছেন তার বিশ্লেষণ নিষ্ফল হবে না।

রবীন্দ্রনাথের ধর্মচেতনার ভিত্তি উপনিষদ—এ ধারণা প্রায় স্বতঃসিদ্ধের মতোই গৃহীত হয়ে আসছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ 'জীবনস্মৃতি'তে বলেছেন

'আমাদের পরিবারে যে ধর্ম-সাধনা ছিল আমার সঙ্গে তাহার কোনো সংস্রব ছিল না—আমি তাহাকে গ্রহণ করি নাই।'* বলাই বাহুল্য, "আমাদের পরিবারে যে ধর্ম-সাধনা"র কথা এখানে কবি বলছেন তা তাঁর পিতৃদেব মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আচরণীয় বেদান্ত-প্রতিপাদ্য ধর্ম ;—উপনিষদই তার ভিত্তি।

'জীবনস্মৃতি'তে কবি যা বলেছিলেন তারই পুনরুক্তি করলেন 'The Religion of an Artist' গ্রন্থিকায়। তার প্রথমাংশ ১৯২৪ সনে লেখা। উক্ত গ্রন্থিকার দশম পৃষ্ঠার প্রথম অনুচ্ছেদে রয়েছে 'জীবনস্মৃতি'র বক্তব্যের অনুবৃত্তি। দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে কবি বললেন—

"My religion is essentially a poet's religion. Its touch comes to me through the same unseen and trackless channels as does the inspiration of my music. My religious life has followed the same mysterious line of growth as has my poetical life. Somehow they are wedded to each other, and though their betrothal had a long period of ceremony, it was kept secret from me"[১০]

এই মন্তব্য করার ঊনত্রিশ বৎসর পূর্বে ১৮৯৫ সনের ১১ই ফেব্রুয়ারি তারিখে ইন্দিরা দেবীকে লেখা একখানি পত্রে কবি লিখছেন, 'আমি যে কী ভাবে জগৎসংসারকে দেখে থাকি, সমস্ত প্রকৃতির সঙ্গে আমার যে খুব একটা নিগূঢ় অন্তরঙ্গ সত্যিকার সজীব সম্পর্ক আছে, এবং সেই প্রীতি সেই আত্মীয়তাকেই যে আমি যথার্থ এবং সর্বোচ্চ ধর্ম বলে জ্ঞান এবং অনুভব করি এবং আমার এই অন্তরপ্রকৃতিটি না বুঝলে যে আমার অধিকাংশ কবিতার রসাস্বাদন, এমন-কি, অর্থ গ্রহণ করা যায় না—এই কথাটা আমি তাঁকে [ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়কে] বোঝাচ্ছিলুম। * * আমার যে ধর্ম এটা নিত্যধর্ম, এর উপাসনা নিত্য-উপাসনা। কাল রাস্তার ধারে একটা ছাগ-মাতা গম্ভীর অলস স্নিগ্ধভাবে ঘাসের উপরে বসে ছিল এবং তার ছানাটা তার গায়ের উপরে ঘেঁষে পরম নির্ভরে গভীর আরামে পড়েছিল—সেটা দেখে আমার মনে যে-একটা সুগভীর রসপরিপূর্ণ প্রীতি এবং বিস্ময়ের সঞ্চার হল আমি সেইটেকেই আমার ধর্মালোচনা বলি। এই-সমস্ত ছবিতে চোখ পড়বা মাত্রই সমস্ত জগতের ভিতরকার আনন্দ এবং প্রেমকে আমি অত্যন্ত প্রত্যক্ষ

সাক্ষাৎভাবে আমার অন্তরে অনুভব করি। এ ছাড়া অন্যান্য যা-কিছু dogma আছে, যা আমি কিছুই জানি নে এবং বুঝি নে এবং বোঝবার সম্ভাবনা দেখি নে, তা নিয়ে আমি কিছুমাত্র ব্যস্ত হই নে। যেটুকু আমি positively জানতে পারছি সেই আমার পক্ষে যথেষ্ট, তাতেই আমাকে পরিপূর্ণ সুখ দেয়। তার সঙ্গে মিথ্যা অনুমান বিচার মিশিয়ে তাকে একটা systemএ পরিণত করতে গিয়ে তার ভিতরকার প্রত্যক্ষ সত্যটিকেও সংশয়াপন্ন করে তোলা হয়। আমি এইটুকু জানি যে, জগতে একটা আনন্দ এবং প্রেম আছে—তার বেশি জানবার কোনো দরকার নেই।'[১১]

এই দৃষ্টি কতকটা কোঁতের Positivism বা ধ্রুবদর্শনেরই অনুরূপ। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে রবীন্দ্রনাথের ধর্মচেতনায় বৌদ্ধ মানবতাবাদী মৈত্রী ও করুণাও গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনে গায়ত্রীমন্ত্রে দীক্ষার কথা একাধিকবার বলেছেন। অথচ 'পত্রপুট' কাব্যগ্রন্থের পনেরো-সংখ্যক কবিতায় নিজের পরিচয় দিয়ে বলেছেন 'আমি ব্রাত্য, আমি মন্ত্রহীন।' ১৩৪৩ সালের ১৮ বৈশাখে লেখা উক্ত কবিতায় নিজের ধর্মচেতনার স্বরূপ বিশ্লেষণ করে তিনি বলেছেন :

আমি ব্রাত্য, আমি মন্ত্রহীন।
সকল মন্দিরের বাহিরে
আমার পূজা আজ সমাপ্ত হল
দেবলোক থেকে
মানবলোকে,
আকাশে জ্যোতির্ময় পুরুষে
আর মনের মানুষে আমার অন্তরতম আনন্দে।

চৌত্রিশ বৎসর বয়স থেকে পঁচাত্তর বৎসর বয়স পর্যন্ত উপরে উদ্ধৃত কবির রচনাবলী থেকে তাঁর ধর্মচেতনার যে পরিচয় পাওয়া গেল তার সারমর্ম এই যে, রবীন্দ্রনাথ কোনো dogma বা system-এ বিশ্বাস করেন না। তাঁর ধর্মবোধ বাইরে থেকে আহৃত বা আরোপিত নয়, তা তাঁর অন্তরের কবিসত্তা থেকেই উৎসারিত। প্রাণলোকে বিধৃত জগতের প্রেম এবং আনন্দই তার ভিত্তি। পঁচাত্তর বৎসর বয়সে তা দেবলোক থেকে নেমে এসেছে মানবলোকে। মনের মানুষে কবির অন্তরতম আনন্দেই তার চূড়ান্ত বিকাশ।

বাইরে থেকে পাওয়া ধর্মচেতনা যে মানুষের সত্যকার ধর্মচেতনা নয় তা অন্যত্র তিনি আরো সুন্দর করে বলেছেন। তিনি বলছেন, "The religion that only comes to us from external scriptures never becomes our own ; our only tie with it is that of habit. To gain religion within is man's lifelong adventure. *In the extremity of suffering must it be born ; on his life-blood it must live* , and then, whether or not it brings him happiness, the man's journey shall end in the joy of fulfilment."[১২]

এই উদ্ধৃতি থেকে বুঝতে পারা যাচ্ছে, অভ্যাসের ধর্ম থেকে রবীন্দ্রনাথ প্রাণের ধর্মকে সম্পূর্ণ পৃথক করে দেখেছেন। কবির এই প্রাণের ধর্মের আলোকেই তাঁর জীবনদেবতা এবং 'কর্ণধারে'র স্বরূপ নির্ণয় করতে হবে। তাঁর জীবনদেবতার কর্ণধাব-মূর্তি আর আমাদের ভক্তিতদ্গত চিত্তে ভবার্ণবের কর্ণধারমূর্তি যে এক নয় তার অভ্রান্ত প্রমাণ পাওয়া যাবে সত্তর বৎসর বয়সে লেখা, 'পরিশেষ' কাব্যগ্রন্থে সংকলিত, "তুমি" কবিতায়। এই কবিতাটি জীবনদেবতার সঙ্গে আস্বাদ্যমান লীলারসেরই কবিতা। 'চিত্রা'র "অন্তর্যামী"তে এবং 'পূরবী'র "লীলাসঙ্গিনী"তে যে-নারী জীবনদেবতারূপে লীলার অধিনেত্রী সেই নারীই "তুমি" কবিতারও লীলাসহচরী। এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখতে হবে যে, রবীন্দ্রনাথ যখন 'চিত্রা'র "অন্তর্যামী" [রচনাকাল ভাদ্র ১৩০১], "জীবনদেবতা" [২ ফাল্গুন ১৩০২] এবং "সিন্ধুপারে" [২০ ফাল্গুন ১৩০২] কবিতা রচনা করছিলেন ঠিক সেই সময়েই, ১৮৯৫ সনের ১১ই ফেব্রুয়ারি অর্থাৎ ১৩০২ সালের মাঘ মাসে, তাঁর ধর্মচেতনা বিশ্লেষণ করেছেন ইন্দিরা দেবীর কাছে লেখা চিঠিতে। আমরা সে চিঠি উপরে উদ্ধৃত করেছি। রবীন্দ্রনাথের সে চিঠির আত্মবিশ্লেষণকে সত্য বলে ধরে নিলে অন্তর্যামী-জীবনদেবতার উপর কোন দেবত্ব আরোপ করা চলে না। রবীন্দ্রনাথ শেষ জীবনে নিজেও তা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় নিষেধ করেছেন। আশি বৎসর বয়সে যখন রচনাবলী-সংস্করণে 'চিত্রা' প্রকাশিত হয় তখন তার 'সূচনা'য় জীবনদেবতাতত্ত্ব সম্পর্কে কবি যে মন্তব্য করেছিলেন আমরা এই গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে [পৃ° ১৯] তা উদ্ধৃত করেছি। পুনরায় তা স্মরণীয়। সেখানে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন :

'বস্তুত চিত্রায় জীবনরঙ্গভূমিতে যে মিলন-নাট্যের উল্লেখ হয়েছে

তার কোনো নায়ক-নায়িকা জীবের সত্তার বাইরে নেই এবং তার মধ্যে কেউ ভগবানের স্থানাভিষিক্ত নয়।'

অর্থাৎ জীবনদেবতা সম্পর্কে দেবতার কল্পনা কবিকর্তৃকই বারিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের প্রাণের ধর্ম মানবধর্ম, এবং তা একান্তভাবেই প্রেমের ধর্ম। কবিমানসে তাঁর জীবনদেবতার লীলার মধ্যেই সে ধর্ম আস্বাদনীয়। 'Personality' গ্রন্থে "Woman" প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "With the growth of man's spiritual life, our worship has become the worship of love."[১৩] অর্থাৎ প্রেমের উপাসনাই ক্রমোন্নত অধ্যাত্ম জীবনের সত্যকার উপাসনা।

আমরা এই অধ্যায়ের ষষ্ঠ পর্বাধ্যায়ের অন্তিম অনুচ্ছেদে দান্তের 'ডিভাইন কমেডি'র অধিনেত্রী বেয়াত্রিচে সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের উক্তি উদ্ধৃত করে বলেছি, যে-অর্থে বেয়াত্রিচে দান্তের জীবনদেবতা, দান্তের কর্ণধার, সেই অর্থেই রবীন্দ্রজীবনের বেয়াত্রিচেও তাঁর জীবনদেবতা তাঁর জীবনের কর্ণধার। 'ডিভাইন কমেডি' সম্পর্কে এ যুগের একজন বিখ্যাত দার্শনিকের অভিমত এখানে উদ্ধারযোগ্য। ফরাসী দার্শনিক Jacques Maritain-কে বলা হয়েছে "One of the major Christian thinkers in the world today." Maritain তাঁর 'Creative Intuition in Art and Poetry' গ্রন্থে বলেছেন :

"The *Divine ,Comedy* is indeed a Song—a song to a woman who was loved (all poets think so) as no other woman ever was or will be, and a song to the purification of love in the heart of the poet."[১৪]

এই খ্রীশ্চিয়ান মনীষীর অনুসরণ করেই বলা চলে, রবীন্দ্রজীবনে তাঁর জীবনদেবতা-পর্যায়ের কবিতাবলীও "indeed a Song—a song to a woman", আর তার উপজীব্য হল কবির অন্তরে বিশুদ্ধীভূত তাঁর প্রেমের লীলারস।

এবার 'পরিশেষে'র "তুমি" কবিতায় পরিবেশিত সেই লীলারস আস্বাদন করা যাক। আমরা এই কবিতাটিকে বিশেষ ভাবে নির্বাচন করেছি এই কারণে যে, কবিতাটি জীবনদেবতা-পর্যায়ের হয়েও 'চিত্রা'র "অন্তর্যামী" এবং

'পূরবী'র "লীলাসঙ্গিনী"র চেয়েও অনেক বেশি মানবিক। এখানে তাঁর প্রেমসত্তাই তাঁর মুখ্যসত্তা। কবি তাঁকে সম্বোধন করে বলছেন :

প্রেমের দিয়ালি দিয়াছিল জ্বালি
তোমারি দীপের দীপ্তি।
মোর সংগীতে তুমিই সঁপিতে
তোমার নীরব তৃপ্তি।
আমারে লুকায়ে তুমি দিতে আনি
আমার ভাষায় সুগভীর বাণী,
চিত্রলিখায় জানি আমি জানি
তব আলিপনলিপ্তি।
হৃৎশতদলে তুমি বীণাপাণি
সুরের আসন পাতি
দিনের প্রহর করেছ মুখর
এখন এল যে রাতি।

* . * *

এ জীবনময় তব পরিচয়
এখানে কি হবে শূন্য।
তুমি যে-বীণার বেঁধেছিলে তার
এখনি কি হবে ক্ষুণ্ণ।
যে-পথে আমার ছিলে তুমি সাথী
সে পথে তোমার নিবায়োনা বাতি,
আরতিব দীপে আমার এ রাতি
এখনো করিয়ো পুণ্য।
আজো জ্বলে তব নয়নের ভাতি
আমার নয়নময়,
মরণসভায় তোমায় আমায়
গাব আলোকের জয়।'[১৫]

উদ্ধৃত অংশের প্রথম স্তবকে দিন এবং রাত্রি জীবন ও মৃত্যুরই প্রতীক। কবি বলছেন, 'জীবনের পথে তুমি আমার সাথী ছিলে, মৃত্যুপারের পথেও তুমি তাই

থাক। আমার নয়নময় তোমার নয়নের ভাতিই উজ্জ্বল হয়ে আছে। মরণসভায় আমরা দুজনে আলোকেরই জয়গান করব।' বলাই বাহুল্য, এ আলো প্রেমেরই আলো। কবি বলেছেন, ''প্রেমের দিয়ালি দিয়াছিল জ্বালি তোমারি দীপের দীপ্তি।"

৮

এইবার 'সমুখে শান্তিপারাবার' গানটির বাচ্যার্থের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা যেতে পারে। কবি তাঁর কর্ণধারকে বলছেন শান্তি-পারাবারে তরণী ভাসাতে। আসলে গানটির মূলে রয়েছে একটি চিরন্তন যাত্রার পরিকল্পনা। কবি "চিরযাত্রা" কথাটিই ব্যবহার করেছেন। সেই চিরযাত্রার পথ অসীম। কবির প্রার্থনা তাঁর কর্ণধার হবেন সেই অসীমের পথে তাঁর "চিরসাথি"। সেই অসীমের পথ উজ্জ্বল হবে ধ্রুবতারকার জ্যোতিতে। স্বভাবতই এই প্রসঙ্গে কবির সারাজীবনের ধ্রুবতারার ভাবানুষঙ্গ ভেসে আসবে। [তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা, এ সমুদ্রে আর কভু হব না কো পথহারা।] গানের দ্বিতীয় কলিতে কর্ণধার হয়েছেন "মুক্তিদাতা"। মুক্তিদাতার "ক্ষমা ও দয়া" হবে কবির চিরযাত্রার "চিরপাথেয়"। কোন্ মুক্তির কথা এখানে কবি বলছেন? তৃতীয় কলিতে আছে তার উত্তর। "হয় যেন মর্ত্যের বন্ধন ক্ষয়, বিরাট বিশ্ব বাহু মেলি লয়।" অর্থাৎ, মুক্তির অর্থ মর্ত্যবন্ধন ক্ষয় হওয়া এবং বিরাট বিশ্বের বাহুতে বিলীন হওয়া। কর্ণধারের কাছে কবির শেষ প্রার্থনা তিনি [কবি] যেন অন্তরে "মহা-অজানা"র নির্ভয় পরিচয় লাভ করেন। এই "মহা-অজানা"র মধ্যে কি কোনো দেবতার কল্পনা আছে? এই প্রসঙ্গে "শেষ অভিসারে"র শেষ বাক্যটি পুনরায় স্মরণীয়:

এই তব শেষ অভিসারে
ধরণীর পারে
মিলন ঘটায়ে যাও অজানার সাথে
অন্তহীন রাতে।

দুটি কবিতাকে একসঙ্গে চিন্তা করলে বলতেই হবে যে, "শেষ অভিসারে"র অভিসারিকাই হয়েছেন গানের কর্ণধার। অজানা কিংবা মহা-অজানা মানে

মৃত্যু-তীর্ণ মর্ত্যজীবনোত্তর অজ্ঞেয় মহাজীবন। রবীন্দ্র-কল্পনায় মানুষ চির-পথিক। আলোচ্য গানটিতেও সেই পথিক-সত্তারই জয়ধ্বনি। 'চিত্রা'র "সিন্ধুপারে" কবিতায় কবি মৃত্যুর পটভূমিতেই পেয়েছিলেন জীবনদেবতার সাক্ষাৎ। 'পূরবী'র "লীলাসঙ্গিনী" কবিতায় কবি বলেছিলেন, "তিমিরে তোমার পরশলহরী দোলে হে রসতরঙ্গিণী।" আলোচ্য গানে কর্ণধার কবির চিরযাত্রার চিরসাথি, তাঁর কাছ থেকেই কবি পাবেন সেই অসীম পথের চিরপাথেয়। তাঁরই সাহায্যে নির্ভয় পরিচয় ঘটবে মহা-অজানার সঙ্গে। জীবনদেবতা-চেতনার এখানেই পূর্ণাহুতি। জীবনদেবতাই চিরপথিক-কবির চির-যাত্রার কর্ণধার।

৯

কিন্তু কবিমানসীর জীবনদেবতা-মূর্তি নয়, প্রেম-মূর্তিই কবিপ্রেমিকের সর্বশেষ ধ্যানের প্রতিমা। 'সানাই'য়ের পরে কবির জীবদ্দশায় প্রকাশিত হয়েছে তিনখানি কাব্যগ্রন্থ—'রোগশয্যায়', 'আরোগ্য' এবং 'জন্মদিনে'। কবিতাগুলি ১৯৪০-এর অক্টোবর থেকে ১৯৪১-এর মার্চের মধ্যে লেখা। 'জন্মদিনে' গ্রন্থে তার আগেরও কিছু কবিতা সংকলিত হয়েছে। আশি বৎসর বয়সে লেখা এই কাব্যত্রয়ীতে রবীন্দ্রমানসের এক নূতন পরিচয় পাওয়া যাবে। এখানে মহাকবির কবিসত্তা আর ঋষিসত্তা এক হয়ে মিলেছে। কবিতাগুলি যেন শান্ত সমাহিত ঋষির কণ্ঠোচ্চারিত মন্ত্র। কবির এই শেষ কাব্যত্রয়ীর অঙ্গিরস হল শান্তরস। আচার্য বাগ্‌ভট শান্তরসের লক্ষণ নির্ণয়ে বলেছেন, "সম্যগ্‌জ্ঞানসমুত্থানঃ শান্তো নিস্পৃহনায়কঃ।" সম্যক্‌জ্ঞান অর্থাৎ "জগতের মিথ্যাত্বপ্রতীতিবশত পরমাত্মজ্ঞান" যাঁর জন্মেছে তিনিই এই শান্তরসের নায়ক।[১৮] এই অর্থে কিন্তু রবীন্দ্রনাথ শান্তরসের নায়ক নন। আমরা যাকে বলেছি কবিচেতনায় 'মর্ত্যের মধুরতম আসক্তি' এবং 'আকাশের নির্মলতম মুক্তি'—চেতনার এই বিপরীতমুখী প্রবাহ কবিজীবনের অন্তিমলগ্নে হয়েছে নির্দ্বন্দ্ব। মর্ত্য থেকে বিদায় নেবার আগে কবি মর্ত্যজীবনকে চরম মূল্য দিতে কার্পণ্য করেন নি। বলেছেন, "এ দ্যুলোক মধুময়, মধুময় পৃথিবীর ধূলি।" বলেছেন, "সাবিত্রী পৃথিবী এই, আত্মার এ মর্তনিকেতন।"[১]

বলেছেন, "এ জীবনে সুন্দরের পেয়েছি মধুর আশীর্বাদ, মানুষের প্রীতিপাত্রে পাই তাঁরি সুধার আস্বাদ।" আবার বিবিক্ত চিত্তে মহাযাত্রার সুরও সমান তালে বেজে উঠেছে: "অলক্ষ্য পথের যাত্রী, অজানা তাহার পরিণাম। আজি এই জন্মদিনে, দূরের পথিক সেই, তাহারি শুনিনু পদক্ষেপ নির্জন সমুদ্র-তীরে।" "বার বার মনে মনে বলিতেছি, আমি চলিলাম।" "হে সবিতা, তোমার কল্যাণতম রূপ করো অপাবৃত, সেই দিব্য আবির্ভাবে হেরি আমি আপন আত্মারে মৃত্যুর অতীত।"

এই বিবিক্ত শান্তরসনিষ্ণাত কবিচিত্তে প্রেমচেতনা কি অপরূপ রূপ পরিগ্রহ করেছে তা দেখবার কৌতূহল রসিকচিত্তে জাগ্রত হওয়া অস্বাভাবিক নয়। 'রোগশয্যায়ে'র তিন এবং 'আরোগ্যে'র তেরো-সংখ্যক কবিতা তাঁদের কৌতূহল চরিতার্থ করবে। 'রোগশয্যায়ে'র কবিতাটিতে কবি বলছেন, যাতায়াতের পথের তীরে তিনি বসে আছেন একা। যারা 'বিহান-বেলায়' প্রাণের ঘাটে গানের খেয়া বয়ে এনেছিল সাঁঝের বেলায় তারা ধীরে ধীরে যাচ্ছে মিলিয়ে। কবি বলছেন:

আজকে তারা এল আমার
স্বপ্নলোকের দুয়ার ঘিরে;
সুরহারা সব ব্যথা যত
একতারা তার খুঁজে ফিরে।
প্রহর পরে প্রহর যে যায়,
বসে বসে কেবল গনি
নীরব জপের মালার ধ্বনি
অন্ধকারের শিরে শিরে।

কবিকণ্ঠের এই অকুণ্ঠ স্বীকৃতিতে তাঁর জীবনের ছোট-বড় সমস্ত অনুরাগই পরম মূল্য লাভ করল।

'আরোগ্যে'র ১৩-সংখ্যক কবিতাটি অনবদ্য। এর মধ্যে কবি তাঁর তরুণ বয়সের প্রেমের যে সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করেছেন তা দ্বিতীয়রহিত বলেই তার গুরুত্ব অসাধারণ। ১৯৪১ সনের ৩০ জানুয়ারি লেখা এই কবিতাটির বিষয়ালম্বন হল কাদম্বরী দেবীর প্রতি তরুণ কবির ভালবাসা। তার স্বরূপ বর্ণনায় সত্যদ্রষ্টা ঋষিকবির কণ্ঠ যেমন কুণ্ঠাহীন তেমনি উদাত্ত-গম্ভীর। সমগ্রভাবে উদ্ধার না

করলে এই অনতিপরিচিত কবিতাটির সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যাবে না। কবি বলছেন :

ভালোবাসা এসেছিল একদিন তরুণ বয়সে
নির্ঝরের প্রলাপকল্লোলে,
অজানা শিখর হতে
সহসা বিস্ময় বহি আনি
ভ্রূভঙ্গিত পাষাণের নিশ্চল নির্দেশ
লঙ্ঘিয়া উচ্ছল পরিহাসে,
বাতাসেরে করি ধৈর্যহারা,
পরিচয়ধারা-মাঝে তরঙ্গিয়া অপরিচয়ের
অভাবিত রহস্যের ভাষা,
চারিদিকে স্থির যাহা পরিমিত নিত্য প্রত্যাশিত
তারি মধ্যে মুক্ত করি ধাবমান বিদ্রোহের ধারা।

আজ সেই ভালোবাসা স্নিগ্ধ সান্ত্বনার স্তব্ধতায়
রয়েছে নিঃশব্দ হয়ে প্রচ্ছন্ন গভীরে।
চারিদিকে নিখিলের বৃহৎ শান্তিতে
মিলেছে সে সহজ মিলনে,
তপস্বিনী রজনীর তারার আলোয় তার আলো,
পূজারত অরণ্যের পুষ্প-অর্ঘ্যে তাহার মাধুরী।

"ভালোবাসা এসেছিল একদিন তরুণ বয়সে।" সেই পরম আবির্ভাবকে একটি মহাকাব্যিক বাক্যে কবি অভিব্যক্ত করেছেন। কবিতার প্রথমার্ধ একটিমাত্র মহাবাক্য। লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে 'নির্ঝর'-রূপকল্প কবি এই শেষবারের মতো ব্যবহার করলেন। ভালোবাসার সেই আবির্ভাব (১) "নির্ঝরের প্রলাপ-কল্লোলে।" প্রলাপ এবং কল্লোল দুটি শব্দ একসঙ্গে যুক্ত হয়ে সমাসবদ্ধ পদটিতে অর্থের নূতন ব্যঞ্জনা এনেছে। নির্ঝর এসেছে (২) "অজানা শিখর" হতে "সহসা বিস্ময়" বহন করে, আর "ভ্রূভঙ্গিত পাষাণের নিশ্চল নির্দেশ" "উচ্ছল পরিহাসে" লঙ্ঘন করে। (৩) বাতাসকে সে করেছে ধৈর্যহারা। (৪) সে এসেছে "পরিচয়ধারা-মাঝে তরঙ্গিয়া অপরিচয়ের অভাবিত রহস্যের

ভাষা।" (৫) চারিদিকে যা স্থির, যা পরিমিত, যা নিত্য-প্রত্যাশিত তার মধ্যে সে মুক্ত করে দিয়েছে "ধাবমান বিদ্রোহের ধারা।" তরুণ বয়সের প্রেমের সেই দুর্জয় নির্ঝর-প্রবাহের এর চেয়ে সত্যতর ও বলিষ্ঠতর বিশ্লেষণ কবির লেখনী-মুখেও আর কোনদিন শোনা যায় নি। ভ্রূভঙ্গিত পাষাণের নিশ্চল নির্দেশ লঙ্ঘন-করা নির্ঝরের ধাবমান বিদ্রোহের ধারা: প্রেমের এই সমাসোক্তি অলংকারটি নিগূঢ় ব্যঞ্জনায় অসামান্য।

কবিতার দ্বিতীয়ার্ধে আছে কবিজীবনে সেই প্রেমের সার্থক পরিণতি ও সর্বশেষ পর্যায়ে অসীম শ্রীলোকে তার বিশ্ব-রূপায়ণের অপূর্ব মাধুরীর প্রসাধিত লাবণ্য। কবি বলছেন, জীবনদিনান্তে সেই ভালোবাসা "রয়েছে নিঃশব্দ হয়ে প্রচ্ছন্ন গভীরে।" "চারিদিকে নিখিলের বৃহৎ শান্তিতে মিলেছে সে সহজ মিলনে।" নিখিলের বৃহৎ শান্তির মধ্যে তার সহজ-মিলনের দুটি রূপকল্প ব্যবহার করেই কবিকণ্ঠ চিরদিনের মত নীরব হয়ে গেছে:—

তপস্বিনী রজনীর তারার আলোয় তার আলো,
পূজারত অরণ্যের পুষ্প-অর্ঘ্যে তাহার মাধুরী।

রজনী এবং অরণ্যের বিশেষণ দুটিতে এসেছে তপশ্চর্যাপূত শুভ্রতা ও পবিত্রতার ব্যঞ্জনা। প্রেমের মন্দিরে সারাজীবন বিচিত্র সুরের অনিঃশেষ সংগীত রচনা করে সর্বশেষে এই কবিতায় কবি যেন প্রেমের স্তবমন্ত্র উচ্চারণ করলেন। মহাকবির ধ্যানসম্ভূত সেই মন্ত্রে মানসীর যে "প্রেমমূর্তিখানি" উদ্ভাসিত হল তা চিরন্তন কালের নিত্য-বর্তমানের শাশ্বতী হ্লাদিনী প্রতিমা।

॥ উল্লেখ-পঞ্জী ॥

১ রবীন্দ্রজীবনী-৪ পৃ° ২১৭।

২ ছিন্নপত্রাবলী, পৃ° ১৯৯।

৩ তদেব, পৃ° ৪৪৮-৪৯।

৪ তদেব, পৃ° ৪৪৬-৪৭।

৫ দ্রষ্টব্য, রবীন্দ্র-রচনাবলী-২৪, পৃ° ৪৮১।

৬ মংপুতে রবীন্দ্রনাথ, ১ম সং, পৃ° ১৭৮।

৭ আত্মপরিচয়, পৃ° ২০।

৮ দ্রষ্টব্য, এই গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে ২৪ পৃষ্ঠায় সংকলিত উদ্ধৃতি।

৯ দ্রষ্টব্য, রবীন্দ্র-রচনাবলী-১৭, পৃ° ৩৭৭।

১০ The Religion of an Artist, স° ১৯৫৩ মার্চ, পৃ° ১০।

১১ ছিন্নপত্রাবলী, পৃ° ৩৯৯-৪০০।

১২ 'Rabindranath Tagore: A Centenary Volume' গ্রন্থে ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো লিখিত 'Tagore on the Banks of the River Plate' প্রবন্ধে উদ্ধৃত। দ্রষ্টব্য, উক্ত গ্রন্থ, পৃ° ৪২। এই উদ্ধৃতির অংশবিশেষের অক্ষরবক্রতা আমাদের কৃত।

১৩ দ্রষ্টব্য, 'Personality', ম্যাকমিলন স° ১৯৫৯, পৃ ১৭৮।

১৪ দ্রষ্টব্য, উক্ত গ্রন্থ, মেরিডিয়ান বুকস স° ১৯৫৭, পৃ° ২৭৮।

১৫ রবীন্দ্র-রচনাবলী-১৫, পৃ° ১৭৬-৭৭।

১৬ দ্রষ্টব্য, শ্রীশিবশঙ্কর শাস্ত্রী বাচস্পতি বিরচিত 'কাব্য-রশ্মি' গ্রন্থ, পৃ° ১২২।

পরিশিষ্ট

বিহারীলালের কাদম্বরী-স্তোত্র

আসনদাত্রী দেবী

গীতি

রাগিণী ললিত—তাল কাওয়ালী

প্রাণ কেন এমন করে, (আমার)
কি হল কি হল রে অন্তরে !
ভ্রমি ত্রিভুবন মন
করে কার অন্বেষণ,
কাতর নয়ন কার তরে ?
ত্যজি এই মর্ত্যভূমি,
কোথা চলে গেলে তুমি
কি জানি কি অভিমান ভরে !

১

তোমার আসনখানি
আদরে আদরে আনি,
রেখেছি যতন কোরে, চিরদিন রাখিব ;
এ জীবনে আমি আর
তোমার সে সদাচার,
সেই স্নেহ-মাখা মুখ পাশরিতে নারিব ।

২

সাক্ষাৎ আমার প্রাণ
'সারদামঙ্গল' গান,
অসম্পূর্ণ পড়ে ছিল, যেন ম'রে গিয়েছে !

যে-সুরা বীণার মত
জানি না কি দশা হ'ত,
তোমারি আদরে, দেবি, ফিরে প্রাণ পেয়েছে।

৩

সাহিত্য সংসারে তুমি
সুকুমার ফুলভূমি,
তোমারি স্নেহের গুণে কত রকমের ফুল
ফুটে আছে থরে থরে,
কেমন সৌরভ ভরে
সোহাগ-সমীরে কিবে করিতেছে ঢুলঢুল্।

৪

তোমার উৎসাহ-ধারা
বিচিত্র বিদ্যুৎপারা,
কতই বোবার মুখে কত কথা ফুটেছে,
কতই পরমানন্দে,
কত মত ছন্দবন্ধে,
কত ভাব ভঙ্গিমায়,
ইংরাজী ফরাসী কত বাঙ্গালায় বলেছে

৫

চলিয়া গিয়াছ তুমি,
কি বিষণ্ণ বঙ্গভূমি;
সে অবধি আজো কেন
দেশে কি হয়েছে যেন!
নিকুঞ্জ-কাননে আর কোন পাখী ডাকে না।
ভাগীরথী-তীর থেকে আর বাঁশী বাজে না!
মানস-সরসে হায় পদ্ম ফুটে হাসে না!

স্বর্গের বীণার ধ্বনি ভেসে ভেসে আসে না!
এ দেশে ভারতী দেবী বুঝি প্রাণে বাঁচে না!

৬

সেই প্রিয় মুখ সব, সেই প্রিয় নিকেতন,
সেই ছাদে তরুরাজি, শূন্যে শোভে উপবন,
সেই জাল-ঘেরা পাখী, সেই খুদে হরিণী,
সেই প্রাণখোলা গান, সেই মধুযামিনী,
কি যেন কি হয়ে গেছে!
কি যেন কি হারায়েছে!
কেন গো সেথায় যেতে কিছুতে সরে না মন?

৭

কবে কার আবির্ভাবে,
থাকে যে কি এক ভাবে,
অভাবে সে ভাবে আর সেই সব থাকে না;
দোলায়ে ফুলের বন
চোলে গেলে সমীরণ,
সেই ফুল হাসে হায়, সে সৌরভ আসে না!

৮

কে গায় কাতর গান,
কেন শোকাকুল প্রাণ,
প্রাণের ভিতর কেন কাঁদিয়া উঠিছে প্রাণী?
আজি কি বিজয়া এল,
তিন দিন কোথা গেল?
কেন মা আনন্দময়ী, কাঁদো-কাঁদো মুখখানি?

সুখের স্বপন কেন
চকিতে ফুরায় যেন,
হারালে হাতের নিধি, আর নাহি পাওয়া যায় !
রয়েছে স্বজন-গণে
যে যার আপন মনে,
নির্জনে বাতাস শুধু কোরে ওঠে 'হায় ! হায় !'

১০

হা দেবী ! কোথায় তুমি
গেছ ফেলে মর্ত্যভূমি ?
সোনার প্রতিমা জলে কে দিল রে বিসর্জন ?
কারো বাজিল না মনে,
বজ্রাঘাত ফুল-বনে !
সাহিত্য-সুখের তারা নিবে গেল কি কারণ ?

১১

ওই যে সুন্দর শশী,
আলো কোরে আছে বসি !
চিরদিন হিমালয়,
কি সুন্দর জেগে রয় !
সুন্দরী জাহ্নবী চির বহে কলস্বনে ;
সুন্দর মানব কেন,
গোলাপ-কুসুম যেন—
ঝ'রে যায়, মরে যায় অতি অল্পক্ষণে।

১২

ভোরের গানের মত,
ভোরের তারার মত,

মধুর সুন্দর মূর্তি ত্রিদিব-ললনা ;
ভোরে ভোরে আসে, যায়,
কেহ নাহি দেখে তায়,
রেখে যায় কোমল কুসুমদলে
নির্মল দুয়েক ফোঁটা শিশিরাশ্রুকণা !

১৩

আহা সেই স্বর্গের নিবাসী
চলে গেছে !
রেখে গেছে—
সুহৃদ জনের মনে
যাবার সময় সেই প্রাণ-ফাটা বিষাদের হাসি !

১৪

সেই মুখখানি মনে
কেন পড়ে ক্ষণে ক্ষণে,
করুণ নয়ন দুটি সদাই প্রাণেতে ভায় ?
হা দেবী ! তোমায় আর দেখিব না এ ধরায় !

১৫

অমরার পদ্ম-পথে
পারিজাত-পুষ্পরথে
কিরণ-কলিত-মূর্তি তোমারই মহাপ্রাণী
অপরূপ রূপ ধরি,
যেতেছিল আলো করি ;
চেনো চেনো কোরেছিনু, চিনিতে পারিনে রাণী !

১৬

কেঁদে উঠেছিল প্রাণ,
মনে এসেছিল ধ্যান,

বুক ফেটে বারবার
উঠেছিল হাহাকার,
উঠিল বাতাস ভোরে কি যেন আকাশবাণী—
তবুও—তবুও আহা নারিনু চিনিতে রাণী।

১৭

তুমিও আমায় দেখে
চেয়ে ছিলে থেকে থেকে,
চক্ষে গড়াইল জল,
মুখখানি ছলছল।
কেন গো কি পেলে ব্যথা?
কি জন্যে ক'লে না কথা?
বুঝি বা আমারি মত
স্মরি স্মরি অবিরত,
এই পরিচিত জনে
পড়ে, পড়িল না মনে!
পুষ্পরথ থেকে নেমে কেন কাছে এলে না?
সেই দেখা, শেষ দেখা, কিছু বলে গেলে না!

১৮

সকলি পড়িছে মনে,
যেন সেই পদ্মবনে
যোগেন্দ্রবালার কাছে
যে সব সঙ্গিনী আছে,
খেলিতে তাঁদের সনে দেখেছি আমি তোমায়
করুণ নয়ন দুটি এখনো প্রাণেতে ভায়।

১৯

সকল সতীর প্রাণ,
সুমধুর ঐক্যতান,

সুরপুরে একতারে কি মধুর বাজিছে !
ঘুমায়ে মায়ের কোলে সুখে শিশু শুনিছে !
সে সব সতীর মাঝে দেখেছি আমি তোমায়—
করুণ নয়ন দুটি এখনো প্রাণেতে ভায় !

২০

আহা সে রূপের ভাতি,
প্রভাত করেছে রাতি !
হাসিছে অমরাবতী, হাসিতেছে ত্রিভুবন,
হৃদয় উদয়াচল আলো হয়েছে কেমন !

[সাধের আসন, নবম সর্গ

পতিব্রতা

গীতি

ললিত কাওয়ালী

অহহ !—সম্মুখে সুমঙ্গল এ কি !
দেবি, দাঁড়াও, নয়ন ভোরে দেখি !
ত্যজেছ মানব-কায়া,
আজো ত্যজ নাই মায়া !
এ কি অপরূপ ছায়া—এ কি !
করুণ নয়ন দুটি
তেমনি রয়েছে ফুটি,
তেমনি চাঁচর কেশ, বেশ ;
মলিন—মলিন মুখ,
কেন গো কিসের দুখ ?
ভালবাসা মরণে মরে কি ?

১

সতীর প্রেমের প্রাণ
পতি প্রতি একটান ;
অমর সে ভালবাসা, মরণেও মরে না,
স্বর্গ থেকে এসে, তাকে
অলক্ষ্যে আগুলে থাকে,
সে দেখে নয়ন ভোরে, কেহ তারে দেখে না।

২

শোকে কেঁদে উভরায়
পতি যদি ডাকে তায়,
প্রকৃতি নিস্তব্ধ হয়,
কি যেন নিঃসরে বাণী বহমান পবনে ;
কি জানি কি শক্তি-বলে
সতীত্ব-তপের ফলে
আকাশে প্রকাশে আসি স্নেহ-মাখা আননে

৩

কিবে শান্তিময় মুখ—
হেরে দূরে যায় দুখ,
প্রফুল্ল কপোল বহি গড়ায় নয়ন-জল !
যত সাধ ছিল মনে,
পূর্ণ সেই শুভক্ষণে ;
বিয়োগ-কাতর-প্রাণ করুণায় সুশীতল

৪

সে অবধি স্বপ্ন-প্রায়
সদাই দেখিতে পায়
পত্নীর করুণছায়া বেড়াইছে কাছে কাছে,

চারিদিকে মৃদুমন্দ
অপূর্ব ফুলের গন্ধ,
করুণ নয়ন দুটি মুখ-পানে চেয়ে আছে।

৫

স্বর্গ সর্বসুখময়
সতীদের পিত্রালয়,
সে আদরে তত স্নেহে তবুও টেঁকে না মন,
থেকে থেকে ক্ষণে ক্ষণে
কার মুখ পড়ে মনে,
কার তরে পাগলিনী! ধরাতলে বিচরণ?

৬

"মিতং দদাতি হি পিতা মিতং ভ্রাতা মিতং সুতঃ।
অমিতস্য তু দাতারং ভর্তারং কা ন পূজয়েৎ?"
অহহ পবিত্র ভাষা!
কি উদাত্ত ভালবাসা!
কে দিল উত্তর? আহা, কোন্ দেবী নাহি জানি!
এ যে রামায়ণ-কথা
সে যে সীতা স্বর্ণলতা,
কন্যা কবি বাল্মীকির,
পতি তাঁর রঘুবীর,
এ শ্লোক সীতার মুখে
শুনেছি মনের সুখে।
আজি সেই শ্লোকগান
কেন চমকায় প্রাণ?
কথা কয় বাতাসে কি?
একি, একি, একি দেখি!

আধ আধ বিভাসিত কার এ প্রতিমাখানি—
আকাশে সুন্দরী শ্যামা কার এ প্রতিমাখানি ?

৭

তুমি প্রভাতের উষা,
স্বর্গের ললাট-ভূষা,
ব্রহ্মার মানস-সরে প্রফুল্ল নলিনী গো !
কেন মা পৃথিবী আসি
শুকায় মুখের হাসি !
সতী, সাধ্বী, পতিব্রতা,
কই তোর প্রফুল্লতা ?
কে ছিঁড়েছে আশালতা ? কি মানে মানিনী গো ?

৮

আজি মা কিসের তরে
হাসি নাই বিম্বাধরে,
মলিন বিষণ্ণ-মুখী, নেত্রে কেন অশ্রুজল ?
ভাল মানুষের ভালে
সুখ নাই কোন কালে ;
কঠোর নিয়তি, আরো কতই কাঁদাবি বল ?

৯

এস না ধরায়—আর, এস না ধরায় ।
পুরুষ কিম্ভূতমতি চেনে না তোমায় !
মনঃ প্রাণ যৌবন—
কি দিয়া পাইবে মন !
পশুর মতন এরা নিতুই নূতন চায় ।
এস না ধরায় !

১০

গোলাপ ফুলের চেয়ে
সুন্দর, যুবতী মেয়ে,
মনের উল্লাসে হাসে প্রফুল্ল-নলিনী ;
সেই পুণ্য-প্রতিমায়
আহা কি সৌন্দর্য ভায় !
জুড়াতে মানব-হৃদি
কি নিধি দিয়েছে বিধি !
পরম আনন্দ ভরে
পুণ্যাত্মা দর্শন করে ;
কুরসিক পুরুষের কি ঘোর চাহনি !

১১

সরল হৃদয় লুটি
এ ফুলে ও ফুলে ছুটি
ভ্রমর কলঙ্ক-কালো উড়িয়া বেড়ায়,
গুণ গুণ রবে ওর
বিষাক্ত মদের ঘোর,
ও নহে কাহারো পতি ;
কেন গো দাঁড়ায়ে সতি !
যাও মা অমরাবতী, এস না ধরায় !—
আর এস না ধরায় !

১২

দুর্বহ প্রেমের ভার,
যদি না বহিতে পার,
ঢেলে দাও আকাশে, বাতাসে, ধরাতলে !
মিটায়ে মনের সাধ
ঢালিয়া দিয়াছে চাঁদ
জগত-জুড়ানো হাসি ;
প্রাণের অমৃতরাশি
ঢেলে দাও মানবের তপ্ত অশ্রুজলে !

[সাধের আসন, দশম সর্গ ।

পরিশিষ্ট—২

কাদম্বরী দেবীর উদ্দেশে রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থোৎসর্গ

১। ভগ্নহৃদয়

(ক) সাময়িক-পত্রিকায় প্রকাশকালে :

উপহার

রাগিনী—ছায়ানট

তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা।
এ সমুদ্রে আর কভু হব নাকো পথহারা।
যেথা আমি যাই নাকো, তুমি প্রকাশিত থাকো
আকুল এ আঁখি 'পরে ঢাল' গো আলোকধারা।
ও মু'খানি সদা মনে জাগিতেছে সংগোপনে
আঁধার হৃদয় মাঝে দেবীর প্রতিমা-পারা।
কখনো বিপথে যদি ভ্রমিতে চায় এ হৃদি
অমনি ও মুখ হেরি শরমে সে হয় সারা।
চরণে দিনু গো আনি— এ ভগ্ন-হৃদয়খানি
চরণ রঞ্জিবে তব এ হৃদি-শোণিতধারা।

ভারতী, কার্তিক ১২৮৭

(খ) গ্রন্থাকারে প্রকাশকালে :

উপহার

শ্রীমতী হে………………,

১

হৃদয়ের বনে বনে সূর্যমুখী শত শত
ওই মুখ পানে চেয়ে ফুটিয়া উঠেছে যত।
বেঁচে থাকে বেঁচে থাক্, শুকায় শুকায়ে যাক্,
ওই মুখপানে তারা চাহিয়া থাকিতে চায়,

বেলা অবসান হবে, মুদিয়া আসিবে যবে
ওই মুখ চেয়ে যেন নীরবে ঝরিয়া যায়!

২

জীবন-সমুদ্রে তব জীবন তটিনী মোর
মিশায়েছি একেবারে আনন্দ হইয়ে ভোর,
সন্ধ্যার বাতাস লাগি ঊর্মি যত উঠে জাগি,
অথবা তরঙ্গ উঠে ঝটিকায় আকুলিয়া,
জানে বা না জানে কেউ, জীবনের প্রতি ঢেউ
মিশিবে—বিরাম পাবে—তোমার চরণে গিয়া

৩

হয়ত জান না, দেবি, অদৃশ্য বাঁধন দিয়া
নিয়মিত পথে এক ফিরাইছ মোর হিয়া।
গেছি দূরে, গেছি কাছে, সেই আকর্ষণ আছে,
পথভ্রষ্ট হই নাক তাহারি অটল বলে,
নহিলে হৃদয় মম ছিন্ন ধূমকেতু সম
দিশাহারা হইত সে অনন্ত আকাশ তলে!

৪

আজ সাগরের তীরে দাঁড়ায়ে তোমার কাছে
পরপারে মেঘাচ্ছন্ন অন্ধকার দেশ আছে;
দিবস ফুরাবে যবে সে দেশে যাইতে হবে,
এ পারে ফেলিয়া যাব আমার তপন শশী,
ফুরাইবে গীত গান, অবসাদে ম্রিয়মান,
সুখ শান্তি অবসান কাঁদিব আঁধারে বসি!

৫

স্নেহের অরুণালোকে খুলিয়া হৃদয় প্রাণ,
এ পারে দাঁড়ায়ে, দেবি, গাহিনু যে শেষ গান,

তোমারি মনের ছায় সে গান আশ্রয় চায়,
একটি নয়ন জল তাহারে করিও দান।
আজিকে বিদায় তবে, আবার কি দেখা হবে,
পাইয়া স্নেহের আলো হৃদয় গাহিবে গান ?

গ্রন্থপ্রকাশ : আষাঢ় ১২৮৮

২। সন্ধ্যাসংগীত

উপহার

[গ্রন্থের সর্বশেষ কবিতা]

ভুলে গেছি, কবে তুমি ছেলেবেলা একদিন
মরমের কাছে এয়েছিলে,
স্নেহময়, ছায়াময়, সন্ধ্যাময় আঁখি মেলি
একবার শুধু চেয়েছিলে,
স্তরে স্তরে এ হৃদয় হয়ে গেল অনাবৃত,
হৃদয়ের দিশি দিশ হয়ে গেল উদ্ঘাটিত,
একে একে শত শত ফুটিতে লাগিল তারা,
তারকা-অরণ্য মাঝে নয়ন হইল হারা !
বুঝি গো সন্ধ্যার কাছে, শিখেছে সন্ধ্যার মায়া
ওই আঁখি দুটি,—
চাহিলে হৃদয় পানে মরমেতে পড়ে ছায়া,
তারা উঠে ফুটি !
আগে কে জানিত বল কত কি লুকান' ছিল
হৃদয়-নিভৃতে,
তোমার নয়ন দিয়া আমার নিজের হিয়া
পাইনু দেখিতে !
কখনো গাওনি তুমি, কেবল নীরবে রহি
শিখায়েছ গান,
স্বপ্নময় শান্তিময় পূরবী রাগিনী তানে
বাঁধিয়াছ প্রাণ।

আকাশের পানে চাই— সেই স্বরে গান গাই—
একেলা বসিয়া!
একে একে স্বরগুলি, অনন্তে হারায়ে যায়
আঁধারে পশিয়া!

বল দেখি কত দিন আসনি এ শূন্য প্রাণে,
বল দেখি কত দিন চাওনি হৃদয় পানে,—
বল দেখি কত দিন শোননি এ মোর গান,
তবে সখি গান-গাওয়া হল বুঝি অবসান!

বল মোরে, বল দেখি, এ আমার গানগুলি
কেন আর ভাল নাহি লাগে,
প্রাণের রাগিনী শুনি নয়নে জাগে না আভা
কেন সখি কিসের বিরাগে?
যে রাগ শিখায়েছিলে সে কি আমি গেছি ভুলে?
তার সাথে মিলিছে না স্বর?
তাই কি আস না প্রাণে, তাই কি শোন না গান,
তাই সখি, রয়েছ কি দূর!
ভাল সখি, আবার শিখাও,—
আর বার মুখপানে চাও,
একবার ফেল অশ্রুজল,
একবার শোন গানগুলি,
তাহলে পুরাণ' স্বর আবার পড়িবে মনে,
আর কভু যাইব না ভুলি!

সেই পুরাতন চোখে মাঝে মাঝে চেয়ো সখি
উজলিয়া স্মৃতির মন্দির,
সেই পুরাতন প্রাণে মাঝে মাঝে এসো সখি
শূন্য আছে প্রাণের কুটীর।

নহিলে আঁধার মেঘরাশি
হৃদয়ের আলোক নিভাবে,
একে একে ভুলে যাব সুর,
গান গাওয়া সাঙ্গ হয়ে যাবে।

প্রথম সংস্করণ, ১২৮৮

৩। য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র

উপহার

ভাই জ্যোতিদাদা,

ইংলন্ডে যাঁহাকে সর্বাপেক্ষা অধিক মনে পড়িত, তাঁহারই হস্তে এই পুস্তকটি সমর্পণ করিলাম।

স্নেহভাজন
রবি

গ্রন্থপ্রকাশ ১২৮৮

৪। বিবিধ প্রসঙ্গ

[গ্রন্থের শেষ রচনা 'সমাপনে'র শেষ স্তবক]

আমার পাঠকদিগের মধ্যে একজন লোককে বিশেষ করিয়া আমার এই ভাবগুলি উৎসর্গ করিতেছি। এ ভাবগুলির সহিত তোমাকে আরও কিছু দিলাম, সে তুমিই দেখিতে পাইবে! সেই গঙ্গার ধার মনে পড়ে? সেই নিস্তব্ধ নিশীথ? সেই জ্যোৎস্নালোক? সেই দুই জনে মিলিয়া কল্পনার রাজ্যে বিচরণ? সেই মৃদু গম্ভীর স্বরে গম্ভীর আলোচনা? সেই দুই জনে স্তব্ধ হইয়া নীরবে বসিয়া থাকা? সেই প্রভাতের বাতাস, সেই সন্ধ্যার ছায়া! এক দিন সেই ঘনঘোর বর্ষার মেঘ, শ্রাবণের বর্ষণ, বিদ্যাপতির গান? তাহারা সব চলিয়া গিয়াছে! কিন্তু আমার এই ভাবগুলির মধ্যে তাহাদের ইতিহাস লেখা রহিল। এই লেখাগুলির মধ্যে কিছু দিনের গোটাকতক সুখদুঃখ লুকাইয়া রাখিলাম, এক একদিন খুলিয়া তুমি তাহাদের স্নেহের চক্ষে দেখিও, তুমি ছাড়া আর কেহ তাহাদিগকে দেখিতে পাইবে না। আমার এই লেখার মধ্যে লেখা রহিল, এক লেখা তুমি আমি পড়িব, আর এক লেখা আর সকলে পড়িবে।

গ্রন্থপ্রকাশ : ভাদ্র ১২৯০

৫। ছবি ও গান

উৎসর্গ

গত বৎসরকার বসন্তের ফুল লইয়া এ বৎসরকার বসন্তে মালা গাঁথিলাম। যাঁহার নয়ন-কিরণে প্রতিদিন প্রভাতে এই ফুলগুলি একটি একটি করিয়া ফুটিয়া উঠিত, তাঁহারি চরণে ইহাদিগকে উৎসর্গ করিলাম।

গ্রন্থপ্রকাশ : ফাল্গুন ১২৯০

৬। প্রকৃতির প্রতিশোধ

উৎসর্গ

তোমাকে দিলাম

গ্রন্থপ্রকাশ : ১২৯১

৭। শৈশব সংগীত

উপহার

এ কবিতাগুলিও তোমাকে দিলাম। বহুকাল হইল, তোমার কাছে বসিয়াই লিখিতাম, তোমাকেই শুনাইতাম। সেই সমস্ত স্নেহের স্মৃতি ইহাদের মধ্যে বিরাজ করিতেছে। তাই, মনে হইতেছে তুমি যেখানেই থাক না কেন, এ লেখাগুলি তোমার চোখে পড়িবেই।

গ্রন্থপ্রকাশ : জ্যৈষ্ঠ ১২৯১

৮। ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী

উৎসর্গ

ভানুসিংহের কবিতাগুলি ছাপাইতে তুমি আমাকে অনেক বার অনুরোধ করিয়াছিলে। তখন সে অনুরোধ পালন করি নাই। আজ ছাপাইয়াছি, আজ তুমি আর দেখিতে পাইলে না।

গ্রন্থপ্রকাশ : ১২৯১

৯। মানসী

উপহার

নিভৃত এ চিত্তমাঝে নিমেষে নিমেষে বাজে
জগতের তরঙ্গ-আঘাত,

ধ্বনিত হৃদয়ে তাই মুহূর্ত বিরাম নাই
নিদ্রাহীন সারা দিনরাত।

* * *

এ চিরজীবন তাই আর কিছু কাজ নাই
রচি শুধু অসীমের সীমা;
আশা দিয়ে ভাষা দিয়ে তাহে ভালোবাসা দিয়ে
গড়ে তুলি মানসী-প্রতিমা।

বাহিরে পাঠায় বিশ্ব কত গন্ধ গান দৃশ্য
সঙ্গীহারা সৌন্দর্যের বেশে,
বিরহী সে ঘুরে ঘুরে ব্যথাভরা কত সুরে
কাঁদে হৃদয়ের দ্বারে এসে।

* * *

অন্তরে বাহিরে সেই ব্যাকুলিত মিলনেই
কবির একান্ত সুখোচ্ছ্বাস।
সেই আনন্দ-মুহূর্তগুলি তব করে দিনু তুলি
সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণের প্রকাশ।

৩০ বৈশাখ, ১২৯৭

১০। চৈতালি

উৎসর্গ

আজি মোর দ্রাক্ষাকুঞ্জবনে,
গুচ্ছ গুচ্ছ ধরিয়াছে ফল।
পরিপূর্ণ বেদনার ভরে
মুহূর্তেই বুঝি ফেটে পড়ে,
বসন্তের দুরন্ত বাতাসে
নুয়ে বুঝি নমিবে ভূতল,
রসভরে অসহ উচ্ছ্বাসে
থরে থরে ফলিয়াছে ফল।

* * *

শুক্তিরক্ত নখরে বিক্ষত—
ছিন্ন করি ফেল বৃন্তগুলি,
সুখাবেশে বসি লতামূলে
সারাবেলা অলস অঙ্গুলে
বৃথা কাজে যেন অন্য মনে
খেলাচ্ছলে লহ তুলি তুলি
তব ওষ্ঠে দশন-দংশনে
টুটে যাক পূর্ণ ফলগুলি।

* * *

১৩ চৈত্র, ১৩০২

পরিশিষ্ট—৩

পরিশোধন ও পরিমার্জন

পৃষ্ঠা ৪, স্যাঁৎ-বাস্ত্-এর স্থলে হবে স্যাঁৎ-ব্যেভ্।

পৃ° ২৮, সত্যেন্দ্রনাথের জন্ম ১৮৪২ ; বিলাতযাত্রা ১৮৬২ মার্চ, সিবিল সার্ভিসে প্রবেশ ১৮৬৪ জুলাই।

পৃ° ৪৩, একুশ পংক্তির পরে নিম্নলিখিত অংশ যুক্ত হবে :—

জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে সে আমলের মজলিস ও বৈঠক সম্পর্কে অবনীন্দ্রনাথ বলছেন :

"সে আমলে এ মজলিস আর বৈঠক ছিল সত্যি, জীবন্ত ; আমরাও তার শেষ রেশটুকু দেখেছি। ও বাড়িতে বসত বড় জ্যাঠামশাইদের বৈঠক সকালে ; বাবামশাই, বড় জ্যাঠামশাই সবাই বসতেন দক্ষিণের বারান্দায়। বড় জ্যাঠা-মশাই 'স্বপ্নপ্রয়াণ' লিখেছেন, তাই নিয়ে অবিরত চলছে সাহিত্য-আলোচনা ; দার্শনিকেরা আসতেন, পণ্ডিতেরা আসতেন, নিজের নিজের সাধনা নিয়ে আসর জমিয়ে সবাই বসতেন ; অবাধে বইত সাহিত্যের হাওয়া। ছেলেবেলায় উঁকিঝুঁকি মেরে আমিও দেখেছি এই বৈঠকের চেহারা।

সন্ধ্যেয় বসত জ্যোতিকাকামশাইদের বৈঠক। এ বৈঠকের চেহারা ছিল আর এক রকম ; সেখানে আসতেন তারক পালিত, ছোট অক্ষয়বাবু, কবি

বিহারীলাল। রবিকা বয়সে ছোট হলেও এই বৈঠকেই যোগ দিতেন। এখানে মেয়েদেরও প্রবেশাধিকার ছিল। নতুন কাকীমা অর্থাৎ জ্যোতিকার স্ত্রী ছিলেন এই বৈঠকের কর্ত্রী। এখানে চলত গান, বাজনা, কবিতার পর কবিতা পাঠ।"—'আবহাওয়া', অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'শনিবারের চিঠি' আশ্বিন ১৩৪৮, পৃ° ৭৪২-৪৩।

পৃ° ৯৬, শেষ পংক্তি : 'রবীন্দ্র-রচনাবলী-১৭' হবে 'রবীন্দ্র-রচনাবলী-১৬'।

পৃ° ১৪২, পংক্তি ৯ : 'প্রায় চল্লিশ হাজার'-এর স্থলে হবে 'হাজার হাজার'।

পৃ° ১৭১, শেষ পংক্তি : 'সেনস-ম্পাদিত'-এর স্থলে হবে 'সেন-সম্পাদিত'।

পৃ° ২০১, পংক্তি ২০ : 'ভাগবত'-এর স্থলে হবে 'ভাবগত'।

পৃ° ২০৩, ২৭ পংক্তি : 'প্রকাশের' হবে 'প্রবেশের'।

পৃ° ২১৩, দ্বাদশ পংক্তির পরে নিম্নলিখিত অংশ যুক্ত হবে :

'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' এবং 'অভিমানিনী নির্ঝরিণী'র 'আজন্ম বন্ধন'-এর হেতু যে 'ভারতীতে একত্র প্রকাশ' নয়, তা বলাই বাহুল্য। অত তুচ্ছ কারণে রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যগ্রন্থে অন্যের রচনাকে স্থান দেবেন, এ কথা অবিশ্বাস্য। 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ'-এর 'প্রসঙ্গক্রমে' 'অভিমানিনী নির্ঝরিণী' লেখা হয়েছিল—এই কথাই সত্য। নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নিজের হৃদয়বাসনার কথা অভিব্যক্ত হয়েছে, আর অভিমানিনী নির্ঝরিণীতে ভাষা পেয়েছে কাদম্বরী দেবীর হৃদয়বেদনা। এই প্রসঙ্গেই দুটি কবিতার আজন্ম বন্ধন স্থাপিত হয়েছে। এই গ্রন্থের ১৯৫ পৃষ্ঠায় 'বিবিধ প্রসঙ্গে'র আলোচনায় আমরা দেখিয়েছি যে, রবীন্দ্রনাথ 'বিবিধ প্রসঙ্গে'র ভাবগুলিকে একলা তাঁরই ভাব বলেন নি ; বলেছেন, "আমাদের এই ভাবগুলি।" বলেছেন, এই ভাবগুলির মধ্যে "আরও কিছু" আছে যা শুধু দুজনের। দুজনের, অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ ও কাদম্বরী দেবীর। বস্তুত, 'বিবিধ প্রসঙ্গে'র অনেক কথাই কাদম্বরী দেবীর। "মাছ ধরা"র রূপকটি অনুসরণ করে বলা যায়, কাদম্বরী দেবীর মানস-সরোবরে কথোপকথনের চার ফেলে রবীন্দ্রনাথ নিজের লেখনী-রূপ ছিপের সাহায্যে অনেক ভাব-মৎস্য আহরণ করেছেন। স্বামীর বিরুদ্ধে কাদম্বরী দেবীর অভিযোগ এবং তজ্জনিত অভিমান অন্তরঙ্গজনের অজানা ছিল না। কবি অক্ষয় চৌধুরী সবই জানতেন। তাই রবীন্দ্রনাথ যখন নির্ঝরের রূপকে তাঁর নিজের কথা বললেন, তখন অক্ষয় চৌধুরী সেই রূপকটির সাহায্যেই কাদম্বরী

দেবীর হৃদয়বেদনাকে ভাষা দিলেন। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে, রবীন্দ্রনাথ 'শৈশব সংগীত'-এর "অপ্সরা-প্রেম" কবিতায় [ভারতীতে ১২৮৫ সালের ফাল্গুনে প্রকাশিত] অপ্সরার গীতে [কেন গো সাগর এমন চপল, এমন অধীর প্রাণ] সাগর ও তটিনীর রূপকেই প্রেমের গান গেয়েছেন।—

তটিনীরে আমি দিব গো শিখায়ে
না হবে তাহার আন,
তারা গাহিবে প্রেমের গান,
তারা কানন হইতে আনিবে কুসুম
করিবে তোমারে দান—
তারা হৃদয় হইতে শত প্রেম-ধারা
করাবে তোমারে পান!
তবে থাম গো সাগর—থাম গো,
কেন হয়েছ অধীর প্রাণ?

[রবীন্দ্র-রচনাবলী, অলচিত সংগ্রহ-১, পৃ° ৪৮২-৮৩।

পৃ° ২৭৬, প্রথম অনুচ্ছেদের শেষে নিম্নলিখিত অংশটি যুক্ত হবে:

কাদম্বরী দেবী যে অনেক দিন ধরেই আত্মহত্যার কথা চিন্তা করছিলেন তার সারস্বত প্রমাণ রয়েছে 'সন্ধ্যাসংগীতে'র "তারকার আত্মহত্যা" এবং 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'র "মরণ রে তুহুঁ মম শ্যাম সমান" কবিতায়। "তারকার আত্মহত্যা" কবিতাটি ভারতী পত্রিকায় ১২৮৮ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। আর তার দু মাস পরে, শ্রাবণে বেরোয় "মরণ রে তুহুঁ মম" কবিতাটি। "তারকার আত্মহত্যা"য় কবি বলছেন:

জ্যোতির্ময় তীর হতে আঁধার সাগরে
ঝাঁপায়ে পড়িল এক তারা,
একেবারে উন্মাদের পারা।

* * *

কেন গো কী হয়েছিল তার?
একবার সুধালে না কেহ—
কী লাগি সে তেয়াগিল দেহ?

যদি কেহ সুধাইত
আমি জানি কী যে সে কহিত।
যত দিন বেঁচে ছিল
আমি জানি কী তারে দহিত।
সে কেবল হাসির যন্ত্রণা,
আর কিছু না!
জলন্ত অঙ্গার খণ্ড, ঢাকিতে আঁধার হৃদি
অনিবার হাসিতেই রহে,
যত হাসে ততই সে দহে।
তেমনি—তেমনি তারে হাসির অনল
দারুণ উজ্জ্বল—
দহিত দহিত তারে দহিত কেবল।
জ্যোতির্ময় তারাপূর্ণ বিজন তেয়াগি,
তাই আজ ছুটেছে সে নিতান্ত মনের ক্লেশে
আঁধারের তারাহীন বিজনের লাগি।
কেন গো তোমরা যত তারা
উপহাস করি তারে হাসিছ অমন ধারা?
তোমাদের হয় নি তো ক্ষতি,
যেমন আছিল আগে তেমনি রয়েছে জ্যোতি।

এই কবিতার সঙ্গে "মরণ রে তুহুঁ মম শ্যাম সমান" কবিতাটি মিলিয়ে পড়লেই বুঝতে পারা যাবে, দুটি কবিতা একই উৎস থেকে উৎসারিত। আমরা ২১৯ পৃষ্ঠায় 'মরণ রে তুহুঁ মম' কবিতাটির আলোচনা করেছি। রাধা এখানে শুধু বিরহিণীই নন, তিনি অভিমানিনী। মাধবের উপর দুর্জয় অভিমানে মরণকে সম্বোধন করে তিনি বলছেন:

চিরবিসরল যব নিরদয় মাধব
তুহুঁ ন ভইবি মোয় বাম॥

মূলত ১২৮৮ সালে লেখা 'বিবিধ প্রসঙ্গে'র বিবিধ রচনায় মুখ্যত প্রেমের বিচিত্র আলোচনার সঙ্গে মৃত্যুচেতনাও দেখা দিয়েছে। পৌষ মাসে প্রকাশিত "জগতের জন্ম মৃত্যু" প্রসঙ্গে বলছেন, "এক জন লোক যখন মরিয়া গেল,

তখন আমরা ভাবি না যে একটি জগৎ নিভিয়া গেল। একটি নীলাকাশ গেল, একটি সৌরপরিবার গেল, একটি তরুলতাপশুপক্ষীশোভিত পৃথিবী গেল।" এই প্রসঙ্গকেই বিশদতর করে রবীন্দ্রনাথ পৌষেই প্রকাশিত "অসংখ্য জগৎ" শিরোনামায় লিখছেন, "এক জন লোক মরিয়া গেল, আমরা সাধারণতঃ মনে করি, সেই গেল তাহার সহিত আর কিছু গেল না। এরূপ ভ্রমে পড়িবার প্রধান কারণ এই যে, আমরা সচরাচর মনে করি যে, সেও যে জগতে আছে আমরাও সেই জগতে আছি; সেও যাহা দেখিতেছে, আমরাও তাহাই দেখিতেছি। কিন্তু সেই অনুমানটাই ভ্রম নাকি, এই নিমিত্ত সমস্ত যুক্তিতে ভ্রম পৌঁছিয়াছে। * * * অতএব প্রতি লোকের সঙ্গে সঙ্গে শত শত চন্দ্র সূর্য জন্মগ্রহণ করে ও শত শত চন্দ্র সূর্য মরিয়া যায়।" [রবীন্দ্র-রচনাবলী, অচলিত-১, পৃ° ৩৮৪-৮৫]

এই পর্যায়ে, অর্থাৎ কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুর পূর্বে, রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু-চিন্তার শেষ সাক্ষী 'আলোচনা' গ্রন্থে প্রকাশিত "ধর্ম" প্রবন্ধটি। প্রবন্ধটি 'ভারতী'তে ১২৯০ সালের চৈত্র মাসে প্রকাশিত হয়। ওর মধ্যে শুধু যে মৃত্যুচিন্তাই ভাষা পেয়েছে এমন নয়, প্রবন্ধটি যেন কাদম্বরী দেবীর মুখোমুখি বসে তাঁকে আত্মহননের 'অধর্ম' থেকে প্রতিনিবৃত্ত করবার জন্যে রবীন্দ্রনাথের শেষ সকাতর মিনতি। প্রবন্ধটিতে যুক্তিপরম্পরায় গ্রথিত বাচ্যাতিরিক্ত অর্থের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করলে আত্মহননের হেতুনির্দেশও করা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথ বলছেন:

"একেবারেই প্রেমের যোগ্য নহে এমন জীব কোথায়! যত বড়ই পাপী অসাধু কুশ্রী সে হউক না কেন, তাহার মা ত তাহাকে ভালবাসে। অতএব দেখিতেছি, তাহাকেও ভালবাসা যায়, তবে আমি ভালবাসিতে না পারি সে আমরা অসম্পূর্ণতা।

"যেমন জড়ই বল আর প্রাণীই বল সকলের মধ্যে এক মহা চৈতন্যের নিয়ম কার্য করিতেছে, যাহাতে করিয়া উত্তরোত্তর প্রাণ অভিব্যক্ত হইয়া উঠিতেছে, তেমনি পাপীই বল আর সাধুই বল সকলেরই মধ্যে অসীম পুণ্যের এক আদর্শ বর্ত্তমান থাকিয়া কার্য করিতেছে। স্বর্গের পাথেয় সকলেরই কাছে রহিয়াছে, কেহই তাহা হইতে বঞ্চিত নহে। * *

"অতএব পাপ বলিয়া যে একটা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে তাহা নহে। * * *

"বিশ্ব-জগতের মধ্য দিয়া আমাদের মধ্যে যে দৃঢ়সূত্র প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে ইহাই ছিন্ন করিয়া ফেলা মুক্তি, এইরূপ কথা শুনা যায়। কিন্তু ছিন্ন করে কাহার সাধ্য। আমি আর জগৎ কি স্বতন্ত্র? কেবল একটা ঘরগড়া বাঁধনে বাঁধা? সেইটে ছিঁড়িয়া ফেলিলেই আমি বাহির হইয়া যাইব? আমি ত জগৎ-ছাড়া নই, জগৎ আমা-ছাড়া নয়। * * *

"জগতের একটি প্রধান ধর্ম পরার্থপরতা। স্বার্থপরতা জগতের ধর্ম-বিরুদ্ধ।...পরের জন্য কাজ করিতেই হইবে তা ইচ্ছা কর আর না কর।... তুমি ত দুই দিনে পৃথিবী হইতে সরিয়া পড়িবে, কিন্তু তোমার জীবনের সমস্তটাই পৃথিবীর জন্য রাখিয়া যাইতে হইবে—তুমি মরিয়া গেলে বলিয়া তোমার জীবনের এক মুহূর্ত হইতে ধরণীকে বঞ্চিত করিতে পারিবে না, প্রকৃতির আইন এমনি কড়াক্কড়। * *

"নিতান্ত ঘৃণা করিয়া আর কাহাকেও একেবারে পর মনে করা শোভা পায় না। * * *

"অনেক লোক আছেন, তাঁহারা জগতের সর্বত্রই অমঙ্গল দেখেন। তাঁহাদের মুখে জগতের অবস্থা যেরূপ শুনা যায়, তাহাতে তাহার আর এক মুহূর্ত টিঁকিয়া থাকিবার কথা নহে। সর্বত্রই যে শোক তাপ দুঃখ-যন্ত্রণা দেখিতেছি একথা অস্বীকার করা যায় না, কিন্তু তবুও ত জগতের সংগীত থামে নাই! তাহার কারণ, জগতের প্রাণের মধ্যে গভীর আনন্দ বিরাজ করিতেছে। সে আনন্দ-আলোক কিছুতেই আচ্ছন্ন করিতে পারিতেছে না, বরঞ্চ যত কিছু শোক তাপ সেই দীপ্ত আনন্দে বিলীন হইয়া যাইতেছে।"

বলাই বাহুল্য, তত্ত্বচিন্তা হিসাবে প্রবন্ধটির একটি সাধারণ অর্থ রয়েছে। কিন্তু কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুর সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে তর্ক ও যুক্তিগুলির একটি বিশেষ অর্থই সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। [রবীন্দ্র-রচনাবলী, অচলিত-২, পৃ° ১৭-২৫]

পৃ° ২৮৩। পঁচিশ পংক্তিতে "বরং মৃত্যুর মধ্য দিয়েই তিনি অমরত্ব লাভ করেছেন।"—এই বাক্যের পর নিম্নলিখিত অংশ যুক্ত হবে :—

'আলোচনা'র "ডুব দেওয়া" প্রবন্ধটি 'ভারতী' পত্রিকায় ১২৯১ সালের বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। বৈশাখ সংখ্যা প্রকাশের উদ্যোগ যখন চলছিল তখন অকস্মাৎ কাদম্বরী দেবী মৃত্যু বরণ করলেন। ফলে পত্রিকা-প্রকাশে বিলম্ব ঘটল, এবং বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা একসঙ্গে প্রকাশিত হল। "ডুব

দেওয়া" কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুর পূর্বেই রচিত হয়েছিল, কিন্তু এর শেষ অংশটি যুক্ত হয় মৃত্যুর পরে। এই অংশের নাম "প্রেমের শিক্ষা"। রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, "একজন যে-সে লোক মরিয়া গেলে আমরা সহজেই মনে করিতে পারি যে, এ লোকটা একেবারে ধ্বংস হইয়া গেল; কারণ সে আমার নিকট এত ক্ষুদ্র! কিন্তু একজন প্রিয়ব্যক্তির মরণে আমাদের মনে হয় এ কখনো মরিতে পারে না। কারণ তাহার মধ্যে আমরা অসীমতা দেখিতে পাইয়াছি। যাহাকে এত বেশি ভালবাসিয়াছি সে কি একেবারে "নাই" হইয়া যাইতে পারে! সে তো কম লোক নয়! তাহাকে যতখানি হৃদয় দিয়াছি ততখানিই সে গ্রহণ করিয়াছে, তাহার উপরে যতই আশা স্থাপন করিয়াছি ততই আশা ফুরায় নি, রজ্জুবদ্ধ লৌহখণ্ডের মত আমার সমস্তটা তাহার মধ্যে ফেলিয়া মাপিতে চেষ্টা করিয়াছি, তাহার তল পাই নাই। যাহার নিকট হইতে সীমা যতদূরে তাহার নিকট হইতে মৃত্যুও তত দূরে। অতএব এতখানি বিশালতার এক মুহূর্তের মধ্যে সর্বতোভাবে অন্তর্ধান এ কখনো সম্ভবপর নহে। প্রেম আমাদের হৃদয়ের ভিতর হইতে এই কথা বলিতেছে, তর্ক যাহা বলে বলুক।" [রবীন্দ্র-রচনাবলী, অচলিত-২, পৃ° ১৬-১৭]

এই প্রবন্ধের দু মাস পরে আষাঢ় সংখ্যা 'ভারতী'তে "সৌন্দর্য ও প্রেম" নামে আরেকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তার শেষাংশের শিরোনামা "লক্ষ্মী"। এই অংশের লক্ষ্মী-বন্দনায় রবীন্দ্রনাথের মানসলক্ষ্মীই সৌন্দর্যলক্ষ্মী-রূপে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছেন। রবীন্দ্রনাথ বলছেন, "লক্ষ্মী, তুমি শ্রী, তুমি সৌন্দর্য, আইস, তুমি আমাদের হৃদয়-কমলাসনে অধিষ্ঠান কর। * * * তুমি বিশ্বচরাচরকে তোমার বিকশিত কমলদলের মধ্যে আচ্ছন্ন করিয়া অনুপম সুগন্ধে মগ্ন করিয়া রাখিতে চাও। সেই সুগন্ধ এখন পাইতেছি; অশ্রুপূর্ণনেত্রে বলিতেছি, "কোথায় গো! সেই রাঙা চরণ দুখানি আমার হৃদয়ের মধ্যে একবার স্থাপন কর, তোমার স্নেহহস্তের কোমল স্পর্শে আমার হৃদয়ের পাষাণ-কঠিনতা দূর কর।" তোমার চরণ-রেণুর সুগন্ধে সুবাসিত হইয়া আমার হৃদয়ের পুষ্পগুলি তোমার জগতে তোমার সুগন্ধ দান করিতে থাকুক!" [রবীন্দ্র-রচনাবলী, অচলিত-২, পৃ° ৩৬]

পৃ° ৩০৩। ২১-২২ পংক্তি: "এই অনুভূতির প্রথম প্রকাশ রয়েছে ১২৯২ সালের বৈশাখে প্রকাশিত "নূতন" কবিতায়।" বস্তুত, "নূতন" কবিতা

প্রকাশের কয়েক মাস পূর্বে, ১২৯১ সালের ভাদ্রের 'ভারতী'তে "তোমাকে" শীর্ষক একটি কবিতা প্রকাশিত হয়। কবিতা-শেষে লেখকের নামের স্থলে একটি 'উ' অক্ষর ছিল। শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস এই কবিতাটিকে "রবীন্দ্রকাব্যে প্রথম প্রিয়া-সম্ভাষণ" বলেছেন। তিনি আরো বলেছেন, "'তোমাকে' কবিতার প্রস্তাবনাস্বরূপ নামস্বাক্ষরহীন আরেকটি কবিতা যোজিত হইয়াছে, তাহার নাম দেওয়া হইয়াছে 'নীরব নিশীথে'। * * * এই 'নীরব নিশীথে' ও 'তোমাকে' কবিতা দুটিকে অন্য নাম দিলে ইহাদের মর্ম পরিস্ফুটতর হইবে। 'নীরব নিশীথে'=পুরাতন, অন্ধকার, মরণ বা কাদম্বরী দেবী এবং 'তোমাকে' =নূতন, জ্যোৎস্না, জীবন বা মৃণালিনী দেবী।" [দ্রষ্টব্য, 'রবীন্দ্রকাব্যে প্রথম প্রিয়া-সম্ভাষণ', 'শনিবারের চিঠি', আষাঢ় ১৩৬৭]

পৃ° ৩৪২। প্রথম পংক্তির 'চেনা চোখের জলের চেয়ে সে গভীর।' এই বাক্যের পরে নিম্নলিখিত অংশ যুক্ত হবে :

'পঞ্চভূত' গ্রন্থে "অপূর্ব রামায়ণ" নিবন্ধের সূচনায় রবীন্দ্রনাথ বলছেন, "বাড়িতে একটা শুভকার্য ছিল, তাই বিকালের দিকে অদূরবর্তী মঞ্চের উপর হইতে বারোয়াঁ রাগিণীতে নহবত বাজিতেছিল। ব্যোম অনেকক্ষণ মুদ্রিত চক্ষে থাকিয়া হঠাৎ চক্ষু খুলিয়া বলিতে আরম্ভ করিল—আমাদের এই সকল দেশীয় রাগিণীর মধ্যে একটা পরিব্যাপ্ত মৃত্যুশোকের ভাব আছে; সুরগুলি কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতেছে, সংসারে কিছুই স্থায়ী হয় না। সংসারে সকলই অস্থায়ী, এ কথাটা সংসারীর পক্ষে নূতন নহে; প্রিয়ও নহে, ইহা একটা অটল কঠিন সত্য; কিন্তু তবু এটা বাঁশির মুখে শুনিতে এত ভালো লাগিতেছে কেন? কারণ, বাঁশিতে এই সর্বাপেক্ষা কঠোর সত্যটাকে সর্বাপেক্ষা সুমধুর করিয়া বলিতেছে—মনে হইতেছে মৃত্যুটা এই রাগিণীর মতো সকরুণ বটে কিন্তু এই রাগিণীর মতোই সুন্দর। জগৎসংসারের বক্ষের উপরে সর্বাপেক্ষা গুরুতম যে জগদ্দল পাথরটা চাপিয়া আছে এই গানের সুরে সেইটাকে কী এক মন্ত্রবলে লঘু করিয়া দিতেছে। এক জনের হৃদয়কুহর হইতে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিলে যে বেদনা চিৎকার হইয়া বাজিয়া উঠিত, ক্রন্দন হইয়া ফাটিয়া পড়িত, বাঁশি তাহাই সমস্ত জগতের মুখ হইতে ধ্বনিত করিয়া তুলিয়া এমন অগাধ করুণাপূর্ণ অথচ অনন্ত সান্ত্বনাময় রাগিণীর সৃষ্টি করিতেছে। [রবীন্দ্র-রচনাবলী-২, পৃ° ৬৩৬-৩৭।]

পৃ° ৩৪৯। পংক্তি ১৯। "দোসর" হবে "যথার্থ দোসর"।

পৃ° ৩৫৬। ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো:

"Victoria Ocampo was born in Buenos Aires of an old colonial family related to the most prominant figures of Argentine history and letters, and was brought up at home by French and English governesses. She was, early in life, attracted to French and English literatures, the knowledge of which was later deepened by her frequent stays in Europe. She is editor of *Sur*, a very well-known Spanish literary magazine, which she founded in 1931. Her contribution to Argentine letters consists of 15 books of critical essays, besides a large number of translations from English and French. * * * She is now Directora del Fondo Nacional de las Artes in Buenos Aires."

Rabindranath Tagore : A Centenary Volume, পৃ° ৫২২।

পৃ° ৩৬২। পংক্তি ১৬। 'ধনির' হবে 'ধ্বনির'।

পৃ° ৩৭১। 'সুনীল সাগরের শ্যামল কিনারে' গানটির রচনা-তারিখ ২ মার্চ ১৯৩০।

পৃ° ৪১৬। পংক্তি ১৯। 'উৎসর্জিত' হবে 'উৎসর্গীকৃত'।

পৃ° ৪৩১। প্রথম পংক্তি। 'লালনপালন করন' হবে 'লালনপালন করেন'।

এই গ্রন্থে রবীন্দ্র-জীবনীর প্রথম খণ্ড বৈশাখ ১৩৫৩ সংস্করণ, দ্বিতীয় খণ্ড মাঘ ১৩৫৫ সংস্করণ, তৃতীয় খণ্ড ১৩৫৯ এবং চতুর্থ খণ্ড শ্রাবণ ১৩৬৩ সংস্করণ ব্যবহৃত হয়েছে।

শব্দ-পঞ্জী

[উল্লেখ-পঞ্জীর অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তি গ্রন্থ অথবা রচনানাম গ্রন্থের যে পৃষ্ঠার অন্তর্ভুক্ত, শব্দ-পঞ্জীতে সেই পৃষ্ঠার উল্লেখ করা হয়েছে।]